কোরআন শরীফ

বাঙ্গলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তফছির

উপান

প্রথম খণ্ড

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী পাবলিশিং কোং
৯১নং আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

— সাড়ে চার টাকা —

মুদ্রাকর
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
৯১নং আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

بسم الله الرحمن الرحيم

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

নিশ্চয় আমার সব প্রার্থনা-সব উপাসনা, আমার সব সাধনা-সব কোর্‌বান, আমার সকল জীবন-সকল মরণ —সকল বিশ্বের স্বামী আল্লার নামে নিবেদিত

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ !

প্রভুহে !

নিজের দীন-দাসের পক্ষ হইতে ইহাকে কবূল কর নিশ্চয় তুমিই ত সম্যক্‌শ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা !

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا !

প্রভুহে !

যদি ভুলিয়া যাই বা ভুল করিয়া ফেলি—সেজন্য এই দুর্ব্বল দাসকে দায়ী করিও না !

আমীন !

নিবেদন

"মোস্তফা-চরিত" প্রকাশের পর হইতে কোর্‌আনের তফছির সঙ্কলনে ব্যাপৃত আছি। খোদার ফজলে, এই দীর্ঘকালের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে, আজ তাহার প্রথম খণ্ড সমাজকে উপহার দিতে সমর্থ হইলাম।

বিদেশী ভাষার এবং তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া আরবী সাহিত্যের বাঙ্গলা-অনুবাদ যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইহার মধ্যে আবার ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ আরও কঠিন, বিশেষতঃ কোর্‌আনের অনুবাদ খুবই দুঃসাধ্য। আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে এই দুঃসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি না-হইয়াছি, অভিজ্ঞ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

কোর্‌আনের তফছির বা টীকা সঙ্কলনে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেজন্য তাঁহাদের খেদমতে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। কিন্তু কাহারও অন্ধ অনুকরণ আমি কুত্রাপি করি নাই—এরূপ করিলে এই সময়ের মধ্যে কোর্‌আনের সম্পূর্ণ তফছির প্রকাশ করাও অসম্ভব হইত না। সমাজের জনসাধারণ বোধ হয় তাহারই আদর অধিক করিতেন। সত্য-উদ্ধার করাই আমার এ সাধনার একমাত্র লক্ষ্য এবং ইহার জন্য আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া যাইতেছি। এক শ্রেণীর অসতর্ক লেখকের কল্যাণে কোর্‌আনের প্রকৃত তফছির নানা প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। সেই আবর্জ্জনারাশি অপসারিত করিয়া কোর্‌আনের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে।

কোর্‌আনের অনুবাদ, তফছির এবং তৎসংক্রান্ত বিচারের ধারা কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার অনেক কথা আছে। আল্লাহ শক্তি দিলে, তফছির শেষ হওয়ার পর একখানা স্বতন্ত্র পুস্তকে তাহা প্রকাশ করার চেষ্টা পাইব।

মুছলমান বাঙ্গলাকে নিজেদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছে—আট শতাব্দী পূর্ব্বে। বিদেশাগত অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত, বাঙ্গলার বহু প্রাচীন অধিবাসী এছলাম গ্রহণ করিয়া মুছলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গলাই তাঁহাদের সকলের মাতৃভাষা এবং তাঁহাদের অন্তরের সব আদান প্রদান সম্ভব হয় একমাত্র এই মাতৃভাষারই মারফতে। এই মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা করার ফলে, প্রতিবেশীদিগের নিকট আমরা এছলামকে পরিচিত করিতে

পারি নাই। একদিকে আমাদের এই অভাব, অন্যদিকে খৃষ্টান লেখকগণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এছলামের বিকৃতরূপের শোচনীয় প্রাদুর্ভাব। ফলে এছলাম ও মুছলমান তাঁহাদের দৃষ্টিতে অতি নিকৃষ্ট এবং অতি ভয়ঙ্কররূপেই চিত্রিত হইয়া আছে। এই প্রকার অপরিচয়ের ও অপ-পরিচয়ের জন্য দেশে যে অকল্যাণের সৃষ্টি হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা অতিশয় শোচনীয়। আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টার ফলে এই অকল্যাণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমিয়া গেলেও, তাহাকে জীবনের একটা বড় সফলতা বলিয়া মনে করিব।

মুছলমান-জাতি এখন সকল দিক দিয়া পতিত এবং সকল প্রকারে বিপর্য্যস্ত। এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে—কোর্‌আনের শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া, তাহার আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া। আমি অন্তরের অন্তস্তলে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া থাকি—তাই কোর্‌আনের খেদমত করাকে জীবনের শেষ ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি। যে আকুল আকাঙ্ক্ষা এই সাধনার প্রেরণা সঞ্চয় করিয়া দিতেছে, অন্তর্য্যামী আল্লাহ তাআলাই তাহা অবগত আছেন। সে আশার স্বপ্ন কবে বাস্তবে পরিণত হইবে—আমাদের বংশধরদিগের সাধনার উপরই তাহা বিশেষ করিয়া নির্ভর করিতেছে।

যে দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার উপযুক্ত শক্তি, সম্বল ও সাধনা আমার নাই —এজন্য আমার ভ্রমপ্রমাদে পতিত হওয়ার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তাহা আমি খুব ভাল করিয়াই অবগত আছি। অভিজ্ঞ পাঠকগণ সেই ভুলভ্রান্তি জানাইয়া দিলে যাহার পর নাই বাধিত হইব এবং কৃতজ্ঞতার সহিত সেগুলি সংশোধন করিয়া লইব। তবে এই প্রসঙ্গে বিনীতভাবে ইহাও জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আমি সব দিক সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টার একটুও ত্রুটি করি নাই—যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। সমালোচক বন্ধুরা সে সব দিকের সম্যক্ বিচার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

কলিকাতা
১লা মোহার্‌রম, ১৩৪৮ হিজরী

দীন সেবক—
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

ছুরা ফাতেহার সূচী

বিষয়— পৃষ্ঠা

ছুরা বকরার সূচী

(বিষয়ের পার্শ্বে টীকার সংখ্যা উল্লেখ করা হইল)

অ -- অ -- অ

আ -- আ -- আ

আ—জের

ই — ই — ই

ঈ — ঈ — ঈ

ঋ — ঋ — ঋ

এ — এ — এ

এ—জের

ক — ক — ক

খ — খ — খ

গ — গ — গ

চ — চ — চ

ছ — ছ — ছ

ত—জের

দ — দ — দ

ধ — ধ — ধ

ন — ন — ন

প — প — প

প—জের

ফ — ফ — ফ

ব — ব — ব

ব—জের

ভ — ভ — ভ

ম — ম — ম

র — র — র

ল — ল — ল

য় — য় — য়

শ — শ — শ

স — স — স

স—জের

হ — হ — হ

ক্ষ — ক্ষ — ক্ষ

কোর্‌আন শরীফ

১। ছুরা ফাতেহা

سورة الفاتحة

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।

بسم الله الرحمن الرحيم

১ সর্ব্ব-জগৎ-স্বামী আল্লারই সমস্ত মহিমা ;—

الحمد لله رب العلمين

২ যিনি করুণাময় কৃপানিধান ;

الرحمن الرحيم

৩ যিনি বিচারকালের কর্ত্তা।

ملك يوم الدين

৪ আমরা তোমারই-মাত্র দাসত্ব করি এবং মাত্র তোমারই নিকট শক্তি প্রার্থনা করি।

اياك نعبد و اياك نستعين

৫ আমাদিগকে সুদৃঢ়-সরল পথে পরিচালিত কর,—

اهدنا الصراط المستقيم

৬ যাহাদিগের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ তাহাদিগের পথে—

صراط الذين انعمت عليهم

৭ কিন্তু ক্রোধভাজন ও ভ্রষ্টদিগের পথে নহে।

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

উন্নত
সাধক-

টীকা :—

এই ছুরাকে ফাতেহা বলা হয়, কারণ ইহা হইতে কোর্‌আনের আরম্ভ। অপার মহিমা কেতাব প্রভৃতি ইহার আরও অনেক গুণবাচক নাম আছে। (বোখারী মুখেও ঐ শব্দগুলির প্রভৃতি)। ফাতেহা, কোর্‌আনের প্রথম পারার প্রথম ছুরা; ছুরা বকরে হয় যে, বিবর্ত্তন যা

হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—তাওরাৎ, ইঞ্জিল, জব্বুর বা অন্য কোন আছমানী কেতাবে ইহার অনুরূপ কোন ছুরা নাজেল হয় নাই। (আহমদ, নাছাই প্রভৃতি)। অভিজ্ঞ পাঠকগণ একটু মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে এই হাদিছের সত্যতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১ بسم الله **বিছ্‌মিল্লাহ**—এই পদের সম্পূর্ণ অর্থ—"করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে (প্রবৃত্ত হইতেছি)।" দাতা বলিয়া রহমান শব্দের অর্থ করা ভুল। মুছলমান প্রত্যেক কর্ত্তব্য পালনের পূর্ব্বে এইরূপে আল্লার অস্তিত্ব এবং তাঁহার প্রেম ও করুণা গুণের মহিমা ও ব্যাপকতার ধারণা করিবে—তৎপর সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবে। কোর্‌আনের শিরোদেশে সর্ব্ব প্রথমে এই আয়তটী শোভিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, আল্লার ৯৮টী গুণবাচক নামের মধ্যে কোর্‌আনে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার এই রহমান ও রহিম বিশেষণ দুইটীকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে বিশ্বমানবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। হাদিছে আছে—ইহকালে ও পরকালে যাঁহার অপরিসীম করুণা ও অনন্ত প্রেম সমানভাবে বিশ্বচরাচরকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান, তিনিই রহমান ও রহিম। (ফৎহুল বায়ান)। এই বিছ্‌মিল্লাহ-পদে মুছলমানকে তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের প্রত্যেক স্তরে, আল্লার এই অনাদি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী প্রেমের ধ্যান ও সাধনাকে জাগাইয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কোর্‌আনের বাহক হজরত রছুলে করিম সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিতেছেন— تخلقوا باخلاق الله —অর্থাৎ "নিজের চরিত্রকে আল্লার গুণপুঞ্জের অনুরূপভাবে গঠন করিয়া লইতে চেষ্টা কর।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মুছলমানকে সর্ব্ব প্রথমে আল্লার প্রেম ও দয়া গুণের অনুবর্ত্তী হওয়ার জন্য সাধনা করিতে হইবে, তাহাকে এমনভাবে নিজের আখ্‌লাক বা চরিত্র গঠন করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে সে দুন্‌য়ার সকলকেই, আপন-পর নির্ব্বিশেষে নির্ব্বিকারে প্রেমদান করিয়া যাইতে পারে।

২ الحمد **আল্‌-হাম্‌দ**—হাম্‌দ শব্দের অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, স্তুতিবাদ, ও মহিমা কীর্ত্তন। আল্লার এক নাম হামিদ, অর্থাৎ মহিমাময়। 'আল্' শব্দের ل ল বা লাম সাকুল্য বাচকবর্ণ। অর্থাৎ সকল প্রকারের সমস্ত ধন্যবাদ ও মহিমা একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য। কারণ 'সৃজন', 'পালনাদি' জগতের সমস্ত কার্য্যের একমাত্র কারণ তিনি। তাঁহারই মহিমা ও করুণার ফলে বিশ্বচরাচরের 'অস্তিত্ব' ও স্থিতি। অতএব একজনের কার্য্যের জন্য অন্যের কৃতজ্ঞ হওয়া নহে'।

আল্লাহ্—প্রচলিত ভাষা সমূহে " আল্লাহ্ " শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া
জী, বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি ভাষার God, ঈশ্বর, ভগবান, খোদা প্রভৃতি
তিশব্দ হইতে পারে না। কারণ ঐ শব্দগুলি যুগপৎভাবে মানুষের প্রতিও
পুরুষ God, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গও হইয়া থাকে,

যেমন—Goddess, ঈশ্বরী, ভগবতী প্রভৃতি। আবার ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দের বহুবচনও হইয়া থাকে। ধাতুগত অর্থ এবং বৈদিক যুগের ব্যবহার হিসাবে, সংস্কৃত "ব্রহ্ম" শব্দ এই অভাবটা বহুলাংশে পূরণ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু পৌরাণিক ব্যবহারে এবং হিন্দু-সমাজের সাধারণ সাহিত্যে, বেদের এই " পরম, বিরাট, এক, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় ", ব্রহ্মকে চতুরানন ব্রহ্মার সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় এ সুবিধাটাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে 'আল্লাহ' শব্দের কোন নির্দোষ প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাই নাই। এই বিশেষত্বের জন্যই পৌত্তলিক আরবও নিজেদের কোন ঠাকুর দেবতাকে কস্মিনকালে আল্লাহ নামে অভিহিত করিতে সাহসী হয় নাই। মুছলমান পণ্ডিতগণের মতে—সকল পূর্ণগুণের আধার, সমস্ত ত্রুটীবর্জ্জিত, স্বয়ম্ভু ও নিশ্চিত-অস্তিত্ব যে সত্তা তাহারই নাম আল্লাহ।

رب **রব্**—ইহার ধাতুগত অর্থ—"কোন বস্তুকে পালন করতঃ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া, তাহাকে পূর্ণতার চরম সীমায় উপনীত করিয়া দেওয়া।" (রাগেব, আজিজী প্রভৃতি)। এই ধাতু হইতে আধিক্য বাচক কর্ত্তৃবাচ্যে 'রব্' শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ণিত গুণ যাঁহার মধ্যে পূর্ণতররূপে বিরাজমান—তিনিই 'রব্'। (এমলা—প্রভৃতি)।

العلمين **আলামীন**—আলম শব্দের বহুবচন, অর্থ—বহু জগৎ বা জগৎ সমূহ। আমাদিগের অধ্যুষিত এই দুন্‌য়া ছাড়া আরও বহু জগৎ যে আল্লার কুদ্‌রতে বিরাজমান আছে, এই আয়তে তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক রকমে জগৎ শব্দের ব্যবহার আছে, যেমন জীবজগত ও জড়জগত, ভৌতিক জগত ও আধ্যাত্মিক জগত। মানুষ, ফেরেশ্‌তা, জেন প্রভৃতিকেও কেহ কেহ বিভিন্ন আলম বা জগৎ বলিয়াছেন। কোর্‌আনের লক্ষ্য ও উপাস্য আল্লাহ, মানুষের বিদিত অবিদিত সকল প্রকারের সমস্ত জগতের রব্। বহুবচনের সঙ্গে لام استغراق ব্যবহৃত হওয়ায় এই অর্থ স্পষ্টতর ভাবে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক যুগের মুছলমান পণ্ডিতের মুখে এই প্রকার 'হিজদা হাজার আলম' বা অষ্টাদশ সহস্র জগতের কিংবদন্তি শুনিতে পাওয়া যায়। (দোর্‌রে মন্‌ছুর)। প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে আরবের নিরক্ষর নবী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদিগের অধ্যুষিত এই দুন্‌য়া ব্যতীত এমন আরও কতিপয় জগৎ বিদ্যমান আছে—যেখানে আমাদিগেরই ন্যায় মানুষ বসবাস করিয়া থাকে।

অতএব, প্রথম আয়তের অর্থ হইতেছে যে—"যে আল্লাহ, আমাদিগের বিদিত, অবিদিত সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুকে পালন করেন, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উন্নত করিয়া তাহাকে পূর্ণতার চরম সীমায় পৌঁছাইয়া দেন—সমস্ত মহিমা তাঁহারই।" সাধক-মোছলেম তাঁহার দরবারে দস্তবস্তা দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অনন্ত শক্তি ও অপার মহিমা সংক্রান্ত এই বিরাট ও ব্যাপক ভাবগুলির ধারণা করিবে—এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখেও ঐ শব্দগুলির দ্বারা এই ভাবের অভিব্যক্তি করিতে থাকিবে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, বিবর্ত্তন ধা

ক্রমবিকাশবাদ—Theory of Evolution—গ্রহজগৎ এবং তাহাতে মানুষের সন্ধান প্রভৃতি, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কিন্তু রব্ ও আলামীন শব্দের অর্থে ও টীকায় পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, কোর্‌আন ও তাহার মহিমাময় বাহক বহুপূর্ব্বে এ সকল তথ্য বলিয়া দিয়াছেন। তবে আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে একটা নাস্তিকতার ধারণা জড়াইয়া আছে। কোর্‌আন সকল যুগের সকল দেশের সমস্ত মানুষের পথপ্রদর্শক। সেই জন্য এখানে ঐ নাস্তিকতার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, ঐ সকল অভিব্যক্তির মূল মালেক ও বিবর্ত্তক একজন আছেন—এবং তিনিই আল্লাহ্।

এওমুদ্দিন—এওম অর্থে দিন, ক্ষণ, দিন বা রাত্রির কোন সময়, সময় বা তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন অংশ। কোর্‌আন হাদিছে, এবং প্রাচীন ও আধুনিক আরবী সাহিত্যে, এই সকল অর্থে এওম শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। (মেছবাহুল-মুনির, মাজ্‌মাউল-বেহার, রাগেব প্রভৃতি)। আল্লার ন্যায়-বিচার এবং তদনুসারে মানুষের সৎ-অসৎ কর্ম্মের সহিত যথাযথরূপে প্রতিফল দানের ব্যবস্থা, এখনও জারী আছে, এবং কিয়ামতের সময়ও থাকিবে। আল্লাহ যে কেবল কিয়ামতের দিন বিচার করিবেন, আর তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুন্‌য়াটা বিচার-শূন্য হইয়া রহিবে, এবং আল্লার বিচারক-গুণটা কিয়ামতের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। এই জন্য আমি "সময়" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, কারণ ইহাই অধিকতর ব্যাপক। দুন্‌য়া আখেরাতের সকল বিচারই ইহার মধ্যে আসিয়া যাইতেছে। 'দিন' শব্দ ধর্ম্ম ও কর্ম্মফল, এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য আয়তে উহার অর্থ হইবে "কর্ম্মফল"। এওম শব্দের 'দিবস' অর্থ গ্রহণ করিলে আয়তের মর্ম্ম এইরূপ হইবে —'আল্লাহ কিয়ামতের দিনের মালেক'। এই প্রকার আংশিক অর্থ গ্রহণ করার ফলে বিধর্ম্মী লেখকগণের পক্ষে কোর্‌আনের উপর আক্রমণ করার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন—তাহা হইলে আল্লাহ কি কিয়ামত ব্যতীত অন্য সময়ের মালেক নহেন? অন্য সময়ের মালেক কি আর কেহ আছেন? কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আল্লার বিচার সকল সময় সমান ভাবে চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং সকল সময়েরই মালেক তিনি। এক দল লোক কার্য্য-কারণ-পারম্পর্য্য মাত্র স্বীকার করেন। আয়তে মালেক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার এই যে বিধান, তাহারও একজন বিধাতা আছেন—তিনি আল্লাহ।

৪ عبادت এবাদত—এবাদত শব্দের আভিধানিক অর্থ দাসত্ব করা—আজ্ঞাবহ হওয়া। নিজের সমস্ত ইচ্ছা, সকল প্রবৃত্তি এবং সমুদয় কর্ম্মকে আল্লার হুকুমের অধীন ও তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিয়া জীবন যাপন করাই এছলামের এবাদত। 'ইয়াকা' শব্দে, বিশেষতঃ তাহা 'না-বোদো' ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হওয়ায়, কৈবল্যসূচক অর্থ—"হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করিতেছি ও করিতে থাকিব"—ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং চতুর্থ আয়তের প্রথম অর্দ্ধের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। (এখানে বলা হইতেছে যে,

মানুষ একমাত্র আল্লার এবাদত করিবে। ইহার অন্যথা করিলে সে অমার্জ্জনীয় মহাপাতকের ভাগী হইবে।) এই অর্থটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিন প্রকারে এই আয়তের শিক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। প্রথম, আল্লার এবাদত না করিলে; দ্বিতীয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু, বা ভাবের এবাদত করিলে; তৃতীয়, আল্লার এবাদত করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাহারও এবাদত করিলে। আরবের মোশ্‌রেকগণ আল্লাহকে স্বীকার করিয়াও, পার্থিব আপদ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, অথবা কোন প্রকার সুখ সৌভাগ্য লাভ করার নিমিত্ত, ঠাকুর দেবতার দরবারে বা পীর-ফকিরদিগের দরগাহে হাজত নয়াজ করিত। এই জন্যই তাহাদিগকে মোশ্‌রেক বলা হইয়াছে। যে আল্লাহকে অমান্য ও অস্বীকার করে—সে কাফের। আর আল্লার ঐশিক শক্তি ও গুণের মধ্যে যাহারা অন্যকে শরিক করে—মোশ্‌রেক তাহারাই।

আল্লাহ মানুষকে—বরং বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক পদার্থকে—এমন প্রকৃতি দিয়া পয়দা করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা স্বভাবতঃ তাঁহার এবাদত করিয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম, প্রকৃতি, দিন, ফেৎরত প্রভৃতির ইহাই মর্ম্ম। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থই এই স্বভাব ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে আল্লার এবাদত করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মানুষ তাহার কর্ম্মদোষে এই স্বভাব ধর্ম্মকে বিগড়াইয়া ফেলে, এবং সে জন্য সে আল্লার এবাদত হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। এ অবস্থায় তাহার রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়—আল্লার সাহায্য। সেই করুণাময় কৃপানিধানের সাহায্য না পাইলে এই বিকারের ঘূর্ণিপাক হইতে রক্ষা পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই জন্য চতুর্থ আয়তের শেষার্দ্ধে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, যথাযথভাবে আল্লার এবাদত করার জন্য তুমি সর্ব্বদাই সেই আল্লার নিকটেই শক্তি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতে থাকিবে; কারণ :—

هیچ کسے بخویشتن رہ نبرد بکوے او
بلکہ ز پاے او رود ہر کہ رود بکوے او

৫ صراط المستقيم **ছেরাতুল-মোস্তাকিম**—ছেরাত অর্থে পথ। মোস্তাকিম পথের বিশেষণ। উহার অর্থ সোজা, সরল ও সুদৃঢ়। কেবল 'সোজা ও সরল' অর্থ গ্রহণ করিলে মোস্তাকিম শব্দের অর্দ্ধেক অর্থ বাদ পড়িয়া যায়। মুক্তি-পথের যাত্রীকে সরল পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে সত্য, কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। সোজা পথেও অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। দুর্দ্ধর্ষ আততায়ী পথিকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করার জন্য কোথায় ঘাঁটী পাতিয়া আছে; ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগুলি তাহার মস্তক চর্ব্বণ করার উদ্দেশ্যে কোথায় করাল বদন ব্যাদান করিয়া অপেক্ষা করিতেছে; ঝোপের মধ্যে কোথায় সর্ব্বনাশকর কাল সর্পের দল অদৃশ্যভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে—কে বলিতে পারে? ফলে সোজা পথেও অনেক বিপদ। পক্ষান্তরে পথ ভুলিয়া যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। সুতরাং যে পথ সরল এবং সঙ্গে সঙ্গে যে পথে এ

সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাও বিদ্যমান, সাধন মার্গের যাত্রীকে সেই পথই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। মোস্তাকিম শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠ আয়তে সেই অর্জ্জনীয় পন্থার লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, আল্লার অনুগ্রহভাজন মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া মানব জীবনের পরম কাম্যকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাত্রীকে সেই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করিতে, এবং তজ্জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের জ্যোতি স্বরূপ আল্লার শরণপ্রার্থী হইতে হইবে। এই মহাজনগণ সম্বন্ধে ছুরা নেছায় বর্ণিত হইয়াছে :—

و من يطع الله و الرسول ' فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين
و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا —

ইহার ভাবার্থ এই যে—" আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের অনুগত ব্যক্তিগণ, আল্লার অনুগ্রহ প্রাপ্ত নবী, ছিদ্দিক, শহিদ ও সাধুগণের সঙ্গলাভ করিয়া থাকে, এবং ইহাঁরাই উত্তম সঙ্গী।" এখানে রফিক ও তরিক, এবং মুরিদ, এরাদা, ও ছলুক সম্বন্ধে অনেক বলিবার ও বুঝিবার কথা আছে। এখানে পাঠকগণকে এই টুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, পথে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক হয় সাধু ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের। তাহার পর আলোকের অভাব হইলে সঙ্গীর অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অন্ধকারে পথ চলায় আরও অনেক বিপদ আছে। সুতরাং সঙ্গে তাহার আবশ্যক হইবে নুর বা আলোকের। সেই নুর বা জ্যোতির আধার হইতেছেন আল্লাহ,— তিনিই "নুরছ্ছামাওয়াতে অল্-আর্জ্জ"—বা স্বর্গ মর্ত্ত্যের জ্যোতি। সুতরাং সেই আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

৭ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়তে অর্জ্জনীয় পথের বিশেষণ ও নিদর্শনগুলি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম আয়তে বর্জ্জনীয় পথের লক্ষণ ও উদাহরণ বর্ণিত হইতেছে। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, যে সকল ব্যক্তি বা জাতি নিজেদের কর্ম্মফলে আল্লার গজব-ভাজন হইয়াছে, অথবা যাহারা নিজ কর্ম্মদোষে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, মুক্তিকামী সাধকের পক্ষে তাহাদিগের অবলম্বিত পন্থা অবশ্য বর্জ্জনীয়। ধর্ম্মের নামে তাহারা যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছে বা যে সকল অন্যায় বিশ্বাস ও আকিদা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তদ্রূপ অপকর্ম্ম করিলে বা বিশ্বাস রাখিলে তাহাদিগের পন্থা অবলম্বন করা হইবে। হজরত বলিয়া গিয়াছেন— এহুদগণ আল্লার গজবপ্রাপ্ত, এবং খৃষ্টানগণ পথভ্রষ্ট। (আহমদ, তিরমিজী ও মালখী ৩—৯ প্রভৃতি)। যে যে কারণে ইহাদিগের এই পতন ঘটিয়াছে, কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ বকর ছুরায়, তাহার খোলাসা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। হজরত ঈছা বা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে এহুদ ও খৃষ্টানদিগের অনাচার ও অন্ধবিশ্বাস তাহাদিগের অপকর্ম্মের একটা নিদর্শন। এহুদগণ আল্লার সত্য নবীকে অস্বীকার করিল, এবং সাময়িক মৌলবী ও পীরগণের কৌফরের ফৎওয়া মোতাবেক—নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা

করিয়া ফেলিল। পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণ 'বিনা বাপে জন্ম' বলিয়া হজরত ইছাকে আল্লার ঔরসজাত পুত্র বা পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইল—তৌরাতের পবিত্র একত্ববাদ বা তাওহিদকে ত্রিত্ববাদের জঘন্যতর শের্কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

غضب গজব—মানুষের সহিত সম্বন্ধ হইলে ইহার অর্থ হইবে 'ক্রোধ'। কিন্তু এই গজব শব্দটী যেখানে আল্লার সহিত সম্পর্কিত হইবে, সেখানে উহার একমাত্র অর্থ—'প্রতিফল দান'। (রাগেব, খাজেন, বায়জাভী প্রভৃতি)। সুতরাং এখানে 'মগজুব' শব্দের অর্থ হইবে—যাহারা আল্লার ন্যায়-বিধান অনুসারে, নিজেদের অন্যায় কর্ম্মগুলির উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন অমুছলমান লেখক, আরবী ভাষায় অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষ বশতঃ এই 'গজব' শব্দ লইয়া অনেক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই শ্রেণীর হঠোক্তিগুলির গুরুত্ব যে কতটুকু, উপরের আভিধানিক প্রমাণ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত, যাঁহারা ঈশ্বরকে দয়া ও প্রেমগুণ সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের মতে ইহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্তির অধীনতা দোষে দোষিত হইতে হয় না, তাঁহারা যে 'আল্লার ক্রোধ'—পদের প্রতি কিরূপে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে সাহসী হন, তাহা আমি আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ ঃ—

এমামের পশ্চাতে নমাজ পড়ার সময় মোক্তাদিকে ছুরা ফাতেহা পাঠ করিতে হইবে, কি না, এ সম্বন্ধে ছাহাবীদিগের ও এমামগণের সময় হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ইহাঁদের এক শ্রেণীর মত এই যে, মোক্তাদিকে সকল অবস্থায়—অর্থাৎ এমাম মনে মনে কেরআৎ করুন বা জোরে কেরআৎ করুন—ছুরা ফাতেহা পাঠ করিতে হইবে, না করিলে তাহার নমাজ অসিদ্ধ ও বাতিল হইয়া যাইবে। এমাম শাফেয়ী ও মোহাম্মদী জমাতের আলেমগণ অতিশয় কঠোরতার সহিত এই মত প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁরা কোরআন হাদিছের বিভিন্ন দলিল দ্বারা নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে আর এক দল বলিয়া থাকেন যে, মোক্তাদির পক্ষে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম—পড়িলে তাহার নমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণের নামে জোরগলায় এই মতবাদ প্রচার করা হইয়া থাকে।* ইহাঁরাও কোরআন হাদিছের বিভিন্ন দলিল প্রমাণ দ্বারা নিজেদের দাবী প্রতিপন্ন করার

---

* প্রকৃত পক্ষে এমাম ছাহেবের ও তাঁহার সমস্ত শিষ্যের মত যে ইহাই, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। হানাফী মজহাবের কতিপয় বিশিষ্ট এমাম ও আলেমের মত এই যে—"এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা না পড়িলেও মোক্তাদির নমাজ সিদ্ধ হইয়া যাইবে।" এমাম আবু হানিফা কেবল এই কথা কহিয়াছেন। কিন্তু এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ করা যে নিষিদ্ধ, অথবা পাঠ করিলে মোক্তাদির নমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, এমাম ছাহেব বা তাঁহার শিষ্যদ্বয় এ কথা কখনও বলেন নাই। দেখ—এমাম এবনে হুমাম কৃত কেতাবুজ্জোআফা, মওলানা আবদুল হাই কৃত তাজিরুল-মোমাজ্জাদ প্রভৃতি।

প্রয়াস পাইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই দুই দলের পণ্ডিতেরা প্রতিপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণগুলি সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের ন্যায় আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, শক্তিশালী উকীলের ন্যায় কেবল সেগুলিকে খণ্ডন করার নিমিত্ত নিজেদের সমস্ত জ্ঞান ও প্রতিভার সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন।

এই দুই দল ব্যতীত আর একটী মধ্যপন্থী দলও প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই দলের এমাম ও আলেমগণ, উভয় পক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত আয়ত ও হাদিছগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বলেন যে, এমাম যখন জোরে কেরআৎ করিবেন, মোক্তাদি তখন ছুরা ফাতেহা পাঠ না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে এবং মনোযোগ সহকারে এমামের কেরআৎ শ্রবণ করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে এমাম যখন মনে মনে কেরআৎ করিবেন, মোক্তাদিকে তখন ছুরা ফাতেহা নিশ্চয়ই পাঠ করিতে হইবে। নানাবিধ যুক্তিপ্রমাণ ও বহু অকাট্য দলিল দ্বারা ইঁহারা নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। এমাম মালেক, এমাম আহ্‌মদ-বেন-হাম্বল, শেখুল-এছ্‌লাম এমাম এবনে তাইমিয়া, হাফেজ এবনে কাইয়্যম প্রমুখ বহু এমাম ও মোহাদ্দেছ এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। দুঃখের কথা, এই মতবাদটীর বিষয় আমাদের দেশের বহুলোকের অজ্ঞাত। যাহা হউক, ছুরা আরাফের তফছিরে এই বিষয়টী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানের মত এমাম এবনে তাইমিয়ার একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব। এমাম ছাহেব বলিতেছেন :—

اصول الاقوال ثلثة ' طرفان و وسط - فاحد الطرفين ان لا يقرأ خلف الامام بحال - والثانى انه يقرأ خلف الامام بكل حال - والثالث وهو قول اكثر السلف انه اذا سمع قرأة الامام انصت ولم يقرأ ' و اذا لم يسمع قرأته قرأ لنفسه ـــــ هذا قول جمهور العلماء كما لك و احمد بن حنبل و جمهور اصحابهما و طائفة من اصحاب الشافعى و ابى حنيفة - وهو القول القديم للشافعى و قول محمد بن الحسن - فتاوى ابن تيمية ' ب۲' ص ۱۵۰-۱۴۱ و قال المصنف ايضا -

মর্ম্মানুবাদ :—"এ বিষয়ে মূলে তিন প্রকার মতভেদ বিদ্যমান। ইহার মধ্যে দুইটী দুই দিককার চরম পন্থা, আর একটী মধ্যপথ। ইহার মধ্যে একটী চরম-পন্থী মত এই যে, মোক্তাদি কোনও অবস্থাতেই ছুরা ফাতেহা পাঠ করিবে না। অন্যদিককার চরমপন্থীদের মত এই যে, মোক্তাদিকে সকল অবস্থাতেই ফাতেহা পাঠ করিতে হইবে। এই দুইটী চরম মতের মধ্যে মধ্যপথ এই যে, মোক্তাদি যখন এমামের কেরআৎ শুনিতে পাইবে, তখন তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে এমামের কেরআৎ শুনিতে না পাইলে মোক্তাদিকে ফাতেহা পাঠ করিতে হইবে।........পূর্ব্ব যুগের অধিকাংশ মহাজনগণের এবং অধিকাংশ আলেমদিগের ইহাই অভিমত। শাফেয়ী ও আবু হানিফার একদল শিষ্য এই মত পোষণ করিতেন এবং মোহাম্মদেরও এই মত।"......(ফাতাওয়া এবনে-তাইমিয়া ২—১৪১-৫০ পৃষ্ঠা।)

এক শ্রেণীর পাঠক এমাম এবনে-তাইমিয়র উক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান নাও করিতে পারেন। সেই জন্য 'নূরুল্ আনওয়ার' প্রণেতা স্বনামখ্যাত মোল্লা জীওন ছাহেবের একটী উক্তিও সংক্ষেপে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। মোল্লা ছাহেব তাঁহার 'তফছির আহমদী'তে বলিতেছেন :—

فان رأيت الطائفة الصوفية والمشائخ الحنفية ترهم يستحسنون قرأة الفاتحة للمؤتم كما استحسنه محمد ايضاً - تفسير احمدى ' ص ۴۱۷ -

অর্থাৎ—"ছুফী সম্প্রদায়ের এবং হানাফী মজহাব অবলম্বী পীর মুর্শিদগণের মতামত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এমাম মোহাম্মদের ন্যায় * তাঁহারাও এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ করাকে উত্তম ও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন।" (৪১৭ পৃঃ)।

উপসংহারে আমাদিগের নিবেদন এই যে এই মছলা সম্বন্ধে ছাহাবা ও এমামগণের সময় হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। অথচ ইহা লইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হয় নাই। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থী এমাম ও আলেমগণ প্রথম হইতে উভয়পক্ষের দলিল প্রমাণের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এই সমস্যার অতি সঙ্গত সমাধান করিয়া রাখিয়াছেন।

আমীন বলা :-

ছুরা ফাতেহা শেষ করার পর "আমীন" বলা যে সুন্নৎ, সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু উহা উচ্চ স্বরে অথবা মনে মনে বলিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বাদ বিতণ্ডা করা হইয়া থাকে। এ দেশের হানাফী ও মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা লইয়া অতিশয় জেদ ও গোঁড়ামী প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, অনেক সময় এই মছলার মীমাংসার জন্য বিধর্ম্মী রাজার আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেও মুছলমানগণ এক বিন্দুও কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন না। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কোন্দলের কোনই হেতু নাই। প্রকৃতপক্ষে হজরত কখনও মনে মনে, কখনও উচ্চ শব্দে, আর কখনও এরূপ শব্দে আমীন বলিয়াছেন—যাহা তাঁহার নিকটবর্ত্তী প্রথম কাতারের মোক্তাদিগণ মাত্র শুনিতে পাইতেন। বিভিন্ন সময়ের এই বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন রাবী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব যুগে সব এমামের পক্ষে এক সঙ্গে সব হাদিছ প্রাপ্ত হওয়ার সুবিধা ছিল না। কাজেই তখন যে এমাম যে রেওয়ায়ত পাইয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ তাহারই উপর আমল করিতে থাকেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের উভয়পক্ষের ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ আলেমগণ সমস্ত হাদিছ প্রাপ্ত হওয়ার পর, 'আমীন জোরে ও আস্তে বলা'—উভয়কেই হজরতের ছুন্নৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ স্থলে ভূপালের সুনাম-ধন্য নওয়াব মওলানা ছৈয়দ ছিদ্দিক হাছান খাঁ ও লক্ষ্ণৌর সুবিখ্যাত আলেম

* অর্থাৎ এমাম যখন মনে মনে কেরআৎ পাঠ করেন—সেই সময়।

মওলানা আবদুল হাই ছাহেব প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। নওয়াব ছাহেব তাঁহার উর্দ্দু তফছিরে লিখিতেছেন :—

بلکہ کہنا آمین کا بجہر اور باسرار دونوں طرح پر ثابت ہوا ہے - جہر سے کہنے میں اس وقت کہ بدعت کا زور و شور ہے زندہ کرنا مردہ سنت کا ہے و باللہ التوفیق - لکن جب کہ اس کہنے پر کسی جگہ نوبت حرب و ضرب کی آوے تو پھر چپکہ ھی کہنا مصلحت ہے - ترجمان القرآن - ص۳۳-۱

অর্থাৎ—"আমীন উচ্চ শব্দে ও মনে মনে বলা উভয়েরই প্রমাণ আছে। বেদ্‌আতের বর্ত্তমান প্রাবল্যের সময় জোরে আমীন বলিলে একটা মৃত ছুন্নৎকে জীবন্ত করা হয়। তবে যেখানে ইহাতে আপোষের মধ্যে ঝগড়া লড়াই ও মারধর আরম্ভ হইয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে মনে মনে আমীন বলাই সঙ্গত।" (১—৩৩ পৃঃ)।

উক্ত নওয়াব ছাহেব তাঁহার 'মেছকুল খেতাম' পুস্তকে লিখিতেছেন :—

وارد شدہ است در جہر بتامین احادیث صحیحہ ــــ و احادیث در جانب جہر بیشتر و بصحت آمدہ - و بعضے علما در عدم جہر نیز تصحیح احادیث نمودہ اند ــــ و تواند کہ جہر و اخفا ہر دو باشد تارۃ فتارۃ ' قالہ الشیخ - مسک الختام - ص۲۲۳-۱

অর্থাৎ—"উচ্চ শব্দে আমীন বলা সম্বন্ধে বহু ছহী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে……উচ্চ শব্দে আমীন বলার হাদিছ সংখ্যা ও মর্য্যাদার হিসাবে অধিক…… কোন কোন আলেম মনে মনে আমীন বলার হাদিছগুলিকেও ছহি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আস্তে ও জোরে বলা উভয়ই ছুন্নৎ। হজরত কখনও আস্তে আমীন বলিয়াছেন, আর কখনও জোরে বলিয়াছেন—শেখ আবদুল হক এইরূপ বলেন।" (১—২২৩ পৃঃ)।

মওলানা আবদুল হাই ছাহেব 'তা'লিক' পুস্তকে বলিতেছেন :—

و الانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل ــــ و قد ورد ما یشہد لکل من المذہبین - التعلیق الممجد -

অর্থাৎ—"ন্যায্য কথা এই যে, দলিলের হিসাবে উচ্চ শব্দে আমীন বলার প্রমাণগুলি অধিকতর বলবান। …… তবে প্রত্যেক মতের অনুকুল হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে।"

(১০৩ পৃষ্ঠা, ৯নং টীকা)।

মওলানা শেখ আবদুল হক 'লাম্‌আতে' লিখিতেছেন :—

و الظاہر العمل علی کلا العملین تارۃ فتارۃ -

অর্থাৎ—"প্রমাণগুলির সার এই যে, আস্তে ও জোরে আমীন বলার উভয় প্রকার আমলই হজরত হইতে সপ্রমাণ হইতেছে,—ইহাই এ মছলার স্পষ্ট সমাধান।"

প্রকৃত পক্ষে ইহাই সরল, সহজ ও প্রকৃত সমাধান। জোরে আমীন বলার হাদিছকে যাঁহারা সমধিক বলবান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে তাহার উপর আমল করিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আস্তে আমীন বলার রেওয়ায়তগুলিও হজরত রছুলে করিমের হাদিছ, এবং তাঁহার ছুন্নতের নিদর্শন। অতএব এই হাদিছগুলির উপর আমল করার উদ্দেশ্যে, মধ্যে মধ্যে আস্তে আমীন বলাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে কেহ কেহ জোরে আমীন বলিতেছে না বলিয়া তাহার প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ করা অন্যায়। তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ওমর ফারুক ও আবদুল্লাহ-এবনে-মছউদের ন্যায় মহামান্য খলিফা ও ছাহাবীও মনে মনে আমীন বলার পক্ষপাতী ছিলেন। (মেছবুল খেতাম প্রভৃতি)। পক্ষান্তরে মনে মনে আমীন বলার হাদিছগুলিকে যাঁহারা সমধিক বলবান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকেও অপর পক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত হাদিছগুলি সম্বন্ধে বর্ণিতরূপ মনোভাব পোষণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগকেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হজরতের অধিকাংশ খলিফা ও ছাহাবাগণ উচ্চ শব্দে আমীন বলারই পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে রছুলের কোন ছুন্নতের প্রতি এন্‌কার বা বিদ্বেষ পোষণ করা মহাপাপ—এ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর মছলা লইয়া মুছলমান সমাজের মধ্যে আত্ম-কলহ সৃষ্টি করার ন্যায় সর্ব্বনাশকর মহাপাতক আর নাই। কেহ যদি আজীবন জোরে বা আস্তে আমীন বলে, তাহাতে তাহার দিন-ঈমানের এক বিন্দু ক্রটী হইতে পারে না, মুছলমান সমাজও তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু মুছলমানের পক্ষে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা এবং কলেমার বাহক উম্মতে-মোহাম্মদীকে বিচ্ছিন্ন ও গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া দেওয়ার মত ব্যক্তিগত ও জাতিগত পাপ আর কিছুই নাই। প্রথমটী ছুন্নৎ এবং দ্বিতীয়টী হারাম। ছুন্নতের প্রকার ভেদের কলহ তুলিয়া স্পষ্ট হারামে লিপ্ত হওয়া যে কত দূর অন্যায়, আশা করি বাঙ্গলার ভক্তিভাজন আলেম সমাজ তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

উম্মুল কেতাব ঃ—

ছুরা ফাতেহার এক নাম—"উম্মুল কেতাব"। উম্ শব্দের সাধারণ অর্থ মাতা। কিন্তু আরবী ভাষায় প্রত্যেক বস্তুর মূলকেও তাহার উম্ বলা হইয়া থাকে। (কবির ১—১৩৪)। কোর্‌আনে, এমন কি অন্য সমুদয় ঐশিক ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় আছে, ফাতেহা ছুরায় তাহার মূল ও সারৎসার সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত হইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সাধারণ তফছিরকারগণ ফাতেহার এই প্রধানতম বিশেষত্বটীর প্রতি অতি মারাত্মক ভাবে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে নিম্নে অতি সংক্ষেপে ইহার একটু আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করিব।

সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধারণতঃ, এবং কোর্‌আনে বিশেষতঃ মানব সমাজকে যে সকল বিষয়ের শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহাকে মূলতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(১) তত্ত্বজ্ঞান বা মা'রেফাতে এলাহী—

(ক) আল্লাহ এবং তাঁহার জাত ও ছেফাত বা স্বরূপ ও সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(খ) আল্লার সহিত বান্দার সম্বন্ধ ও তাঁহার প্রতি বান্দার কর্ত্তব্য।

(গ) মানুষের মুক্তি ও মালেকের সহিত তাহার মিলনের উপায়।

(২) পরকাল তত্ত্ব বা এলমুল মাআদ—

(ক) মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবস্থা।

(খ) পরজীবনে বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মফল ভোগ।

(৩) অদৃষ্টবাদ ও কর্ম্মবাদ—

কেহ বলিতেছেন—মানুষ ইট ও পাথরের ন্যায় সম্পূর্ণ অক্ষম। খোদা তাহাকে যে ভাবে ও যতটুকু পরিচালিত করেন, সে সেই ভাবে ততটুকু মাত্র নড়া চড়া করিতে পারে। ইচ্ছা ও ক্ষমতা বলিয়া তাহার কিছুই নাই। পক্ষান্তরে আর এক দল লোক বলিয়া থাকেন—মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে নিজের ইচ্ছা ও শক্তিক্রমেই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। তাহার কোন কাজে সৃষ্টিকর্ত্তার কোন দখল বা প্রভাব নাই।* এই সমস্যার সমাধান করাও ধর্ম্ম শাস্ত্রের একটা প্রধানতম কর্ত্তব্য।

(৪) ইতিহাসের শিক্ষা—

দুনয়ার সমস্ত ইতিহাস যুগযুগান্তরের যে সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট আর্শ বুকে ধারণ করিয়া আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ইতিহাসের সেই সার শিক্ষাকে মানুষের সম্মুখে সততঃ জীবন্ত করিয়া রাখিতে চায়। কোর্আন শরীফে ব্যক্তি ও জাতিগণের জীবন মরণের এই কার্য্যকারণ পারম্পর্য্য উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে ফাতেহা ছুরায় কোর্-আনের ঐ সমস্ত শিক্ষা ও আদর্শের সারৎসার স্বরূপ মূল কথাটী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১) তত্ত্বজ্ঞান বা মা'রেফাতে এলাহী :—

এখন বিছমিল্লাহ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাতেহার শেষ আয়তটী পর্য্যন্তের শিক্ষাগুলিকে আমাদের এই আলোচনার সহিত মিলাইয়া দেখুন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাস্তবিকই ছুরা ফাতেহা সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের, বিশেষতঃ কোর্আন শরীফের উম্ম্ অর্থাৎ মূল বা মাতা। বিছমিল্লায় বলা হইতেছে যে, সমস্ত সৎ ও মহৎ কর্ম্মের আরম্ভ আল্লার নামে ও তাঁহার দেওয়া শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করিতে হয়। আবার তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রথমেই শরণ গ্রহণ করিতে হয়—তাঁহার নামের। এই নামের জপ বা জেকের সাধকের

* মুছলমানদিগের মধ্যে জবরিয়া ও কাদরিয়া নামক দুইটী "গোমরাহ ফের্কা" যথাক্রমে এই দুই মত পোষণ করিয়া থাকে। আজকাল এদেশের আলেমগণের মধ্যে প্রায় সকলকেই জবরিয়া মতবাদের প্রচার ও সমর্থন করিতে দেখা যায়। অথচ তাঁহারাই আবার জবরিয়াদিগকে গোমরাহ ও জাহান্নমী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যাত্রা-পথের প্রথম পথপ্রদর্শক। নামের মধ্যে নিহিত ভাবের যথাযথ ধারণা করার সঙ্গে মুখে সেই নামের উচ্চারণ—মোটামুটি ভাবে ইহারই নাম জেকের। মনের সঙ্গে যোগ না থাকিলে কেবল মুখের জপে বিশেষ সুফল পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে মুখে উচ্চারণ না করিয়া কেবল মনে মনে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ বা উপকার জনক হয় না। কোর্‌আনে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে— الا بذكر الله تطمئن القلوب - رعد
অর্থাৎ—"জানিয়া রাখ! আল্লার জেকেরেই (স্তব ও ধ্যান ধারণা) মানুষের আত্মা স্বস্তিলাভ করিতে পারে।" (ছুরা রুদ)।

বিছমিল্লার সঙ্গে সঙ্গে, ফাতেহার প্রথম তিনটী আয়তে বর্ণিত আল্লার গুণবাচক নামগুলি একত্রে আলোচনা করিয়া দেখুন। এই আয়তগুলিতে প্রথমতঃ "আল্লাহ ও তাঁহার জাত ও ছেফাত" সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্যের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইতেছে। আল্লাহ এবং রহমান ও রহিম প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে বর্ননা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেছে ঐ নাম-গুলির আভিধানিক বা সাহিত্যিক বিশ্লেষণ মাত্র। "কার্য্যের" হিসাবে ঐ নামগুলির আর একটা দিকের প্রতি কোরআনের বিভিন্ন স্থানে সাধকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। নিম্নে দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

ছুরা বকরে বলা হইয়াছে :—

الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور -

অর্থাৎ—"আল্লাহ বিশ্বাসীগণের 'নিকট বন্ধু' ও অভিভাবক, তাহাদিগকে তিনি অন্ধকারের মধ্য হইতে নূর বা আলোকে বাহির করিয়া আনেন।" মিলনকামী সাধকের পক্ষে আল্লার এই স্বরূপটীর সম্যক ধারণা করা যে কতদূর আবশ্যক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অতএব খোলাসা মতলব এই হইতেছে যে, মানুষের পক্ষে প্রথম আবশ্যক—আল্লাহ্‌কে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা। নিশ্চিত সত্তা, সকল গুণের আকর, সকল ত্রুটী বর্জ্জিত, মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট বন্ধু যে আল্লাহ,—মানুষকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনয়ন করেন যে আল্লাহ,—যথা সাধ্য তাঁহার ধারণা করা প্রথম আবশ্যক; এবং ইহাই হইতেছে ঈমানের মূল লক্ষ্য। এই ধারণা বা ঈমান অর্জ্জিত হওয়ার পর যাত্রীকে পথের আলোকের জন্য আর আকুলি ব্যাকুলি করিতে হয় না। এ অবস্থায় তাহার প্রথম অবলম্বন —"নাম।" নামের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জেক্‌রে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ স্বরূপের সত্তা যিনি, স্বয়ং তিনি বন্ধু হইয়া, অভিভাবক হইয়া সাধকের মানস-রাজ্যে প্রকটমান হন, এবং মায়ামোহের অজ্ঞান তিমিরপুঞ্জ হইতে তাহাকে নূর বা জ্যোতির পানে বাহির করিয়া আনেন। 'জ্যোতির পানে আনয়ন করেন'—অর্থাৎ নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। কারণ الله نور السموات و الارض —স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রকৃত জ্যোতিও তিনি।

'রহমান' নাম সম্বন্ধে ছুরা মরয়মে বলা হইয়াছে :-

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ـ

অর্থাৎ—"যাহারা বিশ্বাসবান ও সৎকর্ম্মশীল হয়—রহমান তাহাদিগকে অবিলম্বে প্রেমদান করেন।" এই আয়তে রহমান নামের প্রেমময় স্বরূপটা স্পষ্ট ভাবে জানা যাইতেছে। এইরূপে "রহিম" তাঁহার করুণাময় স্বরূপটা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে।

এখন আমরা পাঠককে অনুরোধ করিতেছি—আল্লার গুণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে দুন্‌য়ার সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের সকল শিক্ষার সার একত্র করিয়া, ফাতেহায় বর্ণিত আল্লাহ, রহমান ও রহিম, এই তিনটী নাম, এবং 'রব্ব্‌ুল আলামীন' ও 'মালেকে য়াওমুদ্দিন'—এই দুইটী বিশেষণের সহিত একত্রে তাহার তুলনা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, দুন্‌য়ার সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, সমস্ত দর্শন, 'মা'রেফাতে এলাহী' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে,—বিশেষতঃ কোর্‌-আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লার জাত ও ছেফাত সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়াছে—এখানে ছুরা ফাতেহায় তাহার সারৎসার বা মূলীভূত সত্য অতি সুন্দর ও ব্যাপকরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইতেছে। বলা হইতেছে যে ঃ—

(১) আল্লাহ—নিশ্চিত সত্তা—সর্ব্বগুণাকর—সকল ত্রুটী বর্জ্জিত।
(২) আল্লাহ—প্রেমময়, করুণাময়।
(৩) আল্লাহ—সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা।
(৪) আল্লাহ—বিচারক।
(৫) আল্লাহ—স্বর্গ মর্ত্ত্যের জ্যোতি স্বরূপ।
(৬) আল্লাহ—সমস্ত মহিমার একমাত্র অধিকারী।

(২) পরকাল তত্ত্ব বা এল্‌মুল মাআদ ঃ—

কোর্‌আনের বিভিন্ন ছুরায় এ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা সন্নিবেশিত আছে, তাহার সার এই যে, মানুষের আত্মা দেহচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লয় হইয়া যায় না। মৃত্যু মানুষের বিনাশ নহে—পরিবর্ত্তন। মানুষ এ জীবনে সৎ বা অসৎ যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাকে পরজীবনে তাহার অনুরূপ সু বা কু ফল ভোগ করিতে হইবে। এই পর-জীবনের বা তাহার ফল ভোগের স্বরূপ সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, মূল পরজীবন ও কর্ম্মফল ভোগের কথা দুন্‌য়ার সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র এক বাক্যে স্বীকার করিতেছে। তৃতীয় আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লার এই ন্যায়ের রাজ্যে—নিয়মের রাজ্যে,—মানুষকে আল্লার হুকুমে নিজের কৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে, আল্লার বন্ধু, করুণাময় ও প্রেমময় স্বরূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহার রাজ্যে প্রেমের সঙ্গে বিচারেরও স্থান আছে।

তাহার পর কর্ম্মফল যখন সত্য, তখন সৎকর্ম্ম অবলম্বন করা, এবং অসৎকর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থান করাও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। আল্লার প্রতি, তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি,

এবং নিজের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্পাদন করার নামই আমল বা 'এবাদত'। সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে সাধারণতঃ এবং কোর্‌আনে বিশেষতঃ এই এবাদতের বিভিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফাতেহায় তাহার এই সার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লার আদেশ, নিষেধ ও সন্তোষ অসন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়ার নামই 'এবাদত', এবং এই 'এবাদত' বা দাস-রূপে আত্মসমর্পণই মানুষের কর্ম্ম জীবনের প্রধান সাধনা।

(৩) অদৃষ্টবাদ ও কর্ম্মবাদ :—

তক্‌দির ও তদ্‌বির বা অদৃষ্টবাদ ও জড়বাদের জটিল সমস্যার সমাধান করার জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহে চিরকালই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কোর্‌আনে ইহার যে সুন্দর সমাধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ফাতেহার চতুর্থ আয়তে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইতেছে। এমাম রাজী যথার্থ বলিয়াছেন যে, এই আয়তে জবর ও কদরের দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, মানুষ ইচ্ছা ও শক্তি শূন্য অচল জড়পদার্থের ন্যায় সম্পূর্ণ অক্ষমও নহে, পক্ষান্তরে সে সর্ব্ব শক্তিমান ও সম্পূর্ণ স্বাধীনও নহে। তাহার শক্তি আছে বটে—কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ;—জ্ঞান আছে বটে--কিন্তু তাহা মায়া মোহের প্রপঞ্চে আচ্ছাদিত; ইচ্ছা আছে বটে—কিন্তু তাহা রিপু ও প্রবৃত্তির প্রভাবে আবিষ্ট। সেই জন্য নিজের ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞানকে কাজে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে তাহার সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর, তাহার প্রেমময় বন্ধুর, তাহার করুণা নিধান অভিভাবকের—অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্যের জ্যোতি স্বরূপ সেই আল্লার শরণ গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতে হয়—শক্তি ভিক্ষা করিতে হয়। ইহাই হইতেছে প্রথম আবশ্যক* এবং প্রধান সাধনা ;—এবং ইহাই হইতেছে আল্লার হুজুরে বান্দার শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনীয় বিষয়

কিন্তু দুন্‌য়া আবার বিবেকের বিকারে মায়ার মোহে ও পাশবিক প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ—ঘোর তিমির পুঞ্জে আচ্ছাদিত। ইহার মধ্যে আবার আলেয়ার আলো আছে—, মরু মরীচিকা আছে। এগুলি মানুষকে সর্ব্বদাই আলোকের নামে জোলমাতের অতল গুহা-গহ্বরের এবং মঞ্জিলের নামে পূতিগন্ধময় শ্মশানের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সুতরাং এ পথের জন্য অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক এবং হিতৈষী সহযাত্রীগণের খুবই আবশ্যক হইয়া থাকে। নবী ও রছুল হইতেছেন—যুগের সর্ব্ব প্রধান আদর্শ, এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হাদী বা পথপ্রদর্শক। কোর্‌আনে এই নবুয়তের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার সারৎসাররূপে নবুয়তের আবশ্যকতার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইতেছে।

(৪) ইতিহাসের শিক্ষা :—

কোর্‌আনে ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বহু উপাখ্যান

* 'দৈনিক রুটি' নহে। খৃষ্টানদিগের Lord's prayer বা প্রভুর প্রার্থনা; দেখ মথি ৬ অধ্যায়।

বর্ণিত হইয়াছে। মন্দ জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভের এবং জাতিগণের জীবন মরণের দুই দিককার দুই বিসদৃশ্য চিত্র পরিস্ফুট করিয়া দিয়া তাহার দ্বারা মানব সমাজকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক দিকে নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও অন্যান্য সাধু সজ্জনগণের মঙ্গল ও মুক্তির পুণ্য আদর্শ,—অন্যদিকে অবিশ্বাসী অনাচারীদিগের সর্ব্ব নাশের শোচনীয় আলেখ্য। ফাতেহার শেষ দুই আয়তে এই সকল শিক্ষার সারৎসাররূপে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লার এবাদৎ ও সত্যের সেবাতেই মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি সমূহ আল্লার অনন্ত 'ন্যামত' ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া থাকে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার ও অনাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে সে নিজেই তাঁহার 'গজব' বা দণ্ডকে নিজের উপর ডাকিয়া আনে।*

খৃষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি :—

কতিপর খৃষ্টান লেখক ছুরা ফাতেহার তফছির প্রসঙ্গে কতকগুলি ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

রডওয়েলের অন্যায় উক্তি—

পাদরী রডওয়েল (Rev. J. M. Rodwell) বিছমিল্লাহ্ সংক্রান্ত টীকায় লিখিয়াছেন :—

This formula—Bismillahi 'rrahmani 'rrahim—is of Jeweish origin. It was in the first instance taught to the Koreish by Omayah of Taief the poet......who during his mercantile journeys......had made himself acquainted with the sacred books and doctrines of Jews and Christians. (Kitab-al-Aghani : 16, Delhi). Muhammad adopted and constantly used it.

এই মন্তব্যের সার মর্ম্ম এই যে, "তাএফের কবি ওমাইয়া সর্ব্ব প্রথমে কোরেশদিগকে 'বিছমিল্লাহির-রহমানির-রহিম' পদটী শিখাইয়া দিয়াছিল। ওমাইয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম পুস্তক ও ধর্ম্ম বিশ্বাসাদির সহিত পরিচিত হইয়াছিল। ফলে এই পদটী মূলতঃ এহুদীদিগের নিকট হইতে গৃহীত। (দিল্লীর মুদ্রিত 'কেতাবুল আগানী' পুস্তকের ১৬শ খণ্ডে ইহা বর্ণিত হইয়াছে)। মোহাম্মদ উহা গ্রহণ এবং নিয়ত উহার ব্যবহার করিতে থাকেন।" [The Koran—১৯ পৃষ্ঠা।]

নিজের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য রডওয়েল সাহেবের প্রথমে দেখান উচিৎ ছিল যে, কবি উমাইয়া এহুদী ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিশ্বাসাদির সহিত পরিচিত হইয়াছিল। তাহার পর এহুদী ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির বচন উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখান উচিৎ ছিল যে, ঐ সকল শাস্ত্রের অমুক অমুক স্থানে বিছমিল্লাহির-রহমানির-রহিম বা তাহার

* দুইটী আয়তে ভাষার তারতম্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। 'এন্‌আম' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'যাহাদিগের প্রতি আল্লাহ 'এন্‌আম' করিয়াছেন।' আর 'গজব' সম্বন্ধে বলা হইতেছে—'যাহারা অভিশপ্ত হইয়াছে।'

মর্ম্মানুবাদ বিদ্যমান আছে। এই দুইটী বিষয় সপ্রমাণ না করিলে যুক্তির হিসাবে তাঁহার দাবীর কাণা কড়িরও মূল্য থাকে না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই,—করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই প্রমাণহীন দাবীর কোন মূল্যই হইতে পারে না।

"আগানী"র কথা ঃ—

"আগানী"র উদ্ধৃত অভিমত সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, "কেতাবুল আগানী' ইতিহাস পুস্তক নহে, এবং উহার রচয়িতা ঐতিহাসিক হিসাবে উহার সঙ্কলন করেন নাই "কেতাবুল আগানী" নামের অর্থ—সঙ্গীত পুস্তক। আলী এস্পেহানী নামক জনৈক সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ সাহিত্যিক এই পুস্তকে বহু প্রাচীন ও সমসাময়িক সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া তাহার স্বর ও তাল মান প্রভৃতি উহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। গায়কদিগের জীবনীও ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গীত চর্চ্চা করাই গ্রন্থকারের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এই হিসাবে যে কোন প্রাচীন কবিতা ও সঙ্গীত সংক্রান্ত যে কোন বর্ণনা ও গল্প গুজব তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহার বিশ্বস্ততার কোন পরীক্ষা না করিয়াই, তিনি সেগুলিকে নিজের পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। এ জন্য শত শত ভিত্তিহীন এমন কি সত্যের বিপরীত বিবরণ তাঁহার পুস্তকে অবাধে স্থান লাভ করিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত মণ্ডলী এই কারণে "আগানী"র বর্ণনা বা রেওয়ায়তগুলিকে ভিত্তিহীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "আগানী"র গ্রন্থকার ২৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং ৩৫৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। (১)

পক্ষান্তরে, বদর সমরে নিহত কোরেশদিগের সম্বন্ধে শোক-গাথা রচনা করার পর নব হিজরীতে উমাইয়ার মৃত্যু হয়। (২) সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, "আগানী"-রচয়িতার জন্মের ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে উমাইয়ার মৃত্যু হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর বয়সে এস্পেহানী "আগানী রচনা শেষ করিয়াছিলেন, এইরূপ হিসাব ধরিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকার নিজ পুস্তকে অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বকার বিবরণ প্রদান করিতেছেন। এই দীর্ঘ তিন শতাব্দী পরে তিনি যে বিবরণ প্রদান করিতেছেন, তাহা তিনি কোন্ সূত্রে অবগত হইলেন, এবং সে সূত্র বিশ্বস্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা না করিয়া ঐ শ্রেণীর বিবরণকে প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

পাদ্রী সাহেবের অসাধুতা ঃ—

"আগানী"র বিশ্বস্তার বিচার পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা তাহার বর্ণিত বিবরণটার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। পাঠকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রকৃত পক্ষে "আগানী

(১) এডওয়ার্ড যন্তিক কৃত—একতেফা, ১—৩২, ৮০ পৃষ্ঠা।
(২) এছাবা, ১—১৩৩ পৃষ্ঠা।

পুস্তকে পাদ্রী সাহেবের উক্তির কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না। প্রমাণ স্বরূপে আমরা "আগানী"র বিবরণটী নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

و يقال ان امية قوم على اهل مكة باسمك اللهم فجعلوها فى اول كتبهم مكان بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الاغانى مصرى ' ب ۴ ' ص ۱۸۰ -

অর্থাৎ—"কথিত হইয়া থাকে, উমাইয়া মক্কাবাসীদিগকে 'বে-এছমেকা আল্লাহুম্মা' এই পদটী শিক্ষা দিয়াছিল। তাহারা তখন হইতে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' পদের স্থলে নিজেদের পত্রাদির প্রারম্ভে ঐ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।" (৪—১৮০ পৃষ্ঠা)।

"আগানী"র এই বিবরণটী যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা আমরা পরে দেখাইব। এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই বিবরণকে বিশ্বস্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উমাইয়া মক্কাবাসীকে "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" শিক্ষা দেয় নাই, বরং সে শিখাইয়াছিল—"বে-এছমেকা আল্লাহুম্মা"—এই পদটী। তাহার পর আলোচ্য বিবরণ হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উমাইয়ার শিক্ষা দানের পূর্ব্বে "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদের ব্যবহার মক্কাবাসীর মধ্যে যথেষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। সুতরাং উমাইয়া ঐ পদটী মক্কাবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল,—এ দাবীরও কোন সার্থকতা নাই।

এই বিবরণের ভিত্তিহীনতা :—

(ক) "আগানীর" গ্রন্থকার এই বিবরণের পূর্ব্বে يقال ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার শাব্দিক অনুবাদ—"কথিত হয়।" কোন দুর্ব্বল অবিশ্বস্ত ও ভিত্তিহীন বর্ণনা প্রসঙ্গে এই প্রকার 'মজহুলের ছেগা' বা Passive Verb ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা আরবী সাহিত্যের একটা সর্ব্বজন বিদিত সাধারণ ধারা। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, "আগানী" রচয়িতা নিজেই এই বর্ননাটীকে দুর্ব্বল ও অবিশ্বস্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। অতএব "আগানী"র বরাত দিয়া এই বিবরণকে প্রমাণ স্থলে উপস্থাপিত করা যে কতদূর অন্যায় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

(খ) কোর্‌আনের ফোর্কান ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে :—

و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن !

অর্থাৎ—"এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় যে, তোমরা রহমানের সন্নিধানে ছেজদা কর, তাহারা বলিয়া উঠে—'রহমান' আবার কি ?"

মিঃ পামার (Mr. Palmer) তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় ছুরা ফোর্কানের সার সঙ্কলন প্রসঙ্গে এই আয়ত সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—The Quraish object to the 'Merciful' as a new God. অর্থাৎ—"কোরেশগণ 'রহমান' নামে আপত্তি করিয়া বলিল—ইহা ত নূতন খোদা।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ছুরা ফোর্কানের এই আয়তটী প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্য্যন্তও 'রহমান' শব্দটী কোরেশদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত

ছিল। বস্তুতঃ 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' পদটীও যে, সে সময় পর্য্যন্ত কোরেশদের অবিদিত ছিল, তাহাও এই সঙ্গে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ বিছমিল্লায় 'রহমান' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সে সময় "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদটী জানা থাকিলে, এবং রডওয়েল সাহেবের কথা মতে কোরেশগণ নিজেদের পত্রাদিতে উহার যথেষ্ট ব্যবহার করিতে থাকিলে, এই সময় 'রহমান' শব্দ শুনিয়া তাহাদের আশ্চর্য্য প্রকাশের, বা তাহাকে "অভিনব" নাম বলিয়া অভিমত প্রকাশের কোনই কারণ ছিল না।

স্যর উইলিয়ম মুয়র প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ ছুরা ফোর্কানকে Fifth Period বা পঞ্চম পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে এই পর্য্যায়ের ছুরাগুলি নবুয়তের দশম সন হইতে মদিনায় হেজরত কাল অবধি প্রকাশিত হইয়াছিল। (Hughes, ৫০২ পৃঃ)। সুতরাং তাঁহাদিগের হিসাব মতেও দেখা যাইতেছে যে, হেজরতের সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত, বিছমিল্লায় বর্ণিত 'রহমান' শব্দ মক্কাবাসীদিগের তথা আরবের জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অশ্রুত ও অবিদিত ছিল। অন্ততঃ তাহারা ঐ শব্দটা কখনই ব্যবহার করে নাই। অথচ হেজরতের পূর্ণ তের বৎসর পূর্ব্বে কোর্‌আনের প্রথম ছুরা নাজেল হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদটীও অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। কার্য্যতঃ আমরা দেখিতেছি যে, কোরেশদিগের বিছমিল্লার সহিত পরিচিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই কোর্‌আনের প্রত্যেক ছুরার সহিত 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' পদটীও নাজেল হইয়া আসিয়াছিল। অতএব—"মোহাম্মদ কোরেশদিগের নিকট হইতে ঐ পদটী গ্রহণ করিয়াছিলেন"—রডওয়েল সাহেবের এই উক্তিটী যে কতদূর অসমীচীন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

(গ) হজরতের জীবনী আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের শেষ ভাগে হোদায়বিয়া নামক স্থানে হজরতের সহিত কোরেশদিগের একটা সন্ধি হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সন্ধি লেখার সময় হজরত উহার প্রারম্ভে "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" লিখিতে আদেশ করেন। কোরেশ প্রতিনিধি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন ঃ—

فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم و لكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم - مسلم ' ب ٢ ' ص ١٠٥ -

অর্থাৎ—" 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' যে কি, তাহা আমরা অবগত নহি। অতএব উহার স্থলে 'বে-এছমেকা আল্লাহুম্মা' লেখা হউক—যাহার সহিত আমরা পরিচিত।" (ছহি মোছলেম ২—১০৫)।

হাদিছের এই বিশ্বস্ততম কেতাবে বরা-বেন-আজেব নামক হজরতের সহচর ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কর্ত্তৃক বর্ণিত এই বিবরণ হইতে অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিজরীর ষষ্ঠ সনের অর্থাৎ নবুয়তের উনিশ বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কোরেশগণ "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদের সহিত পরিচিত ছিল না। যে সময় তাহারা নিজেদের পত্রাদির প্রারম্ভে ঐ পদ লিখিতে

অভ্যস্ত হইলে, সন্ধিসভায় উপস্থিত উভয় পক্ষের বহু গণ্যমান্য লোকের সাক্ষাতে কোরেশগণ তোমাদের এই 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' যে কি, তাহা আমরা জানি না বলিয়া কখনই উহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিত না, এবং তাহা হইলে মুছলমান পক্ষ তাহাদিগের এই আপত্তির যথাযথ প্রতিবাদ করিতেও কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলে এই সকল যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রডওয়েল সাহেবের উক্তি কেবল প্রমাণহীন দাবীই নহে, বরং উহা স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণের বিপরীত একটা কল্পিত উপকথা মাত্র।

সেল সাহেবের অনুমান :—

কোর্‌আনের বিখ্যাত অনুবাদক পাদ্রী সেল সাহেব বলিতেছেন,—"এহুদী ও প্রাচ্য খৃষ্টানদিগের এইরূপ স্থলে বিছমিল্লার অনুরূপ এক একটা পদের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে (apt to believe) বাধ্য হইতেছি যে, প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ মজুসদিগের নিকট হইতেই 'বিছমিল্লাহ' গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের পুস্তকগুলি بنام یزدان بخشایشگر دادگر—এই পদের সহিত আরম্ভ করিতে অভ্যস্ত ছিল।" (ভূমিকা, ৪২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সেল সাহেব তাঁহার এই দাবীর কোন প্রকার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। এ ক্ষেত্রে পার্সীদিগের দুই একখানা পুস্তকের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে সেই পুস্তক রচনার ও তাহার বর্ত্তমান মুসাবিদার সন তারিখ লইয়া আলোচনা করার সুবিধা হইত। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণের ইহাতে সুবিধা হইলেও পাদ্রী সাহেবের সমস্ত উদ্দেশ্যই তাহা হইলে পণ্ড হইয়া যায়! এই জন্য সাবধানতার সহিত এ বিষয়টা তিনি চাপিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, পাদ্রী সাহেব এখানে বিশেষ কারণ বশতঃ পার্সীদিগের ব্যবহৃত পদটী কাট ছাঁট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'দছাতিরে আছমানী' পুস্তকে এই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে :—

بنام ایزد بخشایندہ بخشایشگر مہربان دادگر- سراجی پریس' دہلی' ১৮৮০ع-

এই পদটী একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা অন্য কোন পদের অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মূলের ভাব যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অনুবাদক মূলের এক একটা শব্দের অনুবাদে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সত্যটা ঢাকিয়া রাখার উদ্দেশ্যে পাদ্রী সাহেব পার্সীদিগের ব্যবহৃত পদটী এমন করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর বাস্তবিক সেল সাহেব ঐ সংক্ষিপ্ত পদটী যদি পার্সীদিগের কোন পুস্তকে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের মূল পুঁথি পুস্তকে ঐ পদটী বিদ্যমান ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থকার বা অনুবাদকগণ অন্য কাহারও নিকট হইতে ঐ পদটী গ্রহণ, এবং নিজ নিজ ইচ্ছা মত তাহার বিভিন্ন প্রকারের অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্য কোন পুস্তকে بنام یزدان بخشایشگر دادار -

আর কোনও পুস্তকে بنام ایزد بخشایندهٔ بخشایشگر مهربان دادگر বলিয়া তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে।

মজুসদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আভেস্তা ও তাহার জেন্দ বা ব্যাখ্যা, এবং তাহাদিগের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আলেকজন্দরের আক্রমণের পর হইতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর তৃতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে সাসানীয় বংশের সম্রাটগণের চেষ্টায় পুরোহিতদিগের স্মৃতি, বাজার প্রচলিত কিংবদন্তি, এবং অন্যান্য কাগজ পত্র হইতে ঐ সমস্ত পুস্তকের শিক্ষা একত্রে সঙ্কলন করা হইতে থাকে। সম্রাট দ্বিতীয় শাহপুরের সময় (৩০৯—৩৮০ খৃষ্টাব্দ) এই সঙ্কলন কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে। যে প্রাচীন ভাষায় আভেস্তা প্রভৃতি লিখিত বা পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বহু পূর্ব্বেই অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই সাসানীয় বংশের শেষ রাজাদিগের সময় তাহার অধিকাংশ পুঁথি পুস্তক প্রচলিত পাহলভী ভাষায় অনূদিত হয়। 'ব্রিটানিকা' বিশ্বকোষের লেখক এই সকল বিবরণ দিবার পর পাঠকগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন ঃ—

"But this Sassanian origin of the Avesta must not be misunderstood.........it is now impossible to draw a sharp distinction between that which they found surviving ready to their hand and that they themselves added."

অর্থাৎ—"কিন্তু আভেস্তার এই সাসানীয় মূল সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল ধারণা না করেন।...... প্রকৃত পক্ষে আভেস্তার কতকটা অংশ তাহারা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, আর তাহাতে নিজে তাহারা যে কতকটা অংশ যোগ করিয়া দিয়াছে, তাহা এখন বাছিয়া বাহির করা অসম্ভব।"

পাঠকগণ এখানে স্মরণ রাখিবেন যে, সাসানী বংশের শেষ রাজাগণের সময় এই অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। এবং নওশেরওয়ান আদেল, তাঁহার পুত্র খসরু পরভেজ প্রভৃতি হইতেছেন সাসানী বংশের শেষ রাজা। নওশেরওয়াঁ হজরতের সমসাময়িক এবং হজরতকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজধানীতে পাঠাইবার জন্য এই নওশেরওয়াঁই এমনের গবর্ণরের নিকট ওয়ারেণ্টের পরওয়ানা পাঠাইয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে তাঁহার পুত্র খসরু পরভেজ পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের অধিকারী হন এবং এই পরভেজের নিকটই হজরত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রের মুসাবিদা আজও সুরক্ষিত হইয়া আছে। ঐ পত্রের শিরোভাগে যথানিয়মে সম্পূর্ণ "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম"—পদটী লিখিত আছে। সুতরাং নওশেরওয়াঁ ও খসরু পরভেজের সময়, যখন পুরাতন অবোধ্য ভাষায় লিখিত পুঁথি পুস্তকের অনুবাদ এবং নূতন বিষয়ের সঙ্কলন চলিতেছিল—সম্পূর্ণ 'বিছমিল্লাহ'টী তখন যে তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, পার্সিকেরা 'বিছমিল্লা'র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের পুস্তকে তাহার অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া

লইয়াছিল। এই সমস্ত বিজ্ঞান জ্যোতিষ, ইতিহাস ও অন্যান্য নীতি কথাগুলি তাহারা যে ভাবে, আভেস্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছিল, তাহাতে 'বিছমিল্লা'র অনুবাদও যে উহাতে শামিল করিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, হজরতের সময় তাঁহার সমসাময়িক পার্সিক পণ্ডিতগণ আভেস্তা প্রভৃতির অনুবাদ করিতেছিলেন, এবং তাহাদিগের অনুবাদ সরকারী কোষাগারে আবদ্ধ থাকার অবস্থাতেই হজরত পরলোক গমন করেন। এই সময় পার্সিকদিগের দুর্ব্বোধ্য পাজেন্দ ভাষায় লিখিত তাহাদের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা তাহার কোন অংশ হজরতের হস্তগত হইয়াছিল বলিয়া শত্রুপক্ষ ঘুণাক্ষরেও সামান্য একটা প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় হজরত পার্সিকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান না করিয়া পার্সিকগণই হজরতের পত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করাই অধিক সঙ্গত।

বস্তুতঃ এই প্রকার অনুমান করার কোনই আবশ্যকতা নাই। সেল সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, আলেফ-বে প্রভৃতি বর্ণমালাগুলিও কি হজরত পার্সিকদিগের পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ? তাঁহার যুক্তির হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, যে হেতু পার্সিক-দিগের ধর্ম্ম পুস্তক সমূহে এই বর্ণমালাগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে, সুতরাং বলিতে হইবে যে, আরবীগণ পার্সিকদিগের কোন পুস্তক হইতে তাহা চুরি করিয়া থাকিবে! জেন্দ ও পাহলভী ভাষার বর্ণমালার সমস্ত ইতিহাসকে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামীর যুপকাষ্ঠে বলি দিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যেরূপ অসঙ্গত, প্রচলিত আভেস্তা প্রভৃতির সমস্ত ইতিবৃত্তকে অস্বীকার করিয়া কোর্‌আনের পদ বিশেষকে তাহার অনুকরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও ঠিক সেইরূপ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রচলিত আভেস্তা প্রভৃতি পার্সিক ধর্ম্ম পুস্তকের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, পাহলভী ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এবং তাহার পর পারস্য দেশে আরব অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে। মুছলমানেরা আরবী ও আধুনিক ফার্সী ভাষায় উহার অনুবাদ করেন। প্রাক্-এছলামিক যুগের ইতিহাস সঙ্কলন ব্যপদেশে তাবরী প্রভৃতি মুছলমান ঐতিহাসিকগণ তাহার অনেক অংশ নিজ নিজ পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। 'পঞ্চতন্ত্রের' আরবী অনুবাদক 'এবনুল্ মোকাফ্ফা' (মৃত্যু ১৫৮ হিজরী, ৭৭৪ খৃষ্টাব্দ) পার্সিকদিগের বহু পুস্তক পুস্তিকার অনুবাদ করিয়াছিলেন,—ইহা অকাট্য সত্য। (দেখ—এডওয়ার্ড কৃত্তিক প্রণীত এক্‌তোফা, 'ব্রিটানিকা' বিশ্বকোষ Art, Pahlavi প্রভৃতি)। এই শ্রেণীর মুছলমান অনুবাদকগণের প্রভাবেই যে, পার্সিকগণের প্রচলিত কোন কোন পুস্তকে বিছমিল্লার অনুবাদ স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই জন্য পার্সিকদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের এক অংশ মুছলমান ধর্ম্ম সাহিত্যের অনুকরণে Rewayat—রেওয়ায়াত—নামে অভিহিত হইয়া আছে। (দেখ—ব্রাউন, 'ব্রিটানিকা')।

হজরত পার্সিকদিগের কোন পুস্তক হইতে 'বিছমিল্লাহ' পদটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পাদ্রী সেল সাহেব তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। না বলার অনেক কারণও আছে। কারণ পার্সিকদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় আভেস্তা প্রভৃতির যে সকল পুরাতন মুসাবিদা পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সমস্তই ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীর লিখিত। আভেস্তার প্রাচীনতম মুসাবিদা Copenhagen নগরে রক্ষিত আছে। উহা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের লিখিত। হরবাদ মিহিরপান্ কাইখসরূ নামক জনৈক পার্সীর লিখিত যে চারি খানি ক্ষুদ্র মুসাবিদা ক্যাম্বে (Cambay) নগরে রক্ষিত আছে, তাহাও ১৩২৩ ও ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের লিখিত। (ব্রিটানিকা—'জেন্দ')। ফলে এছলামের পূর্ব্বকার লিখিত আভেস্তা বা অন্য কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র দ্বারা যতক্ষণ না সপ্রমাণ করা হইতেছে যে, বাস্তবিক তাহাতে 'বিছমিল্লাহ' পদটী এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাবৎ এ সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনাই হইতে পারে না। সেল সাহেব এই জন্যই কোন পুস্তকের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

কোরআন শরীফ

২। ছুরা বকরা*।

٢ - سورة البقــرة

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।

بسم الله الرحمن الرحيم

১ আমি-আল্লাহ্-জ্ঞানময়!

١ الـــمّ

২ এই মহামান্বিত গ্রন্থ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই,—সংযমশীলদিগের জন্য ইহা (সৎপথে) পরিচালক।

٢ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ، هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

৩ যাহারা লোকচক্ষের অগোচরেও ঈমান পোষণ করিয়া থাকে, এবং যাহারা নামাজকে যথাযথরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি—তন্মধ্য হইতে (কতকাংশ) ব্যয় করিয়া থাকে—

٣ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

৪ এবং তোমার প্রতি যাহা নাজেল (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা নাজেল করা হইয়াছে — তাহার প্রতি যাহারা ঈমান পোষণ করে, এবং পরকাল সম্বন্ধে যাহারা দৃঢ়-প্রত্যয়।

٤ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ، وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

---

* এই ছুরা বকরা নামে খ্যাত—বকরা অর্থে গাভী। বনি এছরাইল জাতি এক সময় গো-পূজার মোহে আত্মহারা হইয়া পড়ে। সেই সময় তাহাদিগকে গো-কোরবানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই ছুরায়

৫ ইহারাই (হইতেছে) নিজ প্রভুর পথের অনুসরণকারী, এবং ইহারাই (হইতেছে) সিদ্ধমনোরথ।

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ
وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৬ নিশ্চয় যাহারা (সত্যকে জ্ঞাতসারে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর — তাহাদিগের পক্ষে উভয়ই সমান, তাহারা কখনই ঈমান আনিবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ

৭ আল্লাহ্ তাহাদিগের মনের উপর ও তাহাদিগের কাণের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের চোখের উপর পর্দা পড়িয়া আছে, — ফলে তাহাদিগের নিমিত্ত গুরুতর শাস্তি (নির্দ্ধারিত) আছে।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى
سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

টীকা ঃ—

১ الم। **আলেফ লাম মীম** ঃ—

ইহা আরবী বর্ণমালার তিনটী অক্ষর, ছুরা বকরার প্রারম্ভে এই অক্ষর তিনটী সন্নিবে হইয়াছে। আমাদিগের তফছিরকারগণ ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে এক দলের মতে, কোর্‌আনের বিভিন্ন ছুরার প্রারম্ভে এই শ্রেণীর যে সব অক্ষর বর্ণিত হইয় তাহার অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে। কোর্‌আনের "মোতাশাবেহ শব্দের অসঙ্গত অর্থ করিয়া তাঁহারা এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। অন্য দল বলে ইহার নিশ্চয়ই অর্থ আছে, এবং সেই অর্থ বান্দার বোধগম্য করাইবার উদ্দেশ্যে ঐ অক্ষরও

নি এছরাইলের পতনের সেই সকল উপাখ্যানের উল্লেখ আছে বলিয়া ইহাকে 'বকরা' নাম দেওয়া হইয়া এই ছুরাটী হেজরতের বৎসরাধিক কাল পরে নাজেল হইয়াছিল। দ্বিতীয় পারার প্রথম ভাগে কে পরিবর্ত্তনের বর্ণনা আছে। কেবলা পরিবর্ত্তনের ঐ আদেশ যে হেজরতের ১৭।১৮ মাস পরে নাজেল হইয়া বিভিন্ন ছহি হাদিছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (বোখারী, মোছলেম, প্রভৃতি)।

আল্লার কালামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লার কালামে কোন ব্যর্থ আয়ত, শব্দ বা বর্ণ কখনই স্থানলাভ করিতে পারে না। এ সকল তর্ক বিতর্ক কোর্‌আনের সমস্ত প্রধান প্রধান তফছিরে বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া আছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। আমরা দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদ সমর্থন করি, কারণ উহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মত। "মোতাশাবেহাত" সংক্রান্ত আয়তের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য পক্ষের মতের অযৌক্তিকতা বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

হজরত রছুলে করিমের আবির্ভাব এবং তাঁহার প্রতি কোর্‌আন নাজেল হওয়ার সময়, আরবী সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। আরবগণ তখন বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, এক একটা শব্দের, এমন কি এক একটা পদের পরিবর্ত্তে এক একটা অক্ষর মাত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং এই প্রকার সংক্ষেপ তাঁহাদের অলঙ্কারের একটা সর্ব্বজন সমাদৃত বিশেষত্বে পরিণত হয়। আরবী ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রগুলিতে ইহার ভূরি ভূরি নজির পাওয়া যায়। এবনে জরির, রাজী প্রভৃতি তফছিরকারগণও আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহার কতকগুলি নমুনাও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

আরবীর ন্যায় অন্যান্য সাহিত্যেও এই প্রকার সংক্ষেপ ব্যবহারের ধারা দেখা যায়। গায়ত্রীর প্রথম বর্ণ "ওঁ" ইহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বি-এ, এম-এ, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলিরও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রসায়ন, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রেও এইরূপ অক্ষরের ব্যবহার হইয়া থাকে। ফলে, কোর্‌আনে এই অক্ষরগুলির ব্যবহার একটা অভিনব কিছু নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যে সময় কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল, সমসাময়িক আরব বা ছাহাবীগণ তখন এই অক্ষর তিনটাকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন? আবহুল্লাহ এবনে মাছউদ ও এবনে-আব্বাছ ছাহাবীদিগের মধ্যে সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা উভয়ই বলিয়াছেন,—'আলেফ-লাম-মীম' অক্ষর ত্রয়ের অর্থ :— انا الله اعلم — বা 'আমি জ্ঞানময় আল্লাহ'। ছঈদ-এবনে-জোবেরও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। (মনছুর ১—২২, মহিত ১—৩৪, এবনে-জরির প্রভৃতি)। পক্ষান্তরে ইহার বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তি প্রমাণ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। কাজেই উহার এই অর্থ গ্রহণ করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি।

২ ذلك জালেকা :—

পাদ্রী পামার সাহেব বলিতেছেন—'জালেকা' শব্দের প্রকৃত অর্থ that বা 'সেই'। তাঁহার মতে কোর্‌আনের অনুবাদকগণ এ বাবৎ this বা 'এই' বলিয়া উহার অনুবাদ করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (The Quran ১—২, ২নং টীকা)। খৃষ্টান লেখকগণ এই ধুয়া ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, আয়তের প্রকৃত অনুবাদ হইবে—"সেই গ্রন্থ"; আর

সেই গ্রন্থ মানে বাইবেল। ফলে, ইহা দ্বারা তাঁহারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চাহেন।

আরবী সাহিত্যে যাঁহার সামান্য একটুও ব্যুৎপত্তি আছে, তিনি পামার সাহেবের সিদ্ধান্তকে কখনই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ আরবী সাহিত্যে "এই" ও "সেই" উভয় অর্থেই 'জালেকা' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু মূলতঃ উহার আভিধানিক অর্থ—"এই"। এমাম রাজী বহু অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ স্থলে ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। (১—২৩৭)।

তাহার পর 'জালেকাল্-কেতাব' পদের অর্থ যদি "সেই কেতাব" বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কেবল বাইবেলকে বুঝাইবে—তাহার কারণ কি? কোর্‌আন ত দুন্‌য়ার সমস্ত আছমানী কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে, এক তাওরাত বা ইঞ্জিল বলিয়া কোনও খৎ নাই। পক্ষান্তরে তাওরাত বা ইঞ্জিলের সমর্থনের অর্থ এই যে, হজরত মূছার নিকট যে তাওরাত আসিয়াছিল, বা হজরত ঈছা আল্লার নিকট হইতে যে ইঞ্জিল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কোর্‌আন তাহার সমর্থন করে। তাওরাতের নামে প্রচারিত এহুদীদিগের 'খোশ্‌খিয়াল' বা 'জালিয়াতি'র সমর্থন কোর্‌আন করে না,—সেণ্টপল বা মার্ক-মথির উক্তিকে হজরত ঈছার প্রতি অবতারিত আল্লার কালাম বলিয়াও কোর্‌আন কখনই স্বীকার করে না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'জালেকা'কে—'সেই' অর্থে গ্রহণ করিলেও, 'জালেকাল্-কেতাব' পদটী "সেই গ্রন্থ" অর্থে আদৌ গৃহীত হইতে পারিবে না। এ ক্ষেত্রে উহার অর্থ হইবে ذلک ' اى الصراط المذکور فى الفاتحة —অর্থাৎ ছুরা ফাতেহায় যে ছেরাতুল্-মোস্তাকিমের-উল্লেখ হইয়াছে, তাহা হইতেছে 'এই কেতাব'। (মুহিত, ১—৩৬ পৃঃ)। বিভিন্ন হাদিছ হইতে স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতেছে যে, হজরত স্বয়ং কোর্‌আনকেই الصراط المستقیم বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (আহমদ, তিরমিজী প্রভৃতি)।

আরবী ভাষায় 'হা-জা' ও 'জালেকা' শব্দের একটা বিশেষ ব্যবহারিক অর্থ আছে—ইংরাজী অনুবাদকেরা সে দিকে লক্ষ্য না করায় ইহা লইয়া এত আলোচনার উৎপত্তি হইয়াছে। পামার সাহেব অন্ততঃ লেনের (Lane) অভিধান খুলিয়া দেখিলে জানিতে পারিতেন যে, কোন বস্তুর অকিঞ্চিৎকারিতা প্রতিপন্ন করার জন্য, আরবীতে তাহার সম্বন্ধে 'হা-জা' এছমে ইশারা ব্যবহার করার যেমন নিয়ম আছে, So, on account of its high degree of estimation, a thing that is approved, is indicated by Zalika." (Lane's Lexicon).—সেইরূপ কোন সমর্থিত বস্তুকে তাহার উচ্চ সম্মানের কারণে 'জালেকা' দ্বারা বর্ণনা করা হয়।

প্রকৃত পক্ষে 'জালেকা' এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং 'জালেকাল্-কেতাব' পদের অর্থ হইবে—"এই মহামান্বিত বা সম্মানিত কেতাব"।

الكتب কেতাব—কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থের ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন অংশ এবং কোন লিখিত বিষয়কে কেতাব বলা হয়। আরবীতে পত্রের প্রতিশব্দরূপেও 'কেতাব' শব্দ সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩ لا ريب فيه লা-রাইবা-ফীহে ঃ—

এই পদের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (ক) 'ইহাতে সন্দেহ নাই'—অর্থাৎ সন্দেহ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ এই কেতাবে নাই। তফছিরকারগণ সাধারণতঃ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(খ) لا ريب فيه —ইহাতে সন্দেহ নাই, অর্থাৎ সন্দেহ করিতে নাই। ভাবার্থে—"সন্দেহ করিও না"। হজ্জের সময়কার নিষেধ সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে— فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج —শাব্দিক অনুবাদে ইহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ— 'হজ্জের সময় নারীর সাহচার্য্য নাই, অনাচার নাই, কলহ বিবাদ নাই।' এখানে "নাই" অর্থে যে, 'করিতে নাই' বা 'করিও না' হইবে,—তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে, এই হিসাবে 'লা-রাইবা' পদের স্পষ্ট অর্থ ঃ—"ইহাতে সন্দেহ করিও না"।

هدى للمتقين হুদাল-লিল্-মোত্তাকীন ঃ—

হেদায়ত শব্দের অর্থ—'পথ দেখাইয়া দেওয়া', অথবা 'পথে পরিচালিত করতঃ পথিককে তাহার লক্ষ্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া'। উপক্রম উপসংহার অনুসারে প্রত্যেক স্থানে সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ কোর্‌আন পথ সকলকেই দেখাইয়া থাকে। কিন্তু কোর্‌আনের হেদায়তকে গ্রহণ করিয়া লক্ষ্য স্থানে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন—কেবল সংযম পরায়ণ ব্যক্তিগণ। এই জন্য বর্ণনার উপসংহারে (৫ম আয়তে) মোত্তাকীদিগকে **সিদ্ধমনোরথ** বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোত্তাকীন—'তাক্‌ওয়া' হইতে উৎপন্ন। আভিধানিক হিসাবে, প্রত্যেক ক্ষতি জনক বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করার চরম চেষ্টার নাম—'তাক্‌ওয়া'। (রাগেব, বায়জাভী, কবির, Lane—প্রভৃতি)। যে সকল ভাব, প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম আধ্যাত্মিক হিসাবে বা পারলৌকিক জীবনে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়—এবং যে সকল কাজ উপস্থিত ক্ষেত্রে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলেও তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় পরিণামে মানুষের পতনের আশঙ্কা থাকে, সেই সকল ভাব, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম হইতে নিজকে রক্ষা করার যথা সাধ্য চেষ্টাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তাক্‌ওয়া' বলা হয়। (রাগেব)। আমার মতে ফার্সী 'পর্‌হেজগার' ইহার ঠিক প্রতিশব্দ। বাংলাতে 'সংযম পরায়ণ' অপেক্ষা উত্তম প্রতিশব্দ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। ধর্মভীরু বা God-Fearing 'মোত্তাকী' শব্দের অনুবাদ করা সঙ্গত হইবে না।

'তাক্‌ওয়া' কাহাকে বলে, ইহা পরিস্ফুটরূপে দেখাইবার জন্য নিম্নে দুইটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হজরত রছুলে করিম বলিয়া দিতেছেন ঃ—

لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس ـ

অর্থাৎ—"বান্দা যাবৎ দূষ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ার আশঙ্কায় (তৎপ্রতি আকর্ষক) নির্দ্দোষ বিষয়গুলিকেও পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত না হয়, তাবৎ সে পূর্ণ ভাবে 'মোত্তাকী' পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না।" (বোখারী—তারিখ, তিরমিজী, এবনে-মাজা, হাকেম, প্রভৃতি)।

ওমর ফারুক, ওবাই-এবনে-কা'ব ছাহাবীকে 'তাক্‌ওয়া'র তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ওবাই বলিলেন,—আপনি কখনও কণ্টকপূর্ণ পথে চলিয়াছেন কি ? ওমর বলিলেন—হাঁ চলিয়াছি। ওবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ভাবে চলিয়াছেন ? ফারুক উত্তর করিলেন—কাপড় চোপড় উত্তমরূপে গোছাইয়া লইয়া, দক্ষিণে বামে ও অগ্রে পশ্চাতে অবস্থিত কণ্টক হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া, নিষ্কণ্টক স্থানে অতি সন্তর্পণে পা রাখিয়া, গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। ওবাই বলিলেন—আমিরুল্ মুমেনিন্! এই চেষ্টা আর এই সাবধানতার নামই 'তাক্‌ওয়া'। (কছির, ১—৭২ পৃঃ)।

হজরতের এই উপদেশে 'তাক্‌ওয়া' বা সংযমের পূর্ণ আদর্শ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে এই আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য সাধককে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। অন্যথা কোর্‌আনের শিক্ষা হইতে বিশেষ কোন ফল লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না একে একে পাশবিক রিপুগুলিকে দমিত ও শমিত করার এই যে সাধনা, ক্রমে ক্রমে অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে বর্জ্জন করার এই যে অভ্যাস,—ইহাই হইতেছে এছলামী যোগ সাধনের প্রথম স্তর। ছুফীর পরিভাষায় تزكية نفس বা 'আত্মার শুদ্ধি' ইহাকেই বলা হইয়াছে। অশুদ্ধকে বর্জ্জন করার নামই শুদ্ধি। রোগীর দেহে যে মারাত্মক উপাদানগুলি সঞ্চিত হইয়া আছে, সে তাহার শোধনের চেষ্টা করিল না। অধিকন্তু, ক্রমাগত ভাবে নানা কুপথ্য গ্রহণ করিয়া সে নিজ দেহের সাংঘাতিক কলুষ রাশিকে আরও বর্দ্ধিত এবং আরও মারাত্মক করিয়া তুলিতে থাকিল। এ অবস্থায় কোন চিকিৎসকই তাহাকে এই আত্মহত্যা জনক প্রচেষ্টার কুফল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। যাহার চোখে ছানি পড়িয়াছে, দুই প্রহরের সূর্য্যও তাহাকে পথ দেখাইতে পারে না। সূর্য্যের আলোক হইতে উপকার লাভের সত্যকার আকাঙ্ক্ষা যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে—নিজের চোখ দুটীকে নির্দ্দোষ করিয়া লইবার। কোর্‌আনকে আল্লাহ তাআলা 'নূর' বা জ্যোতি বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াছেন। এই জোতি প্রতিভাত হয়—মানুষের মানস-দর্পণে। কিন্তু নানাবিধ কুভাব ও অসৎ প্রবৃত্তির সাহচার্য্যে আসিয়া আল্লার শ্রেষ্ঠতম 'ন্যামত' স্বরূপ এই দর্পণ খানা জঙ্গার ও কালিমা লিপ্ত হইতে হইতে একেবারে দর্পণ নামের অযোগ্য হইয়া যায়। আম-পারার 'তৎফিফ' ছুরায় বলা হইয়াছে ঃ— بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

অর্থাৎ—"বরং, তাহাদিগের স্বকৃত কর্ম্মফলগুলিই তাহাদিগের হৃদয়ে মরিচারূপে জমিয়া গিয়াছে।" চোখের ছানি এবং মানস দর্পণের মরিচা একই কথা। ফলে, সমস্ত কুভাব, কুপ্রবৃত্তি, কুসংস্কার এবং কুকর্ম্ম হইতে আত্মরক্ষা করার একটা সত্যকার চেষ্টা ও যথার্থ সঙ্কল্প যাহার আছে, কোর্‌আনের 'নূর' গন্তব্য পথকে উদ্ভাষিত করিয়া দেয়—তাহারই সম্মুখে, আর আল্লাহ স্বয়ং পথের সাথী হইয়া (ছুরা নহল—শেষ আয়ত) প্রকাশমান হন—এই সাধকের সম্মুখে।

অহঙ্কার, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, অত্যাচার, মিথ্যাবাদীতা, 'রিয়াকারী', কৃপণতা ও কাপুরুষতা প্রভৃতি মন্দভাব ও মন্দ প্রবৃত্তিগুলি বর্জ্জন করার আদেশ কোর্‌আন ও অসংখ্য ছহি হাদিছে বিশেষ তাকিদের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই তফছিরে যথাযথ স্থানে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। এখানে এইটুকু নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে, এই ভাব ও প্রবৃত্তিগুলিকে বর্জ্জন করার নামই 'তাক্‌ওয়া'। এই বর্জ্জন মানবজীবনের একটা গুরুতর সাধনা, এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক হয় দৃঢ় ও অবিচল সঙ্কল্পের। বর্জ্জনের এই নিয়ত বা সঙ্কল্প অবলম্বন করার পর কোর্‌আনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আত্মশুদ্ধির এই প্রাথমিক সাধনা সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মানব জীবনের একমাত্র সাফল্যরূপ খোদা-প্রাপ্তির পথ সাধকের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে।

সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গের কয়েকটা হাদিছ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

১। হজরত বলিয়াছেন—তোমরা কৃপণতার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করিও না, কারণ তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা এই কৃপণতার পাপেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। (আবু দাউদ)।

২। হজরত বলিয়াছেন—তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি সমূহের মহা ব্যাধি নীরবে ও ধীরে ধীরে তোমাদিগের পানে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—সে মহা ব্যাধি হইতেছে—হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। এই ব্যাধি ধর্ম্মকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে। আমার প্রাণের মালেক যিনি, তাঁহার দিব্য করিয়া বলিতেছি—মোমেন না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর পরস্পর পরস্পরকে প্রেম করিতে না শিখা পর্য্যন্ত তোমরা মোমেন হইতে পারিবে না। (তির্‌মিজী)।

৩। হজরত বলিয়াছেন—সম্পদের মায়া ও সম্মানের মোহ মানুষের ধর্ম্মে যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে, দুইটা বুভুক্ষ শার্দ্দুল কোন এক মেষপালে প্রবেশ করিয়াও তাহার ততটা ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। (তির্‌মিজী)।

৪। কাহার অগোচরে তাহার নিন্দা করাকে 'গীবৎ' বলা হয়। কোর্‌আন ও হাদিছে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নিজের মৃত ভ্রাতার দেহের গলিত মাংস ভক্ষণ করা আর 'গীবৎ' করা সমান ঘৃণিত। (আবু দাউদ, তির্‌মিজী, প্রভৃতি)।

৫। হজরত বলিয়াছেন—অন্তরে কণা মাত্র অহঙ্কার বিদ্যমান থাকিতে কেহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (মোছলেম, আবুদাউদ, প্রভৃতি)।

৬। হজরত বলিয়াছেন—মোমেন কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। (মেশকাত)।

৭। হজরত বলিয়াছেন—দুইটী স্বভাব মুছলমানের মধ্যে কখনও সমবেত হইতে পারে না—কৃপণতা ও অসদ্ব্যবহার। (তির্‌মিজী)।

৮। হজরত বলিয়াছেন—আগুণ যেমন কাঠকুটাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলে, হিংসাও সেইরূপ মানুষের সমস্ত সৎবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। অতএব, হিংসা সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে। (আবু দাউদ)।

এই শ্রেণীর কুভাব ও নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে বর্জ্জন করার যে সঙ্কল্প, কোর্‌আনের পরিভাষায় তাহারই নাম—'তাক্‌ওয়া'। এই সংযম-সাধনার ইচ্ছা বা চেষ্টা যাহার নাই, কোর্‌আনের স্বর্গীয় আলোক দ্বারা পথ দেখিয়া লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা তাহার নাই।

৫ يؤمنون بالغيب এওমেনুনা-বিল-গ'এব ঃ—

ঈমান—অর্থে কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ্যতঃ তাহা স্বীকার করা। এক শ্রেণীর এমামগণের মতে, কার্য্যতঃ সেই বিশ্বাসের প্রমাণ দেওয়াও ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অন্যেরা বলেন—আমল ঈমানের অংশ নহে, বরং উহার লক্ষণ ও বাহ্য প্রকাশ। আমাদিগের মতে এই দার্শনিক তর্ক বিতর্কের মূলে সূক্ষ্ম বিরোধ খুবই কম, ইহা যে একটা শাব্দিক কলহ, 'আকাএদের' পুস্তকে বর্ণিত উভয় পক্ষের আলোচনাগুলি পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

গ'এব—অর্থে অনুপস্থিত, অগোচর বা চক্ষের অন্তরাল। মানুষের অগোচরে বা গ'এবে যাহা অবস্থিত হয়, তাহাকে বলা হয়—غايب—'গাএব'। অতএব يؤمنون بالغيب পদের অর্থ হইবে—যাহারা ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজ বিশেষের অসাক্ষাতেও ঈমান পোষণ করিয়া থাকে। এই ছুরায় পর পর মোমেন, মোনাফেক ও কাফেরদিগের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের অবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম দল সত্যকে গ্রহণ করিবে না বলিয়া হঠ করিয়া বসিয়াছে। কাজেই শত যুক্তি, প্রমাণ ও সহস্র নিদর্শন উপস্থিত করা সত্ত্বেও তাহারা আল্লার অস্তিত্বে বা একত্বে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা মোনাফেক বা কপটের দল। দ্বিতীয় রুকুর ১২শ আয়তে ইহাদিগের অবস্থা স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে—"যখন মোমেনদিগের সহিত মিলিত হয়, তখন তাহারা বলিয়া থাকে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। আবার যখন নিভৃতে নিজেদের দলপতিগণের নিকট সমবেত হয়, তখন বলে—প্রকৃত পক্ষে আমরা ত তোমাদিগেরই সঙ্গে আছি, আমরা ত কেবল একটা প্রহসন করিতেছি

মাত্র।" এই মোনাফেকগণ হজরতের ও মুছলমানদিগের চক্ষের অগোচরে ঈমান পোষণ করিত না। সত্যকার মোমেন কোফর ও নেফাক বা শঠতা ও কপটতার এই দোষ হইতে মুক্ত হইবে।

সাধারণ তফছিরকারগণ গ'এব শব্দের এই আভিধানিক ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলেও, এখানে তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকে মতভেদ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন—এখানে উহার অর্থ কোর্‌আন, কেহ বলিতেছেন—অহি, কেহ বলিতেছেন—তক্‌দির। কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতে এখানে গ'এব শব্দের অর্থ হইবে—সমস্ত অদৃষ্ট বিষয়—যেমন আল্লাতে বিশ্বাস, কিয়ামত, হাশর, নশর বা পরকাল সম্বন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলি, বেহেশ্‌ত, দোজখ, প্রভৃতি ব্যাপার, না দেখিয়া যাহার উপর বিশ্বাস করিতে হয়। (খাজেন, ১—২৬ পৃঃ প্রভৃতি)।

আমি প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, কারণ ঃ—

(ক) তাহা হইলে গ'এব মছদর (Infinitive) কে গা'এব এছমে ফায়েলের অর্থে গ্রহণ করার আবশ্যক হয় না। মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব না হইলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু উপক্রম, উপসংহারে বা অন্য প্রকারে সেই গৌণ অর্থ গ্রহণের একটা সমর্থন বা ইঙ্গিত বর্ত্তমান থাকা চাই। এখানে এ সব কিছুই নাই, বরং গৌণ অর্থ গ্রহণের প্রতিকূলে আয়তের স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে।

(খ) তৃতীয় ও চতুর্থ আয়ত পাঠ করিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, তফছিরকারগণ তৃতীয় আয়তের গ'এব শব্দের যে অর্থ করিতেছেন, চতুর্থ আয়তের শেষ ভাগে বর্ণিত আখেরাৎ বা পরকালের অর্থও ঠিক তাহাই। এখন সাধারণ তফছিরকারগণের বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করিলে, গ'এব ও আখেরাৎ অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাতে একই বিষয়ের দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। অতএব, প্রথম অর্থই গ্রহণীয়।

এমাম রাজী আবু মোছলেমের এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন— يؤمنون بالغيب পদ দ্বারা প্রথমে সংক্ষেপে সমস্ত গ'এবী বিষয়ের উপর মোটের উপর ঈমান আনিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর সেই বিষয়টীকে বিশ্লেষণ করতঃ তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইতেছে। সাধারণ তফছিরকারগণের মত বর্ণনা করিতে গিয়া এমাম ছাহেব ইহার অত্র পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আল্লার 'জাত' ও 'ছেফাত' বা স্বত্বা ও স্বরূপের প্রতি ঈমান আনাও এই 'ঈমান-বিল্‌-গ'এবে'র অন্তর্গত। (কবির, ১—২৫০ পৃঃ)। নিজের যুক্তির সমর্থনে এমাম ছাহেব বলিতেছেন—এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর তাহার বিস্তারিত আলোচনা করাতে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে না, যেমন কোর্‌আনে (বকরা, ৯৮ আয়ত) وملائكته "এবং তাঁহার ফেরেশতাগণের" পদের পর আবার জিব্রাইল ও মীকাইল ফেরেশতার উল্লেখ হইয়াছে

এমাম ছাহেবের এই যুক্তিকে আমরা নানা কারণে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এমাম ছাহেব এখানে যে আয়তকে নজির স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারই তফছির প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণের কথা সাধারণ ভাবে উল্লেখ করার পর জিব্রাইল ও মীকাইলের নাম স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করাতে ইহাঁদের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে। এ হেন গুরুত্ব না থাকিলে এই ব্যাখ্যা কখনই সঙ্গত হইত না। (১—৬৩১ পৃঃ)। অতএব তাঁহারই যুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, আল্লার 'জাত' ও 'ছেফাত' সম্বন্ধে ঈমান আনা অপেক্ষা বেহেশ্‌তের 'ন্যামত' ও দোজখের 'আজাব' সম্বন্ধে ঈমান আনার গুরুত্ব অনেক অধিক! তাহার পর, হজরতের প্রতি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহা পুরুষগণের প্রতি যে সকল কেতাব বা সত্য নাজেল হইয়াছে, তাহা সদা প্রত্যক্ষীভূত ও আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরে অবস্থিত বস্তু, তাহাকে গ'এব বলা হইবে কি করিয়া?

(গ) গ'এব শব্দ যে ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজ বিশেষের "অগোচর" অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোর্‌আন ও হাদিছে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সতী সাধ্বী স্ত্রী লোক-দিগের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোর্‌আনে বলা হইয়াছে,— حافظات للغيب —অর্থাৎ—"তাহারা গ'এবের হেফাজত করিয়া থাকে।" রাগেব ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন— اي لا يفعلن في غيبة الزوج ما يكرهه الزوج —অর্থাৎ—"স্বামীর অগোচরে তাহার অপ্রীতিকর কোন কার্য্যে তাহারা লিপ্ত হয় না।" (৩৭৩ পৃঃ)। ছুরা নেছার ৩৪শ আয়তে حافظات للغيب আয়তেও গ'এব শব্দে "স্বামীর অগোচরে" অর্থ সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ এবনে মছউদ বলিতেছেন,—"হজরতের পরবর্ত্তী যে সকল লোক তাঁহাকে চোখে না দেখিয়াও ঈমান আনিবে, তাহাদের ঈমানই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ঈমান, এবং يؤمنون بالغيب আয়তে সেই পরবর্ত্তী উম্মতের ঈমানকেই বুঝাইতেছে।" (মর্ম্মানুবাদ—হাকেম, মন্‌ছুর, ১—২৬ পৃঃ, বয়জাভী, প্রভৃতি)। মদিনার শহরতলীতে বনি হারেছাদিগের মছজিদে জমাত হইতেছে, এমন সময় সংবাদ পৌঁছিল—হজরত পূর্ব্ব কেবলা ত্যাগ করিয়া কা'বাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দুই রেক্‌আত্ শেষ করার পর এই সংবাদ পৌঁছে এবং মুছল্লীগণ এই অবস্থায় কা'বা অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়ান। হজরতের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে, ঐ মুছল্লীগণকে লক্ষ্য করিয়া হজরত বলেন,— اولئك قوم آمنوا بالغيب —অর্থাৎ—"এই লোকগুলি গ'এবে ঈমান আনিয়াছে।" (তেবরানী, প্রভৃতি—মন্‌ছুর, ঐ,

কাদিয়ানী ও শীয়াদিগের অভিমত ঃ—

গ'এব শব্দের ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া শীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন,—আখেরাত্ দ্বারা যখন পারলৌকিক সমস্ত বিষয়কেই বুঝাইতেছে, তখন গ'এব শব্দের অন্য তাৎপর্য্য হওয়া সুস্থির। এই যুক্তির হিসাবে তাঁহারা বলেন যে, এখানে গ'এব শব্দ দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যাশিত "এমাম গাএব"কে বুঝাইতেছে। অন্য দিকে এক শ্রেণীর কাদিয়ানীরা বলিতেছেন,

—আখেরাত্‌ অর্থে পরবর্ত্তী। পরকালের সমস্ত বিষয়ই যখন গ'এব শব্দের অন্তর্ভুক্ত আছে, তখন আখেরাত্‌ শব্দে পরকালকে না বুঝাইয়া স্বতন্ত্র একটা বিষয়কে বুঝাইতেছে। তাঁহারা বলেন,—হজরতের পরবর্ত্তী যুগে মির্‌জা গোলাম আহমদ ছাহেবের উপরও অহি নাজেল হইয়াছে। আয়তে মুছলমানকে সেই অহির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। (দেখ—মির্‌জা বশীর ছাহেব কৃত ইংরাজী অনুবাদ)। কিন্তু, গ'এব শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে এই সকল অন্যায় সিদ্ধান্তের কোন সুযোগই থাকিতে পারে না।

"আখেরাত্‌" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৯ নং টীকা দেখ।

৬ الصلوة ছালাত :—

"ছালাত" শব্দের মুখ্য অর্থ দয়া ও 'দোওয়া'। ধাতুগত হিসাবে উহার অর্থ صليت العود اذ لينته —কোন বস্তুকে কোমল করা, অবনমিত হওয়া। কায়মনোবাক্যে আল্লার হুজুরে নম্র ও অবনমিত হওয়াই নমাজের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উহাকে 'ছালাত' বলা হয়। এই 'ছালাতে'র প্রধান অঙ্গ মোনাজাত বা প্রার্থনা এবং এই বিনয় ও প্রার্থনাই আবার আল্লার রহমতকে আকর্ষণ করিয়া আনে। অতএব 'ছালাত' শব্দের সমস্ত ভাব নমাজে পাওয়া যাইতেছে। দুন্‌য়ার কোন ভাষার কোন শব্দ 'ছালাতে'র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই সকল অর্থ, ভাব, ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এছলাম 'ছালাতের' একটা আকার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই 'ছালাত' এছলামের অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এমন কি, কোন কোন হাদিছে এরূপ তাকিদও আছে যে, ইচ্ছা পূর্ব্বক নমাজ পরিত্যাগ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। নমাজ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর তাকিদ ও তৎসংক্রান্ত দরকারী মছলা মছাএল হাদিছ ও ফেকার কেতাবে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"নমাজ পড়"—এই কথা বলিতে হইলে আরবীতে 'ছল্লে' বলিতে হয়। পাঠক দেখিতেছেন—আল্লাহ এখানে يصلون —যাহারা নমাজ পড়িয়া থাকে, না বলিয়া যাহারা নমাজকে কাএম করিয়া রাখে—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাগেব বলিয়াছেন—

و انما خص لفظ الاقامة تنبيها بان المقصود من فعلها توفية حقوقها و شرايطها -
لا الاتيان بهيئتها فقط — راغب

অর্থাৎ—"সমস্ত শর্ত্ত পালন করিয়া, যাবতীয় 'হক্' পূর্ণ করিয়া নমাজ পড়াই উদ্দেশ্য—শুধু বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র উদ্দেশ্য নহে,—এই কথা ব্যক্ত করার জন্য এখানে 'নমাজ কায়েম করার' কথা বলা হইয়াছে।" অন্যান্য সমস্ত তফছিরে ও অভিধানে মোটের উপর এই ভাবের কথা লিখা আছে। (দেখ—কবির খাজেন মাআলেম লেছান ও তাজল-ওরূছ প্রভৃতি)।

এছলামের চারিটী রুক্‌ন্ বা স্তম্ভ—নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত। ইহার মধ্যে নমাজই সর্ব্ব প্রধান; কারণ নমাজের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। যথা শাস্ত্র টাকা বাহির করিয়া দিয়া ফেলিলে জাকাত হইয়া গেল, সে জন্য বিশেষ কোন ধ্যান ধারণার দরকার হয় না। রোজা সংযমের ব্রত,—সংযম সাধনাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। যথা শাস্ত্র সংযমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপবাস করিয়া গেলে তোমার 'ছিয়াম' ব্রত সিদ্ধ হইয়া গেল। হজ হইতেছে—আল্লার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান—একটা ক্রিয়া-কাণ্ড প্রধান বাৎসরিক যজ্ঞ। যথা শাস্ত্র সেই ক্রিয়া-কাণ্ডগুলি পালন করিয়া গেলেই হজ সম্পন্ন হইয়া যায়—তাহার সহিত আত্মার যোগ সাধনের আবশ্যক অধিক সময়ই হয় না। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত 'ছালাত' হইতেছে। ইহা প্রধানতঃ আত্মার অনুষ্ঠান, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন। যে যোগে আল্লাহ সমস্ত স্বরূপ সহকারে বান্দার মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকট হইয়া উঠেন, তাহার আত্মার স্তরে স্তরে সমস্ত মহিমা গরিমা সহকারে পরিস্ফুট হইয়া থাকেন, এবং যে যোগে সাধক নিজের সকল ত্রুটী বিচ্যুতি ও দোষ দৈন্য যুগপৎভাবে অনুভূত হইয়া বান্দার অন্তরকে আত্মগ্লানি ও অনুতাপে পূর্ণ করিয়া তুলে, তাঁহার সমস্ত দেহকে তাঁহার সন্নিধানে বিনত অবনমিত করিয়া ফেলে, তাহার সমস্ত প্রাণকে প্রেমময়ের মাধুর্য্য গ্রহণে ব্যগ্র ও ব্যাকুল করিয়া তুলে—তাহারই নাম 'ছালাত'।

কোর্‌আন বলিতেছে ঃ—

اقم الصلوة - ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر - و لذكر الله اكبر - و الله يعلم ما تصنعون — سورة عنكبوت

অর্থাৎ—"নমাজকে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখ। কারণ নমাজ (মানুষকে) সমস্ত অশ্লীল ও সমস্ত ঘৃণিত ব্যাপার হইতে বারিত করিয়া রাখে, আর ইহা অপেক্ষাও মহত্তম (উদ্দেশ্য হইতেছে নামাজে) আল্লার ধ্যান, আর তোমরা যাহা করিতেছ—আল্লাহ তাহা জানিতেছেন।" (ছুরা আন্‌কাবুত)।

এই আয়তে স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লার ধ্যানই হইতেছে নমাজের প্রধানতম সাধনা। যে নমাজে এই সাধনার প্রতি উপেক্ষা করা হয় না, তাহা সাধকের জীবনকে এমন স্বর্গীয় ভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয় যে, সে স্বভাবতঃ সমস্ত অশ্লীল ও সমস্ত কুৎসিত ব্যাপার হইতে স্বতঃপরতঃ দূরে অবস্থান করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এ সমস্তের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মানুষ যে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র পালন করে—আয়তের শেষ ভাগে ইহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

হজরত রছুলে করিমের বহু হাদিছ হইতে জানা যায় যে, নমাজ যদি মানুষকে অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ হইতে বারিত করিয়া না রাখিতে পারে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, فلا صلوة له —"তাহার নমাজই হইতেছে না।" আহমদ, তবরানী, এবনে কছির প্রভৃতি

মোহাদ্দেছগণ এই মর্ম্মের আরও অনেক হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অনেক লোক বরাবর নমাজ পড়ে, অথচ দরকার হইলে অন্যায় ও অপকর্ম্ম হইতেও বারিত থাকে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, নমাজের প্রকৃত স্বরূপের, এবং এমাম গজ্জালীর ভাষায়—নমাজের প্রাণের কোন সংবাদই ইহারা রাখে না।

প্রথমে ধারণা করিতে হইবে নমাজের 'মকাম'টা। উপরের আয়তে আমরা দেখিয়াছি যে, অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ হইতে বারিত থাকা হইতেছে—নমাজের লক্ষণ, আর তাহার সাধনা হইতেছে—আল্লার ধারণা, কারণ তাহার একমাত্র সাধ্য, একমাত্র কাম্য, ও একমাত্র লক্ষ্য হইতেছেন আল্লাহ। কোর্‌আনে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে— اقم الصلوة لذكرى — "আমার ধ্যান ও আমার স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নমাজ কায়েম করিবে।" এই আয়তে নমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

নমাজে দাঁড়াইবার সময় নিজকে সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর দাঁড়াইয়া নিয়ত করিতে হইবে। নিয়ত মানে সঙ্কল্প—না বুঝিয়া কতকগুলি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলেই নিয়ত হয় না। তাহার পর নমাজে আল্লার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে তন্ময় তদ্‌গত করিয়া লইতে হইবে।

হজরত প্রথম তক্‌বিরের পর বিভিন্ন দোওয়া পাঠ করিতেন। সেগুলির মর্ম্ম বুঝিয়া পাঠ করিলে আমরাও নমাজে প্রবৃত্তি হওয়ার সময় তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি। একটী দোওয়া এইরূপ:—

اني وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض حنيفاً وما انا من المشركين - ان صلوتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العلمين - لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين - — الحديث -

অর্থাৎ—"আমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে তাঁহাতে তন্ময় করিতেছি—যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আমি অংশীবাদী নহি। আমার সব উপাসনা, সকল সাধনা, আর আমার সব জীবন ও মরণ নিশ্চয় সকল বিশ্বের পরিপোষক আল্লাতে (অর্পিত)। তাঁহার অংশী কেহই নাই, ইহারই জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

আল্লার স্বরূপের এই ধ্যান, একনিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণের এই সঙ্কল্প, সব 'গয়রুল্লাহ' হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাতে তন্ময় তদ্গত হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা—এখান হইতেই নমাজের মহা যোগের সূত্রপাত। নমাজ এছলামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবাদত। বিখ্যাত জিব্রাইলের হাদিছ অনুসারে এবাদত করিতে হইবে এই ভাবে— ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك —যেন আল্লাহকে দেখিতেছ; আর "আমি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিতেছি", এ

ধারণার শক্তি যদি তোমার না থাকে, তবে অন্ততঃ এতটা ধারণা করিয়া লইবে যে, সেই সর্ব্বদর্শী আল্লাহ তোমাকে দর্শন করিতেছেন।" (বোখারী, মোছলেম)।

নমাজে বান্দা আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হয়,—আল্লাহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন,—এবং সে প্রত্যক্ষ ভাবে আল্লার সহিত নিজের প্রাণ খুলিয়া রাজ নমাজের সব কথা ব্যক্ত করিতে থাকে—আল্লার সহিত তাহার কথোপকথন হইতে থাকে—এই মর্ম্মের বহু হাদিছ বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে স্বয়ং 'হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবের অনুভূতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠার নামই হুজুরে কল্‌ব এবং ইহাকেই বলা হয়—

لا صلوة الا بحضور القلب -

"আহয়াউল্ ওলুম" গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

নমাজের প্রাণটা পুষ্ট পরিণত ও পরিস্ফুট بهالم حياة الصلوة হইয়া উঠে, তাহার জন্য সংক্ষেপে ছয়টী উপকরণের দরকার, যথা ঃ—

১। حضور القلب ... মনের তন্ময়তা।

২। التفهم ... জ্ঞান, নিজের উক্তি ও ক্রিয়াগুলি বোধগম্য করা।

৩। التعظيم ... আল্লার বিরাট মহিমার অনুভূতি।

৪। الهيبة ... আল্লার প্রবল প্রতাপের উপলব্ধি।

৫। الرجاء ... আল্লার হুজুরে বান্দার কৃপালাভের আশা।

৬। الحياء ... আত্মগ্লানি ও অনুতাপ—লজ্জা।

(১) মনকে তাহার অন্য সকল আকর্ষণ এবং 'গয়রুল্লার' সমস্ত সম্বন্ধ হইতে নির্লিপ্ত করিয়া এবং আল্লাকে মাত্র তাহাতে একনিষ্ঠ ভাবে গ্রহণ করিয়া নিজের মন, মুখ, ধ্যান, জ্ঞান সবকেই আল্লাতে তদ্গত করিয়া তোলা।

(২) মুখে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিতেছি, তাহার অর্থ বোধ এবং অন্তরে তাহার ভাবগুলিকে গ্রহণ অনুভূতি।

(৩) যাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এবং যাহাকে সম্মুখে করিয়া তোমার কায় মন ও বাক্যের এই এবাদত, তাঁহার মহিমার গুরুত্ব ও সেই গুরুত্বের বিরাট স্বরূপ সম্বন্ধে যথা সাধ্য ধারণা করিয়া লওয়া।

(৪) আল্লার এই জামাল, জালাল ও কামালের এই গুরুত্বের মহিমার ও পূর্ণতার ধারণার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে তাঁহার শক্তি, প্রতাপ ও জালালের যে অনুভূতি সাধকের মনঃপ্রাণকে সংযত করিয়া আনে।

(৫) যিনি তোমার সম্মুখে উপস্থিত ও তুমি যাঁহার হুজুরে দণ্ডায়মান, তাঁহার অনন্ত করুণা ও প্রেম মাধুর্য্যের অনুভূতি। অপার আনন্দে সাধকের প্রাণ তখন সেই মধুর সাগরে লীন হইয়া যায়।

(৬) ইহার মূলে দুই পক্ষের তুলনার অনুভূতি, করুণাময় প্রেমময় বিশ্বনিয়ন্তা এই পবিত্র মধুর স্বরূপ, অন্যদিকে আমার এই 'গাফ্‌লত্' এমন করিয়া তাহাকে ভুলিয়া থাকা,—এমন করিয়া বিদ্রোহী হওয়া,—পাপে তাপে নিজকে জর্জ্জরিত করা,—তাহার প্রেমরাজ্যের অন্যান্য সন্তানগণকে পীড়া দেওয়া, আরও গোনাহগারীর কাজ তাহার চোখের সম্মুখে তীব্র হইয়া উঠে। মাধুর্য্যের দেশে উপনীত হওয়ার পর বান্দার মনে নিজের অন্যায় ও অপরাধগুলি স্মরণ করিয়া আত্মগ্লানিতে তাহার দেহ ও মন নত হইয়া আসিতে থাকে, লজ্জায় তাহার কথা জড়াইয়া কম হইয়া আসিতে থাকে। হাদিছে انا بك اليك.اے اتق بك والتجىء, اليك (مشكوة - مسلم - ص ٧٧)। এই ভাব খুব ধরা পড়িতেছে।

নমাজের সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হইতে হইলে এতৎ সংক্রান্ত সমস্ত আয়ত ও হাদিছ একত্র করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। আমাদের মনীষী সাধকগণ ঐ সকল আয়ত ও হাদিছ অবলম্বন করিয়া যে সকল তত্ত্বকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তাহাও সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করিতে হয়। আজকাল নমাজের বাহ্যিক দিক্‌টাকে নিখুঁৎ করার দিকে সাধারণতঃ যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহার روح বা Spirit টাকে রক্ষা করার দিকে তাহার শতাংশের একাংশ মনোযোগ দেওয়া হয় না,—ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। (শাহ অলি-উল্লার حجة الله ও এমাম গাজ্জালীর 'আহয়াউল্ ওলুম' দ্রষ্টব্য)।

৭ رزقنهم রাজাক্‌নাহুম :—

'রেজ্‌ক্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার আভিধানিক অর্থ—الحظ , النصب—প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অংশ। আরবী ভাষায় প্রত্যেক উপকার জনক বস্তুই 'রেজ্‌ক' পদবাচ্য। উহার অর্থ হইবে—দান করিয়াছি। সাধারণতঃ এই শব্দের অর্থ করা হয়—রুজী দান করিয়াছি বলিয়া। ইহাতে আয়তের অর্থ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা হইয়া থাকে। মানুষের উপকার জনক আল্লার সমস্ত দানই 'রেজ্‌ক' পদ বাচ্য এবং তাহার প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের ছদকা বা সদ্ব্যয়ের আদেশ এই আয়তে আছে। ধনের জাকাতের ন্যায় জ্ঞানের জাকাত, বিদ্যার জাকাত, শরীরের জাকাত প্রভৃতি সমস্ত জাকাতই মুছলমানের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

আল্লাহ তোমাকে বিদ্যা দিয়াছেন—তুমি তাহার কতকটা অংশ অনায়াসে বিদ্যার অভাব-গ্রস্ত নরনারীকে দান করিতে পার। তোমার শরীরে আল্লাহ স্বাস্থ্য দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন—মানুষের সেবা তুমি তাহা দ্বারা অনেক করিতে পার। তোমার চোখ আছে—অন্ধকে পথ দেখাইয়া তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পার।

اللهم ارزقني ولداً صالحاً—এই আয়তের অর্থ এই হিসাবে করিতে হইবে, "হে আল্লাহ! সৎসন্তানকে আমার রুজী বা খাদ্য করিয়া দাও!" প্রকৃত পক্ষে উহার অর্থ হইবে—"হে আল্লাহ! আমার মঙ্গলজনক সৎসন্তান আমাকে দান কর!"

আয়তের একটী বিশেষত্ব ঃ—'মফউল'কে (مفعول) 'ফেএলে'র (فعل) পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সার্থকতা হইতেছে বিষয়টীর গুরুত্ব প্রতিপাদন,—كانه قال و يخصون بعض المال بالصديق - (কবির, ১—২৫২ পৃঃ)।

নমাজ কায়েম রাখার এই প্রকার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কোর্‌আনের বহু স্থানে এই সদ্ব্যয়ের উল্লেখ আছে। বান্দার প্রধান কর্ত্তব্য আল্লার প্রতি ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি,—পূর্ব্বে টীকায় ইহা বলিয়াছি। নমাজ আল্লার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালনের প্রধান সোপান আর এই সদ্ব্যয় হইতেছে বান্দার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালনের প্রধান সোপান। (এবনে-কছির, ১—৭৮)।

ফরজ জাকাত সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

৮ انزلنا আন্‌জাল্‌না ঃ—

'এন্‌জাল্'—'ন-জ-ল' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ নামিয়া আসা বা নামাইয়া দেওয়া। ব্যবহারে অনেক সময় উহার অর্থ হয় দান করা বা পৌঁছাইয়া দেওয়া। সর্ব্বত্র ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামাইয়া দেওয়া উহার অর্থ হইতে পারে না। 'আল্লাহ কেতাব নাজেল করেন, ন্যামত নাজেল করেন'—ইহার অর্থ পৌঁছাইয়া দেন, দান করেন। (রাগেব, মুহীত, প্রভৃতি)।

৯ اخرة আখেরাত্ ঃ—

আভিধানিক অর্থ—'পরবর্ত্তী'। এই বিশেষ্যপদের বিশেষণ 'দার' শব্দ এখানে উহ্য আছে। আরবী ভাষায় ও কোর্‌আন হাদিছে ইহার বহুল ব্যবহার হওয়ার পর বিশেষ্য পদ উল্লেখ করার আবশ্যক হয় নাই,—বিশেষণ বলিলেই বিশেষ্যকে বুঝা যাইবে। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে 'ছেফতে-গালেব' বলা হয়। 'আখেরাতের' বিপরীত শব্দ হইতেছে 'দুন্‌য়া'। ইহাও বিশেষণ,—ইহার বিশেষ্য 'দার' শব্দও ব্যবহারে উহ্য হইয়া গিয়াছে। (মুহীত)।

মির্‌জা বশীরুদ্দিন আহমদ কোর্‌আন শরীফের প্রথম পারার যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে ঃ—'আখেরাত্' শব্দের অর্থ দুই প্রকার। প্রথম—পরকাল, দ্বিতীয়—পরবর্ত্তী 'অহি'। হজরতের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের প্রতি প্রেরিত 'অহি'র উপর ঈমান আনা যেমন মুছলমানের পক্ষে কর্ত্তব্য, সেইরূপ হজরতের পরে যে 'অহি' নাজেল হইবে, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর যেহেতু পরবর্ত্তী 'অহি'র বাহন হইতেছেন—মির্‌জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাহেব, অতএব তাঁহার উপর ঈমান আনাও মুছলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। মোটের উপর লেখক এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতার মুখে এই প্রকার যুক্তি শুনিয়া আমরা যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি।

আখেরাত্ শব্দের দুইটী অর্থ পরকাল ও পরবর্ত্তী অহি,—ইহা অন্যায় কথা। আরবী সাহিত্য ও অভিধান হইতে ইহা কখনই প্রমাণিত হয় না। অভিধানের হিসাবে উহার

ধাতুগত অর্থ পরবর্ত্তী, পশ্চাৎবর্ত্তী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এছলামের পরিভাষায় উহার একমাত্র অর্থ পরকাল,—কোর্‌আন হাদিছের শত শত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এ কথা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আখেরাত্ শব্দ হজরতের পরবর্ত্তী কালের 'অহি' সম্বন্ধে প্রযোজ্য,—ইহার পোষকে আরবী সাহিত্য এবং এছলামী পরিভাষার একটীও প্রমাণ কেহ উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কোর্‌আন শরীফে আল্লাহ স্বয়ং বলিয়া দিতেছেন :— ان الاخرة هى دار القرار - سورة مؤمن
অর্থাৎ—"নিশ্চয় আখেরাত্—তাহাই ত চিরস্থায়ী অধিবাস।" (ছুরা মো'মেন, ২৫)।

মির্‌জা ছাহেব আখেরাত্ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোর্‌আনের যে অর্থ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, বাস্তবিক তাহা খুবই দুঃখের বিষয়। এমন কি আহমদী সম্প্রদায়ের (লাহোরী শাখার) অন্যতম নেতা মওলবী মোহাম্মদ আলী ছাহেবও তাঁহার ইংরাজী অনুবাদে ইহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। (দেখ—কোর্‌আনের ইংরাজী অনুবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা, ৯নং টীকা)।

মির্‌জা ছাহেব নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ছুরা জুম্‌আর একটী আয়তকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় :—

২— هو الذي بعث فى الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آيته و يزكيهم و يعلمهم الكتب و الحكمة ' و ان كانوا من قبل لفى ضلل مبين -

৩— و آخرين منهم لما يلحقوا بهم و هو العزيز الحكيم -

অর্থাৎ—"সেই ত তিনি—যিনি উম্মিগণের মধ্যে তাহাদিগের মধ্যকার একজন রছুল, উত্থাপিত করিয়াছেন, যিনি তাহাদিগের নিকট আল্লার আয়তগুলির আবৃত্তি করেন, তাহাদিগকে শুচী সম্পন্ন করেন, এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দান করিয়া থাকেন—যদিও পূর্ব্বে তাহারা স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে (নিমজ্জিত) ছিল।"

"আর তাহাদিগের মধ্যকার অন্য লোকদিগকে—যাহারা এখনও তাহাদিগের সঙ্গে যোগদান করে নাই (ঐরূপ শিক্ষা দান করিয়া থাকেন) এবং তিনি শক্তিমান ও জ্ঞানময়।" (মির্‌জায়ী ও কামালী অনুবাদ)।

মির্‌জা ছাহেব এই আয়তের অনুবাদে প্রথমে এরূপ ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় similarly, that Prophet will read অংশটা কোর্‌আনের কোন শব্দের অনুবাদ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পূর্ব্ব পদের উপর 'আত্ফ' থাকায় يتلوا প্রভৃতি ক্রিয়া পদের ইহাও অধীন—সেই ভাবে অনুবাদ করা উচিত ছিল। তাহার পর শুধু يتلوا ক্রিয়ার ইহা অধীন নহে। আবার সব চাইতে দুঃখের বিষয়, মির্‌জা ছাহেব منهم শব্দের অনুবাদ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার স্পষ্ট অর্থ—"আর তাহাদিগের উম্মিদিগের উপরের

কথিত—মধ্যকার অন্য লোকদিগকে যাহারা এ যাবৎ (এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত) তাহাদিগের সঙ্গে—মুছলমানদিগের সঙ্গে যোগদান করে নাই, (তাহাদিগকেও হজরত আল্লার বাণী শুনাইবার এবং পবিত্র করার চেষ্টা করিয়া থাকেন)। ফলে হজরতের জীবিত কালের উম্মিদিগের কথাই এ আয়তে বলা হইতেছে, তাঁহার মৃত্যুর তের শত বৎসর-কার কোন ঘটনার প্রতি নিশ্চয়ই এ আয়তে ইঙ্গিত করা হয় নাই। মির্জা ছাহেব নিজের অসাধু উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রথমে উহাকে কতক সংযোগ সহ বাহ্যরূপে অনুবাদ করিয়াছেন, منهم শব্দের অনুবাদ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং يتلوا শব্দের অনুবাদ প্রথমে করিয়াছেন recites, আর পরে করিয়াছেন will read বলিয়া। لما يلحقوا بهم পদের তর্জ্জমা হইবে —who have not yet joined them (মওলবী মোহাম্মদ আলী কৃত অনুবাদ, ১০৭৬ পৃষ্ঠা)। মির্জা ছাহেব করিয়াছেন who are yet to join them, তাহার পর similarly কথাটা যোগ করিয়া দিয়াছেন।

এখন পাঠক দেখিতেছেন—এ আয়তের বিকৃত অনুবাদ করিয়া মির্জা ছাহেব কিরূপ First advent ও Second advent-এর আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার পর منهم -এর অনুবাদ বাদ দিয়াও যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আল্লার বাণী শুনাইতে বা purify করিতে হজরতকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইবে—ইহার মানে কি আছে? উম্মতের আলেমগণ প্রত্যেক যুগে লক্ষ কণ্ঠে তাহার তেলাওত্ করিতেছেন এবং হজরতের শিক্ষা ও আদর্শকে তাঁহারা বহু হাদিছের কেতাবে জীবন্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

জগতের সমস্ত ধর্ম্ম মতের সমন্বয় সাধন করা এছলামের একটা প্রধান সাধনা। এছলামের পূর্ব্বে জগতের মানুষ নিজেদের মধ্যে যে ভয়ানক কোন্দল কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল, এবং এছলামকে অমান্য করিয়া এখনও যাহারা পরস্পরের সহিত কোন্দল কোলাহলে প্রবৃত্ত আছে—তাহার প্রধান উপলক্ষ হইতেছে 'ধর্ম্ম'। প্রত্যেক ধর্ম্ম ও সমাজ বলে ও বিশ্বাস করে—একমাত্র তাহাদের নিকট নবী ও আল্লার বাণী আসিয়াছে। দুনয়ায় তাহারা ছাড়া আর কেহই তাহা পাইবার অধিকারী নহে। যাহারা এরূপ দাবী করিতেছে, তাহারা মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। ঝগড়া বাধিতেছে এই খানে—আমার দেশ, আমার জাতি, আর আমার ভাষা ব্যতীত নবী হইতে পারে না, আল্লার বাণী প্রকাশিত হইতে পারে না। এই অনুদার মনোবৃত্তি লইয়া দুনয়াময় একটা মহা অনর্থ ঘটিতেছে। কিন্তু কোর্‌আন স্পষ্টাক্ষরে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিতেছে—প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে আল্লার বাণী ও তাহার বাহকের আবির্ভাব হইয়াছে,—"প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হইয়াছে।" (ফাতের্ ২৫)। অন্যত্র বলা হইতেছে—"এবং আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রছুল পাঠাইয়াছি।" কোর্‌আন ও হাদিছে এই মর্ম্মের আরও অনেক প্রমাণ বর্ণিত আছে, এবং ইহা মুছলমান সমাজের সর্ব্ববাদী সম্মত আকিদা।

এই আয়তেও বলা হইতেছে যে, মুছলমানগণ যেমন কোর্‌আনের প্রতি ঈমান রাখিবেন, সেইরূপ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পূর্ব্বে যুগে যুগে জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আল্লার যে সব বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতেও ঈমান রাখিবে, এবং সেই সব বাণীর বাহকগণকে আল্লার সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করিবে।

আয়তের শব্দ যোজনার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে জানা যাইবে যে, হজরতের প্রতি অবতীর্ণ কেতাবের শিক্ষার আলোকে হজরতের পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলির প্রতি নজর করিতে হইবে। হজরতের পূর্ব্বে যে সব কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা জাতি বিশেষের ও দেশ বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকন্তু কালক্রমে লোকের উপেক্ষা বা ইচ্ছাকৃত অনাচারের ফলে সেই সকল বাণীর কতক বিকৃত ও কতক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—বহু প্রক্ষিপ্ত বিষয় তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে 'আমল' বা 'আকিদার' জন্য সেই সকল কেতাবের উপর এখন আর নির্ভর করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে কোর্‌আন এই চৌদ্দ শত বৎসর ধরিয়া এমন অসাধারণ সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত হইয়া আছে যে, তাহাতে একটা অক্ষরের বিকার ঘটা সম্ভবপর হয় নাই, হইবেও না। অধিকন্তু সকল দেশের, সকল যুগের সমগ্র মানব সমাজের জন্যই তাহা সমাগত হইয়াছে। কাজেই 'আমল' ও 'আকিদার' জন্য বিশ্বমানবকে এখন একমাত্র কোর্‌আন শরীফের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

১০ المفلحون **মোফলেহুন** :—

'মোফ্‌লেহুনের' অর্থ—সফলকাম। যাহারা লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারে, তাহারাই সফলকাম। সুতরাং দ্বিতীয় আয়তে হেদায়ত অর্থে যে শুধু পথ প্রদর্শন নহে, বরং সত্য পথে পরিচালিত করিয়া যাত্রীকে—পথিককে কাম্য স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

পাঠকগণ, স্মরণ রাখিবেন যে, ছুরা বকরার প্রথম ভাগে মো'মেন, কাফের ও মোনাফেকদিগের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়তে মো'মেনদিগের বর্ণনা শেষ করার পর ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়তে কাফেরদিগের এবং অষ্টম হইতে বিংশতি আয়ত পর্য্যন্ত মোনাফেকদিগের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১১ كفر **কোফর** :—

অভিধানে উহার অর্থ—কোন বস্তুকে অপর বস্তুর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলা। কৃষক মাটীর দ্বারা বীজকে ঢাকিয়া ফেলে, এই জন্য আরবী ভাষায় কৃষককেও কাফের বলা হয়। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় উহার অর্থ—অজ্ঞতার জন্য অস্বীকার করা, জ্ঞাতসারে প্রত্যাখ্যান করা, এবং মুখে স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্তরে অমান্য করা। (মাআলেম)। সত্যকে মিথ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে চায়, এই সামঞ্জস্যের হিসাবে তাহাকে কাফের বলা হয়।

হজরত বলিয়াছেন,—الكفر دون كفر অর্থাৎ—"কোফরের বিভিন্ন স্তর আছে"। প্রথম শ্রেণীর হাজার হাজার লোক হজরতের উপদেশ শুনিয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কাফেরগণ জ্ঞাতসারে হজরতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এই আয়তে তাহাদিগের সম্বন্ধেই বলা হইতেছে যে, তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, তাহারা ঈমান আনিবে না। বুঝিয়া যে অবুঝ হয়, তাহাকে কেহই সৎপথে আনিতে পারিবে না।

১২ ختم الله على قلوبهم মনের উপর মোহর করা ঃ—

আলোচনার সুবিধার জন্য আয়তটীর অনুবাদ প্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উহাতে বলা হইয়াছে—"আল্লাহ তাহাদিগের মনের উপর ও তাহাদিগের কাণের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের চোখের উপর পর্দ্দা (পড়িয়া) আছে ......

আয়তের 'তাহাদিগের' অর্থ—পূর্ব্ব আয়ত বর্ণিত কাফেরদিগের, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞাতসারে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের।

মোহর করার দুইটী রীতি আছে। এক, কোন পাত্রে কোন জিনিষ র‍্যাখয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যাহাতে বাহিরের কোন বস্তু ভিতরে বা ভিতরের কোন বস্তু বাহিরে যাইতে না পারে, সে জন্য পাত্রের মুখে গালা বা ঐ প্রকার কোন বস্তু দিয়া তাহার উপর মোহর করিয়া দেওয়া হয়। আবার চিঠি পত্র লেখার পর তাহাকে পাকাপাকি করিবার জন্যও তাহার উপর মোহর করিয়া অর্থাৎ মোহরের ছাপ দিয়া দেওয়া হয়।

আয়তে এই ছাপ বা দাগের কথা বলা হইতেছে ; এবং ছাপ বা দাগগুলি হইতেছে মানুষেরই স্বকৃত কর্ম্মের ফল। কিন্তু মানুষের সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলও মূলতঃ আল্লার সৃষ্টি। সেই জন্য আল্লাহকেও উহার কর্ত্তা বলা হইয়া থাকে। নিম্নের উদ্ধৃত আয়ত ও হাদিছ হইতে আমাদের এই উক্তি সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

পাঠক, প্রথমে এই আয়তটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। আয়তে একই পদের প্রথমাংশ جملہ فعلیہ, এবং দ্বিতীয়াংশ جملہ اسمیہ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেখুন ঃ—

"আল্লাহ তাহাদিগের মনের উপর ...... মোহর করিয়া দিয়াছেন"

"তাহাদিগের চোখের উপর পর্দ্দা আছে"

جملہ اسمیہ জুম্‌লা এছমিয়া দ্বারা ثبوت و دوام —চিরস্থায়ী অবস্থান বুঝায়। পক্ষান্তরে, جملہ فعلیہ জুম্‌লা ফে'লিয়া দ্বারা حدوث —বা নূতন সংঘটন বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী পর্দ্দা পূর্ব্ব হইতে পড়িয়া আছে,—মোহর বা ছাপ পড়িয়াছে তাহার পর। দুই অংশের যোজকবর্ণ 'ওয়াও'কে হালিয়া গ্রহণ করিলে ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়।

কোর্‌আনের অন্যত্র এই মোহর ও মনের ছাপের কারণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আম্‌পারার 'তাত্‌ফিফ' ছুরায় বলা হইতেছে ঃ—

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون -

অর্থাৎ—"না, কখনই নহে, বরং নিজেদের অভ্যস্ত কাজগুলি তাহাদিগের মনের উপর মরিচা-রূপে জমিয়া গিয়াছে।" (১৪)।

বলা বাহুল্য যে, এই মরিচাই হইতেছে ছাপ, দাগ বা মোহর

ছুরা 'নেছা'য় বলা হইতেছে ঃ—

بل طبع الله عليها بكفرهم -

অর্থাৎ—"সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর ছাপ দিয়া দিয়াছেন।" (১৫৫)।

ছুরা ছফে বলা হইয়াছে ঃ— فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم —অর্থাৎ—"তদনন্তর তাহারা বাঁকিয়া যাওয়ার পরে আল্লাহ তাহাদের অন্তরগুলিকে বেঁকাইয়া দিলেন।" (৫)।

হজরত বলিতেছেন—"মো'মেন প্রথম যখন পাপে লিপ্ত হয়, তখন তাহার হৃদয়ের উপর একটা কাল দাগ পড়িয়া যায়। অনুতপ্ত হইয়া 'তাওবা' করিলে সেই দাগটা উঠিয়া যায়। পক্ষান্তরে অনুতাপ না করিয়া পাপে লিপ্ত হইতে থাকিলে ক্রমশঃ সে দাগটা বাড়িয়া যায়, এবং ক্রমে তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে জুড়িয়া বসে। কোর্‌আনে মনের উপর মরিচা ধরার যে কথা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ।" (আহমদ, এবনে মাজা, তির্‌মিজী, নাছাই)।

"আল্লাহ মোহর করিয়া দিয়াছেন"—এই পদের তাৎপর্য্য এই যে,—নিজেদের অভ্যস্ত অনাচারের ফলে, স্বভাবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে, তাহাদের মানস দর্পণের উপর এমন গাঢ় মরিচা দৃঢ় ভাবে জমিয়া গিয়াছে যে, স্বর্গের আলোক তাহাতে আর প্রতিভাত হইতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ সমস্ত কার্য্যের আদি কারণ এবং যেহেতু ঐ প্রাকৃতিক নিয়মও আল্লার সৃষ্টি, এই জন্য আল্লার সহিত এই শ্রেণীর ক্রিয়া পদগুলির সম্বন্ধ করা হয়। ইহাই মুছলমান আলেমগণের সর্ব্ববাদী সম্মত অভিমত। (বায়জাভী, এবনে কছির, প্রভৃতি)।

অষ্টম আয়তের শেষ অংশে বলা হইতেছে—ولهم عذاب عظيم —অর্থাৎ—"এবং তাহাদের জন্য কঠোর দণ্ড (নির্দ্ধারিত) আছে।" এই অংশটার তাৎপর্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিতেছেন—"এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, আল্লাহ যখন মোহর করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই জন্যই যখন তাহারা সত্যকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না—তখন এই কোফরের জন্য পরকালে তাহাদিগকে কোন প্রকার দায়ী করা চলিবে না। তাই এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে—তাহাদিগের জন্য গুরুতর শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। 'আল্লাহ মোহর করিয়া দিয়াছেন, আর সে জন্য তাহারা বুঝিতেছে না'—ইহার এরূপ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। বরং উহার তাৎপর্য্য এই যে—দর্শন শক্তির অপব্যবহারের, এবং উহাদের বিদ্রোহ ও হঠকারিতার জন্যই আল্লাহ 'মোহর করিয়া দিয়াছেন'।" (আজিজী)।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হজরতের সমসাময়িক কোরেশ প্রধান ও এহুদী পুরোহিতগণকে লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে এই আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আয়তের তাৎপর্য্য পরিষ্কার হইয়া যায়। পাঠকগণ অবগত আছেন—কোরেশ প্রধানগণের মধ্যে আবুতালেব গুণে জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন,—ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি হজরতকে কতই না সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি এছলাম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পৈতৃক সংস্কারের মায়া, গতানুগতিকের মোহ এবং পৌরোহিত্যের অভিমান তাঁহার চোখের উপর পর্দ্দা হইয়াছিল। মৃত্যুর সময় হজরতের আহ্বানে এক একবার সত্যকে দর্শন করার জন্য তিনি যখন চোখ মেলিতে চাহিতেছিলেন, ঐ সব মোহ-যবনিকা তখনই তাঁহার জ্ঞান চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতেছিল। অবশেষে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি বলিয়া উঠিলেন—'আমি আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্মের উপর মরিতে পছন্দ করি।' ইহারই নাম غشاوة —'গেশাওয়াঃ' বা জ্ঞানের উপর মোহ-যবনিকা।

এহুদীদিগের সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে :—

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله - سورة توبه

অর্থাৎ—"তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া নিজেদের আলেম ও দরবেশদিগকে 'কর্ত্তা' বা প্রভু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।"

এই আয়তের আলোচনা প্রসঙ্গে হজরত স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন যে—পুতুল পূজকদিগের ন্যায় এহুদীরা আলেম ও দরবেশদিগের মূর্ত্তিপূজা করে না বটে, কিন্তু পণ্ডিত ও পুরোহিত দিগের আদেশ নিষেধকে তাহারা আল্লার হুকুমের ন্যায় মান্য করিয়া থাকে। আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত পুরোহিতের পূজার ইহাই তাৎপর্য্য। (حديث عدى بن حاتم)

কোন ইন্দ্রিয়ের বা অঙ্গের অপব্যবহারে যেমন তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহার অব্যবহারের ফলেও তাহার শক্তি বা faculty তেমনি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকে হয় ত ঊর্দ্ধবাহু হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়াছেন—দীর্ঘকাল কাজে না লাগাইবার ফলে তাহাদের বাহুগুলি শুকাইয়া কাঠের মত হইয়া যায়, এবং সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলেও আর তাহাকে কাজে লাগাইতে পারেন না। সন্ন্যাসীর হাতের এই যে বর্ত্তমান অবস্থা তাহার প্রত্যক্ষ কর্ত্তা সন্ন্যাসী নিজেই কিন্তু ঐ প্রকার কাজের সঙ্গে ঐ প্রকার ফলের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন—আল্লাহ। সেই জন্য বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ তাহার হাতকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছেন। বাহিরের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মানুষের ভিতরকার ইন্দ্রিয় ও faculty অব্যবহারের ফলে অকর্ম্মণ্য ও আড়ষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহ সমস্ত কাজের আদি কারণ এবং এই প্রতিফলের স্রষ্টা, সেই জন্য আল্লাহকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে 'মজাজ' বলা হয়। ভূমিকায় 'হকিকত' ও 'মজাজ' সংক্রান্ত আলোচনায় এ বিষয়টী খুবই পরিস্ফুটরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বুঝিবার উপায় দুইটী। একটী,—নিজের মনে আলোচনা ও বিচার দ্বারা সত্য বুঝা যায়। যথেষ্ট মনোনিবেশের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে মানুষ যদি নিজে বিচার করিয়া সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে উপযুক্ত লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাহাদের যুক্তি প্রমাণ শ্রবণ করিয়া মানুষ নিজের সংশয় দূর করিতে পারে। যে শ্রেণীর কাফেরদিগের কথা আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের (নিজের কর্ম্মফলে) নিজে বুঝিবার শক্তি নাই, অপরের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াও সত্য গ্রহণ করার শক্তি বা faculty তাহাদের নাই। তাই বলা হইতেছে—'তাহাদের মনের উপর মোহর এবং কাণের উপর মোহর।'

দ্বিতীয় রুকু'

'মোনাফেক্' বা কপটদিগের লক্ষণ

৮ এবং এরূপ এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা (মুখে) বলিয়া থাকে—"আমরা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়াছি" — অথচ বস্তুতঃ তাহারা মোমেন[১৩] নহে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

৯ (এই প্রকার অপ্রকৃত বর্ণনা দ্বারা) তাহারা আল্লাহ্‌কে ও মোমেন বর্গকে প্রতারিত[১৪] করিতে চায়, অথচ প্রকৃত পক্ষে তাহারা কেবল আপনাদিগকে মাত্র প্রতারিত করিতেছে; কিন্তু তাহারা (ইহা) উপলব্ধি করিতেছে না।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .

১০ তাহাদের অন্তরে ব্যাধি (বদ্ধমূল হইয়া) আছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগের সেই ব্যাধিকে[১৫] বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন, এবং তাহারা যে মিথ্যা কথা বলে—ইহার প্রতিফল স্বরূপ তাহাদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড[১৬] (নির্দ্ধারিত) আছে।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

১১ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۞

১১ এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় —'ভূমণ্ডলে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিও না!' (তখন) তাহারা বলে — 'আমরা ত কেবল সংস্কারক মাত্র।'

১২ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۞

১২ সাবধান! নিশ্চয় তাহারাই হইতেছে বিপর্য্যয়প্রার্থী — কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

১৩ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ، اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۞

১৩ এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় —'অন্য লোকেরা যেরূপ (অকপটচিত্তে) ঈমান আনিয়াছে, তোমরাও সেইরূপ ঈমান আনয়ন কর!' তাহারা (মনে মনে) বলে—'আমরা কি ঐ নির্ব্বোধগুলার মত করিয়া ঈমান আনয়ন করিব!' সাবধান! নির্ব্বোধ স্বয়ং তাহারাই, কিন্তু তাহারা অবগত নহে।

১৪ وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ، وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ، قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۞

১৪ এবং যখন মোমেনদিগের সহিত মিলিত হয়, তখন তাহারা বলিয়া থাকে—'আমরা ঈমান আনিয়াছি'; আবার যখন নিভৃতে নিজেদের (দলপতি) শয়তানগণের সমীপে সমবেত হয়, তখন বলে — 'প্রকৃত পক্ষে আমরা ত তোমাদিগেরই সঙ্গে আছি, আমরা ত (একটা) প্রহসন করিতেছি মাত্র।'

١٥ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

১৫ আল্লাহ্ তাহাদিগকে এই প্রহসনের প্রতিফল দান করিবেন এবং এই অতি-পাপাচারে তাহাদিগকে অবসর দান করিতেছেন—মনের অন্ধকারে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আঁকু বাঁকু করিয়া বেড়াইতে থাকুক।

١٦ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى، فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

১৬ হেদায়তের বিনিময়ে গোম্‌রাহীকে খরিদ করিয়া লইয়াছে ইহারাই, সুতরাং ইহাদিগের এই ব্যবসায়ে লাভ কিছুই হইল না; (পক্ষান্তরে গুরুতর ক্ষতি এই হইল যে) তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত হইতে পারিল না।

١٧ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ

১৭ তাহাদিগের উপমা এইরূপ—যেমন এক ব্যক্তি অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করিল, তৎপর সেই অগ্নি যখন চতুষ্পার্শ্বের সমস্তকে আলোকিত করিয়া তুলিল—আল্লাহ্ তখন তাহাদের (চোখের) জ্যোতিকে অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নিবিড় তিমিরপুঞ্জের মধ্যে ত্যাগ করিলেন—তাহারা (কিছুই) দর্শন করিতে পারিতেছে না।

١٨ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

১৮ বধির মূক ও অন্ধ তাহারা—অতএব তাহারা আর ফিরিবে না।

١٩ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ

১৯ অথবা (তাহাদের উপমা) যেমন—মেঘপুঞ্জ হইতে নির্গত অজস্র

ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ، يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۞

বারিধারা; সেই-মেঘপুঞ্জে নিবিড় অন্ধকার, বজ্রনিনাদ ও চপলা-চমক (-বিদ্যমান)। বজ্রনিনাদে মৃত্যুভয়ে (ভীত হইয়া) তাহারা আপন আপন কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

২০ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ، كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ، وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ، وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

২০ বিদ্যুৎচমকে তাহাদের চোখগুলি ঝলসিত প্রায়;—যখনই তাহাদিগকে আলোক দান করে, তাহারা সেই আলোকে চলিতে থাকে, আবার যখন অন্ধকার তাহাদিগের উপর (ঘনীভূত হইয়া) আসে—অমনি তাহারা দাঁড়াইয়া যায়, আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের দর্শন ও শ্রবণগুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান।

টীকাঃ—

১৩ মোনাফেক্ বা কপট ঃ—

এই আয়ত হইতে মোনাফেক বা কপটদিগের অবস্থার বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে। কোর্‌আনের সাধারণ ধারা অনুসারে এই সব আয়তে দুন্‌য়ার সকল দেশের, সকল যুগের, সকল প্রকার মোনাফেকের কথা বর্ণিত হইলেও, হজরতের সমসাময়িক মোনাফেকদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া এই আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদিগের অধিকাংশই

ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এবং মদিনার আওছ ও খজরজ গোত্র দ্বয়ের মধ্যে কলহ বিবাদ সৃষ্ট করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করাই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দুই দায়াদ গোত্রের আত্মকলহের সুযোগে তাহারা রাজা হইবে—ইহাই ছিল তাহাদের সঙ্কল্প। ঠিক যে সময় তাহাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল, দলপতি আবদুল্লাহ বেন উবাই-এর জন্য রাজমুকুট পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, হজরত সেই সময় মদিনায় শুভাগমন করেন—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও সমান অধিকার স্বীকার করিয়া মদিনায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ব্যক্তি বা দলগত শাসন তন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া দেন। ইহার ফলে এহুদী সমাজ খুব বিচলিত হইয়া পড়ে।

এহুদী জাতির কুটবুদ্ধি চির প্রসিদ্ধ। এই সময় তাহাদের দলপতি ও অন্যান্য কতিপয় এহুদী প্রকাশ্যতঃ নিজদিগকে মুছলমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল, এবং গোপনে গোপনে এছলামের শত্রুপক্ষের সহিতও পুরা দমে ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকিল। বহু যুগের সঙ্কল্প ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ায় এছলামের ও হজরতের সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে পীড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, আল্লার অনুগ্রহে এছলামের ক্রমবিকাশের ফলে তাহাদের সে মনোপীড়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তবুও মুখে নিজদিগকে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। কারণ, এছলামই যদি পরিণামে জয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন তাহার রাজনৈতিক সুফল হইতে বঞ্চিত না হইয়া পড়ে। কিন্তু এছলামের সিদ্ধির পথে আপদ, বিপদ, বজ্র বিদ্যুৎও অনেক ছিল। এই পরীক্ষার সময় কপটদিগের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িত। এই রুকুতে মোনাফেকদিগের এই সমস্ত লক্ষণের আলোচনা করা হইয়াছে।

১৪ يخدعون য়োখাদেউনা ঃ—

আয়তে 'য়োখাদেউনা' ও 'য়াখ্দাউনা' দুইটী স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার ধাতু এক হইলেও বিভিন্ন 'বাবের' হিসাবে উভয়ের অর্থে অনেক তারতম্য ঘটিয়াছে। কোর্‌আনের অনুবাদকগণ সাধারণতঃ এই তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয় স্থলে অর্থ করিয়াছেন—"প্রতারণা করিতেছে" বলিয়া। তাঁহারা এখানে অর্থ করিয়াছেন— "তাহারা আল্লাহকে ও মো'মেনদিগকে প্রতারিত করে।" কিন্তু আরবী সাহিত্যের হিসাবে ইহার প্রকৃত অর্থ—"আল্লাহকে ও মো'মেনদিগকে প্রতারিত করার জন্য তাহারা ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া থাকে।"

تقول العرب خادعت الرجل اعملت التحيل عليه فخدعته اى تمت عليه الحيلة و نفذ فيه المراد - (البحر المحيط ' ب ١ ' ص ٥٧) -

يقال خادع اذا لم يبلغ مراده و خدع اذا بلغ - كليات ابو البقاء ' از اقرب

আল্লাহকে প্রবঞ্চিত করা আর আল্লাহকে প্রবঞ্চিত করার ব্যর্থ প্রয়াস পাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

১৫ مرضا মোনাফেকের মনঃপীড়া :—

নিজেদের নীচ স্বার্থপরতা এবং হজরতের ও এছলামের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি ছিল কপটদিগের মনঃপীড়ার কারণ। দিন দিন আল্লাহ এছলামকে জয়যুক্ত এবং তাহাদের অন্তরের কুক্ষীগত কুমৎলবকে বিনষ্ট করিয়া দিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহাদের মনঃপীড়া বাড়িয়া যাইতে থাকিল।

১৬ সেল ও রডওয়েলের বিকার :—

ইহাই আয়তের এই অংশের একমাত্র অর্থ। দুঃখের বিষয়, যে কোন কারণে হউক, সেল ও রডওয়েল সাহেব যথাক্রমে "Because they have disbelieved" এবং "For that they treated their Prophet as a liar" বলিয়া বিকৃত অনুবাদ করিয়াছেন। يُكَذِّبُونَ আর يَكْذِبُونَ কে এক মনে করিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই অঘটন ঘটাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

১৭ সংস্কার ও সংহার :—

কপটদিগের আর একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, মনে মনে অবিশ্বাসী হইলেও তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার লালসায় মুছলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারকের মুখোস পরিয়া তাহারা এছলাম ধর্ম্ম ও মুছলমান সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে চায়। দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দ, জুইমার, গোল্ডসেকের দ্বারা এছলামের যে ক্ষতি হওয়া সম্ভব, সমাজ সতর্ক না হইলে, মুছলমানের রূপ ধরিয়া এবং এছলামের দুই চারিটা পরিভাষা ব্যবহার করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক সহজে তাহার ক্ষতি করা যাইতে পারে। এই সংহারপ্রার্থী সংস্কারকরূপধারী কপটদিগের কুমৎলব সম্বন্ধে আল্লাহ এখানে মুছলমানকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

১৮. কপটের কূটবুদ্ধি :—

কপটের তৃতীয় লক্ষণ এই যে, কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য পালন সে কখনই করিতে পারে না। যাহারা এইরূপে principle মানিয়া চলে, কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিতে চায়, এই বুদ্ধিমানের দল তাহাদিগকে নির্ব্বোধ ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এছলামের দোহাই দিয়া যেখানে কিছু সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারা যায়, সেখানে তাহাদের মুছলমানত্বের দাম্ভিকতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আবার এছলামের জন্য একটু ত্যাগ, একটু ক্ষতি যেখানে স্বীকার করিতে হয়, সে সব স্থানে তাহাদের ছায়া মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়তে মুছলমানকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই বুদ্ধিব্যবসায়ীর দল দুনয়াকে

নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত নির্ব্বোধ ইহারাই। শঠতা ও প্রতারণার এই জঘন্য ব্যবসা কখনই সফল হইতে পারে না।

১৯ প্রহসন করা :—

সাধারণতঃ ইহার অনুবাদ করা হয়—আল্লাহ তাহাদিগের সহিত বিদ্রূপ করেন—ইহা ভুল। আরবী ভাষার সর্ব্ববাদী সম্মত নিয়ম অনুসারে এরূপ ক্ষেত্রে উহার অর্থ হইবে—يؤتيهم جزاء استهزائهم ' كبير - يجازيهم على استهزائهم ' بيضاوي - يجازيهم جزاء الهزؤ ' راغب - —অর্থাৎ "আল্লাহ তাহাদিগের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রতিফল দান করেন।" (কবির, বাইজাভী, রাগেব)।

২০ هدايت و ضلالت হেদায়ত ও জালালত :—

হেদায়ত শব্দের অর্থ—সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণ করা, অথবা সৎপথ গ্রহণ করতঃ লক্ষ্য স্থানে উপনীত হওয়া। ইহার বিপরীত 'জালালত' শব্দের অর্থ সৎপথকে বর্জ্জন করা—হারাইয়া ফেলা। কপটেরা সত্যের বিনিময়ে ভ্রষ্টতাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে—সত্য ও সৎপথ তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল, ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু এই বুদ্ধিব্যবসায়ী কপটের দল সেই সৎপথকে বিক্রয় করতঃ বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিল, আর ইহার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিল—গোমরাহী ও ভ্রষ্টতাকে। আয়তের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই খরিদ বিক্রয়ের মালিক বান্দা নিজেই,—সুতরাং তাহার ফলাফলের জন্যও সে নিজেই দায়ী।

২১ কপটদিগের প্রথম উপমা :—

কোন বস্তুকে দর্শন করার জন্য যুগপৎভাবে সেই জিনিষটার উপর আলোকপাত হওয়া ও দর্শনেচ্ছু ব্যক্তির চোখে দৃষ্টিশক্তি থাকা—উভয়ই দরকার। তোমার চোখে নূর যথেষ্ট আছে, কিন্তু দর্শনীয় জিনিষটী অন্ধকারে অবস্থিত, কাজেই তুমি তাহা দেখিতে পাও না। অন্ধকার রাত্রিতে এই জন্য দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্বেও আমরা কোন বস্তু দেখিতে পাই না। আবার দৃষ্টিশক্তিহীন বা বিকৃতদৃষ্টি ব্যক্তি দিনের প্রখর আলোতেও কিছু দেখিতে পায় না। কোর্‌আন স্বর্গের আলোক। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দুন্‌য়াতে এই আলোক রওশন করিয়াছেন। এই জন্য কোর্‌আনের অন্যত্র তাঁহাকে "দীপক প্রদীপ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করিল"—এই পদের দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বুঝাইতেছে। নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছাদিত ধরাধামে তিনি স্বর্গের আলোক প্রজ্জলিত করিলেন, দুন্‌য়ার হাজার হাজার মানুষ সে আলোকে মুক্তির পথ দেখিয়া লইল। কিন্তু অব্যবহারের প্রতিফল স্বরূপে যাহাদের অন্তর্চক্ষু বিনষ্ট বা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আলোকের দ্বারা কোনও উপকার লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

সাধারণ তফছিরকারগণ মনে করেন যে, আলোচ্য আয়তে "এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল"—পদাংশ দ্বারা "কাফেরগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল"—এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই তাৎপর্য্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁহাদিগকে আয়তে বহু উহ্য মানিয়া নানা কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেল সাহেব এই সুযোগে এই আয়তটীকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহার উত্তর দিবার জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গতানুগতির মোহ কাটাইয়া একটু সরল ভাবে আয়তের ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করিলে সহজে জানা যাইবে যে, এই সকল কষ্ট কল্পনা বা শ্রম স্বীকারের কোন দরকারই এখানে নাই। আমাদের বক্তব্যগুলি নিম্নে সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি ঃ—

(ক) استوقد একবচন ক্রিয়াপদ, অর্থ—এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। সুতরাং "কাফেরগণ" এই বহুবচনাত্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারে না।

(খ) الذي শব্দ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে যে সকল কূট তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে (দেখ—মুহিত), সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আমরা স্বীকার করিতেছি যে—" الذي কখন কখন বহুবচন স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" সুতরাং সাধারণতঃ অধিকাংশ সময়ই যে উহা 'একবচন স্থলে' ব্যবহৃত হয়, সে কথা অন্য পক্ষেরও স্বীকৃত। 'কখন কখন হয়' বলিয়া এখানেও হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? সাধারণ ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়া الذي কখন্ ও কোথায় যে বহুবচন স্থলে ব্যবহৃত হইবে, তাহার কোন লক্ষণ ও নিদর্শন থাকা চাই কি না ? তাহা কি ?

সেল সাহেব সাধারণ তফছিরকারগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতঃ বলিতেছেন যে, আয়তটীতে ব্যাকরণ দোষও আছে।' ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, الذي কখন কখন বহুবচন স্থলেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং কোর্‌আনের وخضتم كالذي خاضوا আয়তকে তাহার নজির স্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। (প্রথমতঃ এরূপ ক্ষেত্রে অন্য সাহিত্যের নজির দেওয়াই অধিক সঙ্গত ছিল)।

কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিলে দেখা যাইবে যে, এই নজিরে خاضوا বহুবচনাত্মক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং মূল অর্থ হইতে ব্যতিক্রম করার এই স্পষ্ট লক্ষণ قرينة صارفة এখানে বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ যেখানে এইরূপ বহুবচনাত্মক ক্রিয়া বা বিশেষ্যাদি الذي-র সঙ্গে ব্যবহৃত হইবে, কেবল সেইরূপ স্থলে উহাকে বহুবচনাত্মকরূপে গ্রহণ করা যাইবে। কিন্তু আলোচ্য আয়তে ইহার বিপরীত ক্রিয়াপদ استوقد স্পষ্টতঃ একবচন। সুতরাং এখানে 'আল্লাজি'কে বহুবচনার্থে কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব কাফেরগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল—এই অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

(গ) ঠিক ইহার অনুরূপ আয়ত এই ছুরাতেই বিদ্যমান আছে ঃ-

ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء ' صم بكم عمي فهم لا يعقلون - سورة بقرة -

অর্থাৎ—"এবং কাফেরদিগের উপমা—যেমন এক ব্যক্তি (পাল রক্ষকের ন্যায়) চীৎকার করিতেছে, অথচ যাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য চীৎকার—তাহারা (তাহার এই চীৎকারের শাব্দিক) আহ্বান ও আরাব মাত্র শ্রবণ করে (তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি তাহারা করে না)—বধির মূক ও অন্ধ তাহারা। অতএব তাহারা বোধ লাভ করিতে পারে না।"

এখানে চীৎকারকারী পালরক্ষকের দ্বারা যে হজরতকে বুঝাইতেছে, তাহাতে মতভেদ নাই। আলোচ্য আয়তটীর সহিত এই আয়তের যে ভাষাগত ও ভাবগত সাদৃশ্য আছে, তাহা সহজে দেখা যায়। এই আয়তের নজির অনুসারে এখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিতকারী শব্দে হজরতকে বোঝাই সঙ্গত।

(ঘ) বোখারী ও মোছলেমের হাদিছে স্বয়ং হজরত রছুলে করিমের মুখে উক্ত হইয়াছে ঃ—

مثلي كمثل رجل استوقد نارا - مشكوة ' ۱ - ۲۸ —অর্থাৎ—"আমার উপমা যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল।" স্বয়ং হজরতের এই উক্তি দ্বারা আমাদের কথা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে।

(ঙ) ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উপমায় "বারিধারা" বলিতে সকলের মতে হজরতের প্রচারিত কোর্‌আনের শিক্ষাকে বুঝাইতেছে। আমাদের গৃহীত তাৎপর্য্য অনুসারে এই পরস্পর সংযুক্ত উপমা দুইটীর ধারাগত সামঞ্জস্য বজায় থাকিয়া যায়।

(চ) কাফেরদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার কোন তাৎপর্য্যই হইতে পারে না। এই জন্য আয়তের কোন একটা তাৎপর্য্য নিঃসন্দেহরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তফছিরকারেরা উহার সাত আট প্রকার পরস্পর-অসমঞ্জস অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

ذهب الله بنورهم —আল্লাহ তাহাদের জ্যোতিকে নষ্ট করিয়া দিলেন,—"নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন" এরূপ অর্থ করা ভুল। এরূপ অর্থ গ্রহণ অভিপ্রেত হইলে ذهب না বলিয়া اذهب বলা হইত। (দেখ—কবির, ১—২৯৬)।

২২ **বধির-মূক-অন্ধ ঃ—**

মানুষ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে—সেই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া, প্রশ্ন ও আলোচনার দ্বারা শ্রুত বিষয়ের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া, অথবা ভূয় দর্শনের দ্বারা। ছুরা দাহ'রে বলা হইয়াছে—আল্লাহ মানুষকে দর্শন ও শ্রবণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সৎ অসৎ পথও তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছেন।" (২—৩)। অন্য ছুরাতে বলা হইয়াছে—"মানুষের মঙ্গলের জন্য তাহাকে আল্লাহ নয়নযুগল এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সৎ

ও অসৎ পথও তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছেন।" (ছুরা বাল'দ—৮, ৯, ১০)। কিন্তু সত্য জ্ঞান আহরণের এই উপকরণগুলিকে অব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে মানুষ যখন বিকৃত বা বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তখন তাহার মনের কপাট চিরকালের তরে রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং স্বর্গের আলোক সেখানে আর কোন মতেই প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

২৩ **কপটদিগের দ্বিতীয় উপমা :—**

হজরত বলিতেছেন :—

ان مثل ما بعثنى اللــه عز وجل به من الهدى و العلـم كمثـل غيث -
الحديث مسلم ' ج ٢ ' ص ٢٤٧ -

অর্থাৎ—"আল্লাহ তাআলা যে আলোক ও প্রজ্ঞা দিয়া আমাকে অভ্যুত্থিত করিয়াছেন—তাহা হইতেছে বৃষ্টিধারারই স্বরূপ।"

হজরতের মারফতে প্রকাশিত এই হেদায়ত ও প্রজ্ঞাকে এই আয়তেও বারিধারা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জলদপুঞ্জে বারিধারার সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ অন্ধকার ও ভীষণ বজ্রনিনাদও থাকে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা অবগত আছেন। সুতরাং বজ্র ও অন্ধকারের ভীতিকে অতিক্রম করিয়াই তাঁহারা শীতল নির্ম্মল বারিধারা দ্বারা আত্মার পিপাসা নিবৃত্তি করিতে চান। আর পক্ষান্তরে কোন উচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে না থাকায়, কপটেরা এ ক্ষেত্রে বিচলিত হইয়া পড়ে। দুন্‌য়ার নীচ স্বার্থ উদ্ধারের লালসায় তাহারা মুছলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া থাকে। সুতরাং একটু অন্ধকারের সম্মুখীন হইলে তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে, পরীক্ষার একটা বজ্র নির্ঘোষ শ্রবণ করিলে তাহাদের কলিজা কাঁপিয়া উঠে, বিপদের বজ্রপাতে এই বার বুঝি মুছলমানদের সর্ব্বনাশ হইল—এই ভাবিয়া তাহারা মুছলমানদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অমনি থমকিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণপ্রভার আলোকের মত যেমনই আশার চপলা চমকিয়া উঠে, অমনি আবার আঁকু বাকু করিয়া তাহারা মুছলমানদের সঙ্গ লইতে চায়। ফলতঃ পরীক্ষার সময় পিছাইয়া পড়া আর মুছলমান স্বরূপে লাভের ভাগ লইবার জন্য আগাইয়া আসা—ইহা হইতেছে কপটদিগের একটা বড় লক্ষণ। আয়তে উপমা দ্বারা এই লক্ষণটাকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর সুবিধাবাদী মোছলেমরূপী কপটদিগের এই লক্ষণের কথা কোর্‌আনের আরও বহু স্থানে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হজ্জ-ছুরায় তাহাদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"ইহাতে উপকার প্রাপ্ত হইলে সেই (পার্থিব) উপকারকে লইয়া সে তৃপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু (এ পথে) পরীক্ষা উপস্থিত হইলে অমনি মুখ ফিরাইয়া সরিয়া পড়ে। (এই শ্রেণীর কপটদিগের) ইহকাল পরকাল উভয়ই পণ্ড হইয়া যায়—ইহাই হইতেছে চরম বিফলতা।" (১১)।

কপটদিগের এই সব লক্ষণ বর্ত্তমান যুগের মোছলেম সমাজে কি পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, চিন্তাশীল পাঠকগণ এখানে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

'ছায়া'—শব্দের আলোচনার জন্য ৩য় রুকুর ২২ আয়তের টীকা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় রুকু'

এবাদত—কোরআন

২১ হে মানব! আপন প্রভুর এবাদত করিতে থাক—যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাতেই তোমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

٢١ يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٭

২২ যিনি তোমাদিগের মঙ্গল হেতু ভূমণ্ডলকে শয্যারূপে ও আকাশকে ছত্ররূপে (পরিদৃশ্যমান) করিয়াছেন এবং মেঘপুঞ্জ হইতে যিনি বারিধারা অবতারণ করিয়া তাহাদ্বারা মেওয়াজাত হইতে তোমাদের উপজীবিকা উৎপন্ন করিয়াছেন—অতএব আল্লার সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দল (গঠন) করিয়া লইও না, অথচ তোমরা জানিতেছ!

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٭

২৩ আর আমরা আমাদিগের বান্দার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছি—সে সম্বন্ধে তোমাদের যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ

مِثْلِهٖ ، وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

হইলে উহার অনুরূপ একটী ছুরা উপস্থাপিত কর, এবং—আল্লাহ্ ব্যতীত—নিজেদের অন্য সমস্ত মুরুব্বিদিকে (সহায়তার জন্য) আহ্বান কর—যদ্যপি তোমরা সত্যবাদী হও !

২ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

২৪ কিন্তু যদি তোমরা না কর—আর করিতে ত কখনই পারিবে না—তবে সেই আগুণ সম্বন্ধে সাবধান হও—যাহার ইন্ধন হইতেছে মানুষ ও প্রস্তর, (এবং) যাহা কাফেরদিগের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে ।

২ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ، كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ، قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ

২৫ পক্ষান্তরে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও পুণ্যকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদিগের জন্য এমন কানন-কলাপ (নির্দ্ধারিত) আছে—যাহার তলদেশ দিয়া নদী-নির্ঝরমালা প্রবাহিত হইতেছে ; যখনই তাহাদিগকে তাহার মধ্য হইতে কোন ফল ভোগ করিতে দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে—ইহাই ত পূর্ব্বে আমাদিগকে দান করা হইয়াছে—এবং তাহাদিগকে পরস্পর সাদৃশ্যমানরূপে

তাহা দেওয়া হইবে ;— আর সেখানে তাহাদের (উপকারের) জন্য সুপবিত্র যুগলার্দ্ধগণ (অবস্থিত থাকিবে) এবং সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

مُتَشَابِهًا ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৬ আল্লাহ্ (ক্ষুদ্র, বৃহৎ যে কোন বস্তুর) কোন প্রকার উপমা দিতে বিরত হন না—তা ক্ষুদ্র মশকের হউক অথবা তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কোন বস্তুর হউক ; অতঃপর বিশ্বাসী যাহারা—তাহারা জ্ঞাত আছে যে, উহা তাহার প্রভুর সন্নিধান হইতে (সমাগত-) সত্য। পক্ষান্তরে কাফের যাহারা—তাহারা বলিতে থাকে — আল্লাহ্ এই সকল উপমা প্রদান করিলেন—কি উদ্দেশ্যে ? ইহার দ্বারা বহু লোককে তিনি ভ্রষ্ট করেন—আবার বহু লোককে তিনি ইহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন ; অবশ্য ইহা দ্বারা অনাচারীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি ভ্রষ্ট করেন না—

٢٦ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

২৭ —(সেই সকল অনাচারী) যাহারা আল্লার বিধানকে—

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِن

بعد ميثاقه، و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل و يفسدون في الأرض، أولئك هم الخسرون.

তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর — ভঙ্গ করিয়া থাকে, এবং যাহাকে সংযুক্ত রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন — তাহা কাটিয়া ফেলে, আর ভূ মণ্ডলে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে — ক্ষতিগ্রস্ত ত তাহারাই।

٢٨ كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবিশ্বাস তোমরা কিরূপে করিতে পার ?—অথচ তোমরা ছিলে জীবনহীন— তখন তিনিই তোমাদিগকে জীবনদান করিলেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাই-বেন — পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিবেন—তাহার পর তোমাদিগকে তাঁহারই পানে প্রত্যাবর্ত্তিত করান হইবে।

٢٩ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سموت، و هو بكل شيء عليم

২৯ সেই (সর্ব্বশক্তিমান) যিনি, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সমস্তকেই তোমাদিগের উপ-কারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার ঊর্দ্ধদেশের প্রতি মনো-যোগী হইয়া সেগুলিকে সপ্ত-গ্রহপথে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, আর সর্ব্ব বিষয়ে মহাপ্রাজ্ঞ তিনিই।

টীকা :—

২৪ عبادت এবাদত :—

চরম বিনয় ও হেয়তা সহকারে কাহার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করার নাম—'এবাদত'। যে 'এবাদত' করে সে 'আব্দ', এবং যাহার 'এবাদত' করা হয় সে 'মা'বুদ'। নিজের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও সন্তোষকে 'মাবুদের' ইচ্ছা, আদেশ ও সন্তোষের নিকট সম্পূর্ণরূপে কোর্‌বান করিয়া তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করাই বান্দার একমাত্র কর্ত্তব্য। এই যে তন্ময় তদ্গত আত্মসমর্পণ—বস্তুতঃ ইহারই নাম এছলাম। পূজা, উপাসনা ইত্যাদি বলিলে 'এবাদতের' সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না। জাকাত দেওয়া ও জেহাদ করা 'এবাদত', আল্লার অভিপ্রায় অনুসারে সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ত্তব্য পালনই বান্দার পক্ষে 'এবাদত'—অথচ ঐগুলিকে পূজা বা উপাসনা বলা যাইতে পারে না। সেই জন্য অনুবাদে মূল 'এবাদত' শব্দ রাখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি।

এই আয়তের পূর্ব্বেও ঈমানের কথা বলা হইয়াছে। এই আয়তে ইহাও বলা হইতেছে যে, ঈমানের সঙ্গে 'আমলের' বা বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম্মের আবশ্যক। 'আমল'হীন ঈমানের বিশেষ সার্থকতা এছলামে নাই। আর প্রকৃত কথা এই যে—'আমল' ঈমানের অংশ হউক বা না হউক—ঈমানের লক্ষণ ও অপরিহার্য্য বাহ্য বিকাশ হইতেছে—'আমল'। আমি কি প্রকার বিশ্বাস করি না করি, আমার কর্ম্মই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।

২৫ فراشا ফেরাশ :—

'ফেরাশ' শব্দের অর্থ—শয্যা। অন্যত্র ভূমণ্ডলকে 'মাহ্‌দ' ও 'মেহাদ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুবিস্তৃত পদদলিত স্থানকে 'মাহ্‌দ' ও 'মেহাদ' বলা হয়। 'মাহ্‌দ' শব্দের ব্যবহারিক অর্থ—শিশুদিগের হিন্দোলা। আবার কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে নরককে পাপীদিগের 'মেহাদ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সকলেই উহার অর্থ করিয়াছেন—অবস্থান স্থল বলিয়া। নরক যে শয্যা বা সমতল ভূমি নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ভূমণ্ডলের ঐ বিশেষণগুলি কোর্‌আনে অধিবাস ও অবস্থান স্থল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীর কোন গতি আছে কি না আছে, এ আয়তে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। "জমিনের শয্যা হওয়ার জন্য তাহার স্থির ও অচল হওয়া জরুরী"—এ উক্তির কোন সারবত্তা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রেল-গাড়ীতে, জাহাজে ও ব্যোমযানে আমরা শয্যা পাতিয়া অবলীলাক্রমে ঘুম পাড়িয়া থাকি—অথচ তাহার গতি নাই, একথা কেহই বলিতে পারে না। আর তাই যদি হয়—তবে 'মাহ্‌দ' বা হিন্দোলার উল্লেখ করিয়া প্রতিপক্ষ ত পৃথিবীর 'হরকত্' (গতি) সপ্রমাণ করিতে পারে। তফছিরের যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

২৬ سماءً - بناءً ছামা—বেনা :—

'ছামা' শব্দের ধাতুগত অর্থ—উচ্চ হওয়া। আরবী সাহিত্যে প্রত্যেক উর্দ্ধস্থ বস্তুকেই 'ছামা' বলা হইয়া থাকে। এই জন্য মানুষের উর্দ্ধ দেশস্থ, শূন্য, মেঘ, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকেও 'ছামা' বলা হইয়া থাকে। ঘরের চাল, তাম্বুর উর্দ্ধ ভাগ, ভূমি হইতে উর্দ্ধ উত্থিত বৃক্ষ, এমন কি ঘোড়ার পিঠকে পর্য্যন্ত 'ছামা' বলা হইয়া থাকে। (বায়জাভী ১—৪২, ফেকহুল্-লোগাত্-ছাআলবী, লেছানুল আরব প্রভৃতি)।

ধাতুগত তাৎপর্য্যের হিসাবে যাহা বানান হয়—তাহাই 'বেনা'। তাম্বুর আচ্ছাদন, গুম্বজ বা ছাতার ন্যায় যাহার মধ্য ভাগ উচ্চ এবং প্রান্ত ভাগগুলি ঢালু হইয়া নিম্নদিকে ঝুলিয়া আসিয়াছে—আরবী সাহিত্যে তাহাকে 'বেনা' বলা হয়। পশম বা চামড়া দ্বারা নির্ম্মিত তাম্বুগুলিই ছিল—আরবের 'বেনা'। (জওহরী, রাগেব, লেছান, মেছবাহ, মহীত)।

এখানে 'ছামা' বা উর্দ্ধ দেশকে 'বেনা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পৃথিবীর উর্দ্ধদেশকে আল্লাহ এমন ভাবে অবস্থিত করিয়াছেন, যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে তাম্বু বা গুম্বজের আচ্ছাদনের মত বোধ হয়।

২৭ ندًا নেদ্দ্ন :—

'নেদ্দ' শব্দের অর্থ—প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দী। 'আল্লার জন্য প্রতিদ্বন্দী গঠন করিয়া লইও না'—ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বচরাচরের কোন ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার করিও না—যাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তাহাদিগকে তোমরা আল্লার শরিক বা প্রতিদ্বন্দী বলিয়া মনে করিয়া থাক। আয়তে বলা হইতেছে যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়ের স্রষ্টা ও নিয়ামক একমাত্র আল্লাহ। মক্কার মোশরেকগণ যে আল্লাকে জানিত না, বা মানিত না—এমন নহে। কিন্তু এই মানার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও বিশ্বাস করিত যে, কতকগুলি পীর ফকির ও ঠাকুর দেবতা প্রভৃতিও মানুষকে তাহার ইষ্ট দান করিতে এবং অনিষ্ট হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই জন্য ইষ্টলাভ করার এবং অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহারা সেই সকল ঠাকুর-দেবতা ও বোজর্গ-বিগ্রহের শরণ গ্রহণ করিত। আলোচ্য আয়ত দুইটীর প্রথমে মানুষকে 'এবাদত' করিবার এবং শেষে সেই 'এবাদত'কে শের্কের কলুষ হইতে মুক্ত রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন—সৃষ্টির কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিযোগীরূপে গ্রহণ করা সর্ব্বপ্রধান মহাপাপ। একজন ছাহাবী একদিন কথা প্রসঙ্গে অসাবধানতা বশতঃ বলিয়া ফেলেন—"আল্লাহ ও মোহাম্মদের মর্জ্জি হইলে এইরূপ হইবে।" এই কথা হজরতের কর্ণগোচর হইলে অবিলম্বে সকলকে সমবেত করিয়া তিনি এক খোত্বা দান করিলেন, এবং সকলকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন—"সাবধান! শুধু বলিবে—আল্লার মর্জ্জি—মোহাম্মদের নাম সে সঙ্গে কদাচিৎ জুড়িয়া দিবে না।" (বোখারী, মোছলেম)।

কিন্তু হায় ! এই কোর্‌আনের বাহক হইয়া এবং এহেন মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মত হইয়া আজ লক্ষ লক্ষ লোক হজরতকেই আল্লার আসনে বসাইয়া দিতেছে, এবং মজার কথা এই যে, তাহাকেই খাঁটি এছলাম বলিয়া ঢক্কা নিনাদে দুন্‌য়াময় ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে। বাজার প্রচলিত মৌলুদের কেতাবগুলিতে এই প্রকার অনাচার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। কেহ আরবের আ খসাইয়া, কেহ আহমদের মীমের পর্দ্দা তুলিয়া দিয়া, রব ও আরবকে এবং আহদ্‌ ও আহমদকে অভিন্ন বলিয়া বন্দনা করিতেছে। মৌলুদের মজলিসে আজ প্রকাশ্য ভাবে এই শ্রেণীর শত শত অনৈছলামিক ভাব ও ভাষার প্রবর্ত্তন করা হইতেছে !

এই ত গেল হজরতের কথা। 'খাঁটি ভক্তের' দল অন্যান্য পীর মুর্শিদদিগকেও প্রকাশ্য ভাবে খোদার আসনে বসাইয়া দিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হন নাই। পীর ও অলিদিগের নামে ফার্সি, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সন্ধান লইলে পাঠকগণ ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত পীরের দরগাহে, এমন কি তাঁহাদের জাল কবরে, এবং বোজর্গদের নামে যে সকল মানত্‌ ও হাজত্‌ নায়াজ করা হয়, তাহা স্পষ্ট শের্ক ও জঘন্য পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তাওহীদের তেজ বর্জ্জিত হওয়ার কারণে সৎসাহসের অভাবে আমাদের আলেম সমাজ জানিয়া শুনিয়াও প্রত্যক্ষতঃ বা প্রকারতঃ এই সব মহা পাতকের সমর্থনই করিয়া যাইতেছেন। انتم تعلمون 'অথচ তোমরা জানিতেছ'—এই পদাংশ আলেমদিগের জন্য বিশেষরূপে প্রযুজ্য।

সব চাইতে মজার কথা এই যে, এই মহাপাতকগুলিকে দুন্‌য়াময় চালাইয়া দেওয়া হইতেছে—এছলামের নামে,—যে এছলাম এই দুন্‌য়ায় আসিয়াছিল প্রধানতঃ এই মহা-পাতকের মূল উৎপাটনের জন্য।

২৮ مثله কোর্‌আনের অনুরূপ :—

কোন দিক দিয়া এই সাদৃশ্যের বিচার হইবে—সে সম্বন্ধে তফছিরের রাবিগণ বহু প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, কোর্‌আন এই তুলনার জন্য, কোন একটা দিক নির্ণয় করিয়া দেয় নাই। সুতরাং তুলনার যত দিক সম্ভব, স্বতন্ত্র ও সমবেত ভাবে সে সমস্ত দিককে বুঝাইতেছে। ভাষার হিসাবে বল, অলঙ্কারের হিসাবে বল, শিক্ষার হিসাবে বল, বস্তুতঃ দুন্‌য়ায় তাহার তুলনা নাই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সুধী সজ্জনেরাও এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের কতিপয় অভিমত দেওয়া গেল।

GOETHE, the celebrated German Philosopher and poet writes in his 'West-Oestlicher Divan' :—"However often we turn to it (Quran) at first disgusting us each time afresh, it soon attracts, astounds,

and in the end enforces our reverence. Its style, in accordance with its contents and aim, is stern, grand, terrible—ever and truly sublime. Thus this book will go on exercising through all ages a most potent influence."

HIRSHFELD says :—"The Quran is unapproachable as regards convincing power, eloquence, and even composition. And to it was also indirectly due the marvellous development of all branches of science in the Moslem world."

DR. STEINGASS, the learned compiler of the 'English-Arabic and Arabic-English Dictionaries' says :—"We may well say that the Quran is one of the grandest books ever written ... such a work is a problem of the highest interest to every thoughtful observer of the destinies of mankind."

PROF. PALMER, in his 'Introduction to the Quran', remarks :—"That the best of the Arab writers has never succeeded in producing anything equal in merit to the Quran itself is not surprising."

GIBBON, in his 'Decline and Fall of the Roman Empire' writes :—"The Quran is a glorious testimoney to the unity of God."

CARLYLE says :—"Sincerity in all senses, seems to me the merit of the Koran."

JOHN DAVENPORT writes in his 'An Apology for Mohammad and the Koran' :—"In a literary point of view, the Koran is the most poetical work of the East. The greater portion of it is in a rhymed prose, conformably to the taste which has, from the remotest times prevailed in the above portion of the globe. It is universally allowed to be written with the utmost purity and elegance of language in the dialect of the tribe of the Koreish. It is, confessedly, the standard of the Arabian language, and abounds with splendid imagery and the boldest metaphors; and notwithstanding that is sometimes obscure and verging upon timidity, is generally vigorous and sublime, so as to justify the observation of the celebrated Goethe, that the Koran is a work with whose dulness the reader is at first disgusted, afterwards attracted by its charms, and finally, irresistibly ravished by its many beauties. ... In order properly to estimate the merits of the Koran, it should be considered that when the Prophet arose, eloquence of expression and purity of diction were much cultivated and that poetry and oratory were held in the highest estima-

tion. The miracle of the Koran consists in its elegance, purity of diction, and melody of its sentences, so that every Ajame who hears it recited perceives at once its superiority over all other Arabic compositions. Every sentence of it inserted in a composition, however elegant, is like a brilliant ruby, and shines as a gem of the most dazzling lustre, while in its diction it is so inimitable as to have been the subject of astonishment to all learned men, ever since its first promulgation The admiration with which the reading of the Koran inspires the Arabs is due to the magic of its style; ... its variety also is very striking. Among many excellencies of which the Koran may justly boast are two eminently conspicious; the one being the tone of awe and reverence which it always observes when speaking of, or refering to, the Deity, to whom it never attributes human frailties and passions; the other the total absence throughout it of all impure, immoral, and indecent ideas, expressions, narratives etc., blemishes, which it is much to be regretted, are of too frequent occurrence in the Jewish Scriptures. So exempt, indeed, is the Koran, from these undeniable defects, that it needs not the slightest castigation, and may be read, from beginning to end, without causing a blush to suffuse the cheek of modesty itself."

সুবিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী এম্‌-এ, ডি-এস-সি মহোদয়ের মন্তব্য নিয়ে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"আরবী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মহা মূল্য গ্রন্থ "আল কোরআন" বা কোর্‌আন শরীফ, অন্য নাম ফোর্‌কান বা মোসাহেফ। ইহা পড়িবার, পড়াইবার, শিখিবার, শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু, হিন্দু হইয়াও এই গ্রন্থের শত মুখে প্রশংসা করিতে পারি। কোর্‌আন এক মহামূল্য রত্ন। এই রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্মজগতে এখনও তাহার সম্পূর্ণ প্রবেশ-অধিকার নাই। যাহারা কোর্‌আনকে "বদমায়েশের কল্পিত উপন্যাস" বলে, তাহারা রজক-বাহকের সখ্যতা করিতে পারে। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বা সাহিত্য-প্রিয় ভদ্র লোকদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষার বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়। ব্যাকরণের বাঁধনি খুব মজবুৎ, এবং শব্দ বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর—বড়ই কৌতুহলময়। সমুদয় কোর্‌আন সাগরে এক অপূর্ব্ব বীরত্ব ব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিতেছে, সেই তেজে এখনও মুছলমান জাতি বাঁচিয়া আছে। অন্য দিকে ধর্ম্মের শান্তিময় ভাবও ধীরে ধীরে অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া দেখা দিতেছে। এই দৃশ্য বড়ই মনোহর! ইহা বেদে বা বাইবেলে নাই। —("নব্য ভারত", ১১শ খণ্ড, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ দ্রষ্টব্য)।

কোন দলিল দস্তাবেজে কাট ছাঁট, জাল জালিয়াত, যোগ বিয়োগ ইত্যাদি হইলে তাহার আর কোন মূল্য থাকে না। বিশ্ব মানব যে গ্রন্থের উপর আমল করিবে—তাহা যে মূলতঃ আল্লার বাণী, শুধু এ কথা প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহা যথাপূর্ব্ব সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আছে, কোন প্রকার প্রক্ষেপ বা পরিবর্ত্তন তাহার ত্রিসীমায়ও প্রবেশ করিতে পারে নাই। এক কোর্‌আন ব্যতীত দুনয়ার আর কোন গ্রন্থ ইহার দাবী করিতে পারে না, ইহা কোর্‌আনের একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। এ হিসাবেও তুলনা করা যাইতে পারে।

আয়তে মুরুব্বীদিগকে আহ্বান করিতে বলা হইয়াছে। সে মুরুব্বী হইতেছে—তাহাদের কুমন্ত্রণাদাতা এহুদী পণ্ডিত পুরোহিতগণ—পূর্ব্বে যাহাদিগকে তাহাদের শয়তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

২৯ نار **অগ্নি—নরক** :—

এই আয়তে বলা হইতেছে যে, মিথ্যাবাদীর শেষ গতি "অগ্নি"। এই অগ্নি হইতে নরকের আগুণকেই বুঝাইতেছে। মওলবী মোহাম্মদ আলী ছাহেব كلما اوقدوا نار الحرب আয়ত দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, আয়তে অগ্নি অর্থে সমরানলকে বুঝাইতেছে। نار الحرب বা সমরানল বলিতে যুদ্ধকে বুঝায়—এই হেতুবাদে প্রত্যেক স্থানে 'অনল অর্থে যুদ্ধ' গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা। দোজখ ও দোজখের আগুণের কথা, কোর্‌আন হাদিছে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা আর প্রকারান্তরে কোর্‌আন হাদিছকে অস্বীকার করা একই কথা। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, পরকালের এই শ্রেণীর ব্যাপারগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানি না, জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপরও নহে।

'সে আগুণের ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর'—এই আয়তে 'পাথর ইন্ধন হইবে' ইহার অর্থ কি? আধুনিক লেখকেরা এ ক্ষেত্রে গন্ধক, পাথরী কয়লা প্রভৃতির নজির দিয়া বলিতেছেন—পাথর ইন্ধন হওয়াতে আশ্চর্য্যের কথা কিছু নাই। কথাটা ঠিক, কিন্তু আমাদের মনে হয়—আয়তের অর্থ ইহা অপেক্ষা আরও গভীর।

সর্ব্ব প্রথমে ইন্ধন শব্দটা বুঝিতে হইবে। ইন্ধনের দ্বারা দুই প্রকার কাজ হয়—প্রথম, আগুণ ছিল না—এমত অবস্থায় ইন্ধনের সাহায্যে আগুণ জ্বালান। দ্বিতীয়, আগুণ আছে—এমত অবস্থায় ইন্ধনের দ্বারা সে আগুণকে প্রজ্বলিত অবস্থায় রক্ষা করা বা তাহার 'হলক'কে আরও উগ্র করিয়া তোলা। বিশ্ব সৃষ্টির হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে নরকের সৃষ্টি হইয়াছিল—এ কথা বহু ছহি হাদিছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য আয়তের শেষভাগেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সুতরাং মানুষ ও প্রস্তর যে প্রথম অর্থে নরকের ইন্ধন হইতে পারে না, তাহা বেশ জানা যাইতেছে। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে এই সমস্যা উপস্থিত হয়

যে, মানুষ ও পাথর এ অবস্থায় ত দুন্য়ার সকল প্রকার আগুণেরই ইন্ধন হইতে পারে—সুতরাং وقودها الناس الاية কে দোজখের আগুণের বিশেষ লক্ষণ বা صفت مميزه রূপে ব্যবহার করার আর কোন সার্থকতাই থাকে না। শাহ আবদুল আজিজ আয়তের তফছিরে (১—৯০) ইহাকে "অতি কঠিন সমস্যা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি "আগুণ" শব্দের যে তফছির করিয়াছেন, তাহাতে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য শাহ ছাহেবের বক্তব্যটা তাঁহারই কথায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

و آن آتش آتش غضب الهي است كه سبب اشتعال آن ابتداء از جنس مردم كفارند و از جنس مخلوقات ديگر بتان - الخ - فتح العزيز ' ج ۱ ' ص ۹۰ -

অর্থাৎ—"আয়তে অগ্নি অর্থে আল্লার গজবের আগুণকে বুঝাইতেছে। এই আগুণ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার প্রথম কারণ হইতেছে না-ফরমান মানব সমাজ আর প্রস্তর—সাধারণতঃ যাহা দ্বারা পুতুল গড়িয়া তাহাকে আল্লার আসনে বসাইয়া দেওয়া হয়।"

কোন কোন তফছিরকারের মতে এখানে 'প্রস্তর' অর্থে কাফেরদিগের প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয়। কাফের বলিতে তাহার হৃদয়কেও বুঝায় বটে, কিন্তু আলোচ্য অপকর্ম্মে যেহেতু তাহার মনই হইতেছে প্রধান অপরাধী, সেই জন্য আমাদের মতে প্রস্তরের এই অর্থ অধিকতর সঙ্গত। আম্‌পারার 'হোমাজা' ছুরায় স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে—"আল্লার সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশন—যাহা হৃদয়গুলিকে স্পর্শ (আক্রমণ) করিয়া থাকে।" (৬—৭)। এই আয়ত হইতে শেষোক্ত অর্থের সমর্থন হইয়া যাইতেছে।

৩০ جنت জান্নত—কানন :—

'জেন', 'জান', 'জান্নত্' ও 'জিনিন' (ভ্রূণ) প্রভৃতি একই 'জ-ন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ প্রচ্ছন্ন হওয়া বা করা। লোক চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া 'জেন'কে 'জেন' ও মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণকে 'জিনিন' বলা হয়। ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষরাজি শাখা প্রশাখা বা তাহার ছায়া দ্বারা সংলগ্ন স্থানকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে বলিয়া কাননকে 'জান্নত' বলা হয়। বেহেশ্‌তের সুখ সম্পদ বা তাহার কানন কলাপের প্রকৃত স্বরূপ এখন প্রচ্ছন্ন আছে—এই জন্য বেহেশ্‌তকে 'জান্নত্' বলা হইয়াছে। (রাগেব, বায়জাভী প্রভৃতি)।

কোর্‌আন-হাদিছে বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিকে একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ মানুষকে অবগত করা হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার সম্যক ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই জন্য বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের জন্য তাঁহাদের জ্ঞানের স্তর অনুসারে রূপক ভাবে তাহার কতকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এবনে-মাজা, বায়হাকী প্রভৃতি ওছামা-বেন-জাএদের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রছুলে করিম 'জান্নত্'কে এক দীপ্তিময়

জ্যোতি, একটী ফুল্ল কুসুম, একটী তরতর প্রবাহিতা নদী, একটী সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ, একটী পরিপক্ক মধুর ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কোর্‌আনেই বলা হইয়াছে ঃ—

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ' جزاء بما كانوا يعملون .
سورة السجدة - ٣٢ ' ١٧

অর্থাৎ—"তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পুরস্কাররূপে তাহাদিগের জন্য যে কি নয়নাভিরাম (পরম ধন) লুকাইয়া রাখা হইয়াছে—কোন ব্যক্তিই তাহা অবগত নহে।" (৩২—১৭)। এই আয়তের উল্লেখ করিয়া হজরত এক হাদিছ কুদ্‌ছীতে বলিতেছেন ঃ—

قال الله تعالى — اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر - متفق عليه

অর্থাৎ—"আল্লাহ বলিতেছেন—আমার সৎকর্ম্মশীল বান্দাদিগের জন্য যে ন্যামত্ আমি প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছি—কোনও চক্ষু তাহা দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ তাহা শ্রবণ করে নাই, আর কোন মানুষের মনে তাহার কল্পনাও স্থান লাভ করিতে পারে নাই।" (বোখারী, মোছলেম)। এই যে অশ্রুত, অজ্ঞাত গুপ্ত ব্যাপার, এই যে দর্শনের অতীত, কল্পনার অতীত নয়নাভিরাম পরম ধন—ইহাই হইতেছে এছলামের 'জান্নত্' বা স্বর্গ।

কর্ম্ম মাত্রের এক একটা ফল থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানুষ এরূপ বহু সৎ বা অসৎ কর্ম্ম সম্পাদন করে—দুনয়াতে সর্ব্বত্র যাহার ফলাফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং এই ফলভোগের জন্য এ জীবনের পর মানুষের আর একটা জীবন থাকাও নিশ্চিত। এই পরজীবন ও আখেরাত্ একই কথা। আখেরাতের এই পুরস্কার প্রাপ্তির নাম 'জান্নত্' এবং দণ্ড ভোগের নাম 'জাহান্নম'। 'জান্নত্' ও 'জাহান্নম'-ভোগ দৈহিক কি আধ্যাত্মিকরূপে —কি উভয়রূপে—হইবে, ইহা লইয়া অনেক কথা কাটাকাটি করা হইয়াছে। আমরা বলি —আধ্যাত্মিকরূপে স্বর্গ ও নরক-ভোগ অসম্ভব নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক স্বর্গ বা নরক ভোগও কোন প্রকার অসঙ্গতও নহে। মৃত্যুর পর আত্মার পক্ষে যদি অবিনষ্ট ও অবিকৃত ভাবে অবস্থান করা এবং এ জগতের কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করা অসম্ভব ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে এই ভৌতিক দেহের পুনর্গঠন বা তাহার সুখ দুঃখ ভোগ অসম্ভব বা অসঙ্গত হইবে কেন?

আমাদের দুনয়ার এই দেহই অবিকল কিয়ামতের দিন উত্থাপিত হইবে—এমন কথা কোর্‌আন বলে নাই। তাহাতে বলা হইতেছে—"আমরাই তোমাদিগের মধ্যে মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি, এবং তোমাদিগের আকার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে ও তোমাদিগের অজ্ঞাত (এক নূতন) আকারে তোমাদিগকে উত্থাপিত করিতে আমরা অসমর্থ নহি। আর নিজে-

দের প্রথম সৃষ্টির কথা ত তোমরা নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছে—তবুও তোমরা জ্ঞানলাভ করিতেছ না—কেন ?" (ছুরা ওয়াকেয়া, ৬০, ৬১, ৬২)।

এই প্রথম সৃষ্টির কথা বিজ্ঞান-জগৎ এইটুকু জানিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে চরম অভিমত পোষণের মত দার্শনিক প্রমাণ তাহাদের হস্তগত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত নাস্তিক পণ্ডিত Huxley এখানে আসিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুমানের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। (হক্সলির বক্তৃতাবলী, ২৩৮)।

অতীতের কোন স্মরণাতীত কল্পনাতীত যুগে প্রোটোপ্লাজমের অণুপরমাণুগুলি জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসরের পর ক্রমবিকাশের আইন (Law of Evolution) অনুসারে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া এখন তাহা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-জ্ঞান গর্ব্বিত মানুষে পরিণত। জিজ্ঞাসা করি, এই ক্রমবিকাশের ধারা পরকাল চিন্তার সময় হঠাৎ স্থগিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ কি ? তাঁহাদের এই যে বহু বিশ্রুত Law of Continuity—তাহার পরিণাম তাহা হইলে কি হইবে ? (দেখ—ষ্টুয়ার্ট ও টেট্ কৃত—Unseen Universe)। পক্ষান্তরে Conservation of Value সংক্রান্ত মতবাদের সার্থকতাই বা তাহা হইলে কি থাকে ? (দেখ—হাফ্‌ডিং কৃত History of Philosophy)।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটু আভাষ দিয়া রাখিলাম। 'রুহ' ও 'আখেরাত্' বা আত্মা ও পরকাল সংক্রান্ত আয়তগুলির ব্যাখ্যায় এ সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

৩১ **ফল—রূজী—সাদৃশ্যমান** ঃ—

এই আয়তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে 'ছামরা' ও 'রেজ্‌ক' শব্দ দুইটীর তাৎপর্য্য উত্তমরূপে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। মছদর হিসাবে 'রেজ্‌ক' শব্দের অর্থ—দোওয়া, দান করা।

হাদিছে এই দোওয়া বর্ণিত আছে ঃ—

اللهم ارزقني ولدا صالحا

অর্থাৎ—"হে আল্লাহ ! আমাকে সৎ সন্তান দান কর।" 'ওরজকনি' শব্দের রূজীদান করা অর্থ লইলে মর্ম্ম হইবে—"হে আল্লাহ ! সৎ সন্তানগুলি আমাকে খাইতে দাও।" (৭নং টীকা দেখ)। 'ছামারা' শব্দের অর্থ—ফল। গাছের ফল, পুণ্যের ফল, পরিশ্রমের ফল, অবহেলার ফল ইত্যাদি সকল প্রকার ফলকেই 'ছামারা' বলা হয়। ছুরা কাহাফের ৩৪ ও ৪২ আয়তে 'ছামার' শব্দে ধন, দওলত্‌কে বুঝাইতেছে। (কবির ৫—১১৭ প্রভৃতি)। বংশ ও সন্তান সন্ততিবর্গকে 'ছামারা' বলা হইয়া থাকে। হাদিছেও ইহার বহু প্রমাণ আছে। হাদিছে আছে فثمرت اجرة اى ثمرته (রাগেব, বেহার, কামুছ, মেছবাহ প্রভৃতি)।

সুতরাং আয়তের শাব্দিক অনুবাদ এইরূপ হইবে ঃ—"এবং বেহেশ্‌তে যখন তাহাদিগকে কোন ফল ভোগ করিতে দেওয়া হইবে ……

এই ফল গাছের ফলও হইতে পারে, আর কর্ম্মফলও হইতে পারে। কিন্তু কোর্‌আনের বর্ণনা ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়—ফল অর্থে কর্ম্মফলকেই বুঝাইতেছে। পরকালের পুরস্কারের বর্ণনার ন্যায় সেখানকার দণ্ডভোগের কথাও কোর্‌আনের বহু আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

আন্‌কাবুত্‌ ছুরায় বলা হইয়াছে ঃ—

ذوقوا ما كنتم تعملون

শাব্দিক অনুবাদ ঃ—"তোমরা (দুন্‌য়ায় যে সকল (কু-) কর্ম্ম করিতে, তাহা আস্বাদন কর। (৫৫)।

ছুরা জারিয়াতে বলা হইয়াছে ঃ— ذوقوا فتنتكم —অর্থাৎ—"নিজেদের অনাচারগুলি চাকিয়া দেখ।" (১৩—১৪)।

অন্যান্য স্থানেও এইরূপ ব্যবহার আছে। (দেখ—ছুরা জুমার ২৪, ছুরা তওবা ৩৫)। দোজখের লোকগুলিকে তাহাদের কুকর্ম্ম ও অনাচারগুলি যে খাইতে দেওয়া হইবে না এবং এ সব স্থলে একমাত্র অর্থ যে কুকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ—সকলেই এ কথা স্বীকার করিতেছেন। আমাদের মতে, আলোচ্য আয়তের ফলভোগ এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

আয়তের শেষ অংশের অর্থ নির্ণয় করিতে তফছিরকারগণ নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধারণ মতের খোলাসা এই যে, মানুষ দুন্‌য়ায় যে সকল সুফল ও মেওয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে, বেহেশ্‌তেও তাহাদিগকে সেই নামের, সেই বর্ণের, এবং সেই আকারের মেওয়াজাত খাইতে দেওয়া হইবে। বেহেশ্‌তের লোকেরা উহা দেখিয়া বলিয়া উঠিবে—'আমাদিগকে দুন্‌য়ায় ইহাই ত খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।' অর্থাৎ বেহেশ্‌তের ফলগুলিকে দুন্‌য়ার ফলের সদৃশ দেখিয়া প্রথমে তাহারা উভয়কে এক বলিয়া মনে করিবে। 'রেজ্‌ক' ও 'ছামারা' শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয় লইয়াই যে মতভেদ, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আয়তের শেষ অংশের ব্যখ্যা সম্বন্ধে নাইশাপুরী বলেন ঃ—

"আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে,—আল্লার মা'রেফাত্‌ ব্যতীত মানবের সৌভাগ্য পূর্ণ-পরিণত হইতে পারে না। …… বিশ্বাসীরা এই দুন্‌য়ায় সেই মা'রেফাতের একটা আভাষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বটে। কিন্তু বহু অন্তরায় বিদ্যমান থাকায় মা'রেফাতে-এলাহীর পূর্ণজ্ঞান—প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জ্জন এবং তাহার পূর্ণ স্বাদ ও আনন্দ প্রাপ্তি দুন্‌য়ায় তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। মৃত্যুর পর এই সব পার্থিব তমজাল হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা সেই পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে এবং সেই পরমানন্দ উপভোগ করিতে পূর্ণভাবে

সমর্থ হইবেন। তখন তাঁহারা বলিবেন—এই পরম ধনের আভাষ ত আমরা দুন্য়াতে পাইয়াছিলাম। (গারাএব ১—১৯৪)।" এই প্রকার ব্যাখ্যা করাও যে সঙ্গত হইতে পারে, বায়জাভীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩২ ازواج **আজওয়াজ** ঃ—

'জওজ' শব্দের বহুবচন। স্বামী-স্ত্রী-প্রত্যেককেই 'জওজ' বলা হয়। স্বামীর 'জওজ' স্ত্রী এবং স্ত্রীর 'জওজ' স্বামী—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Spouse। উহার কোন বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। 'স্বামীরা তাহাদের স্ত্রীদিগকে প্রাপ্ত হইবে'—এইরূপ বর্ণনা করিলে নারীর মর্য্যাদা খর্ব্ব করা হইত। বর্ণনার এই বৈশিষ্ট্যটা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য।

৩৩ يستحي **য়্যাছ্‌তাহ্‌য়ী—বা-উজা** ঃ—

'এছ্‌তেহ্‌য়া' শব্দের অর্থ—লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করা, অথবা কোন কার্য্য হইতে বারিত থাকা। (জওহারী, রাগেব, Lane)। আল্লার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে উহার দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা নিশ্চিত। (খাজেন, বায়জাভী, মাআলেম প্রভৃতি)।

'বা-উজা' শব্দের অর্থ—মশক। আরবেরা অতি দুর্ব্বল কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে বলিয়া থাকে—ইহা মশক হইতে দুর্ব্বল বা হীন। সেই জন্য মশকের কথা উপমা স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই ছুরায় এবং ইহার পরবর্ত্তী ছুরাগুলির কতিপয় স্থানে আল্লাহ প্রকৃত জগৎ ও জীবজগতের নানা বস্তুর কথা উপমা ও উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন আগুণের উপমা, বৃষ্টিধারার উপমা, ইত্যাদি। অন্যান্য ছুরায় মৌমাছি, পিপীলিকা ও মাকড়ষার উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ কোর্‌আন উচ্চকণ্ঠে দাবী করিয়া বলিতেছে যে, উহা আল্লার কালাম—এবং উহার অনুরূপ একটা ক্ষুদ্রাকার ছুরা উপস্থাপিত করাও দুন্য়ার পক্ষে অসম্ভব। কাফের পক্ষ ইহাতে বলিতে লাগিল—'কোর্‌আন যদি আল্লার কালাম হইবে, তবে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ও নগণ্য কীট পতঙ্গের উপমা তাহাতে সন্নিবেশিত হইল কেন ?' আয়তে কাফেরদের এই সংশয়ের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ একটা আপেক্ষিক কথা। ইঁদুরের তুলনায় বিড়াল খুবই বৃহৎ, কিন্তু ব্যাঘ্রের তুলনায় সে আবার নিতান্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু আল্লার সম্বন্ধে এই আপেক্ষিকতার অস্তিত্ব মাত্র নাই। আমরা মশক ও পিপীলিকাকে ক্ষুদ্র এবং মহিষ, হস্তী প্রভৃতিকে বৃহৎ বলিয়া জ্ঞান করি—নিজেদের এই সসীম ও সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বের তুলনায়। কিন্তু সেই অসীম ও বিরাটের হুজুরে ক্ষুদ্রত্বে ও হেয়ত্বে সকলই সমান। তাঁহার নিকট হাতীর শক্তি ও সৃষ্টি এবং একটা মশার সৃষ্টি ও তাহার শক্তিতে কোন তারতম্য নাই। হাদিছে আছে—সমস্ত বিশ্ব চরাচর

একত্রে আল্লার সম্মুখে একটী মশার ডানার মূল্য রাখে না। অজ্ঞ লোকেরা 'তাওহীদের' এই স্বরূপটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়া এই প্রকার সংশয় উপস্থিত করিয়া থাকে।

৩৪ فاسقين ফাছেকীন ঃ—

'ফাছেকীন' বহুবচন, একবচন 'ফাছেক'। 'ফাছেক' অর্থে—'অত্যাচারী', সীমা লঙ্ঘনকারী। এখানে 'মোনাফেক' বা কপটদিগকেই 'ফাছেক' বলা হইতেছে। ছুরা তওবায় বলা হইয়াছে— ان المنافقين هم الفاسقون —নিশ্চয় কপটগণই ত হইতেছে 'ফাছেক'। (৬৭)।

৩৫ عهد - ميثاق আহদ—মীছাক ঃ—

'আহদ' অর্থে প্রতিজ্ঞা। 'আল্লার প্রতিজ্ঞা' অর্থাৎ আল্লার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। 'মীছাক' অর্থে দৃঢ়ীকরণ। ২৬ ও ২৭ আয়ত যে পরস্পর সংলগ্ন, ঐ দুই আয়তের উপসংহার ও উপক্রমই তাহার প্রমাণ। 'ফাছেক' শব্দে এখানে যে 'মোনাফেক'-দিগকে বুঝাইতেছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। 'মোনাফেক'গণ আল্লার নামে প্রতিজ্ঞা বা এছলামের 'বায়আত্' গ্রহণ করিত, তাহার পর পুনঃ পুনঃ হজরতের ও মুছলমানদের নিকট ঘোষণা করিত যে, তাহারা বাস্তবিকই মুছলমান। কিন্তু সময় ও সুযোগ পাইলেই এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এছলামের ঘোর শক্রতায় লিপ্ত হইত। হজরতের জীবনীতে কপটদিগের এই সব কুকীর্ত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। আয়তে 'মোনাফেক'দিগের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলের 'নিয়ম' বা Covenantএর সহিত এই আয়তের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। আলোচ্য আয়তে বর্ণিত 'ফাছেক' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যের এবং দুইটী আয়তের সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করায়, আমাদের তফছিরকারগণকে এখানে অনেক অসংলগ্ন কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং সেই জন্য তাঁহারা আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

৩৬ কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ ঃ—

একটা অবিচ্ছিন্ন কর্ত্তব্য ধারার নামই মানব জীবন। সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি, তাঁহার প্রেরিত নবী ও রছুলগণের প্রতি, নিজের প্রতি, শিক্ষাদাতা গুরু ও মুর্শিদের প্রতি, পিতা-মাতা ও ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি, আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি, মুছলমান সমাজের প্রতি, মানব জাতির প্রতি এবং আল্লার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তাহার এক একটা কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্যপালনের সমন্বয়ই হইতেছে—মানুষের জীবন সাধনার চরম সিদ্ধির একমাত্র সোপান। প্রত্যেকের সঙ্গে তোমার যে কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ, তাহা পালন করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কপটের দল নিজেদের সাময়িক নীচ স্বার্থের অথবা জেদ ও হিংসা বিদ্বেষের তাড়নায় এই সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া ফেলে। আল্লার ও তাঁহার রছুলের প্রতি, নিজের এবং নিজের স্বজনগণের

ও স্বদেশবাসীদের প্রতি তাহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা তাহারা আদৌ পালন করে না। অধিকন্তু—আয়তের শেষ ভাগে বলা হইতেছে—তাহারা দেশে 'ফাছাদ' বা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া থাকে। নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মদিনার 'মোনাফেক'গণ বিদেশী শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত, মদিনায় صلحا بعد সর্ব্ব জাতি ও সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাহারা বিদেশী শত্রুদিগের দ্বারা মদিনা আক্রমণ করাইবার—স্বদেশের শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিপর্য্যস্ত করার দুরভিসন্ধিতে তন্ময় হইয়া থাকিত।

আয়তের শেষ ভাগে 'মোনাফেক'দিগকে 'খাছেরূণ' বলা হইয়াছে। ব্যবসায়ে যাহার মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, সেই সর্ব্বস্বান্ত বণিককে বলা হয়—'খাছের'। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হওয়াও সম্ভবপর হইবে না। এহেন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন মানব সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হইয়া যায়—এবং ইহাই হইতেছে তাহার অপকর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিফল।

৩৭ اموات জীবনহীন :—

মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হওয়ার পর মানুষের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সূত্রপাত হয়—ভ্রূণ আকারে। ভ্রূণ তখন থাকে জীবনহীন অবস্থায়। তাহার পর জীবন লাভ করিয়া যথা সময়ে তাহা মানব আকারে ভূমিষ্ঠ হয়। কিছু কাল পরে সেই মানুষ আবার মরিয়া যায়। এই মরার পর আল্লাহ আবার তাহাকে জীবন দান করিবেন—এবং তাহার কিছু কাল পরে সে আবার আল্লার পানে ফিরিয়া যাইবে। এই যে জীবন-মরণ পরম্পরার অবিরাম ধারা, ইহার কারণ বা কর্ত্তা কি কেহই নাই? বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এই সহজ প্রশ্নটার সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য আপন আপন জ্ঞান অনুসারে যতই চেষ্টা করিতে থাকিবে, আল্লার অস্তিত্ব অস্বীকার করা তাহার পক্ষে ততই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত উদ্ভিদ ও জীবের মূল উপকরণ বলেন—প্রোটোপ্লাজম বা জীবন-রস বলিয়া একটী বস্তুকে। তাঁহারা বলেন—পৃথিবীটা একটা অগ্নিগোলকের মত ছিল। কাল-ক্রমে তাহার উত্তাপ হ্রাস পাইয়া আসিলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে সেখানে পানির সৃষ্টি হইল। তাহার পর পানির সঙ্গে কার্ব্বন, নাইট্রজেন ও গন্ধক প্রভৃতির সংমিশ্রণে এই জীবন-রস বা প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইল। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মতে সমস্ত উদ্ভিদ ও জীবদেহের মূল হইল 'সেল' বা রসকোষ। প্রথমে এই জীবন-রস একটী মাত্র রসকোষে অবস্থান করে। তাহার পর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের পর প্রোওটোজিওয়াতে তাহার পরিণতি। এ অবস্থায় আহার্য্য গ্রহণ حركت - تغذيه - نمو তাহাতে বিদ্যমান থাকে।

এই প্রটোপ্লাজমের সৃষ্টি আর তাহাতে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। লর্ড কেলভিনপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা তাই বলিয়াছেন—কোন কক্ষচ্যুত গ্রহ হইতে এই জীবন জিনিষটা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে।

১৮ خلق لكم ১৮ সমস্ত সৃষ্টি মানুষের জন্য ঃ—

দুনয়ার প্রত্যেক বস্তুকেই আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য আয়তে বলা হইয়াছে—"স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমস্তকেই আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। চিন্তাশীল সমাজের জন্য ইহাতে নিশ্চয় বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। (ছুরা জাছিয়া—১৪)। দুনয়ার সমস্ত বস্তুই মানুষের কার্য্যে নিয়োজিত—এই শ্রেণীর বহু আয়াত কোর্‌আনে বর্ণিত হইয়াছে। যে সমাজের মধ্যে চিন্তাশীলতার অভাব, তাহারা উহা দ্বারা উপকার লইতে পারে না—কিন্তু চিন্তাশীল যাহারা, তাহারা ইহা হইতে দুই প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রথম ঃ—তাহারা পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ হইতে উপকার গ্রহণ করার জন্য লালায়িত হয়, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমস্ত বস্তুকে নিজেদের কাজে লাগাইতে চায়। ইহাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের দরজা তাহাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়। দ্বিতীয় ঃ—যে সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময়ের করুণা-কটাক্ষের ফলে আমাদেরই জন্য এই অনন্ত বিশাল সৃষ্টি—তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া বা অস্বীকার করার মত কৃতঘ্নতা আর কিছুই নহে—এই চিন্তার উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুতত্ত্ব তাহাদিগকে পরমার্থ জ্ঞানের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমবায়ের নামই এছলামের ধর্ম্মসাধনা, এবং বর্ণিত চিন্তাশীলতাই তাহাকে এই সাধনার পথে অগ্রসর করিতে পারে।

কোর্‌আনের এই শিক্ষাই প্রথম যুগে মুছলমানকে কর্ম্মের ও জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে এক অভূতপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভে সমর্থ করিয়াছিল। আজ জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ভাবে ভক্তিতে, শৌর্য্যে বীর্য্যে যে সব মুছলমানের নাম করিয়া আমরা গৌরব ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, তাঁহাদের জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির সন্ধান লইলে কোর্‌আনের এই শিক্ষাকেই তাহার মূলীভূত কারণ বলিয়া স্পষ্টতঃ জানা যাইবে।

১৯ سبع سموات ১৯ সপ্ত গগন ঃ—

'ছামা' শব্দের তাৎপর্য্য পাঠকগণ ২৫ টীকায় অবগত হইয়াছেন।

এই আয়তে প্রথম বিচার্য্য এই যে, 'ছামা' শব্দ একবচন, অথচ পরে তাহার জন্য জমির বা সর্ব্বনাম আনা হইতেছে—বহুবচন 'হুন্না', ইহার কারণ কি? এই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ তফছিরকারগণ নানা প্রকার কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ সত্য কথা এই যে, তবুও তাঁহারা কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সেই জন্য রায়জাভী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ—

والمراد بالسماء هذه الاجرام العلوية او جهات العلو ـ ص ৯৭

অর্থাৎ—" 'ছামা' শব্দ দ্বারা ঊর্দ্ধস্থ গ্রহপথ Orbit বা ঊর্দ্ধের বিভিন্ন দিক Altitutecক বুঝাইতেছে।"

ছুরা বকরার বহু পূর্ব্বে ছুরা মো'মেনুন অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে ঃ-- ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

অর্থাৎ—"তোমাদিগের উর্দ্ধদেশে সপ্তমার্গ সৃষ্টি করিয়াছি।" (১৭)।

অতএব, আয়তের স্পষ্ট অর্থ এই যে,—আল্লাহ উর্দ্ধদেশের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহাকে সাত গ্রহপথে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

ভূমণ্ডলকে লইয়া সৌর জগতের প্রধান গ্রহ আটটী। যথা—Saturn, Jupiter, Neptune, Uranus, Earth, Mars, Mercury, Sun বা শুক্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, পৃথিবী, মার্করী, সূর্য্য। এই সাতটী গ্রহ ও গ্রহপথের বিষয় কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়তে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে এই গ্রহগুলির কক্ষ বিন্যাসের কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া এই যে এক অপ্রতিহত নিয়ম প্রচলিত, ইহার নিয়ামক কি কেহ নাই? সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষের জ্ঞানে এই প্রশ্নটা জাগাইয়া দেওয়াই এই সকল বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য। এ প্রশ্নের উত্তর তর্কে নহে—ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতায় পাওয়া যাইবে। যাহারা এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এ সম্বন্ধে নিজেরা নিভৃতে সাত্ত্বিক ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সত্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই শ্রেণীর আয়তের তফছির প্রসঙ্গে দুন্‌য়া ও তাহার পদার্থগুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে তফছির-কারগণ সাধারণ ভাবে যে সব গল্প গুজবের উল্লেখ করিয়াছেন—এছলামের সঙ্গে তাহার কোনই সংশ্রব নাই। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যকার কতকগুলি কথা হাদিছের কেতাবেও স্থান পাইয়াছে। এমন কি, উহা স্বয়ং হজরতের কথা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মোছলেম ও নাছাই রেওয়ায়ত করিতেছেন—আবু হোরায়রা বলিয়াছেন ঃ—"হজরত আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—আল্লাহ শনিবারের দিনে মাটি, রবিবারে পাহাড়, সোমবারে বৃক্ষ, মঙ্গলবারে অমঙ্গল, বৃহস্পতিবারে আলোক এবং শুক্রবারে আছরের পর আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কখনই হজরতের কথা নহে। কা'ব আহবার বা পাদ্রী কা'ব খৃষ্টানদিগের বহু পৌরাণিক গল্প গুজব আনিয়া মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, এ গল্পটীও আবু হোরায়রা তাঁহারই নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম বোখারী, তাঁহার ওস্তাদ এবনুল মাদিনী, এমাম বায়হাকী প্রভৃতি হাদিছের বহু গণ্যমান্য এমাম এই কথা বলিয়াছেন। (এবনে কছির ১—১২৫)। প্রথমোক্ত এমামগণের মতে কোন রাবীর ভ্রম বশতঃ এই অনর্থ ঘটিয়াছে। কিন্তু কথা এই যে, "হজরত আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—" এতটা কথা যদি ছহি মোছলেমের রাবীদিগের দ্বারা ভ্রম ক্রমেই সংযোজিত হইতে পারে—তাহা হইলে এ সম্বন্ধে অসম্ভব আর কি থাকিতে পারে? যাহার দোষে হউক, এই প্রকারের আরও কতকগুলি রেওয়ায়ত যে হজরতের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ রুকু'

আদমের খেলাফত

٣٠ وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ، قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ :

৩০ এবং — যখন তোমার প্রভু ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলেন— আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (-নিয়োগ) করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহারা বলিল—তুমি কি তথায় (এরূপ মানুষকে) প্রতিনিধি করিবা, যে সেখানে বিপর্য্যয় ঘটাইতে ও শোণিতপাত করিতে থাকিবে ? অথচ তোমার মহিমার গৌরবগান ও তোমার পবিত্রতার জয়কীর্ত্তন আমরা করিয়া থাকি ! আল্লাহ্ বলিলেন—নিশ্চয় আমি তোমাদিগের অনবগত বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত আছি ।

٣١ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

৩১ এবং—আদমকে তিনি নামগুলি সমস্তই শিক্ষাদান করিলেন, তাহার পর সে - সমুদয়কে ফেরেশ্‌তাগণের সমীপে পেশ করিয়া বলিলেন—তোমাদিগের উক্তি যদি যথার্থ হয়—তবে আমার নিকট এই সমুদয়ের নাম প্রকাশ কর (-ত দেখি) !

৩২ তাহারা বলিল—মহিমময় তুমি! কোন জ্ঞানই আমাদের নাই—তবে মাত্র যেটুকু তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ, বস্তুতঃ তুমি—একমাত্র তুমিই ত জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়।

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۲

৩৩ আল্লাহ্‌ বলিলেন—হে আদম! উহাদিগকে এই সমুদয়ের নাম বলিয়া দাও! সে মতে আদম যখন তাহাদিগকে ঐ সমুদয়ের নাম বলিয়া দিল (তখন) আল্লাহ্‌ বলিলেন—আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমস্ত গূঢ় (-রহস্য) আমি সম্যকরূপে অবগত আছি, আরও সম্যকরূপে অবগত আছি—তোমাদিগের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্তকে।

قَالَ يٰـاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ، فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۲

৩৪ এবং—আমরা যখন ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলাম ঃ—"আদমের জন্য প্রণত হও!" সকলেই তখন প্রণত হইল—কিন্তু ইবলিছ,—সে অমান্য করিল ও অন্যায় অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইল, এবং (ফলে) সে কাফেরদিগের দলভুক্ত হইয়া গেল।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ، اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

৩৫ এবং—আমরা বলিলাম ঃ—'হে আদম! তুমি ও তোমার যুগলার্দ্ধ কানননে অবস্থান কর—এবং উভয় তোমরা তাহা হইতে যত্র ইচ্ছা পরিতোষ সহকারে উপভোগ করিতে থাক—(তবে) এই বৃক্ষটীর ত্রিসীমায় কিন্তু পদার্পণ করিবা না—ইহাতে তোমরা অত্যাচারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবা।

٣٥ وَقُلْنَا يٰـآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّـةَ وَكُلَا مِنْهَـا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَـــرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

৩৬ কিন্তু শয়তান উভয়কে উহার উপলক্ষে পদস্খলিত করিয়া দিল, ফলে—যে অবস্থায় তাহারা ছিল—শয়তান তাহাদিগকে তাহা হইতে বহির্গত করিয়া ফেলিল—এবং আমরা বলিলাম—তোমরা চলিয়া যাও—একে অন্যের শত্রু তোমরা! আর কিছু কালের নিমিত্ত পৃথিবীতে তোমাদিগের অবস্থান ও (জীবন ধারণের) আয়োজন আছে।

٣٦ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَـا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ، وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَـرٌّ وَمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ

৩৭ অতঃপর আদম নিজ প্রভুর নিকট হইতে কতিপয় বাক্য (শিক্ষা-) প্রাপ্ত হইল, তখন আল্লাহ্ তাহার অনুতাপ মন্‌জুর করিলেন ;—নিশ্চয় তিনি, এক মাত্র তিনিই ত পরম ক্ষমাশীল ও করুণা নিধান।

٣٧ فَتَلَقّٰـى آدَمُ مِنْ رَبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِـيْمُ

৩৮ আমরা বলিয়াছিলাম—তোমরা সকলেই ইহা হইতে অপসৃত হও! অতঃপর তোমাদিগের নিকট আমার পক্ষ হইতে কোন হেদায়ত উপস্থিত হইলে—আমার (প্রেরিত) হেদায়তের অনুসরণ যাহারা করিবে—না (আসিবে) তাহাদিগের উপর কোন বিভীষিকা, আর না তাহারা সন্তাপ ভোগ করিবে—

٣٨ قلنا اهبطوا منها جميعا ، فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون

৩৯ পক্ষান্তরে (সেই হেদায়তকে) যাহারা প্রত্যাখ্যান করিবে এবং আমার নিদর্শনগুলির প্রতি মিথ্যারোপ করিতে থাকিবে—নরকের অধিবাসী তাহারাই, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

٣٩ والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولئك اصحب النار ، هم فيها خلدون

টীকা :—

৪০ ملائكة ফেরেশ্‌তাগণ :—

'মালাএকা' বহুবচন, একবচন 'মালক', এখানে উহার প্রচলিত অনুবাদ দেওয়া হইল। 'মালক' বা ফেরেশ্‌তার বিবরণ কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যা[illegible] সেখানে উহার টীকা দেওয়া সঙ্গত হইবে।

৪১ خليفة খলিফা—প্রতিনিধি :—

জাএলুন—জ'ল جعل শব্দের দুই প্রকার ব্যবহার ও দুই প্রকার অর্থ আছে। উহ[illegible] যদি সকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার কর্ম যদি দুইটী হয়, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে [illegible] বা হওয়ান। আর একটী মাত্র কর্ম হইলে উহার অর্থ হই[illegible] ক[illegible] করা [illegible]াতী, জ[illegible]রর, কবির প্রভৃতি)। এখানে 'ফিল্‌-আর্জে' ও 'খলিফ[illegible] [illegible]বাক্য না[illegible]

ব্যবহৃত হইয়াছে (কবির ১—৩৮১)। সুতরাং "আমি দুন্‌য়াতে খলিফা সৃষ্টি করিব"—আয়তের এইরূপ অর্থ না হইয়া উহার অর্থ হইবে—"দুন্‌য়াতে আমি খলিফা (-নিয়োগ) করিব, খেলাফত্ প্রতিষ্ঠিত করিব।" আদমের বিবরণে এছরাইলীয় পুরাণ-কথার অনুসারে যে ভ্রান্তি-প্রাসাদ গড়িয়া তোলা হইয়াছে—"আমি দুন্‌য়াতে একজন খলিফা পয়দা করিব" আয়তের এই বিকৃত অর্থই তাহার প্রথম ভিত্তি প্রস্তর।

খলিফা—ইহার অর্থ প্রতিনিধি, নাএব, Viceroy, অন্যের হইয়া এবং তাহার অভিপ্রায় অনুসারে কর্ত্তব্য পালনকারী। একবচন, বহুবচন, এবং স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার হয়। (কবির ১—৩৮২)। মহাত্মা আবু বকর হজরতের প্রতিনিধি হিসাবে এবং তাঁহার প্রচারিত এছলাম ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা মতে শাসন পালনাদি কার্য্য পরিচালনার ভার পাইয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহাকে খলিফাতুর-রছুল বা হজরতের খলিফা বলা হয়। আল্লার আইন ও অভিপ্রায় অনুসারে দুন্‌য়াতে শাসন পালন কার্য্য পরিচালনা করার জন্য আদমকে নির্ব্বাচিত করা হইতেছে এবং খেলাফতের তাজ দিয়া বিশ্বসংসারে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে।

৪২ آدم আদম :—

'আদম' আদৌ আরবী ভাষার শব্দ নহে, সুতরাং আরবী অভিধান ও ব্যাকরণের হিসাবে উহার ধাতুগত তাৎপর্য্য লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনই দরকার নাই। (মুহীত, বায়জাভী)। ইহা যে মূলতঃ কোন্ ভাষার শব্দ, সে সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কাহার পক্ষে আজও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। বাবেলীয় পুরাণ-ইতিবৃত্তে প্রথম মানবকে যে শব্দ দ্বারা আখ্যাত করা হইয়াছে, তাহা এত দিন Adaparূপে পঠিত হইত। কিন্তু সম্প্রতি বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন—উহার প্রকৃত পাঠ Adapa নহে বরং A'damu. আরবী 'আ-দামে' আর ঐ বাবেলীয় শব্দ যে অভিন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। কেহ কেহ বলিতেছেন—সংস্কৃত আদিম বা আদম একই কথা। কেহ বলেন—আদ্য+ম (ভাবার্থে) = আদ্যম = আদমো। ফলে, এ সমস্ত অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা করার কোনই সার্থকতা দেখা যায় না।

আয়তে আদম অর্থে—একজন মাত্র আদি মানব হজরত আদম—না উহার অর্থ বানি আদম বা মানব,—তফছিরকারদিগের মধ্যে ইহা লইয়া প্রথম হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। হাফেজ এবনে কছির প্রমুখ তফছিরকারেরা শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। (কছির ১—১২৫; কবির ১—৩৮২)। যুক্তি প্রমাণের হিসাবে শেষোক্ত মতটীই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়তে এই মতের অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা :—

هو الذي جعلكم خلائف الارض - و يجعلكم خلفاء الارض

একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে এই আয়তের মধ্যেই ইহার অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারিবে। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিতেছি।

প্রথম প্রমাণ :—

এখানে ৩৮শ আয়তে আদেশ দেওয়া হইতেছে—"তোমরা সকলে অপসৃত হও।" আদম ও তাঁহার স্ত্রী—পদের তাৎপর্য্য নর ও নারী না হইয়া যদি particular আদম ও হাওয়াই লক্ষীভূত হইতেন—তাহা হইলে এখানে দ্বিবচন ব্যবহার না করিয়া বহুবচনাত্মক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা কখনই সঙ্গত হইত না। কোন কোন তফছিরকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, শয়তান ও সর্পকেও আদম ও হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল,—সেই জন্য বহুবচন ব্যবহার করা সঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই অনুমানের মূলে কোনই যুক্তি বা প্রমাণ নাই। প্রথমতঃ সাপের গল্পটার কোনই প্রমাণ কোরআন বা হাদিছে নাই। তাহার পর ছুরা 'আ'রাফের' দ্বিতীয় রুকু'তে খুব স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবলিছ আদমকে ছেজদা করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যাইবার হুকুম দেওয়া হয়। এই হুকুম স্বতন্ত্রভাবে ও একমাত্র ইবলিছের উপর দেওয়া হইয়াছিল, আদমের না-ফরমানীতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে। এই প্রকারে ইবলিছকে দূর হইয়া যাওয়ার হুকুম দিবার পর আদমকে বলা হইল—'তুমি আর তোমার স্ত্রী কাননে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান কর', এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষটীর ত্রিসীমায় না যাইবার উপদেশও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়। তাহার পর শয়তান কর্ত্তৃক আদমের পদস্খলন—তাহার পর তাহার অপসৃত হওয়ার এই আদেশ। সুতরাং ইবলিছ 'অপসৃত হও'—এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত কখনই হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রমাণ :—

খলিফা নিয়োগের কথা শুনিয়া ফেরেশ্‌তারা বলিতেছেন—'তুমি কি দুনয়ায় এরূপ (মানুষকে) খলিফা করিবা, যে সেখানে রক্তপাত ও বিপ্লব ঘটাইতে থাকিবে?' (এ৩শ আয়ত)। 'হজরত আদম' সম্বন্ধে হাদিছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে—তিনি নবী ও রছুল উভয়ই ছিলেন (মেশকাত)। রক্তপাত ও ফছাদ করা হারাম। নবী ও রছুলগণ কখনই এরূপ হারামে লিপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং 'হজরত আদম' সম্বন্ধে এই সমস্ত মহা-পাতকে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ফেরেশতাদিগের মনে উঠিতেই পারে না। অতএব, এখানে 'আদম' দ্বারা মানবসমাজকেই বুঝাইতেছে।

তৃতীয় প্রমাণ :—

৩৮শ ও ৩৯শ আয়তে অপসৃত হওয়ার আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইতেছে যে, অতঃপর তাহাদিগের নিকট আল্লার পক্ষ হইতে হেদায়ত উপস্থিত হইবে। তখন যাহারা সেই হেদায়তের অনুসরণ করিবে, তাহারা নির্ভয় ও নির্ভাবনা হইতে পারিবে, কিন্তু যাহারা তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে, তাহারা চিরস্থায়ী নরকদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না।

প্রত্যেক ক্রিয়া ও সর্ব্বনামটী বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে,—আদম ও হাওয়া উদ্দিষ্ট হইলে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইত। পক্ষান্তরে আদম স্বয়ং আল্লার রছুল, হেদায়ত কবুল করা না করার কোন কথাই তাঁহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ হেদায়ত কবুল না করার সম্ভাবনা তাঁহার আদৌ ছিল না। অধিকন্তু ইবলিছ ত পূর্ব্ব হইতে অভিশপ্ত ও নারকী হইয়াই বিদূরিত হইয়াছিল। সুতরাং হেদায়ত কবুল করার কোন আশাই তাহার সম্বন্ধে ছিল না। অতএব আলোচ্য আয়তে আদম বলিতে যে মানবসমাজকে বুঝাইতেছে, তাহা স্থির নিশ্চিত।

চতুর্থ প্রমাণ :—

ফেরেশ্‌তাদিগের প্রতি যে আদমকে ছেজদা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে দুন্‌য়ায় যে আর কোন মানুষ ছিল না—কোর্‌আনে কুত্রাপি উহার প্রমাণ নাই, বরং তাহাতে উহার বিপরীত অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ছুরা 'আ'রাফে' বলা হইতেছে —"আর তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং তোমাদিগের জন্য সেখানে জীবন-উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়া দিলাম—যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (১০) এবং তোমাদিগকে সৃজন করিলাম, তাহার পর (বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ) বিশিষ্ট রূপ তোমাদিগকে দান করিলাম। তাহার পর ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলাম—আদমের জন্য প্রণত হও! ...... (১১)।" এখানে 'তোমাদিগকে' অর্থে নিশ্চয় মানবকে বুঝাইতেছে। এই মানবসমাজকে সৃষ্টি করার পর ফেরেশ্‌তাদিগকে আদমের ছেজদা করার আদেশ দেওয়া হইল, অর্থাৎ মানবসমাজকে ছেজদা করার হুকুম দেওয়া হইল। আমাদের তফছিরকারেরা এই আয়তের তফছির করিতে গিয়া এত বেশামাল হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখানে شمارا يعنى پدر شمارا —"তোমাদিগকে অর্থাৎ তোমাদিগের পিতাকে" বলিয়া আয়তের অনুবাদ করিয়াছেন। এই 'অর্থাৎটা' প্রয়োগ করিতে হইয়াছে নিজেদের পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কারকে বহাল রাখার জন্য। * কিন্তু আমরা যে অর্থ করিতেছি তাহাতে 'তোমরা' অর্থে 'তোমাদিগের পিতা' এইরূপ উদ্ভট স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতে হয় না।

পঞ্চম প্রমাণ :—

আয়তে নর ও নারীর পরিবর্ত্তে 'হজরত আদম ও বিবী হাওয়া' অর্থ গ্রহণ করাতে ছুরা 'আ'রাফের' কয়েকটী আয়তের ব্যাখ্যায় সাধারণ তফছিরকারগণ হজরত আদমকে মোশ্‌রেক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (১৮৯, ১৯০, ১৯১ আয়ত দেখ)।

اسماء আছমা'—নাম :—

আছমা' বহুবচন, একবচন—এছ্‌ম। এখানে এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তফছিরের রাবীরা

---

* [illegible] এই মতের সমর্থন করে যে নাজর উদ্ধৃত করিয়াছেন (৪—২৭০) তাহা যে [illegible] [illegible] ছুরা 'আ'রাফের' ঐ আয়তের তফছিরে বিশদ ভাবে দেখাইয়া দিব।

যাহা বলিয়াছেন, মোটের উপর তাহার সার এই যে,—দুন্য়ার সমস্ত ভূত ও ভবিষ্যৎ, ব্যক্তি বস্তু ও বিষয়ের নাম আল্লাহ তাআলা হজরত আদমকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—যেমন—উট, ঘোড়া, চিল, কাক, ইট, পাথর, আগুন, পানি, সজোরে বা অল্প জোরে বাতকর্ম, এমনকি 'ছিবঅয়হের ব্যাকরণ।' কিন্তু এছ্‌ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি এবং আয়তের বর্ণনা ধারার প্রতি মনোনিবেশ করিলে সহজে বোঝা যাইবে যে, এখানে আছমা' শব্দের তাৎপর্য্য কেবল নাম নহে, বরং উহার একটা গভীর ভাবের প্রতি এখানে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

পাঠককে ৩১শ ও ৩৩শ আয়ত আর একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আদমকে 'সমস্ত নাম' শিক্ষা দেওয়ার পর 'সেগুলিকে' ফেরেশ্‌তাদিগের নিকট পেশ করা হইতেছে। ফেরেশ্‌তাগণ ত্রুটী স্বীকার করিলে পর আদমকে আদেশ দেওয়া হইতেছে—'হে আদম! ফেরেশ্‌তাদিগকে 'এই সমুদয়ের নাম' বলিয়া দাও।" 'এই সমুদয়ের নাম' আর 'এই সমুদয় নাম'—এই দুই পদে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পক্ষান্তরে কেবল মাত্র নাম উদ্দেশ্য হইলে আয়তে আছমায়েহিম না বলিয়া আছমায়েহা বলা হইত।

এই প্রকারের বহু যুক্তি দিয়া কতিপয় তফছিরকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এখানে 'আছমা' শব্দের অর্থ—বস্তু সমূহের তত্ত্ব, বিশেষত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ। (আজিজী, মুহীত, বায়জাভী, কবির প্রভৃতি)। অর্থাৎ আল্লাহ মানবকে বস্তুতত্ত্ব সমূহ সম্যকরূপে জ্ঞাত করাইয়া দিয়াছিলেন।

৪৩ اسجدوا আদমকে ছেজদা কর:—

ছেজদা করার অর্থ—মাটীতে কপাল ঠেকাইয়া প্রণিপাত করা, সম্মান প্রদর্শনের জন্য কাহারও সম্মুখে প্রণত হওয়া, অনুগত হওয়া, সম্মান প্রদর্শন করা সমস্তই হইতে পারে। (রাগেব প্রভৃতি)।

৪৪ ইবলিছের পতন:—

অন্যায় গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ইবলিছ অহঙ্কার ভাবে আল্লার এই আদেশ অমান্য করিয়াছিল, —এই অহঙ্কারই তাহার পতনের কারণ হইয়াছিল। আল্লাহ জোর করিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহাকে 'মরদুদ' করিয়া দেন নাই। এই অহঙ্কারের স্বরূপ সম্বন্ধে যথা স্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

৪৫ الجنة আদমের জান্নাৎ:—

আদমকে আল্-জান্নাৎ বা কানন-বিশেষে অবস্থান করিতে দেওয়া হইয়াছিল,—সে কি পরকালের স্বর্গ, না দুন্য়ার কোন কানন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাধারণ তফছিরকারগণ প্রথম মতের পক্ষপাতী। কিন্তু আবু মোছলেম প্রভৃতি দুই একজন তত্ত্বদর্শী ভাষ্যকার বলিয়াছেন—এখানে জান্নাৎ শব্দে পার্থিব জান্নাৎ বা উর্ব্বর শ্যামল ভূখণ্ডকে [illegible] মতের প্রতিকূলে যুক্তি দেওয়া হইতেছে যে—জান্নাৎ শব্দের পূর্ব্বে যে [illegible] যায় না।

(article) আছে, তাহা হইতে একটা বিদিত ও নির্দ্দিষ্ট কানন বা জান্নাৎ বিশেষকে বুঝাইতেছে। বেহেশ্‌ত ব্যতীত অন্য কোন কানন কোর্‌আনের পরিভাষায় জান্নাৎ বলিয়া বিদিত নাই, অতএব আদমের জান্নাৎ অর্থে এখানে সেই বেহেশ্‌তকেই বুঝিতে হইবে। (বায়জাভী)। একমাত্র বেহেশ্‌ত ব্যতীত কোর্‌আনে দুন্‌য়ার কাননকে জান্নাৎ নামে অভিহিত করা হয় নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কোর্‌আনের বহু স্থানে দুন্‌য়ার কাননকেও জান্নাৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (দেখ—ফোর্কান ৮, বনি এছরাইল ৯১, বকর ২৬১, ছাবা ১৫-১৬, কাহাফ ৫ম রুকু)। সুতরাং বায়জাভী প্রমুখ তফছিরকারগণের যুক্তির ভিত্তিটাই এখানে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, জান্নাৎ শব্দ যখন পরকালের বেহেশ্‌ত ও দুনয়ার কানন উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখন এখানে দুইটার মধ্যে কোন অর্থ অবলম্বন করিতে হইবে ? যুক্তির হিসাবে প্রথম অর্থ টিকিতে পারে না, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এখন দ্বিতীয় অর্থ সম্বন্ধে অন্য পক্ষরা যে সব যুক্তি প্রমাণ প্রদান করিয়া থাকেন, এমাম রাজীর তফছির হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি ঃ—

(১) কোর্‌আনে বেহেশ্‌তকে 'দারুল কারার', 'দারুল মাকামা', 'দারুল খোলদ'—অর্থাৎ চিরস্থায়ী আবাস বলা হইয়াছে। 'ছুরা হেজ্‌রে' বলা হইয়াছে—وما هم منها بمخرجين অর্থাৎ—"বেহেশ্‌তের অধিবাসীরা তথা হইতে কখনই বহির্গত হইবে না।" (৪৮)। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, আলোচ্য জান্নাৎ হইতে আদমকে বহির্গত হইতে হইয়াছিল। অতএব আদমের এই জান্নাৎ যে পরকালের সেই বেহেশ্‌ত নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে।

(২) আদমকে ছেজদা করার আদেশ অমান্য করায় ইবলিছ কাফের ও অভিশপ্ত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর অভিশপ্ত কাফেরের জন্য বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা অসম্ভব ও হারাম। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, আলোচ্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়া সে আদমকে কুমন্ত্রণা দিতেছে। সুতরাং আদমের এই জান্নাৎ যে পরকালের সেই বেহেশ্‌ত নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে।

(৩) বেহেশ্‌তে অবস্থানকালে মানুষের উপর শয়তানের কুহক সফল হওয়া অসম্ভব। অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, পরকালে বেহেশতে প্রবেশের পর শয়তান আবার মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত এবং সেখান হইতে বহির্গত করিয়া দিতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আদমের জন্য শয়তানের কুহক সম্ভব ও সফল হইয়াছিল যে জান্নাতে, তাহা পরকালের সেই বেহেশ্‌ত কখনই হইতে পারে না।

(৪) বেহেশ্‌ত ও দোজখ উভয় কর্ম্মফল ভোগের স্থান। কোনরূপ মন্দ কাজ করার পূর্ব্বে কাহাকেও দোজখে দেওয়া যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ কোন প্রকার সৎকর্ম্ম সম্পাদন করার পূর্ব্বে কাহাকেও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়াও অন্যায়। অন্যথায় তাহার

নামের কিছু সার্থকতাই থাকে না। সুতরাং আদমের এই জান্নাৎ পরকালের সেই বেহেশ্‌ত কখনই হইতে পারে না।

(৫) আদমের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এক বাক্যে স্বীকার করা হইতেছে যে, আদমের সৃষ্টি প্রথমে এই পৃথিবীতেই হইয়াছিল। কিন্তু আদমের এই কালবুদ, অথবা জীবন্ত আদম, কখন ও কি প্রকারে দুন্‌য়া হইতে বেহেশ্‌তে স্থানান্তরিত হইলেন, কোনও রেওয়ায়তেই তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ ইহা সত্য হইলে, আদমের মহিমা প্রচারের জন্য, সর্ব্ব প্রথমে ইহার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। (কবির ১—৪৫৪)।

(৬) আল্লাহ আদমকে খলিফা করিতে চাহিয়াছিলেন—পৃথিবীতে। ফেরেশ্‌তারা আদমের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই পৃথিবী সম্বন্ধে। সমস্ত রেওয়ায়তের সাধারণ সাক্ষ্য অনুসারে, আদমকে প্রথমে পয়দা করা হইল—এই পৃথিবীতে। সেই আদমকে মুহূর্ত্তেকের জন্য আছমানে লইয়া যাওয়ার যে বিশেষ কি কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এবনে আব্বাছ বলিতেছেন—"আছর ও মগরবের মধ্যকার যে সময়, সে সময়টুকু মাত্র আদম বেহেশ্‌তে অবস্থান করিয়াছিলেন।" (হাকেম—মুহিত ১—৫০)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—

ان الله اخرج آدم من الجنة قبل ان يخلقه -

অর্থাৎ—"আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বেহেশ্‌ত হইতে বহির্গত করিয়াছিলেন!" এই শ্রেণীর আরও অনেক অসংলগ্ন ও অপ্রামাণিক কথা এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। নিজেদের সংস্কারের সহিত আয়তকে সমঞ্জস করিতে গিয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে।

'আদম' সংক্রান্ত বিবরণ 'ছুরা আ'রাফে' বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কথা সেইখানেই আলোচিত হইবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, আদমের সৃষ্টি, বেহেশ্‌তের বাগান, সাপ ও শয়তানের মিতালির কেচ্ছা এবং এই প্রকারের আরও যে সকল গল্প-গুজব এই প্রসঙ্গে তফছিরের কেতাবগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মগ্রন্থের সৃষ্টি প্রকরণ, প্রক্ষিপ্ত পুঁথি পুস্তক, অথবা সাধারণে প্রচলিত পৌরাণিক গল্পগুজব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোর্‌আনের ও এছলামের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই।

৪৬ الشجرة শাজারাঃ—নিষিদ্ধ বৃক্ষ :—

আদমকে কোন একটা বৃক্ষ বিশেষের ত্রিসীমায় যাইতে অর্থাৎ উহার ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। তফছিরের রাবীগণ, অবাধ কল্পনার সাহায্যে অথবা এহুদী ও খৃষ্টানদের পৌরাণিক গল্পগুজবের অনুকরণে এই উপলক্ষে এক একজন এক একটা [illegible] নির্ণয় করিয়াছেন। কোর্‌আন বা হাদিছে উহার কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না। [illegible]

এই বৃক্ষের একটা পূর্ণ লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায়। কোর্‌আনে এইটুকু জানা যাইতেছে যে, ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে আদম অত্যাচারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আদমের দোওয়াতে দেখা যাইতেছে— ربنا ظلمنا انفسنا—অর্থাৎ—"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছি।" ফলতঃ যে বৃক্ষের ফলে মজিয়া মানুষ নিজে নিজের উপর অত্যাচার করিতে বাধ্য হয়, আদমকে সেই বৃক্ষের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কার্য্যতঃ এই বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়াই শয়তান আদমকে পদস্খলিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ছুরা 'ত্বাহা'য় দেখা যায়—আদমকে কুহকিত করার সময় শয়তান এই বৃক্ষকে شجرة الخلد বিশেষণ দিতেছে। যে বৃক্ষ বা যে বৃক্ষের ফল মানুষকে অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে পারে, 'শাজারাতুল্ খুল্‌দ' অর্থে তাহাই। একটী হাদিছে হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে—"অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে মৃত্যু ছিল আদমের সম্মুখে, আর বাসনা ছিল তাঁহার পশ্চাতে। কিন্তু অপরাধে লিপ্ত হওয়ার (অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের) পর বাসনা আসিল তাঁহার সম্মুখে, আর মৃত্যু সরিয়া গেল তাঁহার পশ্চাতে।" (মন্‌ছুর ১—৫৮)। 'ছুরা এবরাহিমের' ২৪শ হইতে ২৭শ আয়ত পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে এই বৃক্ষের একটা স্পষ্ট আভাব পাওয়া যাইবে। এখানে সততা ও অসততার কথাকে আল্লাহ তাআলা 'সুবৃক্ষ' ও 'কুবৃক্ষ' বলিয়া উপমিত করিয়াছেন। সুবৃক্ষের মূল চিরস্থায়ী, তাহার শাখা গগনস্পর্শী, আর তাহার ফল সর্ব্বকালে চিরন্তন। পক্ষান্তরে কুবৃক্ষ ধরা পৃষ্ঠের উপরিভাগ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে—কোন স্থায়িত্ব তাহার নাই।

কোর্‌আন ও হাদিছের এই সকল বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, 'বৃক্ষ' এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে ভাবে তন্ময় তদ্গত হইয়া মানুষ এই নশ্বর জীবনের ক্ষণ-স্থায়িতার কথা, জীবন সাধনার সেই পরম সাধ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া দুন্‌য়ার বাসনা-মোহে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে—তাহারই ত্রিসীমায় পদার্পণ করা আদমের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বাইবেলের জ্ঞানবৃক্ষের সহিতও আয়তের কোন সংশ্রব নাই। বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞানবৃক্ষ নহে—অজ্ঞানবৃক্ষ, মায়াবৃক্ষ।

৪৭ هبوط হবুত—চলিয়া যাওয়া :—

'হবুত' শব্দের অর্থ—নামিয়া যাওয়া, অপসৃত হওয়া, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া —সমস্তই হইতে পারে। 'আদমকে আছমান হইতে জমিনে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল'—বলিয়া যে গল্পটী সাধারণভাবে প্রচলিত আছে, তাহার একটা মূলসূত্র এখানে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কেবল প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া—(নামিয়া যাও = উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে গমন কর = আছমান হইতে জমিনে গমন কর); ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ... শব্দ শেষোক্ত অর্থে আরবী সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। (কবির, ... মনীর, Lane)। কোর্‌আনে বনি এছরাইলকে বলা হইয়াছে—

অর্থাৎ—"কোন নগরে গমন কর !" এই সমস্ত তফছিরকারেরাও এখানে 'হবুত' শব্দের অর্থ —গমন করা, চলিয়া যাওয়া বলিয়া একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

৪৮ আদম কোন 'বাক্য' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?

পদস্খলনের পর আদম ও হাউওয়া নিম্নলিখিত ভাষায় অনুতাপ করিয়াছিলেন :—

ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين - اعراف ٢٣ -

অর্থাৎ—"হে আমাদের প্রভু ! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছি ! এখন তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর,—তুমি যদি আমাদিগের উপর দয়া না কর—তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত !" (ছুরা 'আ'রাফ', ২৩)।

মানুষের পদস্খলন হয় বাসনার মোহে মত্ত হইয়া—আর এই মানুষের মনে এই মোহের অধিকার জমিয়া যায়—পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বকে বিস্মৃত হইয়া। অপরাধ স্বীকার ও আন্তরিক অনুতাপে এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। আদম ও ইবলিছ উভয়ই অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল। একজন অপরাধ স্বীকার করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত চিত্তে সেই অপরাধের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, আর একজন—অনুতপ্ত হওয়া ত দূরে থাকুক—সেই অপরাধকে নিজের গর্ব্ব ও গৌরবের কথা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই দুই বিপরীত কার্য্য-কারণ-পরম্পরা উপরের আয়তগুলিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আদম ও ইবলিছের উপাখ্যানে ইহাই মূল শিক্ষণীয় বিষয়।

আদম ও হাউওয়ার উপাখ্যান উপলক্ষে এক শ্রেণীর আরবী পুস্তকে যে সকল হাস্যকর আজগৈবী বাজে গল্প স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন পৌরাণিক কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে,—ঐ গল্পগুজবগুলির কোন সম্বন্ধ এছলামের সহিত নাই। এছলামের শিক্ষা অনুসারে ঐ শ্রেণীর ভিত্তিহীন গল্পগুজবের প্রচার করাও হারাম।

পঞ্চম রুকু'

এহুদী জাতির বিবরণ

৪০ হে এহুদী জাতি! যে ন্যামৎ দ্বারা তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি—তাহা স্মরণ কর; আর আমার সন্নিধানে তোমাদের যে একরার—তোমরা তাহা পূর্ণ কর, তোমাদিগের নিকট আমার যে একরার—আমিও তাহা পূর্ণ করিব, এবং আমাকে —একমাত্র আমাকে ভয় করিয়া চল!

৪০ يبني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم و اياي فارهبون

৪১ এবং আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি—যে বাণী, তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে—তাহার সত্যতা স্বীকার করিতেছে—তাহার প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন কর। আর তোমরাই (যেন) তাহা অমান্য করার প্রথম-আদর্শ হইও না। এবং সামান্য (স্বার্থের) বিনিময়ে আমার আয়তগুলিকে বিক্রয় করিতে থাকিও না! এবং আমার—একমাত্র আমার সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিতে থাক।

৪১ و امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم و لا تكونوا اول كافر به، ولا تشتروا بايتي ثمنا قليلا و اياي فاتقون

৪২ আর সত্যকে মিথ্যার সহিত সং-মিশ্রিত করিও না — জানিয়া শুনিয়া সত্যকে গোপনও করিও না।

٤٢ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون

৪৩ এবং নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখ, আর জাকাত প্রদান করিতে থাক—আর অবনমনশীল লোকদিগের সহিত তোমরাও অবনমিত হও !

٤٣ واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين

৪৪ তোমরা লোকদিগকে সততার আদেশ প্রদান কর—আর নিজ-দিগকে ভুলিয়া যাও—এ কেমন কথা ? অথচ তোমরা পুস্তক পাঠ করিয়া থাক ! তবে কি তোমরা বুঝিতে পার না ?

٤٤ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتب، افلا تعقلون

৪৫ এবং ধৈর্য্য ও প্রার্থনার দ্বারা শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে থাক ;—বস্তুতঃ নিশ্চয়ই ইহা খুব কঠিন (-সাধনা),—কিন্তু সেই সব বিনয়াবনত (সাধক) -দিগের জন্য (ইহা কঠিন) নহে—

٤٥ واستعينوا بالصبر والصلوة، وانها لكبيرة الا على الخشعين

৪৬ —যাহারা বিশ্বাস করে যে, আপন-প্রভুর সহিত তাহাদিগ-কে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিতে হইবে—আর তাঁহার পানে তাহাদিগকে নিশ্চয় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

٤٦ الذين يظنون انهم ملقوا ربهم وانهم اليه رجعون

টীকা :—

৪৯ بنی اسرائيل **এহুদী জাতি :—**

বানি-এছরাইল শব্দের অর্থ—"এছরাইলের বংশধরগণ"। এখানে সমস্ত এহুদী জাতিকে জাতির হিসাবে আহ্বান করা হইতেছে। সুতরাং অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত এহুদীই ইহার অন্তর্ভুক্ত। জাতির হিসাবে তাহারা আল্লার যে সব ন্যামত লাভ করিয়াছিল, জাতির হিসাবে তাহারা যে সকল বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল এবং জাতির হিসাবে তাহারা নিজেদের জাতীয় দুষ্কর্ম্মের যে প্রতিফল ভোগ করিয়াছিল—এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে। কেবল বর্ত্তমানের এহুদীগণই ইহার উদ্দিষ্ট নহে। পাদ্রী হিউজ সাহেব এখানে বলিতেছেন—"No distinction is made between Jews and Israelites,—অর্থাৎ এছরাইলিয়দের ও এহুদীদের মধ্যে কোর্‌আনে কোন ব্যবধান করা হয় নাই। (Dictionary of Islam, ২৩৫ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ তিনি ইহাকে কোর্‌আনের একটা ভুল বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, Juda বা এহুদার মৃত্যুর পর হইতে এছরাইলের বংশধরগণ সকলেই সাধারণ ভাবে এহুদী নাম গ্রহণ করিয়াছিল। (দেখ—ঐতিহাসিক জষ্টিনস Justinus এর অভিমত, Biblica Classica, ৪৫১ পৃষ্ঠা)। The Story of the Nations পুস্তকের The Jews খণ্ডে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"The Israelites, Hebrews, or Jews, as the race is indifferently called"......, (১২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং হিউজ সাহেব এবং তাঁহার অনুসরণকারী পাদ্রী মহাশয়দিগের এই ইঙ্গিত কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

৫০ نعمتى **আল্লার ন্যামত :—**

এহুদী জাতিকে আল্লাহ যে বিশেষ ন্যামত দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, ছুরা মায়দায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। "এবং যখন মূছা তাহার স্বজাতিকে বলিল—

يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكا ـ

অর্থাৎ—"হে জাতি! তোমাদিগের প্রতি আল্লার যে ন্যামত—তাহা স্মরণ কর, যে মতে তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে নবীদিগকে (মনোনীত) আর তোমাদিগকে রাজা (নির্ব্বাচিত) করিলেন।" (২০)। নবুঅত ও রাজত্ব হইতেছে জাতির পক্ষে আল্লার প্রধানতম ন্যামত। এহুদী জাতি এই দুইটী ন্যামতের যথাযথ সম্মান রক্ষা করে নাই, ফলে উভয় দিক দিয়া তাহাদের চরম পতন হইয়াছিল।

নবুঅত ও রাজত্ব—এই দুই ন্যামতের সমবায়ে জাতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। কেবল রাজত্ব মুছলমানের আদর্শ নহে, আবার রাজত্ব না হইলে নবুঅতের শিক্ষাকে সচল ও সবলবৎ করিয়া রাখা কঠিন। দুনয়াতে হেয়, নগণ্য ও পরাধীন হইয়া থাকা মুছলমানের আদর্শ নহে, বরং ইহা ন্যামতকে উপেক্ষা করা রূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।

৫১ عهد একরার :—

বনি-এছরাইলের এই একরার অঙ্গীকার এবং তৎসম্বন্ধে আল্লার প্রতিশ্রুতির কথা কোর্‌আনের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ছুরা 'মায়দা'র ১২শ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে— "বনি-এছরাইলের নিকট আল্লাহ এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা উপাসনা করিতে ও জাকাত দিতে থাকিবে, তাহারা আল্লার রছুলগণের প্রতি ঈমান আনিবে ও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকিবে, আল্লার বান্দাদিগকে তাহারা বিনা স্থদে টাকা কর্জ্জ দিতে থাকিবে,—তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, তাহাদের পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিয়া দিবেন ...... ইত্যাদি।" এহুদী জাতি নিজেদের এ সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া ইহার বিপরীত কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ঈমানের অবস্থা এই যে, তাহারা আল্লার কালামে 'তাহ্‌রিফ' (প্রক্ষেপ) করিতে লাগিল, আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া গো-বৎসরের পর্য্যন্ত পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। আল্লার রছুলদিগকে মান্য করার আর সত্য সাধনে তাঁহাদিগের সহায়তা করার যে একরার, হজরত ঈছা প্রভৃতি নবীগণের হত্যা চেষ্টায় তাহার পরিণতি।

৫২ তাওহীদের শক্তি :—

নবুঅত ও বাদশাহৎ হইতেছে আল্লার প্রধানতম ন্যামত। কিন্তু এ ন্যামত অর্জ্জন ও তাহাকে রক্ষা করার জন্য জাতির মধ্যে কতকগুলি যোগ্যতা থাকা চাই—তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে সৎসাহস ও ঈমানের বল। কাপুরুষ জাতি এ ন্যামতের অধিকারী হইতে পারে না। এই শিক্ষাকে জীবন্ত করিয়া দিবার জন্য এখানে আল্লাহ বলিতেছেন—আমাকে—একমাত্র আমাকে ভয় করিতে থাক—অর্থাৎ আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করিও না। কাপুরুষ জাতি কিন্তু সর্ব্বদাই 'গয়রুল্লার' ভয়ে অস্থির—সত্যকে গ্রহণ ও প্রকাশ করার শক্তি তাহাদের মোটেই থাকে না।

৫৩ তাওরাতের সত্যতা :—

খৃষ্টান অনুবাদকেরা এইরূপ স্থানে মুছলমান পাঠকদিগকে বুঝাইয়া থাকেন যে— কোর্‌আনে মুছলমানদিগকে তাওরাত-ইঞ্জিলের উপর ঈমান আনিতে, অর্থাৎ উহার উপর আমল করিতে বলা হইয়াছে। কারণ আমল না করিলে ঈমান আনার কোনই অর্থ থাকে না। ইহার উত্তরে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, শুধু তাওরাত ইঞ্জিলের কেন, দুন্‌য়ার সমস্ত আছমানী কেতাবের প্রতি ঈমান আনিতে কোর্‌আন মুছলমানদিগকে আদেশ করিয়াছে। কোর্‌আনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারেই মুছলমানেরা বিশ্বাস করে যে, হজরত মূছা ও হজরত ঈছার প্রতিও আল্লার বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের উম্মতিগণ তাহাকে নানা প্রকারে বিকৃত, বিক্ষিপ্ত ও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। হজরত মূছার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে—'যখন তাঁহার কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত এহুদী জাতির অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল'—সেই সময়কার রচিত ইতিহাসকে মুছলমানেরা হজরত মূছার প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত বলিয়া

করিতে পারে না। হজরত ঈছার শিষ্যদিগের নামে প্রচারিত তাঁহার জীবন চরিত, কোর্‌আনের বর্ণিত ইঞ্জিল কখনই নহে।

এহুদী ও খৃষ্টান পুরোহিতেরা যে হজরত মূছা ও হজরত ঈছার প্রতি অবতীর্ণ 'আল্লার কালামকে' নানারূপে বিকৃত ও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, কোর্‌আনের বহু স্থানে তাহার উল্লেখ আছে। এই রুকু'র ৪১শ ও ৪২শ আয়তেও তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৫৪ **সেই ভাববাদী** :—

শত বিকারের পরও এহুদীদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মপুস্তকে এখনও নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সদা প্রভু হজরত মূছাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"আমি উহাদের (বনি-এছরাইলের) জন্য উহাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ ...... মরিতে হইবে।" (১৮, ১৮—২০ পদ)। এখানে বনি-এছরাইলের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে মূছার সদৃশ এক নবী উৎপন্ন করার কথা বলা হইয়াছে। বনি-এছরাইলের ভ্রাতৃগণ অর্থে বনি-এছমাইল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, মূছার সময় হইতে যীশুর সময় পর্য্যন্ত এহুদী জাতি সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। এই নবীর গুরুত্ব ও মহিমা তাহাদিগের নিকট এতই বিদিত ছিল যে, তাহারা তাঁহাকে "সেই ভাববাদী" বলিয়া অভিহিত করিত। যীশুর কথা চারিদিকে প্রচারিত হইলে, এহুদী জাতির পুরোহিত ও প্রতিনিধিগণ একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি আপনি সেই ভাববাদী ?" তিনি উত্তর করিলেন—"না"। সুতরাং তাঁহার পরে হজরতের সময় পর্য্যন্ত এহুদীরা সদা প্রভুর প্রতিশ্রুত মূছার সদৃশ সেই ভাববাদীর অপেক্ষা করিয়া আসিতে থাকে।

তাহার পর, হজরত মূছার নিকট প্রকাশিত সদাপ্রভুর সেই প্রতিশ্রুতি যখন পূর্ণ হইল, যখন কোর্‌আন সমস্ত বাইবেল-পন্থীকে সম্বোধন করিয়া সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঘোষণা করিল—আমরা যদৃশ রছুল ফের্‌আওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাদৃশ রছুল তোমাদিগের নিকট প্রেরণ করিলাম। (ছুরা 'মোজাম্মেল' ১ম রুকু)। তখন মূছার সদৃশ সেই ভাববাদীকে এহুদীরাই বিশেষ হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিতে লাগিল। এখানে এহুদীদিগের এই কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে।

৫৫ ثَمَنًا قَلِيلًا **"সামান্য বিনিময়"** :—

আল্লার নিদর্শন ও তাঁহার আয়তগুলিকে গুপ্ত বা লুপ্ত করার জন্য যে কোনও বিনিময় গৃহীত হউক না কেন, আর পার্থিব হিসাবে তাহার মূল্য যতই অধিক হউক না কেন—বাস্তবে তাহা অতি সামান্য। টাকা লইয়া লোকের ইচ্ছানুরূপ ফৎওয়া দেওয়া এহুদী আলেমদের একটা বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হজরতের বিরুদ্ধে উত্থান করার সময় এহুদ [illegible] নিয়মিত মাসহারা দিয়া পুরোহিতদিগের মুখ বন্ধ করিয়াছিল।

৫৬ **এহুদীদিগের প্রথম দুষ্কর্ম্ম ঃ—**

এই আয়তে এহুদী-আলেমদিগের প্রথম দুষ্কর্ম্মের কথা ব্যক্ত করা হইতেছে। যে বিষয়কে তাহারা নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—কোন স্বার্থের প্রলোভনে বা ক্ষতির আশঙ্কায় তাহাকে তাহারা ব্যক্ত করিতে পারে না। সে জন্য কখনও তাহারা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই কূল রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে, অথবা আদৌ সত্যকে গোপন করিয়া ফেলে, জনসাধারণকে তাহা জানিতে দেয় না।

৫৭ **দ্বিতীয় দুষ্কর্ম্ম ঃ—**

এহুদী পুরোহিতদিগের ধর্ম্মজীবনের দ্বিতীয় ব্যাধির কথা এই আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে। লোকদিগকে সাধু ও সৎকর্ম্মপরায়ণ হওয়ার উপদেশ দেওয়া, তাহা দ্বারা নিজের পৌরোহিত্যের প্রসার বাড়াইয়া লওয়া, আর নিজেরা আত্মসংশোধনে মনোনিবেশ না করা—ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? কোর্‌আনে ইহাকে كبر مقتا অর্থাৎ—'মহাপাতক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এহুদী আলেম ও পুরোহিত সমাজ সাধারণতঃ কপটতার এই মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিজদিগকে অধঃপতিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

৫৮ الصبر والصلوة **ধৈর্য্য ও প্রার্থনা ঃ—**

'ধৈর্য্য ও প্রার্থনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় কর'—ইহার দুইটা স্তর আছে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে মানুষ যথাযথ ভাবে নমাজে প্রবৃত্ত হইবে, বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একমাত্র বিপদবারণ আল্লার শরণ গ্রহণ করিবে, প্রাণের সমস্ত 'খলুছ' ও একাগ্রতা সহকারে তাঁহার নিকট 'ফর্‌য়াদ' করিতে থাকিবে। এই নমাজ ও প্রার্থনার ফলে তাহার প্রাণে শক্তি সঞ্চয় হইতে পারিবে। 'তির্‌মিজী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই মর্ম্মের একটা হাদিছও বিদ্যমান আছে। শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিতেছেন যে, ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনা এবং সাধারণ স্তরের সাধকদিগের জন্য এ ব্যবস্থা। ইহার উত্তম স্তর এই যে, বিপদ আপদে নিমজ্জিত হইয়া সাধক যখন নমাজে মনোনিবেশ করে—বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যাকুলি তখন আর তাহার থাকে না। নমাজে মনোনিবেশ করার ফলে বিপদের অনুভূতি পর্য্যন্তও তাহার অন্তঃকরণ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। শাহ ছাহেব আরও বলিতেছেন—রোগীর অঙ্গে গুরুতর অস্ত্রোপচার করার পূর্ব্বে বা পরে তাহাকে যেমন কতকটা মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে যেমন রোগী উপচারের জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করিতে পারে না—সেইরূপ নমাজের যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া আল্লার প্রেম-মদিরার এমন একটা বান সাধকের মনঃ-প্রাণকে আপ্লুত ও অভিভূত করিয়া ফেলে যে, বিপদ আপদের অস্তিত্বের অনুভূতি পর্য্যন্ত সে বিস্মৃত হইয়া বসে। (আজিজী)। ইহার চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় মহানবী, মোস্তফার পুন্য জীবনে।

৫৯. ঈমানের শক্তি :—

সত্যের সাধনায় যে বিপদ আপদ আছে, তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইলে যে শক্তির দরকার, অন্যের পক্ষে তাহা খুবই কঠিন। কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান যাহার মন—যে দৃঢ় প্রত্যয় করে যে, সে আল্লার নিকট হইতে সমাগত হইয়াছে এবং দু'দিন পরে আবার সে তাঁহারই নিকট প্রত্যাগত হইবে, এ হেন বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে নমাজ ও ধৈর্য্যের দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করা সহজ হইয়া থাকে। আর কেবল এই জীবনকেই যে ব্যক্তি মানবজীবনের শেষ কথা বলিয়া ধরিয়া লয়—কোন ন্যায়, কোন নীতি, কোন সত্য তাহার প্রাণে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্য আপাতমধুর পার্থিব সুখের প্রলোভনের বা আশু আশঙ্কাজনক কোন্ ক্ষতির বিভীষিকার পরীক্ষায় সে অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। কারণ এই আশু ও আপাতক ব্যতীত ভাবী ও স্থায়ী বলিয়া কোন জীবনের কল্পনা সে করিতে পারে না।

ষষ্ঠ রুকু'

এহুদীদিগের অনাচার

৪৭ হে এহুদী জাতি! যে ন্যামত (দ্বারা) আমি তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে যেরূপে (সমসাময়িক) বিশ্বের উপর মহিমান্বিত করিয়া দিয়াছিলাম—তাহা স্মরণ করিয়া দেখ!

٤٧ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৮ এবং সেই (ভয়ঙ্কর) দিবস সম্বন্ধে সাবধান হও, (যে দিন) কেহ কাহারও কোনই উপকারে আসিবে না, এবং কাহারও পক্ষ হইতে কোন সুপারিসই মন্‌জুর করা হইবে না, আর তাহার পক্ষ হইতে কোনই বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না—আর কোনও প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেও তাহারা পারিবে না।

٤٨ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৯ আরও (স্মরণ করিয়া দেখ) ফের্‌আওনের লোকজনেরা যখন তোমাদিগকে জঘণ্যতম অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতেছিল—তোমাদিগের পুরুষদিগকে

٤٩ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ

তাহারা নিহত করিতেছিল, আর তোমাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখার সঙ্কল্প করিতে-ছিল—আমরা তখন তোমাদিগ-কে তাহাদিগের (কবল) হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং ইহাতে তোমাদিগের প্রভুর পক্ষ হইতে কঠিন পরীক্ষা (বিদ্যমান) ছিল।	يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ
৫০ আরও (স্মরণ করিয়া দেখ) আমরা যখন তোমাদিগের জন্য সাগর (-বেলা) কে বিভক্ত করিয়াছিলাম, সে মতে তোমা-দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং ফের্‌আওনের লোকজন-দিগকে ডুবাইয়া দিলাম—আর তোমরা ইহা দেখিতেছিলে।	٥٠ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ
৫১ আরও (স্মরণ করিয়া দেখ) আমরা যখন মূছাকে চল্লিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দান করিয়া-ছিলাম, তৎপর তাহার অনু-পস্থিতিকালে তোমরা গোবৎস-কে (পূজ্যরূপে) গ্রহণ করিলে —আর তোমরা ছিলে অত্যা-চারী!	٥١ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ
৫২ তখন আমরা তোমাদিগকে অতঃপর মার্জ্জনা করিলাম—যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও!	٥٢ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

৫৩ আরও (স্মরণ করিয়া দেখ) যখন মূছাকে আমরা কেতাব ও ফোর্কান দান করিয়াছিলাম—যেন তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইতে পার।

٥٣ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

৫৪ আরও (স্মরণ করিয়া দেখ) মূছা যখন স্বজাতিকে (সম্বোধন করিয়া) কহিল — 'হে আমার স্বজাতীয়গণ! (গোবৎসকে পূজ্যরূপে) গ্রহণ করিয়া তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ; অতএব আপন স্বৃষ্টিকর্ত্তার হুজুরে তওবা কর—সে মতে নিজেদের (অপরাধী) স্বজন-গণকে নিহত কর! তোমা-দিগের স্বৃষ্টিকর্ত্তার সন্নিধানে তোমাদিগের পক্ষে ইহাই মঙ্গলজনক! অতঃপর তিনি তোমাদিগের 'তওবা' গ্রহণ করিলেন, নিশ্চয় তিনি—তিনিই ত মহাক্ষমাশীল কৃপা-নিধান।'

٥٤ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

৫৫ এবং তোমরা যখন বলিয়াছিলে —'হে মূছা! যাবৎ আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যরূপে দর্শন না করিতেছি, তাবৎ তোমার

٥٥ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

(কথার) উপর কখনই আস্থা স্থাপন করিব না।' ফলে তোমরা 'ছাএকা' (আজাব) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে—অথচ তোমরা (নিজেদের এই অবস্থা) দর্শন করিতেছিলে।

٥٦ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

৫৬ তখন তোমাদিগের মরণের পর আবার তোমাদিগকে জীবন্ত (জাতিরূপে উত্থাপিত) করিলাম—যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে থাক!

٥٧ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ، كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ، وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

৫৭ আরও (ভাবিয়া দেখ, সেই ছায়াহীন প্রান্তরে) মেঘপুঞ্জকে

করিয়া দিয়াছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগের নিকট 'মান্না' ও 'ছাল্‌ওয়া' প্রেরণ করিয়া (বলিয়া) ছিলাম — "আমার প্রদত্ত বিশুদ্ধ পদার্থগুলি ভোগ করিতে থাক!" এবং (এই সমস্ত উপদেশ অমান্য করিয়া) আমাদের কোন ক্ষতি তাহারা করে নাই, বরং নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়াছে।

٥٨ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

৫৮ আরও (সেই সময়ের কথা ভাবিয়া দেখ) যখন আমরা

شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لكم خطيكم و سنزيد المحسنين ۝

বলিয়াছিলাম— প্রবেশ কর এই পল্লীতে, আর উহার (শস্যাদি) হইতে যদৃচ্ছা স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে থাক, এবং প্রণত অবস্থায় উহার দ্বার দিয়া (নগরে) প্রবেশ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক, (তাহা হইলে) আমরা তোমাদিগের পাপপুঞ্জ (ত) ক্ষমা করিয়া দিব (-ই, অধিকন্তু) সৎকর্ম্মশীল লোকদিগকে (ইহা ব্যতীত আরও) অধিক প্রদান করিব।

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ۝

৫৯ অতঃপর যে কথা-তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—অত্যাচারী দল তাহাকে অন্য কথায় বদলাইয়া ফেলিল[৬০]। সুতরাং তাহাদের সেই অনাচারের ফলে অত্যাচারী-দিগের প্রতি আকাশ হইতে কঠোর দণ্ড প্রেরণ করিলাম।

টীকা :—

৬০ জাতীয় মহিমার কারণ :—

দুন্‌য়াতে মানুষকেই আল্লাহ নিজের খলিফা ও প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আল্লার প্রতিনিধিরূপে মানুষ স্বজাতির যে সেবা করে—তাহার পূর্ণবিকাশ হয় ধর্ম্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মধ্য দিয়া স্বাধীনতা ও নবুঅতের আকারে। এহুদী জাতিকে আল্লাহ এই উভয় ন্যামতই দান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেদের কর্ম্মদোষে তাহারা সেগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া

পড়ে—পরজাতির অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যতঃ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এহুদী জাতির সেই উত্থান পতনের সেই কার্য্যকারণ-পরম্পরা এখানে এক এক করিয়া বর্ণনা করিয়া কোর্‌আন মুছলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে—ঐ দোষগুলি সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে মুছলমানকেও ঐরূপে দিন ও দুন্‌য়া উভয় হিসাবে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে হইবে।

৬১ **ফের্‌আওনের অত্যাচার ঃ—**

এছরাইল বংশের আদি পুরুষ হজরত য়্যাকুব নিজের পুত্র পরিবারবর্গকে লইয়া মিসরে গমন করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে ইঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। এহুদী জাতির অন্যান্য বহু লোকও ক্রমে ক্রমে স্বদেশ ছাড়িয়া মিসরে গমন করিতে থাকে। ফলে, কএক পুরুষ অতিবাহিত হইতে না হইতে মিসরে এহুদীদিগের সংখ্যা ও প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাতে মিসর রাজগণের ও তাঁহাদের আমত্যবর্গের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং এহুদীদিগকে দলিত মথিত করার জন্য তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হইয়া পড়েন। অবশেষে আমালেকা গোত্রের রাজা দ্বিতীয় রামসেস বা ফের্‌আওন কিব্‌তী জাতির সহায়তা ও এহুদীদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ও তাহা-দিগকে নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। এই সময় এহুদী জাতির উদ্ধারের জন্য আল্লার মঙ্গল ইচ্ছায় হজরত মূছার আবির্ভাব। তিনি ফের্‌আওনের দরবারে উপস্থিত হইয়া অত্যাচার জর্জ্জরিত স্বজাতির মুক্তির দাবী পেশ করার সময়, মূলের কারণটার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন— لقد عبدت بني اسرائيل - سورة شعراء অর্থাৎ—"তুমি এছরাইল বংশকে দাস জাতিতে পরিণত করিয়াছ।" (ছুরা 'শোআরা')। কারণ, পরজাতির অধীনতাই হইতেছে সকল অত্যাচারের ও সমস্ত অধঃপতনের কারণ।

ফের্‌আওন বানি-এছরাইলকে কিরূপ জঘন্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতেছিল, সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে। এই আয়তে সেই অত্যাচারের চরম অবস্থা বর্ণিত হইতেছে—তাহারা এহুদীদের পুরুষদিগকে নিহত করিয়া ফেলিতেছিল, আর নারীদিগকে জীবিত রাখিতেছিল। ইহা অপেক্ষা ধ্বংসের ও অবমাননার কারণ আর কি হইতে পারে?

কোন কোন খৃষ্টান লেখক বলিতেছেন—ফের্‌আওন এছরাইল বংশের পুত্রগুলিকে নদীতে ফেলিয়া বা অন্য প্রকারে ধ্বংস করিত বটে, কিন্তু 'জবাই' করার কোন প্রমাণ বাইবেলে পাওয়া যায় না, অথচ কোর্‌আনে 'জবহ'—ذبح শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে! এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, বাইবেলে যাহা আছে তাহাই সত্য, আর যাহা নাই তাহাই মিথ্যা—এ কথা স্বীকার করার কোন প্রমাণ নাই, বরং অনেক স্থলে ইহার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। অতএব "বাইবেলে নাই, সুতরাং কোর্‌আনের বর্ণনা ভুল"—এ প্রতিজ্ঞা অসমীচীন। তাহার পর একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আরবী ভাষায় 'জবহ' শব্দ জবাই ব্যতীত অন্য উপায়ে নিহত করাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (জওহরী, তাজ,

মাওয়ারেদ)। কোর্‌আনের অন্যত্র (৭—১৪১) 'জবহ' স্থলে 'কতল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬২ **ফের্‌আওনের উপাখ্যান** ঃ—

অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের তফছিরের রাবীগণ তাওরাত, তালমূদ ও দেশ প্রচলিত কিংবদন্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বানি-এছরাইলের উদ্ধার ও ফের্‌আওনের ডুবিয়া মরা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি গল্পগুজবকে কোর্‌আনের তফছিরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন—কোর্‌আন ও হাদিছে যাহার কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং যুক্তি, ইতিহাস ও মানুষের সাধারণ জ্ঞান যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। আজকাল আমাদের আলেম সমাজের মধ্যে অনেকেই এই শ্রেণীর তফছিরকে কোর্‌আন বলিয়া দুন্‌য়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছেন এবং দুন্‌য়ার লোক তাহাতে বিশ্বাস করিয়া কোর্‌আনকে অমান্য করিতে বাধ্য হইতেছে। এই কারণে আমরা এখানে বিষয়টীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইতে চাই যে, ঐ শ্রেণীর আজগৈবী গল্পগুজবগুলির সহিত কোর্‌আনের কোন সম্বন্ধ নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে রাবীগণের বর্ণিত এই কেচ্ছাটী সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"দাদা আদম আল্লার হুকুমে যখন বেহেশ্‌ত হইতে জমিনে নিক্ষিপ্ত হন, তখন দুন্‌য়ায় সংসার যাত্রার সুবিধার জন্য এই বিপদের সময়ও তিনি সেখান হইতে কতকগুলি গৃহস্থালী জিনিষপত্র বহিয়া আনিতে বিস্মৃত হন নাই। তাহারই মধ্যকার একটা জিনিষ হইতেছে—হজরত মূছার 'আছা'। বেহেশ্‌তে 'আছ' নামে এক বৃক্ষ আছে। হজরত আদম ভূ-পতিত হওয়ার সময় তাড়াতাড়ি তাহার একখানা ডাল ভাঙ্গিয়া আনেন। তাহাই হইতেছে হজরত মূছার বহু মো'জেজার উপলক্ষ বিশ্ববিখ্যাত 'আছা'। উহার কয় মুখ, কয় চোখ, তাহাও ইঁহারা গণিয়া গাঁথিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

"বানি-এছরাইলকে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া হজরত মূছা লোহিত সাগরের (মতান্তরে নীল দরিয়ার) উপকূলে আসিয়া নিরুপায় হইয়া পড়িলে, আল্লাহ তাঁহার নিকট 'অহি' প্রেরণ করিলেন—'তুমি সমুদ্রে ঐ লাঠির আঘাত কর।' আল্লার 'অহি', পয়গম্বরের হস্তাস্থিত বেহেশ্‌তী 'আছা'র আঘাত। কিন্তু সমুদ্র তবুও তাঁহার হুকুম মানিল না। দ্বিতীয় বার দোওয়া করার পর আল্লাহ বলিয়া দিলেন—'সমুদ্রকে তাহার 'কুন্নিয়ৎ' ধরিয়া ডাক।' তখন হজরত মূছা 'আয় আবা খালেদ!' বলিয়া সমুদ্রে লাঠির আঘাত করা মাত্র বানি-এছরাইলের বার গোত্রের জন্য সমুদ্রে বারটী প্রশস্ত রাস্তা হইয়া গেল। বাতাস ও রৌদ্র অবিলম্বে সাগর-গর্ভকে শুকাইয়া দিল। আর লোহিত-সাগরের এক তীর হইতে অন্য তীর পর্য্যন্ত এই যে বহু মাইল দীর্ঘ বারটা সুপ্রশস্ত পথ হইয়া গেল, সেই পথ প্রস্তত হইতে যে অগাধ জলরাশিকে স্বস্থান হইতে অপসৃত করিতে হইয়াছিল—তাহা উচ্চ পর্ব্বতমালার মত সাগর জল-তল হইতে

উর্দ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল। পথের দুই পাশে এই যে পানির প্রাচীর, তাহার মধ্যে জানালা ও খিড়কী হইয়া গেল,—এক দল অন্য দলকে না দেখিয়া পাছে ঘাবরাইয়া যায়! হজরত মূছা ৬ লক্ষ ৪০ সহস্র বানি-এছরাইলকে সঙ্গে লইয়া শেষ রাত্রে কেনানের দিকে যাত্রা করিলেন। ২০ বৎসর বা তন্নিম্ন বয়স্ক ও ৬০ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক লোককে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

"হজরত মূছা ত এই কম বেশী বার লাখ লোক লইয়া পার হইয়া গেলেন। কিন্তু ফেরআওন আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কে মূছার অনুসরণ করার সাহস করিতে পারে? সে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। কিন্তু আল্লার মর্জ্জি ছিল ফেরআওনকে হালাক করার। তাই এই অবস্থায় হজরত জিব্রাইল একটী ঘোটকী সহ সমুদ্রে নামিলেন, আর ফেরআওনের দশ লাখ সেনার ঘোড়াও ঐ ঘোটকী দর্শনে কামমত্ত হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িল। অমনি সমুদ্রের পানি মিলিত হইয়া গেল, আর ফেরআওন তাহার সমস্ত লোক লশ্‌কর সহ ডুবিয়া হালাক হইয়া গেল।"

এই গল্পটীর মূল্য কতটুকু, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সূক্ষ্মশাস্ত্রীয় বিচারের পরীক্ষায় ইহা টিকিতে পারে কি না, এখন আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই জন্য পাঠকগণের সুবিধার জন্য মূল বিচার্য্য ইস্যুগুলি স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়া দিতেছি ঃ—

(১) মিসর একটা বিশাল সাম্রাজ্য। এহুদীরা সেই সাম্রাজ্যের কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিল? পলায়নের সময় তাহাদিগকে লইয়া হজরত মূছা কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন?

(২) হজরত মূছা পলায়ন করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন?

(৩) এই যাত্রা স্থল হইতে তাঁহার গম্যস্থানে যাইতে হইলে কোন্ পথ অপেক্ষাকৃত সোজা ও নিরাপদ?

(৪) সেই পথের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল? অর্থাৎ ভূমধ্য সাগরের এশিয়াটিক উপকূল হইতে লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগের ভৌগলিক অবস্থা তখন কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমানেই বা কিরূপ আছে?

(৫) হজরত মূছা, চান্দ্রমাসের কোন্ তিথিতে কোন্ সময় "মিসর" হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, বিশ্বস্ত ভাবে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব কি না? সম্ভব হইলে তাহার সহিত সাগর জলের হ্রাস বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক কি না?

(৬) কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এহুদীদিগের পলায়ন ও ফেরআওনের ডুবিয়া মরা সম্বন্ধে যে সব বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা কোন অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য গল্পগুজব সপ্রমাণ হয় কি না?

প্রথম প্রশ্নের বিচার :—

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে মিসরের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্য জগতে যে অবিরাম উদ্যম চলিয়া আসিয়াছে, এবং বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দিক দিয়া এ সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—সে সমস্তের সমবেত সাক্ষ্য এই যে, হজরত য়্যাকুবের সময়কার প্রথম মিসর প্রবাস হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত মূছার সময়কার পলায়ন পর্য্যন্ত, এহুদীরা গোশেন (Goshen) নামক ভূভাগে অবস্থান করিতে থাকে। গোশেন ও তাহার সংলগ্ন ভূভাগকে বাইবেলে হিরোপোলিস, (Land of Rameses) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা দৃঢ়তার সহিত ইহাও বলিতেছেন যে, "The land of Rameses must be in Wadi Tumilat near the line of the modern fresh water canal." অর্থাৎ—"এই 'রামসেস-ভূভাগ'টা নিশ্চয়ই তুমিলাত প্রান্তরে—তাজা পানির আধুনিক খালের লাইনের সন্নিকটে অবস্থিত।" ওয়াদি-তুমিলাতের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বলিতেছেন—"The fertile Wadi Tumilat extending east of the Nile valley almost to the head of the Gulf." অর্থাৎ—"উর্ব্বর ওয়াদী তুমিলাত নীল উপত্যকার পূর্ব্বে বিস্তারিত হইয়া (স্যুয়েজ-) উপসাগরের প্রায় মোহনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।"

এখন আমাদের প্রদত্ত ১নং মানচিত্রের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, এহুদীগণ সে সময় লোহিত সাগরের উপকূল ভূমিতে অবস্থান করিতেছিল না। বরং স্যুয়েজ উপসাগরের উত্তর প্রান্ত হইতে অন্ততঃ ৫০ মাইল উত্তরের এক উর্ব্বর ভূভাগে তাহাদের স্থায়ী অধিবাস ছিল। এখান হইতে যাত্রা করিয়া কেনআনে যাইতে হইলে লোহিত সাগর পার হওয়ার কোন কারণ বা দরকার হইতে পারে না। লোহিত সাগর পার হইতে গেলে তাহাদিগকে বিনা কারণে শতাধিক মাইল দক্ষিণে চলিয়া আসিতে হইত। তাহার পর এই লক্ষ লক্ষ লোককে লইয়া বিশাল লোহিত সাগর পার হইবার বিপদ, আবার সেখান হইতে এক শত মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিবাহন করিয়া কেনআনের পথে আসিয়া উঠা—বিনা কারণে, বিনা দরকারে এই পণ্ডশ্রম এহুদীরা স্বীকার করিতে যাইবে কেন? বিশেষতঃ তাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত ফেরাওনের অত্যাচার হইতে গোপনে পলাইয়া যাইতেছিল, এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল। এ অবস্থায় গন্তব্য স্থানের সোজা পথ পরিত্যাগ করিয়া এহুদী-দিগের পক্ষে লোহিত সাগর পার হওয়ার ঝকমারি করিতে যাওয়া, কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

পূর্ব্বের বর্ণনায় ইহাও জানা যাইতেছে যে, এহুদীগণ নীল নদীর পূর্ব্ব উপকূলের ওয়াদী-তুমিলাতে বাস করিত। সুতরাং পলায়নের সময় নীল দরিয়া পার হওয়ার কোন কারণ বা

সম্ভাবনাই যে তাহাদের ছিল না, এ কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু তবুও আমাদের একদল লেখক, নীল দরিয়ায় ডুবিয়া মরার গল্পকেই সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন! এই ভ্রমের মূলীভূত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যাইবে যে, মিসরের কোন এক রাজা কোন এক সময় নীল নদে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন—এ কথা সত্য। ফের্‌-আওনও মিসরের রাজা এবং সেও ডুবিয়া মরিয়াছিল। অসতর্ক লেখকেরা এই দুই ঘটনাকে একত্রে মিলাইয়া, মিসর-রাজ ফের্‌আওন নীল নদে ডুবিয়া মরিয়াছিল—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, নীল নদে যে মিসর-রাজ ডুবিয়া মরিয়াছিলেন—তাঁহার নাম দারেম, এবং তাহা হইতেছে হজরত ইউছফের সময়ের, অর্থাৎ হজরত মূছার প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বকার ঘটনা। (দেখ—বোল্‌দান ৮—১৩)। সুখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত সতর্ক তফছিরকারেরা নীল নদের কথাকে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচার :—

হজরত মূছা বানি-এছরাইলদিগকে লইয়া নিজেদের পৈতৃক আবাস ভূমি শাম দেশে গমন করিতেছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। শাম দেশের এই পবিত্র ভূভাগ (الارض المقدسة) তাঁহাদিগকে দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ তাআলা হজরত মূছাকে ওয়াদা করিয়াছিলেন। কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়ত হইতে এ কথা স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে, এবং ইহাই স্বাভাবিক। কারণ ফিলিস্তিন, এহুদা ও কেন্‌আন অঞ্চল তখনও এছরাইল বংশীয়দিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। অপর পক্ষও স্বীকার করিতেছেন যে, "হজরত মূছা বানি-এছরাইল সহ কেনানের দিকে রওনা হইলেন।"

এই দুই প্রশ্নের আলোচনায় আমরা বুঝিলাম যে, হজরত মূছা মিসর হইতে রওয়ানা হইলেন, এবং তাঁহার গম্য ও লক্ষ্য ছিল কেন্‌আন প্রদেশ।

তৃতীয় প্রশ্নের বিচার :—

তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা খুবই সহজ। এ জন্য আমরা মিসর হইতে দেমশক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ভূভাগের একখানা প্রাচীন মানচিত্রের নকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সুয়েজ খাল খনন করার পর ঐ অঞ্চলের ভূভাগের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহারও একখানা মানচিত্র প্রদান করিতেছি।

কোর্‌আন, হাদিছ প্রভৃতি একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, হজরত মূছা পার হইয়া 'তীহ' নামক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথ হারাইয়া এই খানেই তাঁহারা বহু আপদ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তফছিরকারগণ সকলে একবাক্যে ইহা স্বীকার করিতেছেন।

হজরত মূছা বানি-এছরাইলকে লইয়া 'তিমসাহ' হ্রদের পশ্চিম পার সংলগ্ন ওয়াদী-তুমিলাতের অন্তর্ভুক্ত গোশেন নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং কেন্‌আন

১নং মানচিত্র

গোশেন-প্রদেশ

২নং মানচিত্র।

মিছর হইতে কৈনান

৩নং মানচিত্র।

সুয়েজ খাল খননের পর, ঐ অঞ্চলের অবস্থা
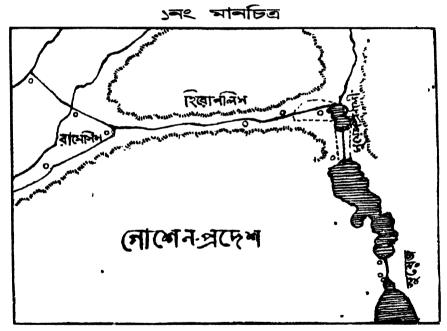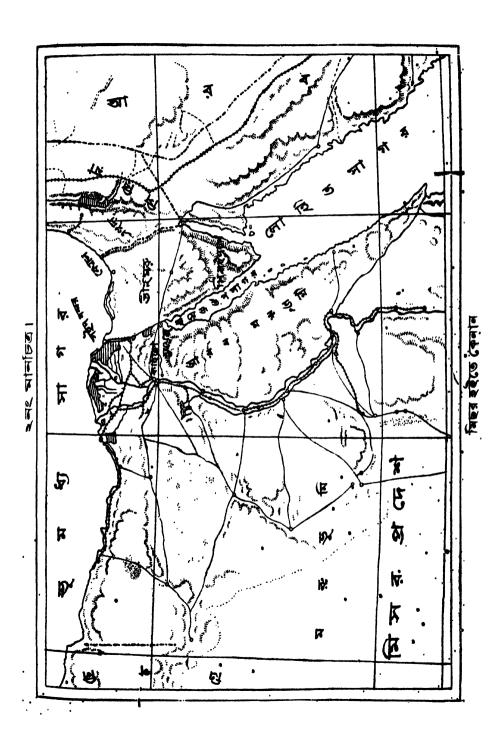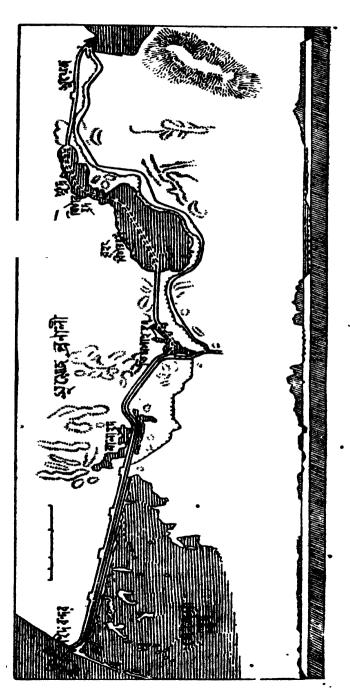
অঞ্চলে গমন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই যাত্রা পথে তাঁহারা 'তীহ' প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এ সমস্ত কথা আমরা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিতেছি। পাঠকগণ এখন মানচিত্র খুলিয়া মিসরের ওয়াদী-তুমিলাত হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে তিমসা হ্রদ ও তীহ মরুপ্রান্তরের উপর দিয়া ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত ফিলিস্তিন প্রদেশের এহুদা (Judah) কেন্‌আন (Canan) পর্য্যন্ত একটা সংক্ষিপ্ততর রেখা টানিয়া নিজেরাই হজরত মূছার যাত্রাপথ নির্দ্ধারণ করিয়া লউন। তাহা হইলে সহজে ধরা পড়িবে যে, হজরত মূছা বানি-এছরাইলকে লইয়া লোহিত সাগর আদৌ পার হন নাই—বরং তাহার বহু মাইল উত্তর হইতে তাঁহারা মিসরের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, এবং ইহাই হইতেছে তাঁহাদের পক্ষে সোজা, সহজ ও স্বাভাবিক পথ।

হজরত মূছা বানি-এছরাইলকে লইয়া Red Sea বা লোহিত সাগর পার হইয়া গিয়াছিলেন,—বাইবেলের বাজার প্রচলিত মূসাবিদায় এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে। আমাদের মতে এই বিবরণই সমস্ত অনর্থের মূল। সেই জন্য এ সম্বন্ধেও দুই একটা কথা বলিয়া রাখিতে হইতেছে।

আমরা আজ যে শব্দের অনুবাদ করিতেছি Red Sea বা লোহিত সাগর বলিয়া, মূল এবরানী তাওরাতে সেখানে يم صوف —Yam Suph—শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 'য়্যাম' শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে Sea বা সমুদ্র বলিয়া। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "এবরানী ভাষায় বিশেষ করিয়া এই শব্দটী Lake বা হ্রদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" বাইব্লিকা বিশ্বকোষের লেখক এই মন্তব্য প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল হইতে তাহার নজীরও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

Yam Suph শব্দের অর্থ—'Sea' of the water plant—Suph,—জলজাত সুফ, Reed বা নল-খাগড়া যে 'সাগরে' উৎপন্ন হয়—সেই সাগর। আমরা যাহাকে এখন Red Sea বা লোহিত সাগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি—"তাহার লোনা জলে এই শ্রেণীর জলজাত গাছগাছড়া যে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত।" এই মন্তব্য প্রকাশের পর উক্ত বিশ্বকোষের লেখক মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে,—"The freshwater Timsah Lake with its large marshes full of reeds, exactly at the entrance of Goshen, would fulfil all conditions for the Exodus and for the Hebrew name." অর্থাৎ—"গোশেনের ঠিক প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত টাটকা জলরাশি সমন্বিত ও reed বা নল-খাগড়াপূর্ণ তিমসাহ হ্রদ ও তাহার বৃহৎ জলাভূমিগুলি এহুদীদিগের পলায়নপথেরও এই ('য়্যাম সুফ') এবরানী নামের সমস্ত শর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে।"

ফলতঃ আমরা দেখিতেছি যে,—(১) মূল এবরানী বাইবেলে ব্যবহৃত 'য়্যাম সুফ' পদের প্রকৃত অর্থ—'নল-খাগড়াপূর্ণ হ্রদ।' লোহিত সাগর বলিয়া উহার অনুবাদ করা কখনই

সঙ্গত হইতে পারে না। (২) লোহিত সাগরের লোনা জলে এই প্রকার নল-খাগড়া জন্মায় না—জন্মান সম্ভবপরও নহে। (৩) পক্ষান্তরে বানি-এছরাইলের অবস্থান স্থল গোশেন অঞ্চলের সহিত মিলিত 'তিমসাহ' হ্রদ ঐ প্রকার reed বা নল-খাগড়ায় পরিপূর্ণ। মানচিত্র অনুসন্ধান করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, এই 'তিমসাহ' হ্রদ, সুয়েজ বা লোহিত সাগরের শেষ প্রান্ত হইতেও অন্ততঃ ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নল-খাগড়া হ্রদ বা Reed Lakeকে Red Sea বা লোহিত সাগরে পরিণত করাতেই আসল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। বানি-এছরাইলগণ এই Yam Suph—নল-খাগড়া হ্রদ অর্থাৎ 'তিমসাহ' হ্রদের সংলগ্ন গোশেন অঞ্চলে বাস করিত। সেখান হইতে পলায়নের সময় এই হ্রদের কোন বেলা বা তৎসংলগ্ন কোন marsh বা জলাভূমি—তাহারা পার হইয়া গিয়াছিল—মূল বাইবেল-লেখকেরও উদ্দেশ্য তাহাই। পরবর্ত্তী অনুবাদকদের হাতে পড়িয়া সেই 'নল-খাগড়াপূর্ণ হ্রদ' বিশাল লোহিত সাগরে পরিণত হইয়া গিয়াছে!

চতুর্থ প্রশ্নের বিচার ঃ—

সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ তীর হইতে সুয়েজ প্রণালীর উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানটী একটী শুষ্ক জলশূন্য ভূভাগ। এই সম্পূর্ণ ভূভাগ ব্যাপিয়া সুয়েজ খাল খনন করিয়া লোহিত সাগরকে ভূমধ্য সাগরের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অপ্রকৃত ধারণা। এই দুই সাগরের মধ্যস্থিত ভূভাগটী বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ হ্রদমালা, বেলাভূমি ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং এখনও আছে। অবশ্য খাল কাটার জন্য অপ্রশস্ত জলাভূমিগুলি শুকাইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। মানচিত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পাঠকগণ এই জলাশয়গুলির অবস্থা জানিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এইজন্য বহু স্থানে খাল খনন করার মোটেই দরকার হয় নাই, অথবা কেবল বালি ও কাদা সরাইয়া কাজ শেষ করা হইয়াছিল।

ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই হ্রদগুলিতে ও তৎসংলগ্ন জলাভূমিগুলিতে একই সময় দুই দিক হইতে প্রবল বেগে জোয়ারের জল প্রবেশ করে, এবং সেগুলিকে প্লাবিত ও উদ্বেলিত করিয়া ফেলে। এই সময় হ্রদের উপকূলে ও জলাভূমির মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিগুলিও জোয়ারের পানিতে ডুবিয়া যায়। পক্ষান্তরে ভাটার সময় দুই দিক হইতে পানি সরিতে আরম্ভ হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে জোয়ারের পানি বাহির হইয়া যায় এবং ঐ উপকূল ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানগুলি চড়া বা চরের মত জাগিয়া উঠে। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের নবমী-দশমী হইতে দ্বাদশী-ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত জোয়ারের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং এই সময় জলের পরিমাণও অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই একাদশী-দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী তিথিতেই জোয়ারের সাগরজলে বান—Bore—ডাকিয়া তৎসংলগ্ন নদী, হ্রদ ও বেলাভূমির দিকে প্রবল বেগে ছুটিয়া যাইতে

থাকে। বানের সময় সাগর জল স্ফীত হইয়া কএক হাত উচ্চ হইয়া নক্ষত্র গতিতে ছুটিয়া আসিতে থাকে।

পঞ্চম প্রশ্নের বিচার ঃ—

হজরত মূছা বানি-এছরাইলদিগকে লইয়া চান্দ্রমাসের কোন তিথিতে রওয়ানা হইয়াছিলেন—একটী হাদিছেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। বোখারী, মোছলেম ও আবু দাউদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"হজরত মদিনায় আসিয়া দেখিলেন, এহুদীরা 'আশুরার' রোজা রাখিতেছে। হজরত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এহুদীরা উত্তর করিল—ইহা একটা শুভদিন, এই দিন আল্লাহ তাআলা মূছাকে ও বানি-এছরাইলকে তাহাদের শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, চান্দ্রমাসের ১০ই তারিখে বানি-এছরাইলগণ ফেরূআওনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে চান্দ্রমাসের ১০ই তারিখে দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী তিথি হইয়া থাকে, এক প্রহর পর্য্যন্ত একাদশী থাকারই অধিক সম্ভাবনা।

হজরত মূছা রাত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন, فاسر بعبادي আয়ত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তফছিরকারগণও স্বীকার করিতেছেন যে, রাত্রে উৎসবের আয়োজনের জন্য মিসরীয়রা ময়দানে সমবেত হইয়াছিল, সেই ময়দান হইতেই বানি-এছরাইল মূছার সঙ্গে সরিয়া পড়ে। এই প্রমাণগুলির দ্বারা যাত্রার তিথি ও সময় নির্দ্ধারিত হইয়া যাইতেছে।

উপরে বর্ণিত পাঁচটী প্রশ্নের আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পলায়নের সময় 'তীহ' প্রান্তরের সংলগ্ন কোন জলা বা বেলাভূমি পার হইয়া ঐ প্রান্তরে উপনীত হওয়াই হজরত মূছার পক্ষে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। লোহিত সাগরের তীরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অধিকন্তু যে স্থান দিয়া হজরত মূছা পার হইয়াছিলেন—সেখানে জোয়ারের জল হঠাৎ বাড়িয়া চর ও বেলাভূমিগুলিকে ডুবাইয়া ফেলা এবং ভাটার সময় হঠাৎ তাহার জল বাড়িয়া যাওয়া সাধারণ নিয়ম। ফেরূআওন যে দিন ও যে সময় অতিক্রম করিতেছিল, ঠিক সেই দিন ও সেই সময় জোয়ার আসা ও বান ডাকাও প্রকৃতির সাধারণ ও চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা।

সুতরাং ভাটার সময় বানি-এছরাইলের পক্ষে ঐ marsh বা জলাভূমি পার হইয়া যাওয়া, আর জোয়ারের সময় ও বান ডাকিয়া ফেরূআওনের ডুবিয়া মরা একটুও অস্বাভাবিক বা অসংলগ্ন নহে। কোরআনের বর্ণনাও ইহার সমর্থন করিতেছে।

ষষ্ঠ প্রশ্নের বিচার ঃ—

এখানে অনেকে হয় ত অধৈর্য্য হইয়া বলিবেন, তোমাদের এই সব যুক্তি-প্রমাণ অন্য দিক দিয়া যতই সঙ্গত হউক না কেন—উহা কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা তাঁহাদের অসঙ্গত ধারণা। তফছিরকারগণের

বর্ণনা তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর এমন মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে যে, কোর্‌আনের আয়তগুলির এবং তাহাতে বর্ণিত আয়ত সমূহের নিরপেক্ষ বিচার এখন আর তাঁহারা যেন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহাতেই যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা কোর্‌আনের বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুকূল, আর অন্যপক্ষের বর্ণিত কাহিনীগুলি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা মনগড়া সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নে আমরা একে একে এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রতিপক্ষের প্রথম প্রমাণ :—

অপর পক্ষ বলিবেন—কোর্‌আনে বলা হইতেছে যে, ফের্‌আওন বহরে— بحر —ডুবিয়া মরিয়াছিল। বহর অর্থে সমুদ্র—সুতরাং ফের্‌আওন যে সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত।

আমাদের মতে গোড়ার ভুল এইখানে। 'বহর' শব্দের একটা অর্থ সমুদ্র, একমাত্র অর্থ নহে। কোর্‌আনের পাঠক মাত্রের জানা আছে যে, বানি-এছরাইল যে স্থান হইতে পার হইয়া গিয়াছিল এবং ফের্‌আওন যে স্থানে ডুবিয়া মরিয়াছিল, তাহার জন্য কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে 'বহর' ও 'য়্যাম'— بحر و يم —এই উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুরা 'আরাফে' বর্ণিত হইয়াছে— فاغرقناهم في اليم অর্থাৎ— 'অতঃপর তাহাদিগকে আমরা য়্যামে ডুবাইয়া মারিলাম।' এই দুইটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সহজে এ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। 'বহর' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অভিধানকারেরা লিখিতেছেন :—

البحر الماء الكثير او الملح فقط - قاموس -

البحر خلاف البر يقال يسمي لعمقه و اتساعه . و كل نهر عظيم بحر - جوهري -

البحر خلاف البر - الماء الملح - كل نهر عظيم - كل متوسع في الشيء - موارد -

اصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير ' هذا هو الاصل .. سموا كل متوسع في شيء بحرا حتى قالوا فرس بحر ... و للمتوسع في علم بحرا ... و اعتبر من البحر تارة ملوحته - راغب -

অতএব অভিধান হইতে জানা যাইতেছে যে—

(১) যে স্থানে অধিক পরিমাণে জলরাশি সঞ্চিত থাকে—তাহাকে 'বহর' বলা হয়।

(২) লবণাম্বু রাশিকেও 'বহর' বলা হয়।

(৩) যে কোন বড় নদীকেও 'বহর' বলা হয়। —ইত্যাদি।

সুতরাং 'বহরের' একমাত্র অর্থ যে সমুদ্র নহে, ইহা বেশ সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে। অধিকন্তু আমাদের নির্দ্ধারিত স্থানের হ্রদ ও বিশাল জলাভূমিগুলিও 'বহর' পদবাচ্য হইতে পারে।

'য়্যাম' শব্দের অর্থ এইরূপ বর্ণিত হইতেছে—

و اليم البحر و الساحل غلبه البحر فطمى عليه - موارد -

'য়্যাম' অর্থে সাগর, অথবা সেই উপকূলভূমি—সাগর জল উদ্বেলিত হইয়া যাহাকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। (মাওয়ারেদ)। এবরানীতেও 'য়্যাম' শব্দ যে Lake বা হ্রদ অর্থে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, কোর্‌আনে যে 'বহর' ও 'য়্যামে' ফের্‌আওনের ডুবিয়া মরার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে বৃহৎ জলাশয়, হ্রদ বা বেলাভূমি অর্থেও আরবী ও এবরানী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও বলিতেছি ফের্‌আওন 'তিম্‌সাহ' হ্রদ বা তাহার বেলাভূমির প্লাবনে ডুবিয়া মরিয়াছিল। ফলতঃ আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা কোর্‌আনের বর্ণনার প্রতিকূল কখনই নহে। (১)

প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় প্রমাণ :—

কোর্‌আনের আর একটী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে—

و اذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون -

অর্থাৎ—"আর (স্মরণ করিয়া দেখ) আমরা যখন তোমাদের জন্য 'বহর'কে বিভক্ত করিয়াছিলাম—সে মতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম ও ফের্‌আওনের স্বজনগণকে ডুবাইয়া মারিলাম—আর তোমরা ইহা দেখিতেছিলে।"

এখানে একমাত্র আলোচ্য হইতেছে—'ফরাক্‌না' শব্দ। ইহার ধাতু 'ফরক' অর্থে—বিভিন্ন করিয়া দেওয়া—'এন্‌ফেছাল'।—দুইটী সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে ভিন্ন জাতীয় কোন পদার্থকে স্থাপন করিয়া ঐ সমজাতীয় পদার্থ দুইটীকে পরস্পর হইতে পৃথক করা। এই তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সকলে একমত। সুতরাং ইহা লইয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না।

তফছিরের রাবীগণ বলিতেছেন—বানি-এছরাইল পার হওয়ার সময় সাগরজল বার ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে বারটা রাস্তা হইয়া যায়,—বিভক্ত করার অর্থ ইহাই। আমরা ইহা স্বীকার করি না। কারণ—ইহার কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ অপর পক্ষ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এরূপ অসাধারণ ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হইলে বিশ্বস্ততম ও দৃঢ়তম প্রমাণের আবশ্যক।

পক্ষান্তরে আমরা বলিতে চাই—জোয়ারের জল সরিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের পার্শ্বস্থ এবং জলাভূমির মধ্যস্থ বেলাভূমি ও অপেক্ষাকৃত উঁচু চর ও চড়াগুলি জাগিয়া উঠিতে থাকে। দুই পার্শ্বে জল মধ্যে চড়া ও চরভূমি, এইরূপে অম্বুরাশী বিভক্ত হইয়া পড়ে।

(১) উপরে Egyptology সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য বৃটানিকা ও বাইব্লিকা বিশ্বকোষ—Egypt, Rameses, Exodus, Goshen, Suez, Red Sea, Moses প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং বাইবেলের আধুনিক ভাষ্যগুলি দ্রষ্টব্য।

ভাটার সময় হজরত মূছা এই পথ দিয়া পার হইয়া যান, এবং জোয়ারের সময় ও বান ডাকিয়া ফের্‌আওনের লোকজন এই পথে ডুবিয়া মরে। আলোচ্য স্থানটীর ভৌগলিক অবস্থান, 'য়্যাম' শব্দের তাৎপর্য্য ও অন্যান্য সমস্ত প্রমাণ ইহার অনুকূল, কোর্‌আনের অন্যান্য আয়তের তাৎপর্য্যও এই ব্যাখ্যারই সমর্থন করিতেছে। সেগুলির তাৎপর্য্যের বিচার শেষ হইয়া গেলে কোর্‌আনের এই সমর্থন স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইয়া যাইবে।

প্রতিপক্ষের তৃতীয় প্রমাণের বিচার :—

কোর্‌আনের 'শোআরা' ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে—

فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر ' فكان كل فرق كالطود العظيم

অন্য পক্ষের অনুবাদ—"তখন আমরা মূছার নিকট 'অহি' প্রেরণ করিলাম যে, তুমি নিজ **লাঠির দ্বারা** সমুদ্রকে **প্রহার** (বা আঘাত) কর, তাহাতে সমুদ্র **ফাটিয়া গেল**, ফলে (পানির) প্রত্যেক টুকরা এক একটা বৃহৎ **পর্ব্বতের ন্যায়** হইয়া গেল।"

আমরা ইহার অনুবাদ করি :—

"আমরা তখন মূছাকে প্রত্যাদেশ করিলাম যে, তুমি নিজের **মণ্ডলী সহ** উপকূল ভূমি **অতিবাহন করিয়া** যাও। তখন (চড়াভূমিগুলি) প্রকট হইয়া উঠিল, এবং তাহাতে প্রত্যেক চড়াটী **বালুকা স্তূপের** মত (পরিদৃশ্যমান) হইতে লাগিল।"

পাঠক, দেখিতেছেন—এই দুই অনুবাদে আদৌ কোন মিল নাই। আমাদের এই অনুবাদ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে সমস্ত সমস্যার সমাধান যে এইখানে হইয়া যায়, সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের তাৎপর্য্যই যে সঙ্গত, ইহা প্রমাণ করার জন্য আমরা আয়তের তর্কীভূত শব্দগুলি লইয়া যথাক্রমে নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

(১) 'জরবুন' ضرب :—

ইহার অর্থ যেমন প্রহার করা ও আঘাত করা হয়, ঠিক সেইরূপ—পর্য্যটন করা, ছফর করা, পথ অতিবাহন করাও ইহার অর্থ হইয়া থাকে। সমস্ত অভিধান একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। আরবী সাহিত্য ইহার নজিরে পরিপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ কোর্‌আনের বহু স্থানেও এই 'জরবুন' শব্দ ছফর করা ও পথ পর্য্যটন করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখানে এক দল লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, 'জর্ব্ব' শব্দের অর্থ ছফর করা, ও পথ পর্য্যটন করা উভয় হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য ঐ শব্দের পরে 'ফি' 'ছেলা' থাকা চাই। উহার পর 'ফি' বর্ণিত না হইলে 'জর্ব্ব' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমাদের মতে ইহা তাঁহাদের প্রমাণহীন বরং প্রমাণের বিপরীত অন্যায় সিদ্ধান্ত। 'লেছানুল আরব' ও 'তাজুল্ ওরুছ' প্রভৃতির ন্যায় প্রামাণ্য অভিধান সমূহে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ضربت الارض ও ضربت في الارض একই অর্থবাচক, 'ফি' থাকা না থাকাতে উহার অর্থের

কোনই ইতর বিশেষ হয় না। প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা আরবী ভাষায় নজির উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন— ضربت له الارض كلها فلم اجده অর্থাৎ—'আমি তাহার জন্য সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ফেলিলাম, তবুও তাহাকে পাইলাম না।' এখানে 'জর্ব্ব' শব্দের পর 'ফি' নাই—অথচ উহার অর্থ পর্য্যটন করা। 'ফি' না থাকিলেই যদি প্রহার বা আঘাত করা অর্থ হয়—তাহা হইলে এখানে উদ্ধৃত পদের তাৎপর্য্য দাঁড়াইবে :—"আমি তাহার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে প্রহার করিলাম, তবুও তাহাকে পাইলাম না।" কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই বোধ হয় এ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।।

হাদিছেও فاضربوا مشارق الارض الخ বর্ণিত হইয়াছে। 'মজমাউল বেহারের' গ্রন্থকার লিখিতেছেন— اي سيروا فيها كلها এখানে 'ফি' নাই, অথচ উহার অর্থ ভ্রমণ করা, পর্য্যটন করা।

(২) আছা عصا , বে :—

'বে' অর্থে—সঙ্গে, সমভিব্যাহারে, দ্বারা, জন্য ইত্যাদি সমস্তই হয়। (১)

'আছা' শব্দের দুইটী অর্থ সাধারণ ভাবে প্রচলিত। প্রথম—লাঠি। অপর পক্ষ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়—জমাআৎ, সঙ্ঘ, মণ্ডলী, দলবল। আরবী ভাষায় 'আছা' শব্দ এই অর্থে সাধারণ ভাবে প্রচলিত আছে। আরবীর যে কোন অভিধানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারিবে। জওহরী নজির দিতেছেন—

اذا كانت الهيجاء و انشقت العصا
فحسبك و الضحاك سيف مهند

(দেখ—লেছান, লেন, রাগেব, মেছবাহ, জওহরী প্রভৃতি)। হাদিছেও 'আছা' শব্দ জমাআৎ ও সঙ্ঘ অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে :—

(١) من شق العصا اي فارق الجماعة - (٢) اياك و قتيل العصا اي اياك ان تكون قاتلا او مقتولا في شق عصا المسلمين - (٣) ان الخوارج شقوا عصا المسلمين اي فرقوا جماعتهم - مجمع البحار -

এই সমস্ত স্থানে জমাআৎ, মণ্ডলী ও দল অর্থে 'আছা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং اضرب بعصاك البحر পদের অর্থ দাঁড়াইতেছে—'হে মূছা! তুমি নিজ মণ্ডলী সহ জলাশয় অতিবাহন করিয়া যাও।'

(১) অতঃপর এই ঘটনা উপলক্ষে বর্ণিত ছুরা 'শোআরা'র আয়তটী ইহার একটী অকাট্য প্রমাণ। সেখানেও হজরত মূছাকে বলা হইতেছে— اسر بعبادي অর্থাৎ—আমার বান্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে পলায়ন কর। ;"আমার বান্দাদিগের দ্বারা পলায়ন কর"—এরূপ অনুবাদ কেহই করেন না। সুতরাং بعصاك শব্দের অর্থ—'তোমার লাঠির দ্বারা' না হইয়া 'তোমার মণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া'—এইরূপ হওয়াই সঙ্গত।

(৩) ফলক فلق , তওদ طود :—

'ফলকুন' শব্দের অর্থ—বিদীর্ণ হওয়া, ফাটিয়া যাওয়া, এক বিষয় বা বস্তুর মধ্য হইতে অন্য বিষয় বা বস্তু প্রকট হওয়া—দুই উচ্চ ভূমির মধ্যস্থ ঢালু জমি কিম্বা দুইটা বালুকা স্তূপের মধ্যকার সমতল ক্ষেত্রকেও 'ফলক' বলা হয়। (রাগেব, জওহরী, কামূছ)।

রাগেব লিখিতেছেন—

الفلق شق الشئ و ابانة بعضه عن بعض - يقال فلقته فانفلق -

অর্থাৎ—"কোন বস্তুকে বিদার্ণ করা ও তাহার এক অংশকে অন্য অংশ হইতে পৃথক করা বা প্রকাশ করা।" এখানে 'বাবে-এফতেআলে' 'এন্‌ফেলাক' মছদর সিদ্ধ হইয়াছে। 'এন্‌-ফেলাকে'র অর্থ— شگافتہ شدن বা প্রস্ফুট হওয়া।

'তওদ' শব্দও আরবী ভাষায় পর্ব্বত এবং বালুকাপূর্ণ উচ্চ ভূমি—এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (و الطود المشرف من الرمل قاموس - موارد)। অন্য পক্ষ প্রথম অর্থ গ্রহণ করিতেছেন—'পানি উর্দ্ধে উঠিয়া বড় বড় পর্ব্বতের ন্যায় আকার ধারণ করিল।' আমরা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিতেছি—'জলাশয়ের মধ্য হইতে চরগুলি প্রকাশ-মান হইয়া উঠিল, ইহাতে উহার প্রত্যেক অংশটী এক একটা বৃহৎ বালুকা স্তূপের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল।' জল অপসৃত হওয়ায় মধ্যকার উচ্চ ভূমি বা চরগুলি জাগিয়া বালুকা স্তূপের মত প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং ইহা গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে জলাশয়ের জল এক একটা পর্ব্বতের মত হইয়া উর্দ্ধে অবস্থান করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক—অথচ কোর্‌আন, হাদিছের কোন প্রমাণ আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করে নাই—সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য।

এই আভিধানিক আলোচনার পর পাঠকগণ দুই পক্ষের দুইটা অনুবাদ এক সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন, এবং কোন্‌টী সরল, সহজ ও স্বাভাবিক নিজেরাই তাহার বিচার করুন :—

পূর্ব্বকার অনুবাদ—

তখন মূছাকে 'অহি' করিলাম যে, তুমি **লাঠির দ্বারা** সমুদ্রকে **প্রহার** কর! তাহাতে (সমুদ্র জল) ফাটিয়া গেল এবং তাহার এক একটা অংশ বৃহৎ **পর্ব্বতের** মত হইয়া উঠিল।

আমাদের অনুবাদ—

আমরা তখন মূছাকে প্রত্যাদেশ করিলাম—তুমি আপন **মণ্ডলী সহ** জলাশয় **অতিবাহন** করিয়া যাও! তখন জলরাশির এক অংশ অন্য অংশ হইতে (মধ্যস্থ চরভূমির দ্বারা) পৃথক হইয়া গেল, ইহাতে প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন (১) অংশটী বৃহৎ **বালুকাস্তূপের** মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

(১) الفرق - القطعة المنفصلة و منه الفرقة للجماعة المتفردة من الناس - راغب -

ছুরা 'তাহা'র নিম্নলিখিত আয়তে বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে ঃ—

ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا ' لا تخاف دركا و لا تخشى -

অনুবাদ—"এবং নিশ্চয় আমরা মূছাকে 'অহি' করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার বান্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিশিথকালে যাত্রা কর, তাহার পর তাহাদের জন্য জলাশয়ের মধ্যকার কোন একটা শুষ্কপথ অবলম্বন কর। ইহাতে তোমার ধৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না—(অন্য কোন) ভয়ের কারণও তোমার থাকিবে না।" (৭৭ আয়ত)।

এই আয়ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যাত্রার পূর্ব্বেই আল্লাহ তাআলা হজরত মূছাকে জলাভূমির মধ্যকার একটী **শুষ্কপথ** অবলম্বন করার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। এই পথ অবলম্বন করিলে ফেরূআওন কর্তৃক ধরা পড়িবার ভয় অথবা অন্য কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না, এ কথাও কোর্‌আনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোহিত সাগর অতিক্রম করিতে যাওয়া, আর শুষ্কপথ অবলম্বন করা—কখনই এক কথা নহে। পাঠক দেখিতেছেন —এখানে ضرب 'জর্ব্ব' ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছার' উল্লেখ নাই, সুতরাং অন্যান্য আয়তের ضرب 'জর্ব্ব' শব্দের অর্থ যে 'প্রহার করা' না হইয়া 'অতিবাহন করা' হইবে, এই আয়ত দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃ নির্দ্ধারিত হইয়া যাইতেছে। আল্লাহ বলিতেছেন—**একটী** পথের কথা, আর আমাদের কিংবদন্তি-সঙ্কলকেরা তাহাকে **দ্বাদশ** পথে পরিণত করিয়া দিতেছেন,—পাঠক, এখানে ইহাও লক্ষ্য করিবেন।

ষষ্ঠ দফার শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে, ফেরূআওন ও হজরত মূছার উপাখ্যান সম্বন্ধে কোর্‌আনের কোন আয়তে কোন অস্বাভাবিক আজগৈবী গল্পগুজবের অবতারণা করা হয় নাই। আলোচ্য আয়তের আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, আরবী সাহিত্য ও অভিধান তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে, এবং তাহাই সরল, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ। কোর্‌আন শরিফের সমস্ত আয়ত এবং সমস্ত ভৌগলিক প্রাকৃতিক ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ একবাক্যে তাহার সমর্থন করিতেছে।

একটী প্রশ্ন ঃ—

শিক্ষায় ও সভ্যতায় মিসরবাসী পার্থিব উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই সময় ফেরূআওনের ন্যায় এক বিরাট সম্রাজ্যের অধিপতি আর তাহার পাত্র মিত্র ও সেনা নায়কগণ লোহিত সাগরের উপকূলে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিল যে, লোহিত সাগরের অম্বুরাশি প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম কানুনকে অমান্য করিয়া পর্ব্বত আকারে আকাশে অবস্থান করিতেছে, সাগর জলের মধ্যে জানালা, দরজা ও বারটী রাস্তা হইয়া গিয়াছে, গভীর সাগর তলস্থ রাস্তাগুলি অবলীলাক্রমে শুকাইয়া গিয়াছে, আর মূছা বানি-এছরাইলকে লইয়া সেই পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন—তখন এই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে ফেরূআওনের ও তাহার

অমাত্যবর্গের মনে কি কোন ত্রাস ও আশঙ্কার উদ্রেক হয় নাই ? হজরত মূছা যে কোন অলৌকিক শক্তি বলে এই অঘটন সংঘটনে সমর্থ হইয়াছেন, এই সব ব্যাপার দেখিয়া অতি নিরেট মূর্খও এ কথা বুঝিতে পারিত। ফের্‌আওনের অমাত্যরা ইহা কি একটুও বুঝিতে পারেন নাই ? এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও ফের্‌আওন স্ববংশে নিধন প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সেই অম্বু প্রাচীর ও অম্বু পর্ব্বত বেষ্টিত কবর গহ্বরে প্রবেশ করিতে গেল কেন ? এরূপ কথা ত পাগলেও কল্পনা করিতে পারে না।

কিংবদন্তি-সঙ্কলকেরা যে এই প্রশ্নটার বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই, এমন নহে। সেই জন্য তাল ঠিক রাখার জন্য তাঁহারা আর একটা অদ্ভূততর গল্প রচনা করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন ঃ—এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ফের্‌আওন যাহার পর নাই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, সাগর পথে প্রবেশ করার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। সে জন্য সে নিজের সমস্ত লোক লশ্‌করকে লইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু হইলে কি হয়, আল্লার ইচ্ছা ছিল—ফের্‌আওনকে ডুবাইয়া মারার। তাই অগত্যা তিনি জিব্রাইল ফেরেশ্‌তাকে এক মেয়ে ঘোড়ার পিঠে ছওয়ার করিয়া ফের্‌আওনের লশ্‌করের সম্মুখে পাঠাইয়া দিলেন। জিব্রাইল ঐ মেয়ে ঘোড়ার পিঠে ছওয়ার হইয়া সমুদ্রপথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি—ফের্‌আওনের দশ লাখ সৈন্যের সমস্ত ঘোড়াই ছিল মদ্দা !—একটী মেয়ে ঘোড়া সম্মুখে দেখিয়া এই দশ লাখ মদ্দা ঘোড়া কাম-উন্মত্ত হইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া সাগর পথে প্রবেশ করিল। ফের্‌আওনের লশ্‌কর তাহাদের ঘোড়াগুলিকে কোন মতেই রুকিতে পারিল না (ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া পড়িতেও পারিল না !) কাজেই সকলে ডুবিয়া হালাক হইয়া গেল !

মুছলমানের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে এই শ্রেণীর গাঁজাখুরি গল্পগুজব কোর্‌আনের তফ্‌ছিরে কখনই স্থান লাভ করিতে পারিত না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় এই গল্প-রচকেরা কি লোহিত সাগরের উপকূলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিলেন, না স্বয়ং জেব্রাইল ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাঁহাদিগকে এই সব বেওয়ারা বলিয়া গিয়াছেন ? এই সমস্ত উপাখ্যান তাঁহারা অবগত হইয়াছেন,—কোন্ সূত্রে ?

ফলে, আল্লার কেতাবের সহিত ঐ সমস্ত গল্পগুজবের কোন সম্বন্ধ নাই, কোর্‌আন বরং উহার প্রতিবাদই করিতেছে।

৬৩ গো-পূজা ঃ—

আল্লার আদেশ অনুযায়ী হজরত মূছা চল্লিশ দিবা রজনী দূরে নিভৃত পর্ব্বত গুহায় সাধনায় তন্ময় হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি হজরত হারুনকে এহুদীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান। মিসরীয়দিগের মধ্যে তখন গো-পূজার প্রথা খুবই প্রচলিত ছিল। চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত অধীনতার জীবন অতিবাহন করায় সাধারণ নিয়মানুসারে প্রভু জাতির

অন্যান্য দোষের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতা ও গো-পূজার একটা শোচনীয় মোহও এহুদীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। হজরত মূছার অনুপস্থিতিকালে সুযোগ বুঝিয়া তাহারা নিজেদের জন্য একটা গো-বৎসের মূর্ত্তি গড়িয়া ল. য়া পৌত্তলিকদের অনুকরণে তাহার পূজা করিতে লাগিল। হজরত মূছা 'আল্‌ওয়াহ' বা Tablets লইয়া ফিরিয়া আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া হারুনকে ভৎ'সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। হারুন বলিয়া দিলেন যে, তিনি যথাসাধ্য নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বানি-এছরাইল তাঁহার সেই নিষেধ গ্রাহ্য করে নাই। তখন হজরত মূছা বানি-এছরাইলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বানি-এছরাইল! এই গো-বৎসকে পূজ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ। অতএব তোমরা নিজ প্রভুর সন্নিধানে তওবা কর, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজ হস্তে অনাচারী স্বজনদিগকে নিহত কর।" সকলে ইহার জন্য প্রস্তুত হইলে, এবং সম্ভবতঃ কএকজনের প্রাণদণ্ড হইয়া গেলে, আল্লাহ তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন।

এই বিবরণ কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়ত হইতে গৃহীত। انفسکم পদের অর্থ সম্বন্ধে দেখ— ولا تخرجون انفسکم من دیارکم। বানি-এছরাইলের গো-পূজার জন্য দেখ— বাইব্লিকা ৬৩১, বৃটানিকা, ইজিপ্ট-Religion, বাইবেল যাত্রা পুস্তক ৩২ অধ্যায়। ছামেরীর বিবরণ, ছুরা 'তাহা'র তফছিরে দ্রষ্টব্য।

৫৩শ আয়তে 'কেতাব' শব্দ দেখিয়া পাদ্রী Dr. Wherry তাঁহার অনুবাদের টীকায় ইহাকে কোর্‌আনের ভুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—হজরত মূছা সে যাত্রায় Ten Commandments মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাওরাত পান নাই। আরবী সাহিত্যের সামান্য খোঁজখবরও যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, الکتاب ما یکتب فیه যাহাতে কিছু লেখা যায় তাহাই 'কেতাব' পদবাচ্য। এই জন্য চিঠিপত্রকেও 'কেতাব' বলা হইয়া থাকে। সেই 'কেতাব' যে তাওরাত নহে—প্রস্তর ফলক বা الواح —ছুরা 'আরাফে'র ১৪৫, ১৫০ ও ১৫৪ আয়তেই তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

বাইবেলে এই বিবরণের জন্য যাত্রা পুস্তক ৩২, ৩৩ ও ৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ফোর্‌কান :—

কোন বস্তু বা বিষয়কে অন্য বস্তু ও বিষয় হইতে পৃথক করিয়া দেয় যাহা—তাহার নাম 'ফোর্‌কান'। সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করিয়া দেয় বলিয়া কোর্‌আনের এক নাম—'ফোর্‌কান'। বদর সমরে এছলামের মহা সত্য মিথ্যাপুঞ্জের মধ্য হইতে প্রকটমান হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া কোর্‌আনে তাহাকে 'য়্যাওমুল-ফোর্‌কান' یوم الفرقان বা 'ফোর্‌কান-দিবস' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ছুরা 'আন্‌ফাল ৮—৪১)। ফের্‌আওন নিজকে মিসরীয়দের ربکم الاعلی বা 'মহেশ্বর' বলিয়া দাবী করিত। হজরত মূছা তাহাকে মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাবহ হীনাদপিহীন দাসানুদাস মাত্র বলিয়া প্রচার করেন। বানি-এছরাইলের এই

উদ্ধার, আর সেই 'মহেশ্বরের' এই শোচনীয় পরিণতিতে সত্য ও মিথ্যা পৃথক হইয়া গেল। তাই হজরত মূছার এই 'মো'জেজা'কে 'ফোর্‌কান বলা হইয়াছে। কেতাবে লিখিত উপদেশ-গুলিকেও 'ফোর্‌কান' বলা যাইতে পারে।

৬৪ صاعقة ছাএকা=আজাব :--

'ছাএকা' শব্দের মূল অর্থ—الصوت الشديد من الجو—"আকাশের কোন একটা ভীষণ শব্দ" (রাগেব)। তাহার পর বজ্রাগ্নি, আজাব বা মৃত্যু অর্থে উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিধ্বস্তকারী শাস্তি ও নৈসর্গিক আজাবের ভীষণ শব্দকে 'ছাএকা' বলা হয়। (রাগেব, ছেহাহ, কামুছ)।

'আদ' জাতি ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা بريح صرصر নিহত হইয়াছিল—কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়তে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। (দেখ—ছুরা 'হা-মিম ছেজদা' ৪১—২, ছুরা 'আহকাফ' ৪৬—৩, ছুরা 'জারিয়াত' ৫১—২, ছুরা 'কমর' ৫৪—১, ছুরা 'আল্‌হাক্কা' ৬৯—১)। অথচ ছুরা 'হা-মিম ছেজদায়' ঐ ঝড়ঝঞ্ঝাকে "ছাএকা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'ছমুদ' জাতি الرجفة ভূমিকম্প ও الصيحة ভীষণ শব্দ দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল—'আ'রাফ', 'হুদ', 'আল্‌-হিজ্‌র' প্রভৃতি ছুরায় এ কথা স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। অথচ এই ভূমিকম্পের আজাবকেই ছুরা 'হা-মিম ছেজদা' (২য় রুকু) ও ছুরা 'জারিয়াতে' (২য় রুকু) 'ছাএকা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং 'ছাএকা' শব্দের অর্থ যে আজাব, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। (দেখ—Exodus ১৯—১৬, ১৭)।

৬৫ মওত=মরণের পর :—

আরবী সাহিত্যে সাধারণতঃ এবং কোর্‌আন শরিফে বিশেষতঃ 'মওত' শব্দ—মৃত্যু, মূর্খতা, অচৈতন্য, নিদ্রা, জ্ঞান বিবেকের অভাব, কঠিন পীড়া দায়ক আজাব, জমির উর্ব্বরা শক্তির অভাব ঘটা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমাম রাগেব কোর্‌আন হইতে এই শ্রেণীর বিভিন্ন অর্থের নজির উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন (৪৯৪ পৃষ্ঠা)।

গো-বৎস পূজার ঘটনার পর হজরত মূছা নিজ মণ্ডলীর কতকগুলি নির্ব্বাচিত লোককে সঙ্গে লইয়া তূর পর্ব্বত প্রান্তরে উপস্থিত হন। হজরত মূছা সেই সময় আল্লার বাণী ও নবুঅত প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা সঙ্গীদিগকে জানাইয়া দিলেন। তাহারা ধৃষ্টের মত বলিতে লাগিল—এ যে আল্লার বাণী, তোমার কথায় তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যরূপে দর্শন করিতে চাই। যাবৎ তুমি ইহা পূর্ণ করাইতে না পারিবে, তাবৎ আমরা তোমার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিব না। 'সিনাই' পর্ব্বত নানাবিধ বিস্ফোরক ধাতু-পদার্থের খনি ও আগ্নেয়গিরিতে তখন পরিপূর্ণ ছিল। হজরত মূছার কতিপয় সঙ্গী এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করার পর সেখানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও ভীষণ নির্ঘোষ আরম্ভ হইয়া যায়। ইহাতে তাহারা এমন কি স্বয়ং হজরত মূছা (خر موسى صعقا) মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই

মূর্চ্ছা ও অচৈতন্যকেই এখানে 'মওত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিস্তারিত আলোচনা ছুরা 'আ'রাফে'র টীকায় দ্রষ্টব্য।

৬৬ **মেঘপুঞ্জের ছায়া** :—

'তীহ' প্রান্তরে বানি-এছরাইলকে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। সেই মরু প্রান্তরে মেঘের ছায়াই তাহাদের একমাত্র রক্ষা পাওয়ার উপায় ছিল। দুনয়ার সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের ন্যায় মেঘমালাও আল্লার হুকুমে পরিচালিত হইয়া থাকে, এবং সে সময়ও হইয়াছিল। এ হেন মেঘমালার সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরিচালক আল্লার কৃতজ্ঞ হওয়া এহুদীদের উচিত ছিল। মরু উপত্যকায় বিশেষতঃ দীর্ঘ পর্ব্বতমালার সংলগ্ন স্থানে গ্রীষ্মকালে মেঘপুঞ্জ সঞ্চিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কোর্‌আন এই স্বাভাবিক ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু এক দল লোক যেন মনে করিয়া বসিয়াছেন যে, কোন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড না হইলে আল্লার শক্তি ও মহিমার ভাল রকম বিকাশ হয় না। তাই 'মেঘপুঞ্জ' লইয়া এখানে তাঁহারা নানা প্রকার অস্বাভাবিক গল্পগুজবের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণিত জ্যোতিচ্ছটা ও জ্যোতির্ম্ময় মেঘ প্রভৃতির মূল অবলম্বন বাইবেল ও এহুদীদিগের প্রক্ষিপ্ত পৌরাণিক কিংবদন্তি। বাইবেল বলিতেছে—"আর সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন।" (যাত্রা পুস্তক ১৩—২২)। বাইবেল-রচয়িতার সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের তফছির-রচয়িতারাও বলিতেছেন—"হজরত মূছা পর্ব্বতের নিকট গমন করিলে একটী জোতির্ম্ময় স্তম্ভ, শুভ্র শীতল লঘু মেঘ আকারে প্রকাশ পাইল ...... হঠাৎ একটী জ্যোতিচ্ছটা তাহার দিকে ধাবিত হইল,—ঐ জ্যোতিচ্ছটার মধ্য হইতে এক পাক কালাম তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল যে, আমিই আল্লাহ ...... হজরত মূছা উক্ত জ্যোতির্ম্ময় মেঘে আচ্ছন্ন হইলেন ...... ইত্যাদি।"

পাঠক দেখিতেছেন যে, তফছিরের তথা বাইবেলের এই সব আজগেবী গল্পগুজবের সহিত কোর্‌আনের কোনই সম্বন্ধ নাই।

৬৭ من - سلوى **মান্ন—ছাল্‌ওয়া** :—

সীনাই উপত্যকায় 'মান্ন' ও 'ছাল্‌ওয়া' নামক দুই প্রকার খাদ্য বানি-এছরাইলদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। দশ বার লাখ লোক—অথচ খাদ্যের সম্পূর্ণ অভাব। মরু-প্রান্তরের সেই পার্ব্বত্য উপত্যকায় খাদ্য সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব,—সে দুস্তর পাথার শীঘ্র অতিক্রম করিয়া যাওয়াও সাধ্যাতীত এই সময় বানি-এছরাইল সেখানে 'মান্ন' ও 'ছাল্‌ওয়া'র সন্ধান পাইয়া আশু ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। এই দুর্গম দুস্তর মরু উপত্যকায় যে করুণাময় মহিমাময়, মানুষের জন্য এমন উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন—যাঁহার মহিমায় হজরত মূছার সমভিব্যাহারী দ্বাদশ লক্ষ এহুদী আসন্ন বিনাশের কবল হইতে এমন

সহজে রক্ষা পাইয়া গেল—তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ও প্রণত হওয়া এহুদী জাতির উচিত ছিল। ঐ ঘটনার উল্লেখে তাহাদিগকে এই মাত্র উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, 'মান্ন' ও 'ছাল্‌ওয়া' কোন অসাধারণ খাদ্য, বানি-এছরাইলের জন্য বিশেষ করিয়া উহা সিনাই উপত্যকা প্রান্তরে আছমান হইতে নাজেল করা হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ এ ধারণাটী সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কোর্‌আনের সহিত এ ধারণার কোনই সম্বন্ধ নাই। انزلنا শব্দের তাৎপর্য্য ৮নং টীকায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উহার অর্থ—"দান করিলাম"।

সিনাই উপত্যকা প্রান্তরে সাগুদানার ন্যায় এক প্রকার মিষ্টস্বাদযুক্ত ছোট ছোট বীজবৎ পদার্থ রাত্রিকালে গাছের পাতায় ও পাথরের গায় জমিয়া থাকে, ইহাকেই—'মান্ন' বলা হয়। ফার্সি ভাষায় 'মান্ন'কে তোরাঙ্গবীন ও গজঙ্গবীন বলা হয়। ইহারই এক প্রকারের নাম—شیر خشت—'শীর খেশ্‌ত' বা প্রস্তর দুগ্ধ। সিনাই উপত্যকার প্রান্তর সমূহে, বিশেষতঃ 'ওয়াদীউশ্‌শেখ' প্রান্তরে বর্ত্তমান সময়ও আরবগণ প্রচুর পরিমাণে 'মান্ন' সংগ্রহ করিয়া St. Catherineএর monk বা সন্ন্যাসীদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় Convent-এর যাত্রীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা দুন্‌য়ায় আদৌ কোন অসাধারণ ব্যাপার নহে। এশিয়া ও ইউরোপের বহু স্থানে আবহমানকাল হইতে এই 'মান্ন' উৎপন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং এখনও হইতেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু দিন এমন কি ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার সন্ধান না জানিলেও সেমেটিক জাতিদের নিকট ইহার ব্যবহার কোনকালেই অবিদিত ছিল না। ইটালীর সিসিলী বন্দর মুছলমানদিগের হস্তগত থাকার সময় (৮২৭—১০৭০ খৃষ্টাব্দ) তাহারা এখান হইতে 'মান্ন' সংগ্রহের ব্যবসায় খুব জোরে চালাইয়াছিল। সিসিলীর একটী পর্ব্বত এখনও 'জবলুল-মান্ন' বা 'মান্ন'-পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও এই 'মান্ন' পাওয়া যায়। (ব্রিটানিকা ও Watt কৃত Dictionary of Economic Products of India পুস্তকের Manna দ্রষ্টব্য)। হজরত রছুলে করিমের এক হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে—الكمأة من المن و مائها شفاء للعين অর্থাৎ—" 'কাম্‌আত' এক শ্রেণীর 'মান্ন',—ইহার জলে চক্ষুপীড়ার নিবৃত্তি হয়।" 'কাম্‌আত' শব্দের অর্থ—এক প্রকার ভোজন যোগ্য ক্ষেত্রজাত ছত্রক—কোড়ক জাতীয় উদ্ভিদ, খাওয়ার উপযোগী এক প্রকার 'ব্যাঙ্গের ছাতা'। (বোখারী, মোছলেম, আহমদ, তির্‌মিজী, নাছাই, এবনে মাজা)।

ছাল্‌ওয়া ঃ—

ইব্রানীতে Salwim—এক প্রকারের মাংস বহুল পক্ষী, আরবগণ সাধারণতঃ ইহাকে سمانی 'সোমানা' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই পাখীগুলি এক এক মওছুমে কোথা হইতে আসে তাহা জানিতে পারা যায় না। তাই এক দল লোক বলিয়া থাকে যে, ঐ

পাখীগুলি সমুদ্র হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। মিসরবাসীরা ইহার মাংসের খুবই সমাদর করিয়া থাকে এবং এজন্য তাহারা উচ্চ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে, এই পাখীগুলি মাটিতে বসিয়া থাকে এবং জোর করিয়া উড়াইয়া না দিলে উড়িতে পারে না। (হায়াতুল হায়ওয়ান ২—২৩ ও আজাএবুল মখলুকাত ২—২৩৭)।

ইংরাজীতে ইহাকে Quail এবং বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে ইহাকে ভারুই, ভরতপক্ষী, কণিখেল বলা হয়। সমস্ত পাখীর ন্যায় বিভিন্ন দেশের ভারুই পাখীর মধ্যে বর্ণ, আকার ও প্রকৃতিগত অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে। ভূমধ্য সাগরের উপকূল ভূমি দিয়া ইহাদের migration আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহাদের জাতায়াতের সময় বাজারে বিক্রয়ের জন্য ইহার বহু সংখ্যক পাখী ধরা হইয়া থাকে। (Britanica—Quail)। রাণী এলিজ্যাবেথের সময় পূর্ব্ব দেশে যাত্রার জন্য যে নৌ-অভিযান পাঠান হইয়াছিল, তাহার মধ্যকার একখানা জাহাজের নাম Desire। এই জাহাজের নাবিকগণ খাদ্যাভাবের জন্য যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রের বিদিত। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্যাটাগোনিয়ার একটী বন্দরে জাহাজ লাগাইয়া ইঁহারা একটী দ্বীপের সন্ধান পান। এই দ্বীপে ভারুই জাতীয় পাখী এত অধিক পরিমাণে সমবেত হইয়াছিল যে, সেগুলিকে পদদলিত না করিয়া পথ চলা অসম্ভব। তখন জাহাজের ২২ জন নাবিককে এই পাখীগুলি ধরিয়া তাহার মাংস শুকাইবার কাজে নিযুক্ত করা হয়। ৩০শে অক্টোবর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নিয়ত এই কাজ চলিতে থাকে। এই এক মাস তেইস দিন ভারুই পাখীর মাংসে জীবিকা নির্ব্বাহের পর ১৪ হাজার পাখীর মাংস শুষ্ক করিয়া লইয়া তাঁহারা স্বদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু কিছু কাল পরে জাহাজ অপেক্ষাকৃত গরম দেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের মধ্যে প্লেগ ও বেরিবেরি জাতীয় মহামারীর আক্রমণ আরম্ভ হইয়া যায়। তখন অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এই পাখীর মাংসে এক শ্রেণীর বড় বড় কীট পয়দা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাই এই মহামারীর কারণ। খাদ্যের সাধারণ অনিয়মের জন্য বেরিবেরির সূত্রপাত হইয়া থাকে। এই সাধারণ কথা ব্যতীত, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারুই পাখীর মাংস চর্ব্বি সহ শুকাইয়া রাখিলে তাহা সহজে বিকৃত হইয়া যায়। (Biblica—Quail)।

বোখারী (আম্বিয়া), মোছলেম (নেকাহ) প্রভৃতি গ্রন্থে হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত কএকটা হাদিছে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, বানি-এছরাইল ভবিষ্যতের জন্য এই মাংস বহু পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং পরে তাহা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। (لو لا بنوا اسرائيل لم يخنز اللحم হাদিছ ও তাহার ব্যাখ্যার জন্য 'ফৎহুল বারী' ৬—২৩১ দেখ)। আল্লাহ তাআলা বানি-এছরাইলকে 'মান্ন' ও 'ছালওয়া' طيب নির্দ্দোষ শুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় ভক্ষণ করিতে বলিয়াছিলেন। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা তাহা শুকাইয়া পচাইয়া বিকৃত করিয়া ফেলিল এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া নানা আধি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

ইহা ব্যতীত তফ্‌ছিরে অহব-এবনে-মোনাব্বাহ প্রভৃতি হইতে 'ছাল্‌ওয়া'র যে সব বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'তাওরাতের' অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। (দেখ—যাত্রা পুস্তক ১৬—১৩, ১৪ এবং গণনা পুস্তক ১১—৩১ প্রভৃতি।

৬৮ حطة **হেত্তাতুন = ক্ষমা প্রার্থনা ঃ—**

ভাষার সাধারণ ধারা অনুসারে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, 'মান্ন' ও 'ছাল্‌ওয়া' প্রাপ্তির পর বানি-এছরাইল পর্য্যটন করিতে করিতে কোন এক মরু উদ্যানের নিকট উপনীত হয়। হজরত মূছা তখন আল্লার হুকুমে তাহাদিগকে জানাইলেন—নিজেদের কর্ম্মফলে অনেক কষ্ট ভোগ তোমরা করিয়াছ, এখন আর ব্যভিচার, অনাচার ও আল্লার অবাধ্যতায় লিপ্ত হইও না। এত দিনে আল্লাহ তোমাদিগকে মরুভূমির বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব নিজেদের পূর্ব্বকার অপকর্ম্মগুলিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লার এই ক্ষমা ও অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে এই পল্লীতে প্রবেশ কর। "এই পল্লী" বলিতে ঠিক কোন পল্লীকে বুঝাইতেছে, কোর্‌আন ও হাদিছে তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই,—তাহার কোন আবশ্যকও আমাদের নাই।

'হেত্তাতুন'—'হাত্তন' হইতে উৎপন্ন,—

من ابتلاه الله بجسده فهو له حطة - اي تحط عنه خطاياه و ذنوبه و هي فعلة
من حط الشيء يحط اذا انزله و القاه - (مجمع البحار)

অর্থাৎ—"যে অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মানুষের পাপ ভার নামিয়া যায়, তাহাই 'হেত্তা'।" মোটামুটি ভাবে ইহা 'তওবা'র প্রতিশব্দ।

'হোদায়বিয়া'র সমর প্রসঙ্গে এবনে-হেশাম একটা রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, হজরত বলিতেছেন—

قولوا نستغفر الله و نتوب اليه ' فقالوا ذلك - فقال و الله انها للحطة التي
عرضت على بني اسرائيل - ابن هشام ' ج ۲ ' ص ۱۷۲ - ،

এই বর্ণনায় হজরতের প্রমুখাৎ জানা যাইতেছে—নিজেদের পাপের জন্য আল্লার নিকট অনুতাপ আর ক্ষমা প্রার্থনাই এই 'হেত্তাতুন' শব্দের একমাত্র তাৎপর্য্য।

৬৯ **বানি-এছরাইলের ধৃষ্টতা ঃ—**

বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, "এই সময় বানি-এছরাইল অনুতাপ বা ক্ষমা প্রার্থনা ত করিলই না, বরং ব্যঙ্গচ্ছলে 'হেত্তাতুন' স্থলে 'হেন্তাতুন' (= গম, অর্থাৎ এখন খুব উদর পূর্ত্তি করিয়া গমের রুটি খাওয়া যাইবে) বলিতে বলিতে এবং প্রণত হওয়ার পরিবর্ত্তে নানা প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিয়াছিল।"

৭০　**রেযজ = দণ্ড :—**

'রেয্‌জ' শব্দের মূল অর্থ—চঞ্চল হওয়া বা বিচলিত করা ('রাগেব')। প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি মহামারী ও দৈব বিপদ আপদই যে 'রেযজ'—বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি কর্ত্তৃক বহু ছহি হাদিছে তাহা হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। (এবনে কছির ১—১৮)।

বনি-এছরাইলদিগের উপর এই শ্রেণীর আজাব ও মহামারী অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের অনাচার ব্যভিচারের প্রতিফলে—এ কথা কোর্‌আনে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। (এই নগরে বনি-এছরাইলের পৌত্তলিকতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার বিবরণের জন্য গণনা পুস্তক ২৫ অধ্যায় দেখ)।

সপ্তম রুকু

এহুদী জাতির বিবরণ

৬০ এবং মূছা যখন স্বজাতির নিমিত্ত পানীয় (জল) প্রার্থনা করিল আমরা তখন বলিয়াছিলাম—'নিজের মুগুলী সহ পর্ব্বতে পর্য্যটন কর।' ফলে, তাহা হইতে দ্বাদশটী উৎস বহির্গত হইয়া পড়িল ; সমস্ত লোকই নিজ নিজ পানস্থল জ্ঞাত হইয়া গেল। (তখন তাহাদিগকে বলিলাম) — "আল্লার দান হইতে ভোজন করিতে ও পান করিতে থাক এবং দেশে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বেড়াইও না।"

٦٠ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْ...

৬১ আর তোমরা যখন বলিয়াছিলে — "হে মূছা ! এক খাদ্যে আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে কোন মতেই সমর্থ হইতেছি না—অতএব আমাদের জন্য নিজ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া বল, তিনি যেন উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য, (যেমন =) তাহার

عَلٰى
رَبَّكَ
رْضُ
فُوْمِهَا وَ

শাক-সব্জী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ আমাদিগের জন্য উৎপন্ন করিয়া দেন!" মূছা বলিল—"কী! যাহা উত্তম—তাহার পরিবর্ত্তে, যাহা অধম—তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিতে চাহিতেছ?" (বেশ কথা, তাহা হইলে) "তোমরা কোন নগরে প্রবেশ কর, অপিচ যাহা তোমাদের প্রার্থনা—তোমাদের তাহা নিশ্চয় হস্তগত হইবে।" এবং হেয়তা ও দারিদ্র্য দ্বারা তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, আর আপনাদিগকে তাহারা আল্লার ক্রোধ-ভাজন করিয়া লইল, ইহার কারণ এই যে—আল্লার নিদর্শনগুলিকে তাহারা অমান্য করিত ও নবীদিগকে অন্যায়রূপে হত্যা করিত। ইহা হইতেছে তাহাদের অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘনের পরিণাম।

عَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ، وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

টীকা :—

৭১ حجر **হজর—প্রস্তর :—**

সাধারণ ভাবে এই আয়তের অনুবাদ করা হয়—'নিজের লাঠির দ্বারা প্রস্তরকে আঘাত কর।' আমরা অনুবাদ করিতেছি—'নিজের মণ্ডলী সহ পর্ব্বতে (বা পার্ব্বত্য প্রদেশে)

পর্য্যটন কর।' 'জর্ব্ব', 'আছা' ও 'হজর' শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া এই মতভেদ। 'জর্ব্ব' ও 'আছা' সম্বন্ধে ৬২নং টীকায় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র 'হজর' শব্দের আলোচনা করিলে আয়তের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

(ক) এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'হজর' শব্দে যেমন প্রস্তরকে বোঝায়, ঠিক সেইরূপ তাহা দ্বারা প্রস্তর সঙ্কুল স্থান, পার্ব্বত্য প্রদেশ, এবং পর্ব্বতকেও বুঝাইয়া থাকে। 'হজর' হইতে কি প্রকারে নদী ও জলধারা বহির্গত হইয়া থাকে, কএক আয়ত পরেই (৯ রুকু, ৭৪) তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار - و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء -

অর্থাৎ—"নিশ্চয় কোন কোন حجر —'হজর' এরূপ আছে যাহা হইতে নদ নদী বহির্গত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন حجر —'হজর' এরূপ আছে যাহা বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যাহা হইতে জলধারা নির্গত হইয়া থাকে।" পর্ব্বত হইতে এই প্রকারেই জলধারা বহির্গত হইয়া নদ নদী প্রভৃতিতে পরিণত হয়। 'হেজারা',—'হজর' শব্দের বহুবচন। দুন্‌য়ায় কোনও প্রস্তর খণ্ড হইতে কস্মিন কালে কোন নদ নদী ও জলপ্রপাত প্রবাহিত হইতে কেহই দেখেন নাই। সুতরাং 'হজর'এর অর্থ যে এখানে পর্ব্বত, সকলে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। বলা আবশ্যক যে, এই আয়তটীও বনি-এছরাইলের মিসর হইতে স্বদেশ যাত্রার এই উপাখ্যান প্রসঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ৬০নং আয়তেও যে পর্ব্বতের এই স্বাভাবিক জলধারা-গুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দু মাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। 'হজর' শব্দ যে পর্ব্বত অর্থেও ব্যবহৃত হয়, এই আয়ত দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

(খ) দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিছে বর্ণিত হইতেছে :—

" تبعه اهل الحجر و المدر " — يريد اهل البوادي الذين يسكنون مواضع الاحجار و الجبال - مجمع البحار -

অর্থাৎ—" 'হজর' ও 'মদরের' লোকেরা 'দাজ্জালের' অনুসরণ করিবে"—'হজরের অধিবাসী-গণ'—অর্থে প্রান্তর ভূমির অধিবাসীগণ—যাহারা পর্ব্বতে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া থাকে। (বেহার)!" কবিবর ফের্জদকের একটী পদ্যাংশের অর্থ করিবার সময় আছমায়ীর ন্যায় সাহিত্য-গুরুও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'হজর' শব্দ পর্ব্বত ও Rock অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী আয়তে বনি-এছরাইলের নানা প্রকার খাদ্য প্রাপ্তির প্রার্থনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও মরু প্রান্তরে ঐ প্রকার খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই আল্লাহ বলিতেছেন—ঐ সকল খাদ্য পাওয়ার জন্য যে সকল ক্ষেত্র ও তাহার যে সব উপলক্ষ উপকরণ নির্দ্ধারিত আছে, উহা পাইতে হইলে সেই সকল ক্ষেত্রে গমন এবং সেই সকল উপকরণকে অবলম্বন করিতে হইবে। আল্লার সৃষ্টি—নিয়মের রাজ্য—সেখানে প্রত্যেক

জিনিষের জন্য একটা কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দ্ধারিত আছে। সেই কার্য্যকারণ-পরম্পরাকে বাদ দিয়া সেই জিনিষকে কখনই লাভ করা যায় না। এই জন্য তাহাদিগকে নগরে গমন করিতে বলা হইয়াছে। সেখানে তাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া ঐ সব জিনিষ লাভ করিতে থাকে। এখানেও সেইরূপ, বনি-এছরাইলের জন্য জলের অভাব ঘটিলে তাহাদিগকে জলের স্বাভাবিক প্রস্রবণগুলির সন্ধান করিবার জন্য পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে বলা হইয়াছে। হজরত মূছার সঙ্গে বনি-এছরাইলের বারটা গোত্র ছিল, সন্ধান করিয়া বারটা নির্ঝর বাহির করিয়া প্রত্যেক গোত্রকে এক একটা নির্ঝরের উপকূলে অবস্থিত করা হইল। এই নির্ঝরমালা এখনও বিদ্যমান আছে এবং এখনও তাহা عيون موسى বা Wells of Moses নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এই নির্ঝরগুলি—সাধারণ নিয়ম অনুসারে পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া আছে।

সাধারণ কিংবদন্তি-সঙ্কলকেরা বলিতেছেন—কেরামতি-লাঠির ন্যায় এক খণ্ড কেরামতি-প্রস্তরও হজরত মূছার সঙ্গে ছিল। ঝোলার মধ্য হইতে সেই প্রস্তর বাহির করিয়া হজরত মূছা এই কেরামতী লাঠির দ্বারা তাহার উপর আঘাত করিতে থাকিলেন এবং তাহার ফলে ঐ প্রস্তর খণ্ড হইতে বারটী নদী প্রবাহিত হইয়া গেল, তাহাতে এই বার লাখ লোকের পানীয় জলের অভাব মিটিয়া গেল। এই গল্পের কোন ভিত্তি কোর্‌আনে ও হাদিছে নাই। কোর্‌আনের বর্ণনা সরল, সহজ ও স্বাভাবিক।

বাইবেলে এই দ্বাদশ Well সম্বন্ধে যাত্রা পুস্তক ১৫—২৭ ও গণনা পুস্তক ৩৩—৯ পদ দ্রষ্টব্য। Biblica—Elim—The second station of the Israelites after crossing the sea, where there were twelve fountains.

৭২ مصرا মেছ্‌রান :—

কোন কোন তফছিরকার 'মিছরান' শব্দের অর্থ মিসর বা ইজিপ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কোন কোন খৃষ্টান লেখক এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কোর্‌আনের এই বর্ণনার অসংলগ্নতা প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোর্‌আনের ও আরবী ব্যাকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কোর্‌আনে যেখানে ইজিপ্টকে 'মেছর' বলা হইয়াছে—علم 'আলম' ও 'আজমী' হওয়ার কারণে সেখানে উহাকে غير منصرف রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন— اليس لي ملك مصر - زخرف ও قالوا ادخلوا مصر - يوسف ইত্যাদি। কিন্তু ইহার বিপরীত, আলোচ্য আয়তে উহাকে منصرف রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। সেই জন্য اهبطوا مصر না বলিয়া اهبطوا مصرا বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার অর্থ হইবে—'কোন এক নগর'। মিসর বা ইজিপ্ট বলিয়া ইহার অনুবাদ করা অসঙ্গত।

৭৩ **অপমান ও দারিদ্র্য :—**

এহুদী জাতি নবীদিগকে হত্যা করার চেষ্টা করিত—সাধ্যে কুলাইলে হত্যা করিয়া ফেলিত, এবং আল্লার বাণী ও তাঁহার প্রকাশিত নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিত। নিজেদের এই কৃতকর্মের ফলে তাহারা নিজেরাই আপনাদিগকে আল্লার গজবের উপযোগী করিয়া লইয়াছিল। আল্লার গজব আসিয়াছিল—অপমান ও দারিদ্র্য আকারে। এক শ্রেণীর মুছলমান স্বসমাজের বর্ত্তমান দৈন্য ও দারিদ্র্যকে আল্লার রহমত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই আয়ত পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। বস্তুতঃ জাতির পক্ষে ইহাই আল্লার প্রধান গজব এবং এই গজবও জাতিরই কৃতকর্মের অপরিহার্য্য ফল।

এহুদী জাতি যে চিরকালই নবীদিগকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, এবং সাধ্যে কুলাইলে হত্যা করিয়াছে—বাইবেলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "হা অধ্যাপক ও ফরিশীগণ, কপটীরা, ধিক তোমাদিগকে! কারণ তোমরা ...... বলিয়া থাক, আমরা যদি আমাদের পিতৃ পুরুষদের সময়ে থাকিতাম, তবে ভাববাদীগণের রক্তপাতে তাহাদের সহভাগী হইতাম না। ইহাতে তোমরা আপনাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদীগণকে বধ করিয়াছিল, তোমরা তাহাদের সন্তান।" এহুদীরা যে নিজেদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যীশুকে হত্যা করিয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। তাহাদের এই পাপধারা কোন সময়েই নিবারিত হয় নাই। "ধার্ম্মিক হেবেলের রক্তপাত অবধি বরাখিয়ের পুত্র সখরিয় ('জ'করিয়া)কে তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে। (মথি ২৩ অধ্যায়)।" এহুদী জাতি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে হত্যা করার জন্যও চেষ্টা ও অভিসন্ধির ক্রটী করে নাই।

অষ্টম রুকু'

—ooo—

এহুদীদিগের অনাচার

৬২ বস্তুতঃ যাহারা মুছলমান হইয়াছে ও যাহারা এহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ ও সাবেয়ীগণ, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা (সত্যকার ভাবে) আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে—তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে তাহাদের (কর্ম্মের) সুফল নির্দ্ধারিত আছে, আর কোনই আশঙ্কা তাহাদের নাই এবং তাহারা কখন সন্তপ্তও হইবে না।

٦٢ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

৬৩ এবং আমরা যখন তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম, আর 'তূর'কে তোমাদের ঊর্দ্ধ দেশে উত্থাপিত করিয়া (বলিলাম) —আমরা তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিলাম — তাহাকে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর, এবং তাহার মধ্যে (উপদেশ-) যাহা আছে—তাহা প্রণিধান করিতে থাক, যেন তোমরা সংযমশীল হইতে পার !

٦٣ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ، خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

৬৪ অতঃপর পুনরায় তোমরা (আল্লার আদেশ পালনে ও নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষায়) পরাঙ্মুখ হইয়া গেলে—তখন তোমাদিগের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও করুণা না থাকিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে।

٦٤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ، فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

৬৫ আর তোমাদিগের মধ্যকার যাহারা বিশ্রাম দিবসে 'অত্যাচার' করিয়াছিল—তাহাদিগের বিষয় নিশ্চয়ই অবগত আছ, ফলে তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম — "বিতাড়িত বাঁদর হইয়া যাও!"

٦٥ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۔

৬৬ ফলে এই ঘটনাকে আমরা সমসাময়িক ও ভাবী (মানব সমাজের) জন্য ভয়ঙ্কর নিদর্শন এবং সংযমশীল লোকদিগের নিমিত্ত মহা উপদেশ (স্বরূপ) করিয়া রাখিলাম।

٦٦ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۔

৬৭ এবং (স্মরণ করিয়া দেখ) মূছা যখন স্বজাতিকে বলিল — "আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটী গো-কোর্‌বানী করিতে আদেশ করিতেছেন"। তাহারা (মূছাকে) বলিল—"তুমি কি আমাদিগের

٦٧ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ، قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ، قَالَ اَعُوْذُ

সহিত ব্যঙ্গ করিতেছ ! মূছা বলিল—আল্লাহ্ রক্ষা করুন—যেন মূর্খদিগের অন্তর্ভুক্ত না হই !

بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

৬৮ তাহারা বলিল—(হে মূছা !) আমাদিগের জন্য তোমার প্রভুকে ডাকিয়া বল — গরুর স্বরূপটা তিনি আমাদিগকে বলিয়া দিন ! মূছা বলিল—তিনি বলিতেছেন—সে গাভী বৃদ্ধও নয়, বাছুরও নয়, এই দু'য়ের মাঝামাঝি মধ্য বয়স্কা, অতএব (অধিক কূট প্রশ্ন না করিয়া) আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেল !

٦٨ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ، قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ، عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ، فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

৬৯ তাহারা (আবার) বলিল—আমাদিগের (সুবিধার) জন্য তোমার প্রভুকে ডাকিয়া বল কোন্ বর্ণের গাভী কোর্‌বানী করিতে হইবে—তিনি আমাদিগকে বলিয়া দিন ! মূছা বলিল, তিনি বলিতেছেন—সে গাভী হইবে পীতবর্ণ, তাহার গাঢ় (সোণালী) রং দর্শকগণকে পুলকিত করিয়া তুলিবে।

٦٩ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ، قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

৭০ তাহারা (আবার) বলিল—আমাদিগের (সুবিধার) জন্য

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا

مَا هِيَ ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ .

তোমার প্রভুকে ডাকিয়া বল—তিনি উহার স্বরূপ আমাদিগকে (স্পষ্ট করিয়া) বলিয়া দিন, বস্তুতঃ সমস্ত গরু আমাদিগের নিকট একইরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা নিশ্চয়ই সুপথ প্রাপ্ত হইতে পারিব।

৭ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ، قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ : فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ .

৭১ মূছা বলিল, তিনি বলিতেছেন—সে এরূপ শ্রম লাঞ্ছিত গরু নহে, যাহা ভূমি কর্ষণ অথবা ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া থাকে—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক! তাহারা বলিল—এতক্ষণে তুমি প্রকৃত (সন্ধান) দিয়াছ। তখন তাহারা সেই গাভীকে কোর্‌বানী করিল—বস্তুতঃ কোর্‌বানী করার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না।

টীকা :—

৭৪ **সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় :—**

এই আয়তে এবং ছুরা 'মায়েদার' একটী আয়তে বলা হইতেছে যে, মুছলমান, এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি আল্লার পক্ষপাত বা বিদ্বেষ নাই। সকলকেই তিনি মুক্তি ও শান্তি লাভের সমান অধিকার দিয়াছেন। ধর্ম্মের সার সাধনা তিনটী—যে কোন জাতি ও ধর্ম্মের লোক এই তিনটী সাধনাকে গ্রহণ করিয়া সেই মুক্তি ও

শান্তির অধিকারী হইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান সাধনা হইতেছে—আল্লার প্রতি ঈমান। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্ব্ব গুণাকর, সর্ব্ব ক্রটীশূন্য, সর্ব্ব শক্তিমান, চিরজীবন্ত, চিরজাগ্রত, সকল সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কর্ত্তা। মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য তিনি যুগে যুগে নিজের বাণী দুন্‌য়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, মানুষের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য তাহাতে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। এই বিশ্বাসকে কায়মনোবাক্যে পোষণ ও প্রকাশ করার নাম—আল্লার প্রতি বিশ্বাস করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে—পরকালে বিশ্বাস। আমরা বর্ত্তমান জীবনে সৎ বা অসৎ যে সব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি, এই জীবনের পরও আমাদিগকে সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই কর্ম্মফল ভোগে বিশ্বাস করাই এছলামের পরকাল বিশ্বাসের একমাত্র লক্ষ্য। তৃতীয় বিষয়টা হইতেছে—বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্ম সম্পাদন। কর্ম্মের মধ্যেই বিশ্বাসের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিশ্বাসের ও তাহার প্রকার ভেদের বাহিরের প্রকাশরূপই হইতেছে—কর্ম্ম। এই ত্রিবিধ সাধনার সমষ্টির নামই এছলাম এবং মূলতঃ ইহাই হইতেছে সকল যুগের সকল দেশের সকল নবী রছুলের প্রচারিত সমস্ত ধর্ম্মের সার শিক্ষা ও চরম লক্ষ্য।

ছুরা 'মায়দায়' আল্লাহ তাআলা বলিয়া দিতেছেন :—

—"বল আমরা আল্লার প্রতি এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি—সঙ্গে সঙ্গে এবরাহিমের প্রতি, এছমাইলের প্রতি, এছহাকের প্রতি, য়্যাকুবের প্রতি, তাঁহার বংশধরগণের প্রতি—এবং মূছা, ঈছা ও অন্য সমস্ত নবীগণের প্রতি তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে যে কালাম অবতীর্ণ করা হইয়াছে, সে সমস্তের প্রতিও ঈমান আনিয়াছি ;—তাঁহার রছুলগণের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে কোন প্রভেদ আমরা করি না, আর তাঁহারই আজ্ঞাবহ (মোছলেম) আমরা। আর কেহ এছলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মপথকে অবলম্বন করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না, এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

একটা বৃহৎ বট বৃক্ষের বর্ত্তমান পূর্ণ পরিণত অবস্থার সহিত, তাহার মূলীভূত কারণরূপ ক্ষুদ্র বীজটীর এক অভেদ্য অখণ্ড সম্বন্ধ। প্রথম অঙ্কুর হইতে চরম পূর্ণতা পর্য্যন্ত সমষ্টিগত ভাবে তাহার পূর্ণতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এইরূপে এছলামও পূর্ণ পরিণত হইয়াছে। হজরত আদমের সময় হইতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সময় পর্য্যন্ত সেই এক অভিন্ন এছলামই অবিচ্ছেদ্যরূপে ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

দুন্‌য়ায় অন্য সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল দেশ বিদেশের ও যুগ বিশেষের অংশ বিশেষকে গ্রহণ করেন, অন্য দেশে ও অন্য যুগে আবির্ভূত নবীকে তাঁহারা স্বীকার করেন না। সেই জন্য সেই পূর্ণ সত্যকে অখণ্ডরূপে—যথাযথরূপে—গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সে সমস্তকে সমন্বিত ও একত্র সন্নিবেশিত করিয়া কোর্‌আনের মধ্যবর্ত্তিতায় হজরত মোহাম্মদ পূর্ণ পরিণত বিশ্বধর্ম্মের রূপ দিয়াছেন। ইহাকে অবিশ্বাস করিলে সেই পূর্ণ

সত্যকেই অস্বীকার করা হয়, সুতরাং সেই অভিপ্সিত শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

صابئي "ছাবেয়ী" কাহারা, এ সম্বন্ধে তফছিরের রাবীগণ অনেক মতভেদ করিয়াছেন। আরবী অভিধান অনুসারে যাহারা এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'ছাবেয়ী' বলা হয়। হজরতের সময় কোরেশগণ হজরতকে ও মুছলমানদিগকে এই নামে অভিহিত করিত—ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য লেখকেরাও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'ছাবেয়ী' মূলতঃ আরামীয় ভাষার শব্দ। ঐ ভাষায় উহার ধাতুগত অর্থ—'যাহারা আপনাদিগকে ধৌত করে।' আরব লেখকগণও ইহাদিগকে المغتسلة সম্প্রদায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সমস্ত আলোচনা দেখিয়া মনে হয়, বাবিলোনিয়া অঞ্চলে ইহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইহারা দেশ প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্ম মত আংশিক ভাবে ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের অনুসরণে একেশ্বর-বাদকে স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে করিত যে, আল্লাহ তাআলা নিজের শক্তির একাংশ দেব দেবী ও গ্রহ নক্ষত্রকে দান করিয়াছেন। সেই জন্য তাহারা ইহাদেরও পূজা করিত। (মুহীত, রাগেব, Britanica)।

৭৫ 'তুর'কে উত্থাপন করা ঃ—

সাধারণ তফছিরকারেরা বলিতেছেন যে—কেতাব প্রদানের পূর্ব্বে বানি-এছরাইলের নিকট হইতে আল্লাহ তাআলা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু তাহারা ছিল 'শক্তগ্রীব' অবাধ্য জাতি, কিছুতেই 'তাওরাত' মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিতে চাহে না। তখন আল্লাহ সিনাই পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—প্রতিজ্ঞা কর্‌বি ত কর্‌, নতুবা এই পাহাড়কে তোদের মাথার উপর ফেলিয়া দিয়া পিষিয়া মারিব! পাহাড়টী তাহাদের মাথার উপর কয় ফুট কয় ইঞ্চি উর্দ্ধে ছিল, তাহাও তাঁহারা খড়ি পাতিয়া ঠিক ঠাক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন!

এই গল্পের সহিত এছলামের কোনই সম্বন্ধ নাই, কারণ কোর্‌আন ও হাদিছে এই গল্পের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইহা কোর্‌আন হাদিছের, আরবী সাহিত্যের ও এছলামের মূল নীতির বিপরীত—এহুদী পুরাণকারদিগের একটা আজগৈবী কল্পনার অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, সেই জন্য এখানে বিষয়টী লইয়া একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি।

আলোচ্য আয়তে মূল তর্ক হইতেছে رفع 'রফ্‌উন' ও فوق 'ফওক' শব্দ লইয়া। 'রফ্‌উন' শব্দের অর্থ—উত্তোলন করা, উত্থাপন করা ইত্যাদি। আমি একখানা ঘর তুলিয়াছি, তুমি একটা এমারত খাড়া করিয়াছ-বলিলে, কেহ বুঝিবে না যে আমরা একখানা ঘর বা এমারত সমূলে উৎপাটন করিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিয়াছি।

এই ছুরায় একটু পরেই বলা হইতেছে—

اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل -

অর্থাৎ—"এবং এবরাহিম ও এছমাইল যখন কা'বার ভিত তুলিতেছিল।" এখানেও ঐ একই শব্দ, অথচ কেহ কি বলিতে পারেন যে, হজরত এবরাহিম ও এছমাইল কা'বার ভিত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে মাথার উপর শূন্যে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? বেহেশ্‌তের লোকদিগের জন্য فرش مرفوعة ও سرر مرفوعة থাকার কথা কোর্‌আনে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি এই হইবে যে 'তোষক ও তক্তপোষগুলি বেহেশ্‌তবাসীদের মাথার উপর তুলিয়া ধরা হইবে!' হজরত আবুবকর হেজরতের সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন —প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়ার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম, فرفعت لنا صخرة অপর পক্ষের তাৎপর্য্য অনুসারে ইহার অর্থ হইবে—তখন একটা চাটান বা rockকে আমাদের জন্য শূন্যে উত্তোলন করা হইল। কিন্তু হাদিছের অভিধানকারেরা ইহার অর্থ করিতেছেন— اي ظهرت لابصارنا অর্থাৎ—'আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশমান হইল' (বেহার)। এই হিসাবে আমরা আয়তের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি—"এবং যখন পর্ব্বতকে তোমাদের ঊর্দ্ধ দেশে প্রকাশ করিলাম।"

فوق 'ফওক' শব্দের অর্থ—'শূন্যে, মাথার উপর' এবং 'উচ্চ দেশ ও উচ্চ ভূমি' উভয়ই হইতে পারে। 'আহজাব' বা পরিখা সমর সম্বন্ধে কোর্‌আনে বর্ণিত হইয়াছে— اذ جاءوا كم من فوقكم অর্থাৎ—"শত্রু বাহিনী যখন তোমাদের 'ফওক' হইতে সমাগত হইয়াছিল।" সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, 'ফওক' শব্দ এখানে ঊর্দ্ধ দেশ বা উচ্চ ভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নচেৎ বলিতে হইবে যে, কোরেশ বাহিনী উড়িয়া আসিয়া শূন্য হইতে মদিনাবাসীর মাথার উপর পঙ্গপালের মত ঝুপ ঝুপ করিয়া পড়িয়াছিল!

অতএব এই দুইটী শব্দের সঙ্গত তাৎপর্য্য অনুসারে আয়তের অনুবাদ এইরূপ দাঁড়াই-তেছে—'এবং আমরা যখন তোমাদের ঊর্দ্ধ দেশে 'তুর'কে প্রকটমান করিলাম'। অর্থাৎ তোমাদের চক্ষের সম্মুখে 'তুর' পর্ব্বত যখন প্রকাশ পাইল—তোমাদের দৃষ্টি গোচর হইল।

রডওয়েল ছুরা 'আরাফের' অনুবাদে (৩০৯ পৃষ্ঠা, ৫নং টীকা) এহুদীদিগের বিভিন্ন পুরাণ পুস্তকের এবারত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—তফছিরকারগণের মধ্যে প্রচলিত এই গল্পটী এহুদীদিগের মধ্যে হুবহু প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। "The Holy one, turned the mountain over them like a vessel, and said to them, if you will receive the law, well; but if not, there shall be your grave." এই সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করার পর তিনি আরও বলিতেছেন :—

"Its origin is a misunderstanding of Ex. 19—17, rightly rendered in the English version—at the nether part of the mountain." অর্থাৎ—

যাত্রা পুস্তকের ১৯;—১৭ পদের ভ্রান্ত অর্থ করায় এহুদীদিগের এই গল্পের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে ইহার ঠিক অর্থ করা হইয়াছে—'পর্ব্বতের অধস্থ ভূভাগে'।" বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কোন এক অনুবাদক রডওয়েলের এই টীকা হইতে 'আবোদা সার' গ্রন্থের বরাত দিয়াছেন, অথচ গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটী উদ্ধৃত করেন নাই। লেখক যে জিনিষটাকে যে সূত্রে নিজের সমর্থনের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, সেই জিনিষটা যে তাওরাতের একটা ভ্রান্ত অনুবাদের ফল, তাহাও সেই স্থানে স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত লেখক এখানে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের উপর এই অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন যে, তাহারা 'আল্লার পর্ব্বত উত্তোলন করাকে "অসম্ভব বলিয়া" ধারণা করিয়া এইরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছে। তাহার পর নিজেদের যুক্তিবাদের সাধারণ ধারা অনুসারে অজ্ঞ পাঠকবর্গকে সম্মোহিত করার জন্য বলিতেছেন—"যে ঈমানদার বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এই আছমান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, বরং এই জমিকে শূন্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা 'তুর' পর্ব্বত অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ ভারি, সে বলিবে 'তুর' পর্ব্বতকে শূন্যে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ।" 'তুর' পর্ব্বতকে শূন্যে ধারণ করা আল্লার পক্ষে অসম্ভব—কোন আস্তিকের পক্ষে এরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব। সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন এখানে মোটেই নাই—এখানকার একমাত্র আলোচ্য কি ঘটিয়াছিল, কোরআনের শব্দ হইতে কি সপ্রমাণ হয়? সম্ভব মাত্রই সংঘটিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ছুরা 'আরাফের' ১৭১ নং আয়তকে অন্য পক্ষ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত, ঐ আয়তের ব্যাখ্যায় তাহা বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে। পাঠকগণের সন্দেহ মোচনের জন্য এখানে সংক্ষেপে সে আলোচনার আভাষ দিয়া রাখিতেছি।

এই আয়তের প্রধান বিচার্য্য হইতেছে—'নৎকুন' শব্দের তাৎপর্য্য। এহুদীদিগের ভ্রান্ত অনুবাদ ও তাহাদের বর্ণিত গল্পের প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়ায়, তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন—"পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত করা"। অথচ সমস্ত অভিধানের সমবেত সাক্ষ্য অনুসারে উহার প্রকৃত অর্থ—ঝাঁকি দেওয়া, প্রকম্পিত করা, স্পন্দিত করা। (লেছান, ছেহাহ, কামুছ)। আবু ওবায়দার নাম করণে কেহ কেহ নিজের মতের সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যাইবে যে, আবু ওবায়দার নাম করণে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা স্বমত সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অধিকন্তু বস্তুতঃ আবু ওবায়দাও তাঁহাদের প্রতিকুল ও আমাদের অনুকুল অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন (দেখ, জওহরী—'নৎকুন')। প্রকৃত পক্ষে ভূমিকম্পের জন্য যে ঐ সময় পর্ব্বত ভীষণ ভাবে কম্পিত হইতেছিল, কিছু পূর্ব্বে ১৫৫ নং আয়তে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭৬ **বাঁদর হইয়া যাও !—**

এহুদীদিগের Sabbath বা বিশ্রাম দিবস শনিবারে নির্দ্ধারিত ছিল। ঐ দিন তাহাদিগকে বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম হইতে বারিত থাকিয়া বিশ্রাম করিতে ও আল্লার 'এবাদত' উপাসনায় লিপ্ত হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন এক সময়, কোন এক নদীর তীরস্থ নগর বিশেষে অবস্থান করার কালে, এহুদীরা বিশ্রাম দিবসের বিধান অমান্য করিয়া নদীতে মাছ ধরিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। (৭—১৬৩)। দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত এইরূপে আল্লার ব্যবস্থাকে অমান্য করিতে থাকায়, আল্লাহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা বিড়ম্বিত বাঁদর হইয়া যাও !" কোর্‌আনে এই ঘটনা সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কোন বিবরণ জানা যায় না। কোন বিশ্বস্ত হাদিছে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ আছে বলিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই।

মানুষকে আল্লাহ তাআলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করার শক্তি ও স্বাধীনতাও তিনি তাহাকে দিয়াছেন। ঐ শক্তির অব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে মানুষ اسفل السافلين বা নিম্নতর হইতে নিম্নতম স্তরে আসিয়া উপনীত হয়। মানুষ তখন "পশুত্বে, বরং তাহা হইতেও নিকৃষ্টতর স্তরে" আসিয়া উপস্থিত হয়। আয়তে এই শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

একমাত্র 'মোজাহেদ' ব্যতীত, তফছিরের সমস্ত রাবী একবাক্যে বলিতেছেন যে, আয়তের বর্ণিত লোকগুলি সত্য সত্যই আকারেও বাঁদর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বহু শতাব্দী পূর্ব্বকার ঘটনা তাঁহারা যে কি সূত্রে অবগত হইলেন, তাঁহারা তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই, কোন বিশ্বস্ত হাদিছেও তাঁহাদের উক্তির কোন সমর্থনও পাওয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রমাণহীন কল্পনা অথবা এহুদীদের মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলিকে আমরা কোন মতেই কোর্‌আনের তফছিররূপে গ্রহণ করিতে পারি না।

পক্ষান্তরে কোর্‌আনের বর্ণনার প্রতি একটু গভীর ভাবে মনোযোগ প্রদান করিলে স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায় যে, এ ক্ষেত্রে এহুদীদিগের—আকৃতি নহে—বরং প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের কথাই বলা হইয়াছে। ইহার অনুকূলে কএকটা প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

(ক) ছুরা 'নেছা'র ৪৭ আয়তে হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে ঃ—"তাহারা কোর্‌আনের প্রতি ঈমান না আনিলে তাহাদের 'বদন মণ্ডলকে বিলুপ্ত করিয়া পুনরায় পৃষ্ঠদেশে তাহাকে ফিরাইয়া দিব', অথবা—

نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت -

—বিশ্রাম দিবসের অনাচারীদিগকে যে প্রকারে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, তাহাদিগকেও সেই প্রকারে অভিশপ্ত করিব, আর আল্লার আদেশ নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।" পণ্ডিত

দুই চারি জন এহুদী ব্যতীত, এহুদী জাতি হজরতের সময় কোর্‌আনকে চরম ধৃষ্টতা সহকারে অমান্য করিয়াছিল। সুতরাং এই আয়ত অনুসারে এই দুই অভিশাপের একটী নিশ্চয়ই তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল। কোন এহুদীর মুখ ফিরিয়া পিঠের দিকে আসিয়াছিল —ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশ্রাম দিবসের ব্যভিচারী এহুদীদিগের উপর যে অভিশাপ আসিয়াছিল—ঠিক সেই অভিশাপটাই যে, হজরতের সমসাময়িক এহুদী-দিগের উপর নিশ্চয়ই পতিত হইয়াছিল, ইহা বেশ জানা যাইতেছে। অথচ সে সময়কার এহুদীরা যে আকৃতিগত ভাবে বাঁদর হইয়া যায় নাই, তাহা স্থির নিশ্চিত। বাঁদরের কোন বিশেষ অবস্থা বা প্রকৃতি তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র।

(খ) শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিতেছেন—আরবী ভাষার একটা সাধারণ ও সর্ব্ববাদী সম্মত নিয়ম এই যে, ذوي العقول বা Rational beingগুলির জন্যই বহুবচনের লক্ষণ ين ও ون ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আজিজী)। ঐ এহুদগুলি বস্তুতঃ বাঁদরে পরিণত হইয়া গিয়া থাকিলে এখানে ون দিয়া তাহার বহুবচন ব্যবহার করা শুদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা মানুষ ছিল বলিয়া ঐরূপ লক্ষণ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও দেখা যায়—এখানে قردة বা বাঁদর স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বিশেষ্য, 'খাছেয়ীন' তাহার 'ছেফৎ' বা বিশেষণ। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিশেষণগুলি বিশেষ্যপদের সমলিঙ্গবাচক হওয়া চাই। অথচ এখানে 'খাছেয়ীন'কে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য তফছিরকারগণ যে সব উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে মোটের উপর উপরের মন্তব্যেরই সমর্থন হইয়া যাইতেছে।

(গ) এমাম রাজী এই আলোচনার উপসংহারে, যথা রীতি ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন—

و بما قررنا جواز المسخ امكن اجراء الاية على ظاهرها و لم يكن بنا حاجة الى التاويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله و ان كان ما ذكره غير مستبعد جدا ـ لان الانسان اذا اصر على جهالته بعد ظهور الايات و جلاء البينات فقد يقال في العرف الظاهر انه حمار و قرد ـ و اذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير اليه محذور البتة ـ

অর্থাৎ—"আমরা দেখাইয়াছি যে, এই প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং আয়তের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ভাবার্থ বা গৌণার্থ গ্রহণের দরকার আমাদের নাই।—যদিও 'মোজাহেদের' ব্যাখ্যা খুব অসংলগ্নও নহে। কারণ, নিদর্শনগুলি প্রকাশ হওয়ার ও যুক্তি প্রমাণগুলি প্রকট হইয়া যাওয়ার পরও মানুষ যখন নিজের মূর্খতার উপর জমিয়া থাকার জন্য জেদ ধরিয়া বসে—সর্ব্বজন বিদিত Idiom অনুসারে প্রচলিত ভাষায় তাহাকে গাধা ও বাঁদর বলা হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই প্রকার ভাবার্থ যখন স্পষ্ট ও সর্ব্ববিদিত হয়, তখন ঐ ভাবার্থ গ্রহণ করাতে নিশ্চয়ই আশঙ্কার কারণ কিছুই থাকে না। (১—৫৫৫)।

সমসাময়িক পণ্ডিতদিগের আক্রমণের ভয়ে এমাম রাজী তাঁহার তফছিরের বহুস্থানে এই প্রকার প্রকারন্তরে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এমাম ছাহেবের এই বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে—বাঁদর-শব্দের যে ভাবার্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, আরবী ভাষায় তাহা সাধারণ ভাবে প্রচলিত ও সর্ব্বজন বিদিত ইডিয়ম, এবং এই অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাতে কোন প্রমাণহীন ও অস্বাভাবিক ঘটনায় বিশ্বাস করারও কোন আবশ্যক হয় না। সেই জন্য আমরা এই সর্ব্বজন বিদিত সাধারণ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি।

তোমরা বিদূরিত বিতাড়িত বাঁদর হও—ইহার তাৎপর্য্য তোমরা যুগপৎভাবে বাঁদরত্ব প্রাপ্ত হও এবং দেশ দেশান্তরে বিতাড়িত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাও! উভয়ই 'কুনু'-পদের 'খবর', তাহাদের মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ নহে। সেই জন্য 'খাছেয়ীন' ও 'কেরাদাতান' দুই শব্দের লিঙ্গগত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

বাঁদরের কএকটা বিশেষ স্বভাব আছে, সে সময়কার এহুদীরা সেই সব স্বভাবকে অর্জ্জন করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিল। তাহার মধ্যকার একটা স্বভাব হইতেছে—পরের অনুকরণ-প্রিয়তা। বিষয়টীর দোষ গুণের বিচার না করিয়া, খোদার দেওয়া জ্ঞান ও 'শরিঅত'কে উপেক্ষা করিয়া তাহারা পরজাতির অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী আয়তে তাহাদের যে গো-পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাও তাহাদের মিসরীয়দিগের অন্ধ অনুকরণের কুফল। তাহার পর আরবী সাহিত্যে, "বাঁদরের কামুকতা" প্রবাদরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ব্যভিচারী ব্যক্তিকে বলা হয়— هو ازني من قرد অর্থাৎ —"লোকটা বাঁদর অপেক্ষাও অধিক ব্যভিচারী"। এহুদী জাতি এই সমস্ত স্বভাবকে অতি মারাত্মকরূপে অর্জ্জন করিয়াছিল।

কুকুরকে মানুষ নিকটে আসিতে দেয় না—যেখানে যায়, সেখান হইতে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়—ইহাই হইতেছে 'খাছেয়ীন' শব্দের ধাতুগত তাৎপর্য্য। এহুদী জাতি দুন্‌য়ার সর্ব্বত্র এইরূপে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইবে, সকল স্থান হইতে এইরূপে বিতাড়িত হইবে, 'খাছেয়ীন' শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে। ছুরা 'নেছা'র ৪৭ আয়তের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, বিশ্রাম দিবস অমান্যকারী এই এহুদীদিগেরও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। হজরতের সমসাময়িক এহুদী জাতি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত ও পরজাতির পদদলিত হইয়াছিল, সুতরাং বিশ্রাম দিবস অমান্যকারী এহুদীদিগকেও এইরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, স্বদেশ হইতে বিতাড়িত এবং পরজাতি কর্ত্তৃত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, ইহা আয়তের স্পষ্ট তাৎপর্য্য। বাইবেলে এহুদী জাতির এই প্রকার পতন ও দুরবস্থার কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটু নমুনা দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি'।

যিহিস্কেল ২২ অধ্যায়ে এহুদীদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

" ...... তুমি আমার পবিত্র বস্তু সকল অবজ্ঞা করিয়াছ, ও আমার বিশ্রাম দিন সকল

অপবিত্র করিয়াছ ...... তোমার মধ্যে লোকে মাতার সহিত (১) ব্যভিচার করিয়াছে, তোমার মধ্যে লোকে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে ...... প্রতিবাসী স্ত্রীর সহিত ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে, কেহ আপন পুত্রবধূকে কুকর্ম্মে অশুচি করিয়াছে ...... আপনার ভগিনীকে বলাৎকার করিয়াছে। ...... আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ও নানা দেশে বিকীর্ণ করিব।"

এহুদী জাতির এই অবস্থার কথাই কোর্‌আনের এই আয়তে বর্ণনা করিয়া মুছলমান-দিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই কুকর্ম্মগুলি অবলম্বন করিলে, আল্লার অপরিহার্য্য বিধান অনুযায়ী, তাহাদিগকেও ঐ প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে।

ইহা যে হজরত মূছার সময়ের ঘটনা নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য আয়তের প্রারম্ভে পূর্ব্ববৎ اذ ,ـ ব্যবহার করা হয় নাই।

৭৭ গো-কোর্‌বানী :—

এই ছুরার ৫২ ও ৫৪ আয়তে বনি-এছরাইলের গো-ভক্তি ও গো-পূজার কথা বলা হইয়াছে। ৯৩ আয়তে বলা হইতেছে— واشربوا في قلوبهم العجل অর্থাৎ—"গো-পূজা ও গো-ভক্তির ভাব তাহাদের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। বাইবেল পাঠে জানা যায়, হজরত মূছার পরে হোশেয় ভাববাদীর সময় পর্য্যন্তও এই গো-পূজা ও গো-ভক্তির ভাব এহুদী জাতির অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া ছিল! (হোশেয় ৮—৫, ১০—৫)। তখনও গোবৎসের প্রতিমা গড়িয়া তাহার পূজা করিত। 'গয়রুল্লার' মায়াকে আল্লার নামে বলিদান করাই সব কোর্‌বানীর সার শিক্ষা। তাই এই মহাপতক হইতে রক্ষা করার জন্য, এহুদীদিগকে বিভিন্ন উপলক্ষে গো-কোর্‌বানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। গুপ্তহত্যার ও অশৌচের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যও এইরূপে গো-কোর্‌বানী করার আদেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিবরণের ২১শ অধ্যায়ে (১—৯) এমন একটী গো-কোর্‌বানী করিতে বলা হইয়াছে "যাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় নাই, যে যোঁয়ালী বহন করে নাই।" গণনা পুস্তকের ১৯শ অধ্যায়ে সদা প্রভুর এই "শাস্ত্রীয় বিধি অবজ্ঞার" কথা জানা যাইতেছে :—"ইস্রায়েল সন্তানদিগকে বল, তাহারা নির্দ্দোষা ও নিষ্কলঙ্কা, যোঁয়ালী বহন করে নাই, এমন এক রক্ত বর্ণা গাভী তোমার নিকট আনুক। ...... তাহার সম্মুখে তাহাকে হনন করা হইবে। পরে ইলিয়াসর যাজক আপন অঙ্গুলী দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগত তাম্বুর সম্মুখে সাত বার ছিঁটাইয়া দিবে।" (১—৫)।

এই গো-পূজার মূলে কঠোর আঘাত করার জন্য, তাহাদের মহা পাতকগুলির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গো-কোর্‌বানীর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এহুদীদিগের তখনকার

(১) বাঙ্গলা অনুবাদে আছে—"পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করিয়াছে।" এখানে আমরা ভাবার্থ দিয়াছি। দেখ—হেনরী ও স্কট কৃত বাইবেলের টীকা ৬১৭ পৃষ্ঠা। এখানে বনি-এছরাইলের দুষ্কর্ম্মের একটা পূরা তালিকাও পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

মানসিকতা অনুসারে "গো-হত্যা" ছিল তাহাদের প্রধান পরীক্ষা। পক্ষান্তরে কোর্‌বানীর গরুর যে সব লক্ষণ তাওরাতে ও কোর্‌আনে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজে জানা যাইবে যে, গো-পূজক জাতিরা এই শ্রেণীর সুদর্শন ও নির্দ্দোষ গরুগুলিকেই পূজার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

আলোচ্য আয়তগুলিতে এই প্রকারের কোন ঘটনা প্রসঙ্গে কোন একটী গাভী কোর্‌বানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গো-ভক্ত এহুদীদের এই আদেশ পালন করার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। সেই জন্য কোন প্রকার ন্যায়ের ফাঁকি বাহির করিয়া তাহারা "গো-হত্যার" পরীক্ষা হইতে রক্ষা পাইতে চাহিয়াছিল। ইহাই ছিল তাহাদের এই সকল অনাবশ্যক প্রশ্নের কারণ।

৬৭ হইতে ৭১ আয়ত পর্য্যন্ত আর একটা স্বতন্ত্র ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সেই জন্য একমাত্র ৬৭ আয়তের প্রারম্ভে وَاِذْ বলা হইয়াছে। ৭২ আয়ত হইতে আবার একটা স্বতন্ত্র ও নূতন ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, সেজন্য সেখানে আবার নূতন করিয়া وَاِذْ "এবং (স্মরণ করিয়া দেখ) যখন" পদ ব্যবহার করা হইয়াছে।

মদিনার এহুদীরা কোর্‌আনের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষার প্রতি চরম ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা বলিত যে "মোহাম্মদ আল্লার নবী"—ইহার কোন প্রমাণ তাওরাতে নাই। আমরাই হইতেছি তাহার বাহক—সুতরাং তাওরাতের কোন আদেশ নির্দ্দেশ অমান্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে—অর্থাৎ মোহাম্মদের কথা তাওরাতের থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা মান্য করিতাম। মদিনায় অবতীর্ণ এই সব আয়তে এহুদীদিগের এই অন্যায় দাবীর উত্তরে তাহাদের জাতির ধাঁরাবাহিক শাস্ত্রদ্রোহিতার কতকগুলি উদাহরণ দিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, তাওরাতকে তাহারা কস্মিনকালেও মান্য করে নাই। সুতরাং হজরতের কথা তাওরাতে থাকা না থাকার তর্ক উত্থাপন করার কোন অধিকারই তাহাদের নাই।

নবম রুকু'

এহুদীদিগের অত্যাচার

৭২ এবং তোমরা যখন একজন (বিশিষ্ট) ব্যক্তিকে নিহত (করার উদ্যোগ) করিয়াছিলে, পরে তৎসম্বন্ধে দোষ স্খালনের চেষ্টা করিয়াছিলে; অথচ তোমরা যাহা গোপন করিতে চাহিতেছিলে, আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

٧٢ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا، وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

৭৩ আমরা তখন বলিলাম—"এই হত্যা ব্যাপারকে ঐ ব্যক্তির (জীবন-ইতিহাসের) কোন এক অংশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মৃতকে আল্লাহ্ এইরূপে জীবন দান করেন এবং তোমাদিগকে এইরূপে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন—যেন তোমরা তাহা জ্ঞানগম্য করিয়া লইতে পার।"[৭৮]

٧٣ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا، ذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

৭৪ তদন্তর তোমাদের হৃদয়গুলি ইহার পর কঠিন হইয়া গেল, ফলে তাহা প্রস্তরবৎ, বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর। কারণ কোন কোন প্রস্তর এরূপ আছে, বস্তুতঃ যাহা হইতে

٧٤ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً، وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا

يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ، وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ؛ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

নির্ঝর সমূহ উচ্ছসিত হইয়া থাকে এবং কোন কোন প্রস্তর এরূপও আছে — যাহা বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং বস্তুতঃ তাহা হইতে জল নির্গম হইতে থাকে ; এবং কোন কোন প্রস্তর এরূপ আছে যাহা বস্তুতঃ আল্লার ভয়ে অধঃপতিত হয় — আর তোমাদিগের কৃত কর্ম্ম সম্বন্ধে আল্লাহ্ উদাসীন নহেন।

٧٥ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

৭৫ তবুও কি তোমরা (হে মুছলমানগণ !) আশা পোষণ করিতেছ যে, এহুদীরা তোমাদিগের (ধর্ম্মের) প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে ! অথচ তাহাদিগের মধ্যকার একদল আল্লার বাণীকে শ্রবণ করিত, তদন্তর তাহা হৃদয়ঙ্গম করার পর তাহাকে জ্ঞাতসারে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিত।

٧٦ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا، وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا

৭৬ এবং মুছলমানদিগের সহিত সাক্ষাৎ কালে ইহারা বলে :— "আমরা ঈমান আনিয়াছি।" পরন্তু তাহারা যখন নিভৃতে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, (তখন) বলিয়া থাকে :— " আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি

فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, মুছলমানদিগকে কি তাহা বলিয়া দিয়া থাক — যাহাতে তোমাদিগকে তাহারা তোমাদের প্রভুর সন্নিধানে প্রমাণ বলে পরাস্ত করিতে পারে? তোমরা কি বুঝিতে পার না!"

৭৭ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

৭৭ আল্লাহ্ যে তাহাদের গুপ্ত ও ব্যক্ত (সমস্তই) জ্ঞাত আছেন —ইহারা কি তাহাও অবগত নহে!

৭৮ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ

৭৮ এবং তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে—কতিপয় কাল্পনিক ধারণা ব্যতীত 'কেতাবের' (তাওরাতের) কিছুই তাহারা অবগত নহে, অপিচ তাহারা কেবল অনুমানই করিয়া থাকে।

৭৯ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ، فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ

৭৯ অতএব ধিক তাহাদিগকে নিজহস্তে যাহারা কেতাব লিখিয়া থাকে, তদন্তর বলিয়া থাকে— "ইহা আল্লার নিকট হইতে (সমাগত)।" কারণ ইহা দ্বারা তাহারা সামান্য আর্থিক বিনিময় লাভ করিতে চায়! অতএব ধিক তাহাদের সেই

لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

হস্তলিপিকে, আর ধিক তাহাদের সেই উপার্জ্জনকে !

৮০ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

৮০ তাহারা আরও বলিয়াছে — "গণিত কএকটা দিন ব্যতীত আগুণ আমাদিগকে কখনই স্পর্শ করিতে পারিবে না।" (হে মোহাম্মদ !) তুমি বল— "তোমরা কি আল্লার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছ (তাই মনে করিতেছ) যে আল্লাহ্ কদাচ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না ! অথবা আল্লার নামে এমন কথা কহিতেছ (যাহার সত্যতা) তোমরা অবগত নহ ?"

৮১ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞

৮১ হাঁ !—যে কোন ব্যক্তি পাপ অর্জ্জন করে এবং সেই পাপ তাহাকে (চতুর্দ্দিক হইতে) পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে, তাহারা ত নরকেরই অধিবাসী —সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

৮২ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

৮২ আর যাহারা ঈমান পোষণ করে ও সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে — বেহেশ্‌তের অধিবাসী তাহারাই, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

টীকা :—

৭৮ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টা :—

এই রুকুর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এবং ইহার পরবর্ত্তী কএকটা রুকুতে হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের কার্য্য কলাপের বর্ণনা করা হইতেছে। আমাদের তফছিরকারগণও এ কথা স্বীকার করিতেছেন, তবে ৭২ ও ৭৩ আয়ত যে হজরত মূছার সমসাময়িক এহুদী-দিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাও তাঁহাদের অভিমত। তাঁহারা বলিতেছেন যে, পূর্ব্ব রুকুর ৬৭ হইতে ৭১ আয়ত পর্য্যন্ত যে গো-কোর্‌বানী করার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, এই রুকুর ৭২ ও ৭৩ আয়ত সেই একই ঘটনার উপসংহার। তফছিরের রাবীদিগের মধ্যে প্রচলিত একটা গল্পকে রক্ষা করার জন্য তাঁহারা এই প্রকার অসঙ্গত অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে গল্পটার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রাবী লোকেরা বয়ান করিতেছেন :—

"ইস্রাইলীয়দিগের মধ্যে একজন সজ্জন লোক ছিল, তাহার একটী গো-শাবক ছিল। সে মৃতুকালে নিজের শিশু সন্তানের জন্য উক্ত শাবকটী কোন বনে আল্লাহ তায়ালার উপর সমর্পন করিয়া রাখিয়া যায়। তাহার স্ত্রী উক্ত নাবালেগের প্রতিপালন করিতে থাকে, সেই সন্তানটী যুবক হইয়া এরূপ সচ্চরিত্র হইল যে, আপন বৃদ্ধা মাতার বিস্তর সেবা ভক্তি করিত। এক দিবস উক্ত স্ত্রীলোকটী সন্তানকে বলিল যে, তোমার পিতা একটী গরু অমুক বনে আল্লাহ তায়ালার রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি উক্ত গরুটী ঐরূপ রক্ষণাবেক্ষণের সহিত আনয়ন কর। সে বনে গিয়া আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করিয়া উক্ত গরুকে ডাকিল, ইহাতে সে দেখিতে পাইল যে, বনের মধ্য হইতে একটী সুস্থকায় শক্তিশালী জরদ রং বিশিষ্ট শুশ্রী নির্দ্দোষ গরু শিক্ষিত পশুর ন্যায় সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পথিমধ্যে আল্লাহ তায়ালার মহিমা বলে গরুটী বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, হে সজ্জন মাতার সেবক, তুমি কেন পদব্রজে চলিতেছ ? আমার উপর আরোহণ কর। সে ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, হে সৎ পশু, আমার মাতা তোমার উপর আরোহণ করিতে হুকুম করেন নাই। গরু বলিল, তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ ; যদি তুমি আমার উপর আরোহণ করিতে, তবে আমি তোমার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া বনে চলিয়া যাইতাম। সে উহাকে মাতার নিকট আনিলে, তিনি পরিজনের জীবিকার জন্য উহা বাজারে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়া বলিলেন, গরুর মূল্য যাহা হউক আমার পরামর্শ ব্যতিরেকে উহা বিক্রয় করিবে না। সে গরুটী বাজারে লইয়া গেলে এক ব্যক্তি কিছু মূল্য দিতে চাহিল। সে বলিল, আমার মাতার নিকট হইতে জানিয়া আসি। ক্রেতা বলিল, তুমি জিজ্ঞাসা করিও না, তোমাকে দ্বিগুণ মূল্য দিব। সে তাহা শুনিল না। অবশেষে তাহার মাতা মূল্য বৃদ্ধিকারীর নিকট এসম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। ইনি উক্ত স্ত্রীলোককে ছালাম জানাইয়া বলিয়া পাঠ

সে যেন এই গরুটী বিক্রয় না করে, কারণ ইস্রাইলীয়গণের ইহার আবশ্যক হইবে, সেই সময় যেন উহার সম ওজন স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বিক্রয় করে।"

এই গল্পটী হইতেছে আসল গল্পের ভূমিকা। ক্রেতারূপী ফেরেশ্‌তার ইঙ্গিতে বিধবা ও তাঁহার এই সজ্জন পুত্র গরু বিক্রয় স্থগিত রাখিলেন। এ দিকে আর এক ঘটনা ঘটিল। এহুদীদিগের মধ্যে একজন খুব অর্থশালী লোক ছিল, ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত তাহার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। অর্থের লোভে এই ভ্রাতুষ্পুত্র চাচাকে খুন করিয়া রাত্রে অন্য এক পল্লীর নিকট ফেলিয়া আসিল। অনেক গণ্ডগোলের পর লাশ আবিষ্কার করিয়া সে ঐ পল্লীবাসীর উপর চাচার খুনের ও তজ্জনিত ক্ষতি পূরণের দাবী উপস্থিত করিল। নির্দোষ পল্লীবাসীরা ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে এহুদীদিগের প্রার্থনা মতে হজরত মূছা আল্লার নিকট দোওয়া করিলে হুকুম হইল যে, বনি-এছরাইল একটা গরু জবেহ করিয়া তাহার অংশ বিশেষকে দিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিবে।

বনি-এছরাইল দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সন্ধান করার পর এক ব্যক্তির নিকট এইরূপ লক্ষণ যুক্ত একটা গাভী প্রাপ্ত হইল এবং তাহার দশগুণ ওজনের স্বর্ণমুদ্রা মূল্য স্বরূপ প্রদান করিয়া তাহাকে কিনিয়া লইল। তাহার পর ঐ গরু জবাই করিয়া তাহার কোন এক অঙ্গ দ্বারা নিহত ব্যক্তির কবরের উপর আঘাত করা হইলে, সে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ব[illegible] আমার ভাতিজাই আমাকে 'কতল' করিয়াছে, তাহার পরই সেই ব্যক্তি অ[illegible] হইয়া গেল।

ইহাই হইল গল্পের সার ভাগ, এবং এই গল্পটাকে বজায় রাখার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব রুকুর শেষ ভাগে বর্ণিত গো-কোর্‌বানী করার একটা স্বতন্ত্র ঘটনাকে, নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে এই রুকুর ৭২ ও ৭৩ আয়তের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই গল্পটী একটা ভিত্তিহীন উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই দাবীর প্রমাণগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) কোর্‌আন বা হাদিছে এই গল্পের বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ নাই। তফছিরের রাবীগণও হজরত মূছার সময় উপস্থিত ছিলেন না। কোন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক সূত্রেও তাঁহারা উহা অবগত হন নাই। সুতরাং উহার কোন মূল্য নাই। এই জন্য এব্‌নে কছির এই সকল গল্প গুজবের উল্লেখ করার পর বলিতেছেন :—

والظاهر انها ماخوذة من كتب بني اسرائيل - ١-١٠٢.

—"উহা এহুদীদিগের পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।" এহুদীদিগের 'মিছনায়' যে গল্পটী বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের রাবীগণ তাহার বিকৃত বিবরণের সহিত কতকগুলি নূতন কল্পনা যোগ করিয়া দিয়া এই অভিনব কাহিনীটী সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন।

(খ) পাঠকগণ দেখিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বকার কএকটা রুকুতে, বনি-এছরাইলের প্রতি আল্লার বিশেষ বিশেষ 'ন্যামতের' এবং তাহাদের অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার বিশেষ

বিশেষ ঘটনাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক নূতন ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করার সময় وَإِذْ —'এবং যখন' পদ দ্বারা এই স্বাতন্ত্র্যটা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ৬৭ আয়ত হইতে একটা নূতন ঘটনা আরম্ভ হইয়া এবং ৭১ আয়তে তাহা শেষ হওয়ার পর, ৭২ আয়তের প্রারম্ভে আবার وَإِذْ —'এবং যখন' আনা হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, ৬৭ হইতে ৭১ আয়ত পর্য্যন্ত গো-কোর্‌বানীর ঘটনার সহিত, ৭২ ও ৭৩ আয়তে বর্ণিত নরহত্যা জনিত ঘটনার কোনই সম্বন্ধ নাই—উহা পরস্পর সংশ্রবহীন দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনা। অথচ দুইটাকে এক ঘটনা না বলিলে তাঁহাদের এই কল্পনার সার্থকতা কিছুই থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের কল্পিত এই গল্পটী যে, কোর্‌আনের বর্ণনা ধারার বিপরীত, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

(গ) গল্পে বলা হইতেছে যে, ভাতিজা চাচাকে খুন করার পর গরু জবাই করার ও নিহত ব্যক্তিকে তাহার মাংস ফেলিয়া মারার হুকুম হইয়াছিল। সুতরাং হত্যা নিশ্চয়ই অগ্রে ঘটিয়াছিল, গো-কোর্‌বানীর আদেশ তাহার পরে দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহার পর গরু সংগ্রহ করিয়া জবাই করা হইয়াছিল। কিন্তু কোর্‌আনে গরু জবাইএর ঘটনা অগ্রে (৬৭—৭১ আয়তে), এবং নরহত্যার কথা তাহার পরে (৭২ ও ৭৩ আয়তে) বর্ণিত হইয়াছে। উভয় স্থলে একই ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হইলে, ৭২ আয়তকে ৬৭ আয়তের পূর্ব্বে স্থাপন করা হইত। এই সমস্যার সমাধান করার আগ্রহাতিশয্যবশতঃ একদল লোক এখানে কোর্‌আনের 'তর্‌তিব'কে উল্টাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই! এমাম রাজী প্রমুখ তফছিরকারেরা, এ জন্য যে ব্যর্থ কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন (কবির ১—৫৬৫) তাহা দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। সে যাহা হউক, আয়তগুলির 'তর্‌তিব' এক বাক্যে বলিয়া দিতেছে, ৭২ আয়তের নরহত্যা, আর ৬৭ আয়তের গো-কোর্‌বানী দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনা—অধিকন্তু নরহত্যার ব্যাপার গো-কোর্‌বানীর ঘটনার পরে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং কোর্‌আন হইতে গল্পটীর ভিত্তিহীনতাই প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

(ঘ) গল্পে বলা হইতেছে যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর গরু খুঁজিয়া বাহির করিতে চল্লিশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, ৭৩ আয়তের প্রথমে فقلنا اضربوه পদে فاے تعقيب আনা হইয়াছে (কবির ১—৫৬৬)। উহার অর্থ—বিনা ব্যবধানে, অব্যবহিত পরে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, ৭২ আয়তে বর্ণিত হত্যার অব্যবহিত পরেই গরু জবাই করা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা দ্বারাও গল্পের অসত্যতা খুব স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইতেছে।

(ঙ) 'শিক্ষিত ও বাকপটু' গরুর ও তাহার মালেকের কাহিনীতে বলা হইতেছে যে, গরুটীর মূল মালিক বাছুর বেলায় তাহাকে বনে ছাড়িয়া দেন। তাহার পর একটী নাবালক পুত্র ও বিধবা স্ত্রীকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। পুত্র 'যুবক হওয়ার পর' মাতৃ-

তাহাকে বন হইতে গরুটী ফিরাইয়া আনিতে বলেন। এই গরু বাড়ী আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে, কোন মহাপুরুষ বা ফেরেশ্‌তা যুবককে গরু বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়া দেন—"ইস্রাইলীয়গণের ইহার আবশ্যক হইবে, সেই সময় যেন উহার সম ওজন স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বিক্রয় করে।" তাহার পর হত্যাকাণ্ড এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত গরুর সন্ধান ইত্যাদি। কাজেই যে সময় এহুদীরা ঐ গরুটী জবাই করিয়াছিল, তখন তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কম কোন মতেই হইতে পারে না। এ দিকে কোর্‌আনের বর্ণনা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, কোর্‌বানীর গরুটী বৃদ্ধও নয়, বাছুরও নহে—এ দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যবয়স্কা ছিল (৬৮ আয়ত)। পঞ্চাশ বৎসরের গরুকে জওয়ান বা মধ্য বয়স্ক কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহা হইতে গল্পটীর অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

(চ) ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের গুপ্তহত্যা প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সচরাচরই সংঘটিত হইয়া থাকে। আলোচ্য আয়তের এই হত্যা ব্যাপারটা ইতিহাসের কোন একটা গুরুতর ঘটনা না হইলে কোর্‌আনে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ হইত না। পক্ষান্তরে আয়তে হত্যাকারীদিগকে বরাবরই বহুবচনাত্মক পদ দ্বারা বিশেষিত করা হইতেছে। অধিকন্তু আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, এই হত্যার ব্যাপার লইয়া জাতির হিসাবে এহুদী সম্প্রদায়কে ভৎর্সনা করা হইতেছে। সুতরাং জাতির হিসাবে তাহারা যে ব্যাপারে লিপ্ত ছিল না, এবং জাতির হিসাবে যে অভিসন্ধিকে গোপন করার চেষ্টা তাহারা করে নাই, তাহা লইয়া একটা গোটা সমাজকে তিরস্কার করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ গল্প-রচয়িতারা যখন নিজ মুখে স্বীকার করিতেছেন যে, বনি-এছরাইল সাধারণ ভাবে অপরাধীকে ধরিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আয়তের সঙ্গে গল্পটীর খাপ খাওয়ান কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

(ছ) গল্পটাকে আয়তের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য তফছিরকারগণকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধেও অনেক অসঙ্গত কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, যথা—(১) উহ্য স্বীকার— فضربوه ببعضها فحي —'তখন তাহারা মৃত ব্যক্তিকে গো-মাংস ফেলিয়া মারিল, ফলে সে জীবিত হইয়া উঠিল'—এতটা অংশ উহ্য না মানিলে চলিতে পারে না। (২) কষ্ট কল্পনা— فاضربوه ক্রিয়াপদের কর্ম্ম হইতেছে ه 'জমির' বা সর্ব্বনাম। তাহাকে—অর্থে কাহাকে, কাহাকে 'মাংস দিয়া' মারিতে বলা হইতেছে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ঐ সর্ব্বনামের বিশেষ্য হইতেছে 'কতিল' বা নিহত ব্যক্তি। কিন্তু 'কতিলের' নাম গন্ধও ত আয়তে নাই। তাই তাঁহারা বলিতেছেন—'হত্যা করিলে'-ক্রিয়াপদের মধ্যে 'মছদর' হইতেছে 'কতল'—'কতল' বা হত্যা হইলে একজন 'কতিল' বা নিহতের ভাবও মনে জাগিয়া উঠে। এই হিসাবে সর্ব্বনামের সৎকার সম্পন্ন করা হইয়াছে। (৩) ব্যাকরণের প্রতি অত্যাচার—৭২ আয়তে সেই নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে نفسا শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এখানে

এই শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গবাচক বলিয়া فادارئتم فيها পদাংশে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ها সর্ব্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহার পাঁচটী মাত্র শব্দ পরে সেই নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে এত কষ্ট কল্পনার মধ্য দিয়া ه সর্ব্বনাম না আনিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক ها সর্ব্বনাম আনাই সঙ্গত ছিল।

গল্পটীর সহিত কোর্‌আনের যে কোন সম্বন্ধ নাই, বরং উহা যে কোর্‌আনের বর্ণনার বিপরীত একটা ভিত্তিহীন বাজে রূপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই সকল যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়া যাইতেছে।

আয়তের প্রকৃত তাৎপর্য্য ঃ—

আলোচ্য আয়ত-দুইটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য আবিষ্কারের জন্য আমরা দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। এ সম্বন্ধে পড়িবার ও বুঝিবার যাহা আছে, নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে তাহা পড়িতে ও বুঝিতে চেষ্টার ক্রটী করি নাই। আধুনিক মুছলমান লেখকগণ এখানে যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহাও বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিয়াছি এবং শেষে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই আয়ত দুইটীতে দূর অতীতের কোন প্রাচীন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নাই। বরং উহাতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সমসাময়িক এহুদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের দুষ্কীর্ত্তির কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহারা হজরতকে হত্যা করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র পুনঃ পুনঃ করিয়াছে, কিন্তু আল্লার অনুগ্রহে তাহাদিগের সে চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র বরাবরই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এখানে এই সকল গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও হত্যা চেষ্টার কথাই উল্লেখ করা হইতেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এহুদীদিগের এই সব দুরভিসন্ধির বিবরণ নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'বদর' যুদ্ধের পর মদিনার এহুদীরা হজরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠায়—আপনার সহিত আমাদের ধর্ম্ম লইয়াই যত বিসম্বাদ। আমরা ইহার মীমাংসা করিয়া লইতে চাই। অতএব আপনি ৩০ জন মুছলমানকে লইয়া আসুন, আমরা ৩০ জন এহুদী পণ্ডিতকে লইয়া যাইতেছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা করিয়া লওয়া হউক। ইহাতে হজরত লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাহারা আবার বলিয়া পাঠাইল—প্রতিজ্ঞা-পত্রের দরকার নাই, আপনি দুই জন মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া আসুন, আমরা তিন জন এহুদী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই সব বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া লইতেছি।

"তখন হজরতও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দুই জন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, সুতরাং কেহই অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইলেন না। পক্ষান্তরে এহুদীগণ বস্ত্রের মধ্যে খঞ্জর, খড়্গ প্রভৃতি খরধার অস্ত্র শস্ত্র লুকাইয়া লইয়া বহির্গত হইল। সমস্ত এহুদীই যে এই সময় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এছলামের পূর্ব্বে আওছ ও খাজরাজ বংশের

সহিত মদিনার এহুদীদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল। জনৈক আন্‌ছারের ভগ্নী মদিনার একজন বিশিষ্ট এহুদীর সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া, গোপনে তাঁহার ভ্রাতাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। আবু দাউদ باب خبر النضير অধ্যায়ে জনৈক ছাহাবী কর্ত্তৃক একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, এবং হাফেজ এবনে হাজর 'ফৎহুল্ বারী' গ্রন্থে মোহাদ্দেছ এবনে মর্দ্দওয়হ কর্ত্তৃক বর্ণিত আর একটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই হাদিছটী যে ছহী ছনদ সহকারে বর্ণিত, এবনে হাজর তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই দুইটী হাদিছ হইতে উপরের বর্ণনাগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম।" (মোস্তফা-চরিত)।

'খায়বার' অভিযানের পর এহুদীরা আবার হজরতকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল। এজন্য তাহারা মাংসের সহিত তীব্র বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিল। তাহার এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হজরত সতর্ক হন। জনৈক ছাহাবী এই মাংস খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অবশেষে এহুদীদিগের এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। এবং তাহারা স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য হয়। (ঐ—৬৫৭)।

এই রুকুর ৮০ আয়তে এহুদীদিগের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—তাহারা বলিল—"গণিত কএক দিবস ব্যতীত আগুণ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।" এবনে জরির, আহমদ, বোখারী, দারমী, নাছাঈ, বাইহাকি প্রভৃতি গ্রন্থে, ছাহাবী জয়দ-এবনে-আছলম ও আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হাদিছে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খায়বারের এই বিষদানের মোকদ্দমার বিচারের সময়ই হজরতের একটী প্রশ্নের উত্তরে এহুদীরা ঐ কথা বলিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতিবাদ স্বরূপে এই আয়ত এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। (মনছুর ১—৮৪, ৮৫)।

৭৪ আয়তের শেষ ভাগে বলা হইতেছে— و ما الله بغافل عما تعملون —এখানে تعملون 'মোজারে'—বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকাল ব্যতীত, অতীতকাল ইহার অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই আয়তটীতেও হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের কার্য্যকলাপের কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'কাফ্‌ফাল' বলিতেছেন—আয়তে "তোমাদিগের হৃদয়"—পদে 'তোমাদিগের' অর্থে, হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের—এরূপও হইতে পারে। এমাম রাজী ইহার উপর বলিতেছেন—

وهذا اولى ' لان قوله تعالى ثم قست قلوبكم خطاب مشافهة فحملـــة على الحاضرين اولى -

—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত অর্থ। কারণ, আয়তে, "অতঃপর তোমাদিগের হৃদয়গুলি কঠিন হইয়া গেল"—পদে, উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করা বুঝা যাইতেছে। অতএব উপস্থিত লোকদিগের প্রতি উহার প্রয়োগ করাই অধিক সঙ্গত। (কবির ১—৫৬৯)। সুতরাং

৭৪ আয়তেও যে হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছি।

আমাদের মতে ইহা একমাত্র—এবং তফছিরকারগণের মতে অধিক সঙ্গত—তাৎপর্য্য। যাহা হউক, এই একমাত্র বা অধিক সঙ্গত তাৎপর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ৭৪ আয়তের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে বুঝা যাইবে যে, ৭২ ও ৭৩ আয়তের ঘটনার সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কারণ ৭৩ আয়তে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আল্লার নিদর্শনগুলির কথা বলা হইয়াছে, ৭৪ আয়তে "ইহার পর"—অর্থে সেই নিদর্শনগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পর। সুতরাং হজরতের সমসাময়িক এহুদীরাই যে সেই নিদর্শনগুলি দর্শন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। অতএব অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, ৭২ ও ৭৩ আয়তের বর্ণিত হত্যাকাণ্ডও হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হজরত মূছার সমসাময়িক এহুদীদিগের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

হজরতের সমসাময়িক মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া ৭৫ আয়তে প্রশ্ন করা হইতেছে —"তবুও কি তোমরা আশা করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের ধর্ম্মে ঈমান আনিবে?" এখানে "তাহারা" অর্থে কাহারা? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার সময় সহজে দেখা যায় যে, মুছলমানদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস করা যাহাদের পক্ষে সম্ভব এবং যাহাদের কথা পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহই এই সর্ব্বনামের বিশেষ্য হইতে পারে না। হজরত মূছার সময়ের এহুদীদিগের পক্ষে দীর্ঘ তিন হাজার বৎসর পরে 'কবর' হইতে বাহির হইয়া মুছলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা কখনই সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে ছাহাবীরা হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগেরই এছলাম গ্রহণের আশা পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বকার (৭২, ৭৩ ও ৭৪) আয়তেও হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে।

আমাদের মতে এই যুক্তিগুলি দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, হজরতের সমসাময়িক এহুদীগণ কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল, ৭২ ও ৭৩ আয়তে তাহারই কথা বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে ঘটনার সময় বর্ত্তমান ছাহাবাদিগের বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এখানে খায়বারের বিষদানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত মূছার সময়কার এহুদী-দিগের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের যে কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এখন আয়ত দুইটীর আবশ্যকীয় অংশগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا —"এবং যখন তোমরা একজন (বিশিষ্ট) ব্যক্তিকে নিহত (করার ষড়যন্ত্র) করিয়াছিলে।"

এখানে "নাফ্‌ছান্‌" শব্দ 'নাকেরা', সাধারণতঃ উহা দ্বারা একটা গুরুত্ব মহত্ত বা তা'জীমের ভাব সূচিত হইয়া থাকে। এই ভাব প্রকাশ করার জন্য বন্ধনীর মধ্যে "বিশিষ্ট" শব্দ যোগ করা হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই হইতেছেন, আয়তের বর্ণিত সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'কতল'—অর্থে হত্যা করা, হত্যার সঙ্কল্প বা উদ্যোগ করা, উভয়ই হইতে পারে। (রাগেব)। কোর্‌আনে বলা হইয়াছে—'যখন তোমরা নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হও' اذا قمتم الى الصلوة—তখন অজু সম্পাদন কর। অর্থাৎ যখন তোমরা নমাজ পড়ার সঙ্কল্প কর। নমাজে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে অজু করিতে হয়, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অন্যত্র বলা হইতেছে— اذا قرأت القران فاستعذ الاية—'যখন কোর্‌আন পাঠ কর তখন, 'আউজ বিল্লাহ' বলিবে।' 'আউজ বিল্লাহ' পড়িতে হয় কোর্‌আন আরম্ভ করার পূর্ব্বে। অর্থাৎ যখন তুমি কোর্‌আন পাঠের সঙ্কল্প কর। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত অভিমত, অলঙ্কারে ইহাকে বলা হয়— ارادة الفعل بالفعل المسبب بها। (দেখ—রাগেব, বায়জাভী প্রভৃতি)।

(২) فادارئتم فيها—

ادارئتم ক্রিয়াপদের অর্থ—বিসম্বাদ করা এবং অপরাধীর দণ্ড হইতে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা, রেহাই পাওয়া, কোন জিনিষকে সরাইয়া দেওয়া। হাদিছে আছে— ادرؤا الحدود بالشبهات—'সন্দেহ জন্য আসামীর দণ্ড রহিত করিয়া দাও।' (রাগেব, বেহার—দরউন, কবির ১—৫৬৫)। খায়বারের এহুদীগণ এই বিষদানের ব্যাপার স্বীকার করিয়াও নিজের সদুদ্দেশ্য দেখাইয়া দোষ স্খালনের ও দণ্ড হইতে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল—তুমি সত্যবাদী কি ভণ্ড, তাহাই পরীক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। ভণ্ড হইলে বিষ খাইয়া তোমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে, আর সত্যবাদী হইলে আল্লাহ তোমাকে বিষের কথা জানাইয়া দিবেন—তুমি রক্ষা পাইবে। এই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হজরতের সম্মুখে নানা বিষয় লইয়া বাদ বিসম্বাদও করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও দুইবার এহুদীরা হজরতকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল। আল্লার অনুগ্রহে এ সমস্ত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা হজরতের গোচরীভূত হইয়া যায় এবং তাহাতে তাঁহার প্রাণ বাঁচিয়া যায়। এহুদীদিগের এই সব গুপ্ত ষড়যন্ত্র আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দিলেন— والله مخرج ما كنتم تكتمون—"অথচ তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন"—আয়তের ইহাই তাৎপর্য্য।

(৩) فقلنا اضربوه ببعضها—

এখানে প্রথম আলোচ্য 'জর্ব্বন' শব্দ। আরবী ভাষায় ইহার এক অর্থ—তুলনা করা, দুইটী বস্তুর বর্ণনা করিয়া তাহাদের তুলনায় সমালোচনা করা। كذلك يضرب الله الحق و الباطل আয়তে—"এইরূপে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার তুলনা করিয়া দেখান"—এই

তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে 'হইবে। وما ضربوه لك الا جدلا আয়তেও এই তাৎপর্য্য গৃহীত হইবে।

এহুদী জাতির এই অবিরাম হত্যা-চেষ্টা এবং তাহার জন্য তাহাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বিশেষতঃ খায়বারের এই বিষদানের ব্যাপার—এক দিকে, আর রহমতুল্‌-লিল-আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রত্যেক ব্যাপারে তাহাদের প্রতি ক্ষমা, দয়া ও প্রেম প্রকাশের স্বর্গীয় আদর্শ—অন্য দিকে। এখানে এহুদীদিগকে বলা হইতেছে—মোস্তফার এই অনুপম স্বর্গীয় মহিমার যে কোন এক আদর্শের সহিত নিজেদের জঘন্য মনোবৃত্তির তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখ।

(৪) كذلك يحي الله الموتى —

"এইরূপে আল্লাহ মৃতদিগকে জীবন দান করেন"। জীবন ও মৃত্যু, কোর্‌আনে আধ্যাত্মিক জীবন মরণ সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে।—او من كان ميتا فاحييناه ('আনআম'), اذا دعاكم لما يحييكم ولكم فى القصاص حياة ('নহল'), انك لا تسمع الموتى প্রভৃতি আয়তে এই আধ্যাত্মিক জীবন মরণের কথাই বলা হইয়াছে। হজরতের নবী-জীবনের সার্থকতা ছিল—আধ্যাত্মিক মরণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া মানবকে নব জীবন দান করা। হজরতের প্রাণ রক্ষা করিয়া আল্লাহ মৃত আরব জাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

আয়তে বলা হইতেছে—'এইরূপে আল্লাহ মৃতদিগকে জীবন দান করেন এবং তোমা-দিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করেন—যেন তোমরা জ্ঞানবান হও।' পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে 'তোমাদিগকে'—অর্থে হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগকেই বুঝাইতেছে। হজরতের প্রাণকে কোরেশ ও এহুদীদিগের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহা দ্বারা সমগ্র আরব জাতির মধ্যে আল্লাহ যে জীবনের উন্মেষ করিতেছিলেন—এহুদীরা তাহা দেখিতেছিল। ইহাই আল্লার নিদর্শন, এই নিদর্শন দেখিয়া এহুদীদের জ্ঞান লাভ করা উচিত ছিল। হজরত সত্য নবী হইলে এই ভীষণ কালকুট হইতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইবে—খায়বারের এহুদীগণ নিজেরাই এ-কথা বলিয়াছিল। এই পরীক্ষায় তাহারা দেখিল—সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া হজরতের সহচর অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—অথচ হজরতের জীবন বাঁচিয়া গেল। হজরত যে সত্য নবী, এই পরীক্ষার পর তাহা স্বীকার করা এহুদীদিগের উচিত ছিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয় প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন হইয়া গিয়াছিল—তাহারা তাঁহাকে স্বীকার করিল না।

৭৯ **হৃদয়—প্রস্তর :—**

কোন বস্তুর কঠিনতা অধিক মাত্রায় বুঝাইতে হইলে পাথরের সহিত তাহার তুলনা করা হয়। এখানে এহুদীদিগের হৃদয়কে ঐরূপে পাথরের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার সঙ্গে

সঙ্গে বলা হইয়াছে—'বরং সেগুলি প্রস্তর অপেক্ষাও অধিক কঠিন।' তাহার পর, পরস্পর তিনটা নজির দিয়া দেখান হইয়াছে যে, প্রস্তর ও পর্ব্বতও খোদার হুকুম মানিয়া চলে—তাহাকে যে ধর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম সে কখনও করে না। কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে যে, يسبح لله ما في السموات و ما في الارض—"স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রত্যেক বস্তুই আল্লার তছবিহ করিয়া থাকে।" النجم و الشجر يسجدان—"নক্ষত্র ও বৃক্ষ আল্লার ছেজদা করিয়া থাকে।" এই শ্রেণীর আয়তগুলি যে রূপক ভাবে বলা হইয়াছে এবং আমাদের মত তছবিহ (=ছোবহানাল্লাহ—এই শব্দ উচ্চারণ) অথবা আমাদের মত ছেজদা (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত) যে তাহারা করে না, ইহা আলেমগণ বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমাম এবনে হজ্‌মের ন্যায় গোঁড়া ও জাহেরী নামে খ্যাত ব্যক্তিও এই প্রকার ধারণাকে ঘোর অধর্ম্ম ও মূর্খতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য ملل و نحل ১—৮১ হইতে ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলা কোর্‌আনে বলিয়া দিতেছেন—

و ان من شيئ الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم -

—"এবং এমন কোন বস্তু নাই—যাহা আল্লার তছবিহ করে না, তবে তাহাদের সে তছবিহ তোমরা বুঝিতে পার না।" এইরূপে প্রস্তরেরও যে একটা অনুভূতি আছে, এখন বিজ্ঞান জগত কোর্‌আনের ঘোষিত এই সত্যকে একটু একটু করিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোর্‌আনের শিক্ষার বরকতে আমাদিগের আলেমগণ ইহা চিরকালই অবগত ছিলেন, এমন কি ইহা ছুন্নৎ জমাতের একটা সর্ব্ববাদী সম্মত অভিমতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিতেছেন—

و نزد اهل سنت و جماعت هر يكے را از جمادات و حيوانات روحے ست معرف -
فتح العزيز - ۲۰۵-۱ -

অর্থাৎ—"ছুন্নৎ জমাতের 'আকিদা' মতে জড় ও জীবের প্রত্যেকেরই এক একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে।" (আজিজী ১—২০৫)। মনের কঠিনতা সম্বন্ধে ১২নং টীকাতে আলোচনা করা হইয়াছে।

৮০ তাহরিফ বা প্রক্ষেপ :—

'তাহরিফ' বা প্রক্ষেপ নানা প্রকারে হইতে পারে। যেমন, অর্থের পরিবর্ত্তন করিয়া, শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন শব্দ বা পদ যোগ করিয়া দিয়া, কোন শব্দ বা পদ বাহির করিয়া দিয়া। এহুদীরা যে এইরূপ সকল প্রকারের 'তাহরিফ' করিতে অভ্যস্ত ছিল, কোর্‌আনে ও হাদিছে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বয়ং 'তাওরাত'ই ইহার সাক্ষী, এবং ইহা আজ জ্ঞানী সমাজের নিকট অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত একটা সাধারণ সত্য। বিস্তারিত

আলোচনার জন্য দেখ 'মোস্তফা-চরিত'—ভূমিকা, মেলাল ১—২৬৬, ব্রিটানিকা ও বাইবেলিক্যা বিশ্বকোষ প্রভৃতি।

৮১

স্বজাতির এই সকল দুষ্কর্ম্মের বিবরণ হজরতের মুখে ব্যক্ত হইতে দেখিয়া এহুদীরা খুবই আশ্চার্য্য বোধ করিতে থাকে—এই সকল বৃত্তান্ত ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা তিনি কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? তখন তাহাদের সন্দেহ হইতে লাগিল—তাহাদের মধ্যকার লোকেরাই বোধ হয় হজরতের নিকট এই সব তত্ত্ব বলিয়া দিয়া থাকে। ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে—ইহা ত মোহাম্মদের কথা নহে, বরং তাহার সর্ব্বজ্ঞ খোদাই তাহার মুখ দিয়া নিজের বাণী প্রকাশ করিতেছেন, তোমাদের গুপ্ত ব্যক্ত কোন বিষয় ত তাঁহার অগোচর নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদাই নিজের নবীকে তোমাদের এই সকল ষড়যন্ত্রের কথা জানাইয়া দিয়াছেন।

৮২ **আগুন … স্পর্শ করিবে না** :—

এহুদীদিগের ইহা চিরাচরিত বিশ্বাস। আজও তাহারা ধর্ম্মের হিসাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, নাস্তিকরা ব্যতীত অতি বড় পাপীও এগার মাস, জোর এক বৎসরের অধিক নরক ভোগ করিবে না। (দেখ—সেল ১১ পৃষ্ঠা ৪নং টীকার উদ্ধৃতাংশ)। সাধারণ মহাপাতকীদিগের কথা যখন এই, তখন এত আম্বিয়ার বংশধর ও তাওরাতের বাহক তাহারা, আর কয় দিন দোজখে থাকিবে। এ কথা তাহারা বলিয়াছিল—খয়বর সমরের পর, বিষ দেওয়ার মোকদ্দমার বিচারের সময়, পূর্ব্বেই এ কথা হাদিছ হইতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

৮৩ **কোর্‌আনের সাম্যবাদ** :—

এখানে বলা হইতেছে—কোন জাতি বা সমাজ বিশেষের উপর আল্লাহ তাআলার কোন বিশেষ অনুগ্রহ বা বিদ্বেষ নাই। বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহার ন্যায় বিচারের অপক্ষপাত বিধান এই যে, যাহারা পাপাচার কর্ত্তৃক এমন শোচনীয় ভাবে বেষ্টিত হইয়া পড়ে যে, তাহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা বা শক্তি তাহাদের থাকে না—বিবেক বুদ্ধির তাড়না, পাপের অনুভূতি এবং ধর্ম্মের আলোক যখন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এই অবস্থায় মরিয়া গেলে সেই আজীবন সঞ্চিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, যাহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে, এই বিশ্বাস ও সৎকর্ম্মের পুণ্যফল তাহারা লাভ করিবে। এছলাম জগতের একমাত্র উদার মহান বিশ্বধর্ম্ম—তাই বিশ্বমানবকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে :—

ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب - من يعمل سوءاً يجزبه ولا يجد له
من دون الله وليا ولا نصيرا - ومن يعمل الصالحات من ذكر او أنثى وهو مؤمن
فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا -

—"(হে মুছলমানগণ !) তোমাদিগের অথবা গ্রন্থধারীদিগের খোশ খেয়ালের উপর কিছুই নির্ভর করে না—মন্দ কর্ম্মে লিপ্ত হইলে তাহার মন্দ ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, আর সে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও নিজের বন্ধু ও সহায়রূপে প্রাপ্ত হইতে কখনই পারিবে না —পক্ষান্তরে নর, নারী নির্ব্বিশেষে, যে কোন ব্যক্তি আল্লাহতে বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে, তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করিবে, আর (এই পুণ্য ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে) তাহাদের উপর একবিন্দু অত্যাচার করা হইবে না।"

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বলিয়াছেন—"মানুষ যেমন এক একখানা করিয়া কাঠ জড় করিয়া তাহা দ্বারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে, পরে সেই অগ্নিকুণ্ডে যাহা নিক্ষেপ করে, তাহাই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়—সেইরূপ মানুষের মনে পাপ ইন্ধন একটু একটু করিয়া জমা হইতে থাকে এবং পরে তাহা হইতেই এমন ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হইয়া যায় যে, মানুষের জ্ঞান বিবেক ধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যত্বের যথাসর্ব্বস্ব সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। অতএব ক্ষুদ্র বলিয়া কোন পাপকে অবহেলা করিও না।" (আহমদ, কছির ১—২২০ হইতে মর্ম্মানুবাদ)।

দশম রুকু'

এহুদীদিগের অত্যাচার

---

৮৩ এবং আমরা যখন এছরাইল-সন্তানগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ঃ—"তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও 'এবাদত' করিবে না—এবং পিতা মাতার ও স্বজনগণের, পিতৃহীনগণের এবং কাঙ্গালদিগের হিতসাধন করিতে থাকিবে, মানবমণ্ডলীর মঙ্গলার্থে হিত কথা কহিবে এবং নমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, আর 'জাকাত' প্রদান করিতে থাকিবে!" অতঃপর, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত, তোমরা (এই অঙ্গীকার পালনে) পরাঙ্মুখ হইয়াছিলে, এবং এখনও তোমরা (সে সম্বন্ধে) অবাধ্য।

٨٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ؛ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

৮৪ এবং (হে এহুদীগণ!) আমরা যখন তোমাদিগের অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ঃ—"তোমরা পরস্পরের শোণিতপাত করিও

٨٤ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا

না এবং স্বজনগণকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিও না!” তখন তোমরা সকলই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে এবং তোমরাই ইহার সাক্ষী।

৮৫ তাহার পর সেই তোমরাই এখন আবার স্বজনগণকে হত্যা করিতেছ—তাহাদিগের বিরুদ্ধে পাপ ও অত্যাচার ভাবে পরস্পরের সহায়তা করিতেছ! আবার তাহারা তোমাদিগের নিকট বন্দীরূপে সমাগত হইলে তাহাদিগের মুক্তিপণ তোমরা প্রদান করিয়া থাক — অথচ তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়াই ত তোমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল! তবে কি তোমরা কেতাবের এক অংশে বিশ্বাস কর ও অপর অংশকে অমান্য কর? অতএব তোমাদিগের মধ্যকার যাহারা এইরূপ (অন্যায় আচরণ) করে — পার্থিব জীবনের চরম লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি প্রতিফল তাহাদিগের হইতে পারে? অধিকন্তু 'কিয়ামত' দিবসে তাহাদিগকে

تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

٨٥ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ، تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ، اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاۤءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى

اَشَدِّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٠

কঠোরতর 'আজাবের' প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত করা হইবে—আর (উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

٨٦ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ٠

৮৬ পরকালের বিনিময়ে যাহারা দুনয়ার জীবনকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে—এই ত তাহারা—অতএব তাহাদিগের শাস্তির লাঘব করা হইবে না, তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইতেও পারিবে না।

টীকা :—

৮৪ অঙ্গীকার গ্রহণ :—

শব্দের হিসাবে আমরা অনুবাদ করিয়াছি—"অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম।" কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতেছে—

امرناكم و اكدنا الامر و قبلتم و اقررتم بلزومه و وجوبه -

—"আমরা তোমাদিগের প্রতি আদেশ করিলাম, এবং সেই আদেশের তাকিদ করিলাম, পক্ষান্তরে তোমরা তাহাকে স্বীকার করিয়া লইলে, এবং অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে তাহা পালন করার অঙ্গীকার করিলে।" (কবির ১—৬০৮)। এহুদীদিগের শাস্ত্রীয় পরিভাষাতেও এই শ্রেণীর আদেশ-নিষেধের ফরমানকেই 'নিয়ম' বা Covenant বলা হইয়াছে। (২য় বিবরণ ৪—১৩)। এই সমস্ত আদেশ পালন করা হজরত মূছার সময়কার ও তাঁহার পরবর্ত্তী সকল যুগের সকল এহুদীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এই "শক্তগ্রীব" জাতি আল্লার আদেশগুলিকে ধৃষ্ট ভাবে উপেক্ষা করিতে চির অভ্যস্ত। ৮৩ আয়তের শেষ ভাগে এহুদী জাতির এই চিরাচরিত প্রকৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, হজরতের সমসাময়িক এহুদী-দিগকে বলা হইতেছে যে, পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় তোমরাও আল্লার সেই আদেশগুলির অবাধ্যতাচরণ করিয়া চলিয়াছ। অতএব মূছার প্রমূখাৎ ব্যক্ত তোমাদের কর্ম্মফল ভোগের দিন আবার ঘনাইয়া আসিয়াছে—অতএব এখনও সাবধান। ১

বাইবেলে এই সকল আদেশ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে :—

"আর ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন ...... আমা ব্যতিরেকে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক ...... তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও!" (যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায়)।

"অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি—তুমি আপন দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীন হীনের প্রতি, তোমার হাত অবশ্য খুলিয়া রাখিবে।" (২য় বিবরণ, ১৫—১১)। ঐ পুস্তকের ১৪শ অধ্যায়ের ২২ হইতে ২৯ পদ পর্য্যন্ত ওশর ইত্যাদি জাকাতের অঙ্গীকারের কথা স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে।

কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে মুছলমানদিগকেও আল্লাহ ঠিক এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ছুরা নেছার আয়তে বলা হইতেছে :—"তোমরা আল্লার এবাদত করিবে এবং তাঁহার (এবাদতে আর কাহাকেও শরীক করিবে না, এবং পিতা মাতার হিতসাধনে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) স্বজনগণের, পিতৃহীনগণের, দীন দুঃখী কাঙ্গালদিগের, আত্মীয় প্রতিবেশী-গণের, পার্শ্বচর সঙ্গীদিগের, প্রবাসীদিগের ও তোমাদিগের হস্তগত (দাস দাসী)-দিগের হিতসাধনে নিরত থাকিবে—নিশ্চয় আত্মম্ভরী অহঙ্কারীদিগকে আল্লাহ প্রেম করেন না।" আল্লার নিকট মুছলমানের এই অঙ্গীকার আজ কতটুকু পরিমাণে পালিত হইতেছে, মুছলমান পাঠকগণ এখানে এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহা ভাবিয়া দেখিলে বাধিত হইব। যে কর্ম্ম এহুদী-দিগকে যে প্রতিফল ভাগী করিয়াছে—আল্লার সেই অঙ্গীকার ভঙ্গের মহাপাতকে মুছলমানও যদি লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রতিফল মুছলমানকেও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। শুধু মুছলমান নাম ধারণ করিয়া আল্লার কোনও বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হওয়া যে তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, ৮২ টীকায় তাহা দেখান হইয়াছে।

"আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত করিও না"—পদাংশে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক দুইটী আদেশ যুগপৎ ভাবে সন্নিহিত আছে। যথা :—(১) আল্লাহ ব্যতীত কাহারও এবাদত করা মহা পাপ। (২) আল্লার এবাদত না করাও মহা পাপ। প্রথমটা শের্ক এবং দ্বিতীয়টা কোফর। সম্রাট আদেশ করিলেন—'তোমরা নিজেদের সম্রাট ব্যতীত আর কাহাকেও কর দিও না।' ইহাতে সম্রাট ব্যতিরেকে অন্য কাহাকে কর না দেওয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটকে কর দিবার উভয় আদেশই করা হইতেছে। আমি সম্রাট ব্যতীত অন্যকে কর দিলাম না, অথচ সম্রাটকেও কর দিলাম না। এ ক্ষেত্রে, সম্রাট ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর দিলাম না—এই অজুহাতে সম্রাটকে কর না দেওয়ার অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর হইবে না। এছলামের বীজ মন্ত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার তাৎপর্য্যও ইহাই। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত (পূজা, উপাসনা) করা যেমন অন্যায়, আল্লার এবাদত না করাও সেইরূপ অন্যায়। এই ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক তাৎপর্য্য দুইটীর একত্র সমাবেশে এছলামের এই বীজ মন্ত্র দুনয়ার ধর্ম্ম সাহিত্যে

চিরকালই অনুপম হইয়া আছে। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, 'কলেমাই-তাওহীদের' এই ভাবাত্মক দিকের প্রতি লক্ষ্য করা আমরা অনেক সময় আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

৮৫ এহুদীদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ :—

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা এহুদীদিগের চিরন্তন জাতীয় স্বভাব। পূর্ব্ব আয়তগুলিতে ইহার নজির প্রদানের পর, এই আয়তে হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা মদিনায় গমন করার পর, মদিনার এহুদ প্রভৃতি সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোকদিগকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক সাধারণ-তন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন। এ জন্য সকল সম্প্রদায়কে লইয়া এক সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল এবং মদিনার এহুদীরাও তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিল। এই সন্ধি পত্রের কএকটা শর্ত্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) এহুদীগণ মুছলমানদিগের সহিত এক জাতি।

(২) এই সনদের মধ্যকার কোন জাতি বা গোত্র শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সকলকে সমবেত শক্তি দিয়া তাহা প্রতিহত করিতে হইবে।

(৩) শত্রুদিগের সহিত কেহ কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইবে না।

(৪) মদিনা আক্রান্ত হইলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে সমবেত ভাবে যুদ্ধ করিবে।

(৫) এহুদী, মুছলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় স্বাধীন ভাবে আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করিতে পারিবে—কেহ কাহারও ধর্ম্মগত স্বাধীনতায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) অমুছলমানদিগের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে—অর্থাৎ তজ্জন্য তাহার সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারের কোন প্রকার খর্ব্ব করা হইবে না।

(৭) উৎপীড়িতকে রক্ষা করিতে হইবে।

(৮) মদিনায় নরহত্যা চিরস্থায়ী ভাবে রহিত।

(৯) আল্লার নামে ইহা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যাহারা ইহা ভঙ্গ করিবে—তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাৎ।

স্বদেশের মঙ্গলজনক এই প্রতিজ্ঞা পত্রে মদিনার এহুদীগণ স্বাক্ষর করিয়াছিল, এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া তাহার প্রত্যেক ধারাকে পদদলিত করিয়াছিল—স্বদেশের সাধারণ শত্রুদিগের সহিত নানা জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরিতার্থ করার এবং স্বসম্প্রদায়ের হীন স্বার্থ সাধনার নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া তাহারা স্বদেশ

ও দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করার জন্য দেশের সাধারণ শত্রুদিগের যথা সাধ্য সহায়তা করিয়াছিল। 'মোস্তফা-চরিতে'র ৫৭ অধ্যায়ে এহুদীদিগের এই সব অপকর্ম্মের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আয়তে এহুদীদিগের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

৮৫ কেতাবকে আংশিক ভাবে মান্য করা :—

মদিনার আন্ছারগণ আওছ ও খজরজ নামক দুই গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। মদিনা অঞ্চলের তিনটী এহুদী গোত্রের মধ্যে বনি-কোরায়জা গোত্রটী আওছের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল, বনি-কয়নকা ও নজির গোত্র খজরজের পক্ষে ছিল। এছলামের পূর্ব্বে আওছ ও খজরজ গোত্রের মধ্যে ভয়ঙ্কর শত্রুতার ভাব চলিয়া আসিতেছিল, এবং এজন্য উভয় গোত্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইত। এই সময় এহুদীরাও আপন আপন মিত্র গোত্রের সঙ্গে যোগদান করিয়া এই শোচনীয়তার চিত্রকে শোচনীয়তর করিয়া তুলিত। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক নীচ স্বার্থপরতা ও হিংসা বিদ্বেষের ফলেও এহুদীদিগের মধ্যে প্রায়ই গৃহ বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। এই সমস্ত সময় তাহারা স্বজনগণকে নিহত করিতে, দুর্ব্বল স্বজাতীয়দিগকে তাহাদের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করিতে এবং এই স্বজাতিদ্রোহিতার নীচ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীদিগকে পাপ ও অত্যাচার ভাবে সহায়তা করিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু তাহাদের সাহায্য ও সাহচার্য্যের ফলে, এহুদীগণ যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যের হাতে বন্দী হইয়া যাইত, তখন তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও জাতীয়তার ভাব প্রবল হইয়া উঠিত এবং তাহারা মুক্তিপণ দিয়া ঐ বন্দীদিগকে ছাড়াইয়া লইত। তখন তাহারা বলিত—শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বন্দী এহুদীদিগকে মুক্তিপণ দিয়া খালাস করিয়া লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এহুদীদিগের এই উৎকট শাস্ত্র জ্ঞানের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া এখানে বলা হইতেছে যে, স্বজাতীয়-দিগকে তাহাদিগের আবাস ভূমি হইতে বিতাড়িত করার জন্য পরজাতির সাহায্য করাই ত প্রথম ও প্রধান মহাপাতক, শাস্ত্রে ত ইহার ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিষেধ বিদ্যমান আছে। তোমাদিগের আত্মকলহ, আক্রমণ ও অত্যাচার ফলেই তাহারা বন্দী হইয়া থাকে। সে সময় শাস্ত্রের নিষেধকে পদদলিত করিতে তোমাদের একটুও দ্বিধা হয় না কেন ? তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ বন্দী হইয়া আসার সুযোগ ত ঘটে না ! তোমরা কি তবে শাস্ত্রের এক অংশকে স্বীকার ও অন্য অংশকে অস্বীকার করিয়া থাক !

৮৬ পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা :—

উপরের আয়তগুলিতে এহুদীদিগের যে চরিত্র এবং তাহাদিগের যে মানসিকতার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই চরিত্র ও সেই মানসিকতা যে জাতি অর্জ্জন করিবে—"পার্থিব জীবনের চরম লাঞ্ছনাই তাহাদিগের একমাত্র ও অপরিহার্য্য কর্ম্মফল।" আয়তের সর্ব্ব প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা আল্লার 'ন্যামত' বলিয়া গ্রহণ করার ন্যায় অজ্ঞতা আর কিছুই

নাই। কোর্‌আন এখানে বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে ইহা 'ন্যামত' নহে—'লানৎ', ইহা হইতেছে জাতির অনুষ্ঠিত মহাপাতকেরই শোচনীয় প্রতিফল। তাহার পর ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এহুদী জাতির পার্থিব জীবনের এই চরম লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ ছিল তাহাদিগের পরাধীনতা, এবং স্বদেশদ্রোহ ও আত্মকলহই ছিল তাহাদের এই পরাধীনতার প্রধান কারণ।

শাস্ত্রের এক অংশকে গ্রহণ ও এক অংশকে বর্জ্জন করার নজির বর্ত্তমান সময়ে মুছলমান সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ৮৩ ও ৮৪ আয়তে বর্ণিত অঙ্গীকারগুলির কথা আলোচনা করিয়া এ কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। আয়তে যে সব কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, মুছলমানের এক একটী দল তাহার মধ্য হইতে কতকগুলিকে গ্রহণ ও কতকগুলিকে বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে। তাহার পর ৮৫ আয়তে বর্ণিত এহুদী-মানসিকতাও আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে বদ্ধমূল হইয়া চলিয়াছে। এহুদীদিগের নিজ কর্ম্মফলে তাহাদের স্বজাতীয়রা বন্দী হইত, তখন শাস্ত্রের কথা তাহাদের স্মরণ থাকিত না। কিন্তু পরে ধর্ম্ম ও জাতীয়তার নামে তাহাদিগের জন্য মুক্তিপণ সংগ্রহে তাহারা ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিত। এ সম্বন্ধে মুছলমানদিগের মানসিকতার পরিচয় দিবার জন্য গত ইউরোপীয় যুদ্ধের নজিরটার উল্লেখ করাই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। এই সময় মুছলমান-আমরা অর্থ দিয়া, সৈন্য দিয়া, মজুর দিয়া স্বজাতীয় তুর্কীকে, এছলামের শক্তি কেন্দ্র মক্কাকে, মোছলেম জাতীয়তার মেরুদণ্ড খলিফাকে বিদেশী, বিধর্ম্মী শত্রুদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিতে যথা সাধ্য সাহায্য করিয়াছিলাম। তাহার পর তাহাদের বিপদ দেখিয়া ধর্ম্মের ও জাতীয়তার নামে আমরাই আবার উচ্চতম কণ্ঠে হা-হুতাশ করিয়াছিলাম—তাহাদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আজ যে বিপদ ও বিপ্লব মোছলেম জগতকে বেষ্টন করিয়া দিন দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, তাহা মূলতঃ গত যুদ্ধে পরাজয়ের বিষময় ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুছলমানের পার্থিব জীবনের এই যে চরম লাঞ্ছনা, ইহা আমাদের জাতীয় মহা পাতকের সেই কোর্‌আন-বর্ণিত কর্ম্মফল মাত্র।

একাদশ রুকু'

এহুদী জাতির বিবরণ

৮৭ এবং নিশ্চয়ই মূছাকে আমরা কেতাব দান করিয়াছিলাম এবং তৎপরেও পরম্পরাগত ভাবে (আরও) কতিপয় রছুল প্রেরণ করিয়াছিলাম, আর (বিশেষতঃ) মরয়ম-তনয় ঈছাকে নিদর্শন রাজি প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে 'রূহুল্-কুদছের' দ্বারা শক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলাম। তবে কি যখনই কোন 'নবী' এমন কিছু তোমাদিগের নিকট আনয়ন করিবে, যাহা তোমাদের প্রবৃত্তির অভিপ্রেত নহে —তখনই তোমরা দাম্ভিকতা (প্রকাশ) করিতে যাইবে, ফলে এক দল (নবীকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া (উড়াইয়া) দিবে আর এক দলকে হত্যা করিবে!

٨٧ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ، وَ
اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ
وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ،
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا
لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ،
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ

৮৮ তাহারা বলে — "আমাদিগের হৃদয়গুলি আচ্ছাদিত।" না, বরং তাহাদিগের অবাধ্যতা ও

٨٨ وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ، بَلْ

لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ

অবিশ্বাসের ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নৎ করিয়াছেন, অতএব তাহারা অল্পই বিশ্বাস করে।

৮৯ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

৮৯ এবং যখন তাহাদিগের সমীপে আল্লার সন্নিধান হইতে (সেই) কেতাব সমাগত হইল, (যে কেতাব) তাহাদিগের সঙ্গে যাহা আছে-তাহার সমর্থক — অথচ পূর্ব্বে (আরবের) কাফেরদিগের উপর (ঐ কেতাবের দোহাই দিয়া) জয়ী হওয়ার চেষ্টা তাহারা করিয়া আসিয়াছে— অতঃপর পরিচিত সেই (কেতাব) যখন তাহাদিগের নিকট সমাগত **হইল, (** অমনি) তাহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বসিল,—অতএব কাফেরদিগের উপর আল্লার লা'নৎ

৯০ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

৯০ যে বিনিময়ের পারবর্ত্তে তাহারা আত্ম-বিক্রয় করিল, কতই না মন্দ তাহা! (সে বিনিময়ের স্বরূপ এই যে আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা, নিজের প্রসাদ অবতীর্ণ করিতেছেন — এই (কারণে)

عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ، فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী হইয়া আল্লার বাণীকে তাহারা অমান্য করিতেছে, অতএব তাহারা গজবের উপর গজব অর্জ্জন করিয়া লইল,—আর কাফের-দিগের জন্য হেয়ঙ্কর দণ্ড (নির্দ্ধারিত) আছে।

৯১ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৯১ এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় —"আল্লাহ্ যাহা কিছু অবতারণ করিয়াছেম — সে সমুদয়কে বিশ্বাস কর!" তাহারা বলে — "আমাদিগের প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে — আমরা (কেবল) তাহাতে বিশ্বাস করি", এবং তদ্ব্যতীত আর সমস্তকে তাহারা অমান্য করিয়া থাকে, অথচ তাহা সত্য — অধিকন্তু এহুদীদিগের সঙ্গে যাহা আছে-তাহার সমর্থক! (হে মোহাম্মদ!) তুমি বল— (নিজেদের শাস্ত্রেই যদি তোমরা বিশ্বাসী হইবে), তবে পূর্ব্ব হইতে নবীদিগকে হত্যা করিয়া আসিতেছ কেন?

৯২ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ

৯২ অথচ মুছা তোমাদিগের নিকট নিশ্চয়ই স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

আনয়ন করিয়াছিল, তত্রাচ অত্যাচারী তোমরা — তাহার অসাক্ষাতে গো-বৎসকে (ঈশ্বর-রূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে !

৯২ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ، خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؕ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

৯৩ আরও (দেখ—) আমরা যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম এবং 'তূর'কে তোমা-দিগের ঊর্দ্ধদেশে উত্থাপিত করিয়া (বলিলাম—) "আমরা তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিলাম — তাহাকে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর !" তাহারা (কার্য্যতঃ ইহার উত্তরে) কহিল —"আমরা (শব্দগুলি) শ্রবণ করিলাম এবং (তাহার ভাবকে) অমান্য করিলাম ! " আর (প্রকৃত কথা এই যে) নিজেদের অবিশ্বাসের ফলে গো-বৎস পূজার ভাব তাহাদিগের অন্তরে অন্তরে সমাহিত হইয়া গিয়া-ছিল। বল :—(এই রূপেই) যদি তোমরা (শাস্ত্রে) বিশ্বাসী হইয়া থাক, তবে তোমাদিগের পক্ষে (সেই) বিশ্বাসের আদেশ কতই'না জঘন্য !

৯৪ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ

৯৪ বল — আল্লার সমীপস্থ পরম ধাম যদি — অন্য সমস্ত লোক বাদে — বিশেষ করিয়া কেবল তোমাদিগেরই অধিকার ভুক্ত

دُوْنِ النَّـاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔

হইয়া থাকে (আর) তোমরা যদি (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর (ত দেখি)!

৯৫ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِـــمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِـــيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۔

৯৫ আর পূর্ব্ব হইতে তাহারা যে সকল কর্ম্মফল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ — তজ্জন্য তাহারা কখনই ঐরূপ (মৃত্যু-) কামনা করিতে পারিবে না, আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদিগকে সম্যকরূপে অবগত আছেন।

৯৬ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّـاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَـةٍ ۚ وَمَـا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَـذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِـــيْرٌ بِمَـا يَعْمَلُوْنَ ۔

৯৬ এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে তুমি সকল লোক, (এমন কি) মোশ্‌রেকদিগের অপেক্ষাও (পার্থিব-) জীবনের জন্য অধিকতর লালায়িত (দেখিতে) পাইবে, তাহারা জনে জনে কামনা করে — যেন 'সহস্র বৎসর' আয়ুপ্রাপ্ত হইতে পারে; অথচ (এইরূপ) দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্ত হইলেও ত সে (মৃত্যু ও পর-কালের) শাস্তি হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে না; আর আল্লাহ্ তাহাদিগের কার্য্য কলাপ সম্যকরূপে দর্শন করেন

টীকা :—

৮৭ روح القدس রূহুল-কোদোছ :—

কোর্‌আনে 'রূহ' শব্দ—আত্মা, অহি বা এল্‌হাম Inspiration, জিব্রাইল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখ—নহল ২, মো'মেন ১৫, মোজাদেলা ২২, শূরা ৫২ ইত্যাদি। শেষোক্ত আয়তে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি অবতীর্ণ কোর্‌আনকে স্পষ্ট ভাষায় 'রূহ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা হজরত ঈছাকে অহি ও ইঞ্জিলের দ্বারা শক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন—অহি ফেরেশ্‌তার মারফতে আসিতেও পারে। খৃষ্টানদিগের Holy Ghost বা পবিত্রাত্মার সহিত কোর্‌আনের বর্ণিত এই 'রূহের' কোনই সম্বন্ধ নাই। বিশ্বাসী দৃঢ় চিত্ত মো'মেনদিগকেও আল্লাহ 'ايدهم بروح منه' এই 'রূহ' দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন (৫৮—২২)। কবিবর হাচ্ছান সম্বন্ধে হজরত দো'ওয়া করিয়াছেন :—

اللهم ايده بروح القدس -

অর্থাৎ—"হে আল্লাহ তুমি উহাকে 'রূহুল্-কোদোছ' দ্বারা শক্তি সম্পন্ন কর!" (আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি)। ফলে আল্লার নিকট হইতে যে অহি, এল্‌হাম, প্রেরণা বা শক্তি, নবী, রছুল ও সাধু সজ্জনগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাকেই 'রূহুল-কোদোছ' বলা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে, নিজেদের শক্তি ও সাধনার ক্রম অনুসারে আমরাও 'রূহুল-কোদোছ' দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারি।

স্পষ্ট নিদর্শন :—

মূলে এখানে بينات 'বাইয়েনাৎ' শব্দ আছে। উহা বহুবচন, একবচন 'বাইয়েনাঃ'। 'বাইয়েনাঃ' শব্দের অর্থ—স্পষ্ট দলিল প্রমাণ। কোন মোকদ্দমায় বাদী যে সকল দলিল নিদর্শন বা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নিজের দাবীকে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাকে 'বাইয়েনাঃ' বলা হয়। (রাগেব প্রভৃতি)। এছলামের ব্যবস্থা শাস্ত্রে সচরাচরই البينة على المدعي 'প্রমাণের ভার বাদীর উপর' এই হাদিছটী উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এখানেও প্রমাণকে 'বাইয়েনাঃ' বলা হইয়াছে। কোর্‌আনে এই ব্যবহারের বহু নজির বিদ্যমান আছে। যথা :—

افمن كان على بينة من ربه —হুদ, اني على بينة من ربي —আন্‌আম, من هلك على بينة —আন্‌ফাল, ان كنت على بينة من ربي —হুদ, ইত্যাদি। হজরত ঈছার ন্যায় অন্য সমস্ত নবীরা এই 'বাইয়েনাঃ' বা প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখ, كانت تاتيهم رسلهم بالبينات —মো'মেন। নবীগণ ব্যতীত সাধারণ মানুষদিগের সম্বন্ধে এই 'বাইয়েনাঃ' শব্দ কোর্‌আনে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :— ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه —"আমরা কি তাহাদিগকে কোন কেতাব দিয়াছি—যাহার প্রমাণের উপর

তাহারা (আত্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া) আছে ?" (মালাএকা)। ফলে হজরত ঈছার "মোর্দা জেন্দা করার" সহিত এই শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। অন্য নবীগণের ন্যায় প্রমাণের বলে বলীয়ান হইয়া হজরত ঈছা সত্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

৮৮ নবী হত্যা :—

এহুদীদিগের নবী-হত্যার প্রমাণ বিভিন্ন টীকায় প্রদান করা হইয়াছে। আয়তের প্রথম ভাগে বলা হইয়াছে যে, হজরত মূছার সময় হইতে হজরত ঈছার সময় পর্য্যন্ত বনি-এছরাইল জাতির নিকট পর পর অনেক নবী ও রছুল প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং আল্লার বাণী ও দলিল প্রমাণও তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পূর্ব্বকালেও তাহাদিগের প্রবৃত্তির বিপরীত কোন কথা তাহাতে প্রকাশিত হইলে, অমনি তাহারা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া সে আদেশকে অস্বীকার করে, এবং সেই আদেশের বাহক নবী রছুলদিগকে হয় মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়াইয়া দেয়, না হয় তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া আল্লার 'নূর'কে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলার চেষ্টা করে —ইহা এহুদীদিগের চিরাচরিত জাতীয় স্বভাব। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সময়ও এহুদী-দিগের এই স্বভাবের কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই। তাহারা প্রথমে "মিথ্যাবাদী" বলিয়া হজরতকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করিল, এবং তাহার পর তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলার জন্য পুনঃ পুনঃ ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকিল (৭৭ টীকা ও 'মোস্তফা-চরিত' দেখ)। এখানে كذبتم এর অনুরূপ قتلتم ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করিয়া تقتلون মোজারে' ব্যবহার করায় হজরতকে হত্যা করার জন্য এহুদীদিগের ষড়যন্ত্রের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে (কছির ১—২২৮, কবির ১—৬১৫, আজিজী ১—২২৭)।

৮৯ লা'নৎ—গোলফ :—

এহুদীরা গর্ব্ব করিয়া বলিত—আমাদিগের হৃদয়গুলি আচ্ছাদিত ও সুরক্ষিত হইয়া আছে। মোহাম্মদ যতই যুক্তি প্রমাণ প্রদান করুন না কেন—আমাদের অন্তরে তাহা প্রবেশ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে আমাদের অন্তরের কোন সংস্কারকে মন হইতে বাহির করিয়া দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, এমনই সুরক্ষিত ও আচ্ছাদিত সেগুলি। এইরূপে নিজেদের রক্ষণশীলতার কথা বলিয়া এহুদীরা গৌরব করিত। আল্লাহ বলিয়া দিতেছেন যে, ইহা গৌরবের কথা নহে বরং মরণেরই নিদর্শন। বাহিরের আলো বাতাস যখন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, আর ভিতরের বিষবাষ্প যখন বাহির হইয়া যাওয়ার পথ না পায়, মানুষের তথা জাতির মরণ হয় তখনই। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগের মুছলমান সমাজও সাধারণ ভাবে এই মরণের নিদর্শনকেই গৌরবের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে। অথচ বনি-এছরাইলের এই উপাখ্যানগুলি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল—এই মানসিক ব্যাধি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করারই উদ্দেশ্যে!

"অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে লা'নৎ করিলেন"—ইহার অর্থ, আল্লার অপরিহার্য্য নিয়ম অনুসারে তাহারা নিজেদের কৃতকর্ম্মের ঐরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইল।

৯০ **বিজয় কামনা** ঃ—

এহুদীরা আরবের পৌত্তলিকদিগকে বলিত—'আল্লার শেষ নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। তিনি আসিয়া তাওহীদের ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবেন, পৌত্তলিকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন। তখন এহুদীরাই দেশের রাজা হইবে।' কিন্তু তাহারা যখন দেখিল যে, শেষ নবী তাহাদের মধ্য হইতে না হইয়া কোরেশদিগের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন, এছলাম আরবের পৌত্তলিক জাতিগুলিকে ধ্বংস না করিয়া বরং তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দান করিতেছে, তাহার বিচারে বর্ণের ও বংশের সকল বৈষম্য ও কৌলিন্য উঠিয়া যাইতেছে, তাওরাতের সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ঈছার মহিমা প্রচার করিতে এবং সর্ব্বোপরি এহুদী-দিগের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও পাপাচারের প্রতিবাদ করিতেও এছলাম এক বিন্দু কুণ্ঠিত হইতেছে না—তখন তাহারা নিজেদের প্রত্যাশিত সেই নবীকে প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত হইল।

৯০ **ধর্ম্মের সংঘর্ষ** ঃ—

এছলামের সহিত পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মের মৌলিক একটি পার্থক্যের বিষয় এখানে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এহুদীরা বলে—'আমাদের শাস্ত্র অবশ্য মান্য—কারণ তাহা আল্লার নিকট হইতে সমাগত।' কিন্তু 'আল্লার নিকট হইতে সমাগত'—বস্তুতঃ এই কারণে যদি কোন শাস্ত্রকে মান্য করা হয়, তাহা হইলে আল্লার নিকট হইতে সমাগত অন্যান্য কেতাবকে কোন মতেই অমান্য করা যায় না। এ অবস্থায়, দুন্য়ার সকল দেশে ইতিপূর্ব্বে আল্লার যে সব বাণী সমাগত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময় আরবের এই নবীর মধ্য-বর্ত্তিতায় তাঁহার যে চরম পয়গাম প্রচারিত হইতেছে, তাহাকে অমান্য করা হইবে কোন্ যুক্তি বলে? ফলে দেখা যাইতেছে যে, এহুদী ও অন্যান্য জাতিরা নিজেদের শাস্ত্র গ্রন্থকে মান্য করে—কেবল নিজেদের স্বার্থের ও সংস্কারের খাতিরে, আল্লার কালাম বলিয়া নহে। এই জন্যই ধর্ম্ম লইয়া দুন্য়াময় এই সংঘর্ষ এবং এই জন্যই দুন্য়ার বিভিন্ন ধর্ম্ম মানবের ঘোর অমঙ্গলের নিদানে পরিণত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে দুন্য়ার সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক মনে করিয়া থাকে যে, তাহারাই হইতেছে আল্লার একমাত্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত জাতি—সুতরাং তাঁহার বাণী প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার তাহারা ব্যতীত আর কাহারও নাই। এই অন্যায় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অন্য দেশে বা অন্য যুগে প্রকাশিত আল্লার বাণীকে ও তাহার বাহক-গণকে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম্ম সংঘর্ষের ইহাও একটা বড় কারণ। কোর্‌আন এই সমস্ত অমঙ্গলের মূল সূত্র ধরাইয়া দিয়া তাহার কঠোর প্রতিবাদ করিতেছে।

এহুদীরা বলিতেছে—"আমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি।" তাহাদিগের এ দাবীও যে কত দূর মিথ্যা, তাহা এই ও ইহার পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে দেখান হইতেছে। তাওরাতে নবীদিগকে মান্য করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এহুদীরা তাঁহাদিগকে অমান্য করিতে, এমন কি হত্যা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইল না। তাওরাতে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদের ধর্ম্ম চরম দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু এহুদীরা হজরত মূছার সময়ই গো-পূজায় লিপ্ত হইয়া তাওরাতের শিক্ষার চরম অবমাননা করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, নিজেদের শাস্ত্রকেও তাহারা চিরকালই অমান্য করিয়া আসিয়াছে।

৯১ **শাস্ত্রের সম্মান ও সংস্কারের সম্মোহন** ঃ—

শাস্ত্রকে মান্য করা বা না করার প্রমাণ স্থল—কথা নহে, কর্ম্ম ক্ষেত্র। জ্ঞানগত সম্মান আর সংস্কারগত সম্মোহন, এ দুয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। জ্ঞানগত সম্মান প্রকাশ পায় —মানুষের কর্ম্ম জীবনের প্রত্যেক স্তরে, আর সংস্কার গত সম্মোহনের পরিচয় পাওয়া যায়—মুখের দাবীতে, মূল্যবান জেল্‌দ ও যুজদানের মধ্যে, কর্ম্মক্ষেত্রে শাস্ত্রের ভাব ও লক্ষ্যকে নির্ম্মম ভাবে বর্জ্জন করাতে। প্রকৃত ধাম্মিকতার সন্ধান এখানে খুব কম পাওয়া যায়, এখানে প্রবল হইয়া উঠে—ধাম্মিকতার দাম্ভিকতা! কার্য্যতঃ এহুদীরা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে—ইহা শাস্ত্রের সম্মান নহে, রবং স্বোপার্জ্জিত সংস্কারের সম্মোহন। শাস্ত্রের নাম করণে এই সম্মোহনের মারাত্মক প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া জাতিগণের মরণ ঘটিয়া থাকে। অথচ অজ্ঞ লোকেরা মনে করিয়া থাকে যে, শাস্ত্র অনুসরণের ফলেই জাতির এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। এই অবস্থার একটা স্পষ্ট লক্ষণ এই যে, নিজেদের সংস্কারে যখন আঘাত না লাগে, সে অবস্থায় শত শত শাস্ত্র ব্যবস্থাকে তাহারা অমান্য করিয়া চলে এবং সে জন্য তাহাদের মনে কোন বেদনা বা উত্তেজনার উদ্রেক হয় না। পক্ষান্তরে শাস্ত্র-সম্মত হউক বা না হউক, যে সংস্কারটা তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অতি সামান্য আঘাত লাগিতে দেখিলে তাহারা অস্থির হইয়া উঠে এবং শাস্ত্রের সম্মানের দোহাই দিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দেয়। এহুদীদিগের উপাখ্যানের মধ্য দিয়া এই গভীর তত্ত্বটা কোর্‌আনের বাহকদিগকে বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে।

৯২ **"মৃত্যু কামনা"** ঃ—

এহুদীরা দাবী করিয়া বলিত—তাহারা সকলেই বেহেশ্‌তে গমন করিবে এবং তাহারা ব্যতীত আর কোন জাতির লোক বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। এই সকল দাবীর উত্তরে এছলামের পক্ষ হইতে এহুদীদিগকে বলা হইতেছে যে, ইহার চরম মীমাংসার জন্য, আইস তোমরা আমরা উভয়, আল্লার নিকট প্রার্থনা করি—দুই দলের মধ্যে মিথ্যাবাদী যাহারা তাহারা ধ্বংস হইয়া যাক্! ছুরা জুম্‌আর ৬ ও ৭ আয়তে এই প্রকারে এহুদীদিগকে

মোবাহালার 'চ্যালেঞ্জ' দেওয়া হইয়াছে। ছুরা আলে-এম্‌রানের ৬০ আয়তে খৃষ্টানদিগের প্রতি এই প্রকার আহ্বানের কথা জানা যাইতেছে। নিজেদের মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য এহুদীরা এছলামের এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিতে পারিবে না—একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহকে এমন দৃঢ় ও প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আত্ম সত্যে তাঁহার এমনই গাঢ়, গভীর ও অটুট বিশ্বাস ছিল যে, দুন্‌য়াকে এ 'চ্যালেঞ্জ' দিতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত হন নাই।

কোর্‌আনের বিচারে স্বর্গ বা মুক্তি লাভ কোন বিশেষ জাতির অথবা বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীর এক চেটিয়া অধিকার নহে। এ জন্য এছলাম, ঈমান ও আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম্মের এবং জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে যে সাধন মার্গ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোক তাহাকে অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, সেই মার্গকে পরিত্যাগ করিলে মুছলমান-নামধারী ব্যক্তিরাও মুক্তি লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। (৮২ টীকা দেখ)। ৯৫ আয়তে বর্ণিত 'সহস্র বৎসর' অর্থে বহু বৎসর, দীর্ঘ কাল। (কবির)। এহুদীরা পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষাও পার্থিব জীবনের জন্য অধিক লালায়িত—এই তুলনার তাৎপর্য্য এই যে, আরবের পৌত্তলিকগণ পরকালের ও মৃত্যুর পর কর্ম্মফল ভোগের কথা স্বীকার করিত না। তাহারা মনে করিত যে, এই পার্থিব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যথা সর্ব্বস্ব শেষ হইয়া যায়, ইহার পরকার আনন্দ ধামের কথা তাহারা আদৌ বিশ্বাস করিত না। তাই এই জীবনের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত মায়া এবং মৃত্যুর নামে তাহাদের মনে অশেষ বিভীষিকা জাগিয়া উঠিত। সুতরাং পার্থিব জীবনের আকাঙ্খা তাহাদের অত্যন্ত অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পক্ষান্তরে এহুদীরা মুখে বলিত যে, 'আমরা পরকালের অনন্ত আনন্দ ধামে বিশ্বাস করি, এবং তাহার অধিকারী একমাত্র আমরা। পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই আনন্দ ধামে প্রবেশ করিব।' সুতরাং এই দাবী সত্য হইলে পার্থিব জীবনের প্রতি তাহাদের আদৌ কোন মায়া হওয়া উচিত ছিল না। এই সকল আয়তে দেখান হইতেছে যে, "আমরা নিজেদের শাস্ত্র মান্য করি"—এহুদীদিগের এ দাবীও মিথ্যা। তাহারা বস্তুতঃ নিজেদের শাস্ত্রকেও মান্য করে না। তাহারা মানিয়া চলে—নিজেদের স্বার্থ ও সংস্কারকে, এবং এই স্বার্থ ও সংস্কারের খাতিরেই তাহারা হজরতকে ও কোর্‌আনকে অমান্য করিতেছে।

দ্বাদশ রুকু'

—০০০—

এহুদীগণ আল্লার শত্রু

৯৭ বল ঃ— 'জিব্রাইলের শত্রু কে হইবে ?' নিশ্চয় জিব্রাইল ত আল্লার আদেশ ক্রমে কোর্-আনকে তোমার অন্তরে নাজেল করিয়াছে, অথচ তাহা হইতেছে নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত (কেতা-বের) সমর্থক ও সৎপথ প্রদর্শক এবং বিশ্বাসীদিগে জন্য সু-সংবাদ।

٩٧ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

৯৮ যে ব্যক্তিরা আল্লার শত্রু— এবং তাঁহার ফেরেশ্‌তাদিগের, তাঁহার রছুলগণের ও জিব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু হয়, সেই কাফেরদিগকে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই (এই শত্রুতার) প্রতিফল প্রদান করিবেন।

٩٨ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

৯৯ এবং তোমার প্রতি আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট নিদর্শন সকল নাজেল করিয়াছি—আর অনা-চারিগণ ব্যতীত অন্য কেহই তাহা অমান্য করিতে পারে না।

٩٩ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ، وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ

১০০ أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

১০০ যখনই তাহারা কোন অঙ্গীকার করিবে — তখনই কি তাহাদিগের মধ্যকার একদল তাহাকে ভগ্ন করিয়া ফেলিবে ! না-না, তাহাদিগের অধিকতর লোক ঈমানই রাখে না।

১০১ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ، كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

১০১ এবং যেমনই আল্লার পক্ষ হইতে প্রেরিত (সেই নবী) তাহাদিগের. নিকট সমাগত হইলেন—(যিনি) তাহাদিগের সঙ্গে যে (সত্য) আছে-তাহার সমর্থক,— যাহাদিগকে কেতাব দেওয়া হইয়াছে - তাহাদিগের এক দল তখন আল্লার কেতাব-কে নিজেদের পশ্চাতে ফেলিয়া দিল, যেন তাহারা (এই রছুল সম্বন্ধে) কিছুই অবগত নহে !

১০২ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وَمَا أُنْزِلَ

১০২ অধিকন্তু, ছোলায়মানের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কতিপয় শয়তান যে মিথ্যা প্রচার করিয়াছিল— (এই) এহুদীরা তাহারই অনুসরণ করিতে লাগিল। অথচ (প্রকৃত পক্ষে) ছোলায়মান কাফের হয় নাই - বরং ঐ শয়তানগুলিই কাফের হইয়াছিল, (কারণ) লোকদিগকে তাহারা ‘ছেহের’ (যাদু বা

কুহক মন্ত্র) শিক্ষা দিতে থাকে; —এবং (প্রকৃত পক্ষে) বাবেলের দুই ফেরেশ্‌তার (অর্থাৎ তথা কথিত) হারূত ও মারূতের প্রতি কিছুই নাজেল করা হয় নাই;— এবং (প্রকৃত পক্ষে) তাহারা কাহাকে কিছু শিক্ষাই দিত না, "আমরা পরীক্ষা মাত্র অতএব কাফের হইও না—" ঐ ফেরেশ্‌তা দ্বয়ের ইহা বলা এবং তাহাদের নিকট লোকের "স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার বিদ্যা শিক্ষা করা"—(এ সব) ত দূরের কথা;— আর (প্রকৃত পক্ষে) তাহারা আল্লার হুকুম ব্যতীত কাহারও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থও নহে;— এবং ইহারা (এহুদীরা) এমন বিষয় শিক্ষা করে, যাহা তাহাদিগের অনিষ্ট করে অথচ কোন উপকার করিতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি ইহা ক্রয় করে, পরকালে[*] যে তাহার কিছুই প্রাপ্য নাই (নিজেদের ধর্ম্ম-পুস্তকে) ইহা তাহারা নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছে।[**] আর তাহাদিগের যদি জ্ঞান থাকিত (তাহা

عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ
ارين به من احد الا
بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ
عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ　　لَاقٍ ، وَ

لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

হইলে বুঝিতে পারিত যে) তাহারা যে বিনিময়ের পরিবর্ত্তে আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, তাহা কতই না মন্দ !

১০২ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

১০৩ আর জ্ঞান থাকিলে তাহারা (ইহাও বুঝিতে পারিত যে) যদি তাহারা ঈমান আনিত ও সংযমশীল হইত, তাহা হইলে আল্লার নিকট তাহার উত্তম পুরস্কার ছিল।

টীকা :—

৯৩ জিব্রাইলের শত্রুতা :—

এহুদীরা মনে করিত—প্রধান ফেরেশ্‌তাদিগের মধ্যে একমাত্র 'মীকাইল'ই হইতেছেন তাহাদের সমর্থক, অন্যান্য 'অধ্যক্ষ ফেরেশ্‌তা'দিগের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করার, এই 'মীকাইল' ব্যতিরেকে আর কেহ নাই। দেখ বাইবেল, দানিয়েল ১০ অধ্যায় ১৩, ২০ ও ২১ পদ। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে লিখিত আছে—The gurdian angels of the heathen nations oppose Michel, the gurdian angel of the Judah. অর্থাৎ—"যবন জাতিদিগের অধ্যক্ষ ফেরেশ্‌তারা এহুদীদিগের অধ্যক্ষ ফেরেশ্‌তা মীকাইলের বিরুদ্ধতা করেন।" (Art. Angel)। মোছনাদ, বোখারী প্রভৃতির হাদিছেও এহুদীদিগের এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা জিব্রাইলকে আজাবের ফেরেশ্‌তা বলিয়া বিশ্বাস করিত। দেখ বাইব্লিকা ১৫৭৮ কলম। এই জিব্রাইল হজরতের নিকট কোর্‌আন আনয়ন করেন বলিয়া এহুদীরা তাহা মান্য করিতে অস্বীকার করিল।

আল্লার অনন্ত কোটি সৃষ্টির মধ্যে জিব্রাইলও তাঁহার একটী সৃষ্টি এবং তাঁহার বাণীর বাহন মাত্র। কোন্ বাণীকে কোন্ ফেরেশ্‌তার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে না-হইয়াছে, এই শ্রেণীর তর্ক অনর্থক। দেখিতে হইবে যে, সে বাণী সত্য কি না, মঙ্গলজনক কি না এবং আল্লার হুজুর হইতে তাহা সমাগত কি না ? ইহার উত্তরে কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে যে, সে কালাম আল্লার নিকট হইতে সমাগত ও আল্লার আদেশক্রমে সমাগত, সে কালাম হইতেছে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম সংঘর্ষের সমন্বয়কারী পূর্ব্ববর্ত্তী সব কালামের সমর্থক, সে

কালাম হইতেছে মানুষের পক্ষে সৎপথ প্রদর্শক, সে কালাম বিশ্বাসীদিগকে আল্লার অনন্ত রেজওয়ানের সুসংবাদ দান করিতেছে। এই গুণের দিক দিয়া কোর্‌আনকে মান্য করিতে হইবে। কোন্ ফেরেশ্‌তার মারফতে কোর্‌আন নাজেল হইয়াছে না-হইয়াছে, সে তর্কের কোন সার্থকতা এখানে নাই।

৯৪ **আল্লার শত্রুতা :—**

এই অংশের শাব্দিক অনুবাদ—'আল্লাহ তাহাদিগের শত্রু হন।' কিন্তু আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মতে এরূপ ক্ষেত্রে উহার ভাবার্থ হইবে—'আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুতার প্রতিফল প্রদান করেন।' কোর্‌আনের ব্যবহারেও ইহার অনেক নজির পাওয়া যায়। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে اطلاق اسم السبب على المسبب বলিয়া উল্লেখ করা হয়। (দেখ, এমাম এবনে কাইয়ম কৃত 'কেতাবুল ফাওয়ায়েদ', ১৬ পৃষ্ঠা)। অলঙ্কার শাস্ত্রের এই ধারার প্রতি অনুবাদকেরা সাধারণতঃ লক্ষ্য না করায়, এছলাম বিদ্বেষী বিধর্ম্মী লেখকদিগের পক্ষে "কোর্‌আনের আল্লাহ" সম্বন্ধে ধৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছে।

৯৫ **"সেই নবী" :—**

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এহুদী খৃষ্টান ও হিন্দু প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় "সেই নবী" ও শেষ নবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কারণ সেই শেষ নবীর শুভাগমনের সংবাদ তাহাদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই প্রকারে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল স্পষ্ট সুসংবাদ বর্ণিত আছে, মুছলমান লেখকগণ, বিশেষতঃ স্বনামধন্য স্যর ছৈয়দ আহমদ মর্‌হুম তাঁহার خطبات احمديه পুস্তকে, তাহার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বেদে, উপনিষদে ও পুরাণেও সেই শেষ নবীর সুসংবাদ, এমন কি তাঁহার নাম ধাম ও তাঁহার প্রচারিত বীজমন্ত্র—কলেমায় তাওহীদের পর্য্যন্ত স্পষ্ট বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পার্সীদিগের 'দসাতির' গ্রন্থেও আরবের প্রাচীন মন্দিরের ও তাহাতে মূর্ত্তি পূজার কথা বর্ণনা করার পর স্পষ্টাক্ষরে আরব হইতে আবির্ভূত এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সংবাদ দেওয়া হইতেছে :—"সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক একজন বাগ্মী পুরুষ এবং তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বদিকে গমন করিবে। ইরাণের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য জাতিগণ ঐ সমুদ্রে প্রবেশ করিবে।"

অথর্ব্ব বেদীয় অল্লোপনিষদে আল্লা, রছুল, মহম্মদ, ইল্লাল্লা প্রভৃতি শব্দ অতি স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান আছে। হিন্দু পণ্ডিত সমাজ আবহমান কাল হইতে তাহা পাঠ করিয়া আসিতেছেন, কেহই সে সম্বন্ধে কোন সংশয় প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু মুছলমানেরা তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে আরম্ভ করার পর হইতে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, কোন সংস্কৃতজ্ঞ মুছলমান ঐ সূক্তটীকে বেদে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। সম্রাট আকবরের সময় এই সূক্তটীকে অবলম্বন করিয়া একজন নব দীক্ষিত মুছলমান-পণ্ডিত বহু হিন্দু পণ্ডিতকে পরাজিত করেন

এবং ইহার ফলে বহু হিন্দু এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যান। বিশ্বকোষ রচয়িতা এক কথায় বলিয়া দিতেছেন—শেখ ভাবনই নিজের কথা রক্ষা করার জন্য ঐ সূক্তটী রচনা করিয়া "অথর্ব্ব সংহিতায় প্রক্ষেপ করে। কি ভয়ঙ্কর কার্য্য!" কিন্তু যুক্তির হিসাবে তাঁহাদের এ কথার যে কাণাকড়িরও মূল্য নাই, তাঁহারা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিলেন—এবং অবশেষে পণ্ডিত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ শব্দগুলির এক একটা বর্ণকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নানা কষ্ট কল্পনার মধ্য দিয়া সেগুলির সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয় আবিষ্কার করিয়া দিয়া বলিতেছেন —না, না, সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত নহে, এত কাল পরে আমি তাহার তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়াছি। এই টীকায় এ বিষয়গুলি আমাদের আলোচ্য নহে। পার্সী, হিন্দু, এহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির এই আচরণের প্রতি আয়তে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিরূপে তাহারা আল্লার কেতাবকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিতেছে, এই সকল বিবরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

৯৬ **ছোলায়মান, হারূত মারূত, যাদু** :—

তফছিরের কতিপয় রাবী, এই আয়তে বর্ণিত হজরত ছোলায়মানের ও হারূত মারূত ফেরেশ্‌তার বিবরণ প্রসঙ্গে কতকগুলি নিতান্ত অমূলক বাজে আজগৈবী গল্পকে কোর্‌আনের তফছিরে ঢুঁকাইয়া দিয়াছেন। এই গল্পগুলিকে বজায় রাখার জন্য তাঁহারা আয়তের তফছির করার সময়ও নানা ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। আয়তে প্রসঙ্গক্রমে سحر 'ছেহের' বা যাদুর উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা লইয়াও অনেকে অনেক প্রকার অসংলগ্ন কথা বলিয়া থাকেন। সেই জন্য আয়তটীর একটু বিস্তারিত আলোচনা করার আবশ্যক হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে আয়তের কএকটা শব্দের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিতেছি :—

(১) تتلوا ... على আরবী সাহিত্যে يتلوا عليه পদের তাৎপর্য্য يكذب عليه 'সে তাহার উপর মিথ্যা অপবাদ দিল' (রাগেব, তাজুল-ওরূছ)। আবু-মোছলেম ও এমাম রাজী এই তাৎপর্য্যের কথা স্বীকার করিয়াছেন (কবির ১—৬৩৫ ও ৬৩৬)। সেই জন্য আমরা "ছোলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যাহা পাঠ করিত"—এই প্রকার অনুবাদ না করিয়া, "ছোলায়মানের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কতিপয় শয়তান যে মিথ্যা প্রচার করিয়াছিল" —এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছি। এই ছুরার ১৪ আয়তে و اذا خلوا الى شياطينهم পদে এহুদীদিগের দলপতিদিগকেই শয়তান বলা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এহুদীদিগের সেই সব দুষ্কীর্ত্তির কথাই ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। এখানেও শয়তান অর্থে সেই এহুদী দলপতিদিগকেই বুঝাইতেছে।

(২) "মা" — ما — আয়তে কতকগুলি ক্রিয়াপদের প্রথমে 'মা'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য অনুবাদকেরা উপরোক্ত গল্পগুলির খাতিরে কোন কোন স্থানে উহার অর্থ লইয়াছেন 'নাফিয়া' হিসাবে, আবার কোন কোন স্থানে উহাকে 'মাউছালা'রূপে গ্রহণ

করিয়াছেন। যেমন প্রথমের وما كفر سليمان , وما يعلمن من احد , وما هم بضارين به , পদে তাঁহারা অনুবাদ করিতেছেন—(১) ছোলায়মান কাফের হয় নাই; (২) তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না, (৩) কাহারও ক্ষতি করিতে পারিত না। মাউছুলা লইলে উহার অর্থ ঠিক বিপরীত হইয়া যাইত, যেমন—(১) ছোলায়মান যে সকল কোফর করিয়াছিল, (২) তাহারা যাহা শিক্ষা দিত, (৩) তাহারা লোকের যে সব ক্ষতি সাধন করিত। আমি এইরূপে 'মা'-কে নাফিয়া অর্থে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু গল্পের সঙ্গে সমঞ্জস করার উদ্দেশ্যে অন্যেরা এ সকল ক্ষেত্রে উহাকে মাউছুলা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে গল্পটা বজায় থাকিতেছে বটে, কিন্তু ছোলায়মান ও হারূত মারূত সম্বন্ধে যে মিথ্যার প্রতিবাদ করাই আয়তের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে!

তাওরাত, তারগুম প্রভৃতি এহুদীদিগের পুরাতন পুস্তকের এবং Solomon সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনাগুলির সহিত, আরবীয় এহুদীদিগের তাৎকালিন বিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে মিলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, হজরত ছোলায়মানের উত্তরাধিকারের দাবী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরলোক গমন পর্য্যন্ত, এক দল এহুদী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া আসিতেছিল। ছোলায়মানের আশ্চর্য্য আংটী, সখর-জিন্নীর গল্প এবং যাদুর কেতাবের কেচ্ছা, এ সমস্তই তাঁহার শত্রু পক্ষের আবিষ্কার। বাইবেলে লেখা হইয়াছে—সাত শত রমণী তাঁহার পত্নী ও তিন শত তাঁহার উপপত্নী ছিল, তাঁহার সেই স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল—"ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল ...... তাহার অন্তঃকরণ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। কিন্তু শলোমন সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু মিলকমের অনুগামী হইলেন। ...... সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন। সেই সময়ে শলোমন যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্ব্বতে মোয়াবের ঘৃণার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মোলকের জন্য উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিলেন।" (১ রাজাবলী ১১ অধ্যায়)।

হজরত ছোলায়মানের বিরুদ্ধে এই পৌত্তলিকতার অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, পাশ্চাত্যের মনীষী লেখকেরা বহু গবেষণার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিরূপ প্রক্ষেপের ফলে এই সকল অঘটন সংঘটিত হইতে পারিয়াছে, তাহাও তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন (Biblica—Solomon, No. 10)। কোর্‌আন বাইবেলের এই অভিযোগের প্রতিবাদ আজ হইতে সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছে। শয়তানেরা ছোলায়মানের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচার করিয়াছিল, এবং কোর্‌আন তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। ইহা তাহাদের ছোলায়মানের বিরুদ্ধে প্রথম মিথ্যা। ইহা ব্যতীত এহুদীরা আরও প্রকাশ করিত

যে, হজরত ছোলায়মান যাদুকরও ছিলেন। ছোলায়মানের যাদু পুস্তক—Solomon's Book of Magic (Rodwell ৩৪৮) নামে তাহারা হজরত ছোলায়মানের নামকরণে এক খানা যাদুমন্ত্র সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করিয়া লইয়া প্রচার করিয়াছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়া যাইতেছে। বাইবেল সংক্রান্ত জাল পুস্তকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে Testament of Solomon বা "ছোলায়মানের নিয়ম" নামে এইরূপ আর একখানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাইবেল বিশ্বকোষে এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

Practically magical book, though interspersed with large haggadic sections. ...... it narrates the circumstances under which Solomon attained power over the world of spirits, detailes his interviews with the demons, and ends with an account of his fall and loss of power. (Biblica—Col. 254, No. 14)। ইহা বস্তুতঃ একখানা যাদু পুস্তক। 'ভৌতিক' রাজ্যের উপর ছোলায়মান কিরূপে অধিকার বিস্তার করিলেন—তাহার বর্ণনা, জেন ভূতদের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ এবং অবশেষে তাঁহার পতন ও রাজ্যচ্যুতির কথা এই পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারে : salms of Solomon বা 'ছোলায়মানের গীতাবলী' নামে তাহারা আর একখানা জাল পুস্তক প্রচার করে। তাহাতে Dragon দিগের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছোলায়মানের বিরুদ্ধে এহুদীদিগের দ্বিতীয় মিথ্যা প্রচার। কোর্‌আন ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—এ সমস্ত ছোলামানের নামে মিথ্যা অপবাদ।

কালক্রমে এহুদীরা এহুদা ও যেরূশেলম পরিত্যাগ করিয়া বাবেলে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করিতে বাধ্য হয় (দেখ Hutchingson's History of Nations, ৫৫০ পৃষ্ঠা) এবং প্রথমতঃ বাবেলীয় ও পরে পারসিক প্রভাবের ফলে ঐ সমস্ত জাতির সংস্কার এহুদী-দিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। (দেখ—Biblica Art. Demon)। এই খানে পার্সিকদিগের নিকট হইতে তাহারা 'হারূত ও মারূত নামক' ফেরেশ্‌তার বিবরণ অবগত হয়, এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া নানা অনর্থের সূত্রপাত করিতে থাকে। পারস্যের জরদশতের গুরুর নাম ছিল Magi—এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই নামের সহিত c যোগ করিয়া Magic শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে—ইনিই হারূত ও মারূত নামক দুইজন ফেরেশ্‌তার বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে দুন্‌য়ার সম্মুখে প্রচার করেন।' মাজী বলেন ঃ—"হারূত ও মারূত নামক দুই জন ফেরেশতা খোদার অবাধ্য হওয়াতে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাদিগের পা উর্দ্ধদিকে ও মাথা নিম্নদিকে-এই অবস্থায়, বাবেলে লটকান রহিয়াছে। (Hyde. de.Rel. vet. pers. chap. 12, as quoted by sale p. 14)।

ফলে এহুদীদিগের মধ্যে ছোলায়মানের নামকরণে এই মিথ্যা যাদু পুস্তকের প্রসার এবং হারূত মারূত নামক দুই ফেরেশ্‌তার এই কল্পকাহিনীর প্রচার বাবেলে অবস্থান কালে ও

পার্সিকদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় সাধিত হইয়াছিল। সেই জন্য কোর্‌আনেও হজরত ছোলায়মানের যাদু ও হারূত মারূতের বাবেলে অবস্থান সংক্রান্ত অন্ধবিশ্বাস দুইটীর কথা এক সঙ্গে ও এক আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আয়তে ঐ দুইটী সংস্কারের প্রতিবাদই করা হইতেছে।

আলোচ্য ১০২ আয়তটী ১০১ আয়তের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই সকল আয়তে হজরতের সমসাময়িক এহুদীদিগের অনাচারের কথা বর্ণনা করা হইতেছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই আয়তেও তাহাদের একটী জঘন্য দুরভিসন্ধির কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের বিদিত ও প্রত্যাশিত সেই রছুল সমাগত হইলে তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, যে আল্লার কেতাবে সেই রছুলের আগমন সংবাদ লিখিত আছে—তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিল। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, সেই রছুলকে মান্য করা দূরে থাকুক, যাদু মন্ত্র খাটাইয়া তাহারা তাঁহাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই যাদুর আবিষ্কার সম্বন্ধে তাহারা ছোলায়মানের উপর যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল এবং প্রকৃত পক্ষে ঐ মিথ্যার মূল উৎস যে কোথায়—আয়তে প্রসঙ্গক্রমে তাহাও বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লবিদ নামক জনৈক এহুদী এই সময় হজরতকে 'যাদু করার' যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস পাঠকগণের তাহা অবিদিত নহে। এই স্থানে হজরত ছোলায়মান ও হারূত মারূত সম্বন্ধে এহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রক্ষিপ্ত পুরাণ পুস্তক ও বাজে কিংবদন্তি হইতে এমন কতকগুলি গল্পগুজবকে কোর্‌আনের তফছিরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বাজে কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজকাল মুছলমানদিগের মধ্যে 'নক্‌শে ছোলেমানী', 'হেব্‌জে ছোলেমানী' প্রভৃতি নামে যে সকল তাবিজের কেতাব প্রচলিত আছে, তাহা এই সকল গল্পের ফল এবং এহুদী শয়তানদিগের প্রচারিত সেই সব জঘন্য মিথ্যার শোচনীয় অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সখরজিন্নির হজরত ছোলায়মানের রূপ ধরিয়া তাঁহার বিবির নিকট হইতে আংটী চুরি করিয়া লওয়া আর সে আংটীর কল্যাণে সমস্ত দানব মানব চরেন্দা পরেন্দা ইত্যাদি সেই জ্বেনের আজ্ঞাধীন হইয়া যাওয়া, ছোলায়মানের রাজ্যচ্যুত হইয়া এক ধীবরের আশ্রয় লওয়া ও সেই ধীবর কন্যার তাঁহার উপর আশেক হওয়া, সেই কন্যার সহিত ছোলায়মানের বিবাহ ও শ্বশুরের সঙ্গে বখরায় মৎসজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করা, ঘটনাক্রমে সখর জিন্নির হাত হইতে একদিন সেই আংটী পড়িয়া যাওয়া, তাহা গ্রাস করিয়া এক মাছের দরিয়ার রাজত্ব লাভ করা, সেই মৎস্যরাজের আবার শ্বশুর জামাইয়ের জালে এবং অবশেষে জামাইয়ের ভাগে পড়া এবং তাহার পেট হইতে আংটী বাহির হওয়ার পর ছোলায়মানের পুনরায় স্বরাজ্য লাভ ও সখর দৈত্য নিধন—ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করিতেও আমরা লজ্জা অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ এই আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি কোর্‌আনের তফছিরে ঢুকাইয়া দিয়া একদল রাবী এছলামের যে ঘোর ক্ষতি সাধন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মান

হইয়া পড়িতে হয়। 'হারুত-মারুত ফেরেশ্‌তা'দিগের সম্বন্ধেও এই কথা। এই গল্পগুলির মূল উৎস যে কোথায়, উপরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আল্লার দুই জন প্রধান ফেরেশ্‌তা একটা কুলটা নারীর প্রেমে পড়িয়া মদ্যপান, নরহত্যা, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হইলেন এবং সেই কুলটাকে "এছমে আজম" শিখাইয়া দিলেন, তাহার ফলে সেই চরিত্রহীনা নারী "জোহরা ছেতারা" বা Venus শুক্রগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আছমানে চলিয়া গেল—আর নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য হারুত ও মারুত বাবেলের কূপে অধঃমুণ্ড অবস্থায় লটকিয়া থাকার দণ্ড গ্রহণ করিলেন। অথচ এই প্রায়শ্চিত্ত করার অবস্থাতেও তাঁহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে কাফের বানাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক অপ্রামাণিক ও অনৈছলামিক কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহারা বলিতেছেন:—বাবেলের সেই কূপে হারুত-মারুত ফেরেশ্‌তা এখনও সেইরূপ অধঃমুণ্ডে ঝুলিতেছেন। কোন লোক তাঁহাদিগের নিকট যাদু শিখিতে গেলে, তাঁহারা প্রথমে তাহাকে বলিয়া দেন যে—"আমরা ফেৎনা, অতএব তোমরা যাদু শিখিয়া কাফের হইও না।" কিন্তু এই উপদেশে যদি শিক্ষার্থী ক্ষান্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে পেশাব করিয়া আসিতে বলা হয়। যাদু শিক্ষার্থী পেশাব করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঈমান পেশাবের রাস্তা দিয়া বাহির হয় এবং এক নূরানী ঘোড়-ছওয়ারের ছুরৎ গ্রহণ করিয়া আছমানে চলিয়া যায়। শিক্ষার্থী পেশাব করার পর হারুৎ-মারুতের কাছে ফিরিয়া আসিয়া ঐ ঘটনার কথা বিবৃত করিলে, তাঁহারা বলিয়া দেন—'তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি যাহা ভাবিবে বা যাহা হওয়াইবার ইচ্ছা করিবে, অবিলম্বে তাহা হইয়া যাইবে।' এই সকল ভিত্তিহীন গাঁজাখুরি গল্পের প্রতিবাদ করিতেও আমরা লজ্জা বোধ করি। যে যাদু শিক্ষা করিলে মানুষের ঈমান তাহাকে চিরস্থায়ী ভাবে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা শত সহস্র লোককে যাহারা শিক্ষা দিয়া অমন জঘন্য ভাবে বেইমান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা কত বড় মহাপাতকী! ইহাই কি পাপাশক্ত ফেরেশ্‌তাদের প্রায়শ্চিত্ত? বাবেলের সেই অপরূপ কূপটী কোথায় আছে, কেহ তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি? বাবেলের কোন স্থানই ত আজ মানুষের অগম্য নাই। জিজ্ঞাসা করি, হারুৎ মারুতের জোহরার প্রতি কামাশক্তির ঘটনা কবে সংঘটিত হইয়াছিল? শুক্রগ্রহ বা Venus নক্ষত্রের অস্তিত্ব কি তাহার পূর্ব্বে ছিল না?

ত্রয়োদশ রুকু'

১০৪ হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা 'রাএনা' না বলিয়া 'ওন্‌জোর্না' বলিবে ও অবাধান করিতে থাকিবে, আর কাফেরদিগের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্দ্ধারিত) আছে।

١٠٤ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১০৫ তোমাদিগের প্রতি তোমাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে কোনও মঙ্গল সমাগত হয়—গ্রন্থধারী-দিগের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে-তাহারা ও মোশ্‌রেক-গণ (কেহই) ইহা পছন্দ করে না। অথচ (ইচ্ছাময়) আল্লাহ্ নিজ করুণা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা বিশিষ্টরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লন—আর আল্লাই (হইতেছেন) মহীয়সী-করুণা-নিধান।

١٠٥ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

১০৬ আমরা যে কোন নিদর্শনের বিবর্ত্তন করি অথবা তাহাকে বিস্মরণ করাইয়া দেই—তাহা অপেক্ষা উত্তম বা তদনরূপ

١٠٦ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ

তَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ	(নিদর্শন) উপস্থিত করিয়া থাকি, আল্লাহ্ যে সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান—তাহা কি তুমি অবগত নহ !—
১০৭ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	১০৭ তুমি কি অবগত নহ যে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সাম্রাজ্য একমাত্র আল্লারই অধিকারভুক্ত, এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিভাবক বা সহায় তোমাদের নাই ?
১০৮ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ	১০৮ ইতঃপূর্ব্বে মূছাকে যেরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল—তোমরাও কি নিজেদের রছুলকে সেইরূপে প্রশ্ন করিতে চাও ! বস্তুতঃ ঈমানের বিনিময়ে যে ব্যক্তি কোফরকে গ্রহণ করে—প্রকৃত পথকে সে ত নিশ্চয় হারাইয়া বসিয়াছে।
১০৯ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ	১০৯ সত্য তাহাদিগের নিকট স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হওয়ার পরেও, নিজেদের মনের ঈর্ষা বশতঃ, গ্রন্থধারীদিগের মধ্যে অনেকেই, তোমাদিগকে ঈমানের পর আবার কাফের করিয়া ফেলার

জন্য লালায়িত,—কিন্তু তোমরা ক্ষমা কর ও ভৎ'সনা করা ত্যাগ কর—তাহাতে আল্লাহ্ নিজের (উদ্দিষ্ট) ব্যাপারকে উপস্থিত করিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান।	أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ : فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ : اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
১১০ এবং নমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখ আর জাকাত প্রদান করিতে থাক ; বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য পূর্ব্ব হইতে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে—আল্লার সমীপে তাহা প্রাপ্ত হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।	١ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ : اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
১১১ তাহারা বলে ঃ—"এহুদী বা খৃষ্টান না হইলে কেহ কখনও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এ সব হইতেছে তাহাদের 'খোশ্‌খেয়াল' ; বল—সত্যবাদী যদি হও—নিজেদের (দাবীর) প্রমাণ উপস্থিত কর !	١١ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصٰرٰى : تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ : قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

১১২ হাঁ! যে কোন ব্যক্তি আল্লাতে আত্মসমর্পন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মশীল হয় — নিজ প্রভুর সন্নিধানে তাহার পুরস্কার (নির্দ্ধারিত) আছে, এবং কোন আশঙ্কা তাহাদের নাই আর কোন প্রকার সন্তপ্ত হইবে না তাহারাই।

١١٢ بلى : من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه : و لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

টীকাঃ—

৯৭ **রাএনা**ঃ—

'রাএনা' শব্দের অর্থ—আমাদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান কর, আমাদিগের কথা অবধান কর। কিন্তু আএন-বর্ণের 'জের'কে দীর্ঘ ঈকারের ন্যায় উচ্চারণ করিলে উহার অর্থ দাঁড়ায়—ওরে নির্ব্বোধ, ওরে রাখাল, ইত্যাদি। ছুরা 'নেছা'র ৪৬ আয়তে জানা যাইতেছে, এহুদীরা ليا بالسنتهم নিজেদের বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা 'রাএনা' শব্দকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত। ইহাদ্বারা হজরতের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এহুদীরা যাহাতে ইহার সুযোগ না পায়, সেই জন্য মুছলমানদিগকে ঐ শব্দের পরিবর্ত্তে 'ওন্‌জোর্ণা' বলিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উহার অর্থ—দেখুন, অনুধাবন করুন, ইত্যাদি। এহুদীদিগের এই প্রকার আরও অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপের কথা হাদিছে ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এছলামের একমাত্র অভিবাদন—আচ্ছালামো আলায়কুম, অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শান্তি হউক! এহুদীরা উহাকে আচ্ছামো আলায়কুম রূপে বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিত। উহার অর্থ—তোমাদিগের মরণ হউক!

৯৮ **আল্লার ন্যায়-বিচার**ঃ—

এই রুকু'তে কোর্‌আনের, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ও মুছলমানদিগের প্রতি আরবের এহুদী ও পৌত্তলিকদিগের মনোভাবের ও ব্যবহারের কথা বর্ণনা করা হইতেছে এবং মুছলমানদিগকে সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার উপায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে। পৌত্তলিকেরা বলিত—আল্লাহ নিজের কালাম দুন্‌য়ায় পাঠাইতে চাহিলে নিজের একজন ফেরেশ্‌তাকে দিয়া তাহা আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, মোহাম্মদের ন্যায় একজন মানুষ সেজন্য

নির্ব্বাচিত হইল কেন ? এহুদীরা বলিত—আমরা বনি-এছরাইল জাতি' হইতেছি আল্লার "প্রতিজ্ঞা"র বাহক, আমরাই হইতেছি নবীদিগের উত্তরাধিকারী। অতএব নবুঅত ও আল্লার কালাম আমাদিগের জাতির মধ্যকার কোন ব্যক্তির নিকট আসাই উচিত। তাহা না হইয়া মোহাম্মদ নবী হইবেন আর তাঁহার প্রতি আল্লার বাণী সমাগত হইবে, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। এই আয়তে ও ইহার পরবর্ত্তী কএকটী আয়তে তাহাদিগের এই অজ্ঞতার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ও করুণা-নিধান উভয়ই। সুতরাং বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহার যে করুণা, সে হিসাবে যে জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হইলে এবং যে ব্যক্তিকে নবুঅত দান করিলে তাঁহার বান্দাগণের সার্ব্বজনীন মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ কোন উপযুক্ত মানুষকেই তিনি নিজের কালাম প্রদান করিয়া থাকেন। কোন জাতি বা বংশের প্রতি তাঁহার কোন পক্ষপাত নাই।

৯৯ **নাছেখ—মন্‌ছুখ** ঃ—

পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে—গ্রন্থধারীরা মুছলমানদিগের নিকট সমাগত কোর্‌আনকে পছন্দ করে না। বস্তুতঃ কোর্‌আনে এমন অনেক বিষয় আছে, তাহাদিগের নিকট বিদ্যমান কেতাবে যাহা নাই। ঐ কেতাবগুলির বর্ণিত সকল বিষয়ের সহিত কোর্‌আনের সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলির অবস্থা ও কোর্‌আনের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ঐ কেতাবগুলির অনেক আয়ত মানুষ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, কোর্‌আনে তাহা বিবৃত হইয়াছে। মানুষের জ্ঞান পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বে, দুনয়ায় যে সকল নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাময়িক হিসাবে এক এক প্রদেশের ও এক এক জাতির জন্য হেদায়তের ভার পাইয়াছিলেন, এবং সেই হিসাবেই তাঁহাদিগের নিকট কেতাব প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল কেতাবের সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে, বিশ্বের মানবজাতির সমবেত ধর্ম্ম-এছলামে বলবৎ থাকিতে পারে না। এই জন্য সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ী এবং সকল মানবের ব্যাপক ও শাশ্বত কেতাব—কোর্‌আনে পূর্ব্ব ব্যবস্থার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে আল্লাহ এই কথাই বলিয়া দিতেছেন ঃ—আমরা যে কোন আয়তের পরিবর্ত্তন করি—তাহা অপেক্ষা উত্তম আয়ত আনয়ন করিয়া দিই, এবং যে আয়তকে বিস্মৃত করাই—তাহার সমান আয়ত প্রকাশ করিয়া থাকি।

এই আয়ত ও ছুরা নহলের ৬৭ আয়ত হইতে প্রমাণ করা হইয়া থাকে যে, কোর্‌আনের এক একটা আয়ত দ্বারা অন্য আয়ত রহিত বা মন্‌ছুখ Abrogated হইয়া থাকে। তফছির-কারগণ মনে করেন যে, কোর্‌আনে এমন কতকগুলি আদেশ ও নিষেধ সন্নিবেশিত হইয়া আছে, যাহা পরস্পর বিপরীত। সুতরাং এই শ্রেণীর শেষোক্ত আদেশ নিষেধের দ্বারা প্রথমোক্ত আদেশ নিষেধগুলিকে রহিত করা হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। কারণ দুইটী পরস্পর বিপরীত আদেশের উপর আমল করা অসম্ভব। এই হিসাবে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা

কোর্‌আনের পাঁচ শত আয়তকে রহিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞাতব্য এই যে, "কোর্‌আনের অমুক আয়তটী অমুক আয়ত দ্বারা মন্‌ছুখ হইয়াছে"—হজরত রছুলে করিম হইতে এ সম্বন্ধে একটীও প্রামাণ্য হাদিছ বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং অমুক আয়তটী অমুক আয়ত দ্বারা মন্‌ছুখ হইয়াছে—কেবল যুক্তির হিসাবে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। তাই আমাদের আলেম সমাজের মধ্যে এই যুক্তির হিসাবে মন্‌ছুখ আয়তগুলির বিচার বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে, এবং ইহার ফলে এমাম ছয়ুতী প্রমুখ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, উপরোক্ত পাঁচ শত আয়তের মধ্যে অধিকতর আয়তই বস্তুতঃ মন্‌ছুখ নহে। এমাম ছাহেবের মতে কোর্‌আনে মাত্র ২০টী আয়ত এরূপ আছে, যাহাকে মন্‌ছুখ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে। (এৎকান ৪৭ প্রকরণ)। ইহার পরও আলেম সমাজ এ বিষয়ের গবেষণা পরিত্যাগ করেন নাই, এবং শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব ইহার ফলে মত প্রকাশ করেন যে, কোর্‌আনে মাত্র পাঁচটী আয়ত মন্‌ছুখ (ফওজুল কবির)। নওয়াব ছিদ্দিকুল হাছান খাঁ ছাহেব এই রুকু'র তফছিরে শাহ ছাহেবের অভিমত উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন— لیکن ان پانچ میں بھی نظر ہے —অর্থাৎ শাহ ছাহেবের বর্ণিত এই পাঁচটা আয়ত সম্বন্ধেও বিচার করিবার বিষয় আছে। (তর্‌জুমান)। মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী ছাহেব এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই পাঁচটার মধ্যে দুইটী আয়তকে মন্‌ছুখ নহে বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। দেখ—তফছির হাক্কানী ৬—৮৪ ও ৭—৬০ পৃষ্ঠা। এই শ্রদ্ধাস্পদ আলেমগণের প্রদর্শিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সহজে জানা যাইবে যে, বস্তুতঃ অবশিষ্ট তিনটী আয়তও মন্‌ছুখ নহে। যথা স্থানে পাঠকগণ ইহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

এই পদে বর্ণিত "আয়ত" বা নিদর্শন হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলির আয়তকেই বুঝাইতেছে—কোর্‌আনের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। উপক্রম উপসংহারের ও বাস্তব fact এর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আয়তটীর বিকৃত ব্যাখ্যার অনুসরণে ও তফছিরের রেওয়ায়তের নামকরণে এমন কতকগুলি অন্যায় ও অপ্রামাণিক কথা এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা হইয়া থাকে, যাহা কোর্‌আনের বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে আজ খৃষ্টান মিশনরীদিগের হাতে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। (১)

১০০ উদ্ভট প্রশ্ন :—

এহুদীরা হজরতকে বলিয়াছিল—মোহাম্মদ! তুমি আল্লাহ কে বল, "তিনি আছমান হইতে আমাদিগের জন্য একখানা কেতাব অবতীর্ণ করুন", তাহা হইলে আমরা তাহাতে

---

(১) তথাকথিত منسوخ الحكم و التلاوة আয়তগুলি সম্বন্ধে এৎকানে বর্ণিত রেওয়ায়তগুলি এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বিশ্বাস করিতে পারি। (ছুরা নেছা ১৫৩)। কোরেশ দলপতিরাও হজরতকে এই শ্রেণীর উদ্ভট দাবী জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল—মোহাম্মদ! তুমি আমাদের দেশে নদী প্রবাহিত করিয়া দাও, নিজের জন্য একটা কানন প্রস্তুত করিয়া লও, অথবা আমাদিগের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক, কিম্বা নিজের জন্য একটা স্বর্ণ হর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়া বা আকাশে আরোহণ করিয়া দেখাও! (ছুরা বনি-এছরাইল ৮৯ হইতে ৯৩ আয়ত)। ওৎবা শাইবা প্রভৃতি কোরেশ দলপতিগণের এই শ্রেণীর অন্যান্য উদ্ভট প্রশ্নের কথা কোর্‌আনে ও হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়তে এহুদী ও পৌত্তলিকদিগের এই সব উদ্ভট দাবীর উল্লেখ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই প্রকার দাবী আজ নূতন নহে। মূছার নিকটও এহুদীরা এই প্রকার দাবী উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিল—আল্লাহকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমরা কখনই তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না। (ছুরা বকরা)। আল্লার নবীর ও তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কেতাবের সত্যতা তাহার শিক্ষার মহিমার মধ্য দিয়াই প্রকট হইয়া থাকে, সেজন্য এই প্রকার উদ্ভট ও অলৌকিক অঘটন সংঘটন করার আবশ্যক হয় না। গো-কোর্‌আনীর আদেশ সম্বন্ধে হজরত মূছাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহাও ন্যায়ের ফাকি ও হীলা-শরইর দ্বারা খোদার হুকুমকে অমান্য করার প্রচেষ্টা মাত্র। মুছলমানকে এই এহুদী আদর্শের অনুসরণ করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কারণ এই মানসিকতার ফলে মানুষ প্রকৃত মুক্তিপথকে হারাইয়া বসে।

১০১ **ক্ষমা ও উপেক্ষা**ঃ—

এহুদীরা ছলে বলে কৌশলে মুছলমানদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ করার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে থাকিত। হজরতের মদিনীয় জীবনের পূর্ণ দশ বৎসরের ইতিহাস, এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের বিবরণে পরিপূর্ণ। সময় সময় অভিসন্ধি আঁটিয়া ইহাদের দুই চারিজন মুছলমান হইয়া যাইত। আবার অল্পকাল পরে এছলাম পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণকে বলিয়া বেড়াইত—বড় আশা করিয়া মুছলমান হইয়াছিলাম, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বস্তুতঃ এছলাম ধর্ম্মটা নিতান্ত অসার। তাই সত্যের অনুরোধে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপে মুছলমানদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ছুরা আলে-এমরানের ৭১ আয়তে পাঠকগণ এই ষড়যন্ত্রের বিবরণ দেখিতে পাইবেন। আজ-কালও অজ্ঞ মুছলমানদিগকে প্রবঞ্চিত করার জন্য মধ্যে মধ্যে এই প্রকার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই শ্রেণীর শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের পরিবর্ত্তে মুছলমানদিগকে ক্ষমা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে বলা হইতেছে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাই যথা সময়ে ও যথা উপায়ে সত্যকে জয়যুক্ত করার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে "হাত্তা"-শব্দের অর্থ 'যাবৎ না' ও যে মতে So that উভয় হইতে পারে। এখানে দ্বিতীয় অর্থ প্রযুজ্য, কারণ ক্ষমা ও উপেক্ষা

প্রদর্শনের উপযুক্ত সময়ে ক্ষমা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করার আদেশ চিরকালই বলবৎ আছে ও থাকিবে। হজরতের সমগ্র জীবনই এই ক্ষমার আদর্শে পরিপূর্ণ।

১০২ **সাম্য ও ভ্রাতৃভাব** :—

আজকাল একদল লোক সচরাচর বলিয়া থাকেন যে, "এছলামের সার শিক্ষা হইতেছে —সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃভাব। এখানেই এছলামের মহিমা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।" অর্থাৎ এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহারা এছলামের অন্যান্য আদেশ নিষেধের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহেন। বস্তুতঃ এছলামে সার শিক্ষা ও অসার শিক্ষা বলিয়া দুইটা বিভাগ নাই —তাহার সমস্ত শিক্ষাই সার শিক্ষা। যে সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা জোর গলায় প্রচার করা হইয়া থাকে, এছলামের প্রবর্ত্তিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়াই তাহা সফল ও সার্থক হইতে পারে। সকলে সমান ও সকলে ভাই—এইরূপ মহান ভাব মনে জাগাইয়া তুলিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সকলের একটা সাধারণ কেন্দ্রের ও বিশ্বমানবের একজন সর্ব্বশক্তিমান মালেকের চিন্তাকে মনে স্থান দান করিতে হইবে। অর্থাৎ আল্লাহকে না চিনিলে ও তাঁহাকে প্রেম না করিলে তাঁহার বান্দাদিগকে চিনিতে ও প্রেম করিতে মানুষ কখনই সমর্থ হইবে না। এখানে তাই সঙ্গে সঙ্গে নমাজ ও জাকাতের কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। আল্লাহকে চিনিবার জন্য নমাজ এবং সাম্যবাদের আদর্শের জন্য জাকাত হইতেছে এছলামের প্রধানতম সাধনা।

১০৩ **আছ্‌লামা—আত্মসমর্পন** :—

এহুদীরা বলে—এহুদী ব্যতীত আর কেহই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। খৃষ্টানেরাও বলিয়া থাকে—খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কেহই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এ সবকে কোর্‌আনে 'খোশ্‌-খেয়াল' বলিয়া উল্লেখ করার পর বলা হইতেছে —যে কোন ব্যক্তি আল্লাতে আত্মসমর্পন করে আর সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে, পরকালে শঙ্কাহীন সন্তাপহীন জীবন তাহারাই লাভ করিতে পারে। "আত্মসমর্পন করে"—এই অর্থ বুঝাইতে اسلم 'আছলামা' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহারই মছদর হইতেছে 'এছলাম', উহার অর্থ আত্মসমর্পন করা। যে এহছান করে সে মোহছেন। আরবী ভাষায় এহছানের অর্থ—(১) অন্যের মঙ্গলসাধন করা, (২) কোন বিষয়কে সুন্দর ভাবে জ্ঞাত হওয়া ও কোন কাজকে যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা। (রাগেব)। রুকু'র শেষ দুই আয়তে বলা হইতেছে যে, এছলাম ও এহছানই পারলৌকিক মুক্তি ও মঙ্গলের একমাত্র নিদান।

চতুর্দ্দশ রুকু'

১১৩ এহুদীরা বলে — খৃষ্টানেরা (নির্ভর যোগ্য) কোন কিছুর অনুসরণ করে না, খৃষ্টানেরাও বলে — এহুদরা কোন কিছুর অনুসরণ করে না, অথচ তাহারা সকলেই কেতাব পাঠ করিয়া থাকে! যাহারা (কেতাব) অবগত নহে, এইরূপে তাহারাও উহাদিগের অনুরূপ কথা কহিয়া থাকে, অতএব যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে— কিয়ামত কালে আল্লাই তাহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

١١٣ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ، كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ؛

১১৪ আল্লার মছজেদ সমূহে তাঁহার নামের ভজন হউক—যে সকল লোক ইহাতে বাধা প্রদান করে ও ঐ গুলিকে উৎসন্ন দিবার জন্য চেষ্টিত হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে (হইতে পারে)? এইযে লোকগুলি, (আল্লার ভয়ে) ভীত অবস্থা ব্যতিরেকে মছজেদ

١١٤ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا، اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ

لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

সমূহে প্রবেশ করাই ত তাহাদের উচিত নহে। তাহাদিগের জন্য দুন্‌য়াতে অপমান এবং পরকালে তাহাদিগের জন্য গুরুতর শাস্তি (নির্দ্ধারিত) আছে।

১১৫ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

১১৫ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লারই অধিকারভুক্ত, অতএব তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাও না কেন - আল্লার দৃষ্টি সেই খানেই (বিরাজমান), নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বজ্ঞ।

১১৬ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ

১১৬ তাহারা আরও বলে— 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' (মিথ্যা কথা), মহিমময় তিনি বরং স্বর্গ ও মর্ত্তে যাহা কিছু আছে - সে সমস্তের তিনি মালেক, সমস্তই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

১১৭ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

১১৭ গগন মণ্ডল ও ধরা ধামের উদ্ভাবক তিনি, যখন কোন বিষয়ের অনুজ্ঞা করেন, তৎসম্বন্ধে বলেন — "হউক!" অমনি তাহা হইয়া যায়।

১১৮ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا

১১৮ অজ্ঞ লোকেরা বলে—আল্লাহ্ আমাদিগের সহিত কথা কহেন

يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ ،
كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ،
قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يُّوْقِنُوْنَ

না অথবা আমাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আসে না-কেন ? তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও এইরূপে তাহাদিগের অনুরূপ কথা কহিয়াছিল, তাহাদিগের সকলেরই মানস একই প্রকার ;—যে সমস্ত লোক বাস্তব প্রত্যয়ে উপনীত হইতে চায় তাহাদিগের জন্য আমরা ত বহু নিদর্শন স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।

١١٩ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ
نَذِيْرًا وَّ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ
الْجَحِيْمِ

১১৯ নিশ্চয় তোমাকে আমরা সত্যসহকারে সুসমাচার-বাহক ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি—অপিচ নরকগামীদিগের জওয়াবদিহি তোমাকে করিতে হইবে না।

١٢٠ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ
لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ،
قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى :
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِيْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ

১২০ এহুদীরা কদাচ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না—খৃষ্টানেরাও (সন্তুষ্ট) হইবে না—যাবৎ না তুমি তাহাদিগের ধর্ম্ম মতের অনুসরণ কর। বল ঃ—আল্লার যে হেদায়ত প্রকৃত হেদায়ত ত তাহাই। আর তোমার নিকট যে জ্ঞান সমাগত হইয়াছে, তাহার পরও যদি তুমি ইহা-

مِنَ اللّٰهِ مِن وَّلِيٍّ وَّلَا

দিগের বাতেল আকাঙ্খাগুলির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতে (রক্ষা করার মত) কোন অভিভাবক বা সহায় তোমার নাই।

১২১ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

১২১ যাহাদিগকে আমরা কেতাব দিয়াছি, তাহার যথাযথ অনুসরণ তাহারা করিয়া থাকে, ইহাতে বিশ্বাস করে তাহারাই; পক্ষান্তরে তাহাকে অমান্য করে যাহারা—তাহারাই ত হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত।

টীকা :—

১০৪ এহুদী ও খৃষ্টানের কলহ :—

এহুদীরা খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মকে ভিত্তিহীন অসত্য বলিয়া উল্লেখ করিত, হজরত ঈছা সম্বন্ধে নানা কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিত—পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরাও হজরত মূছার শরিয়তের নিন্দাবাদ করিত, তওরাতের ব্যবস্থাকে অমান্য করিত। অথচ উহারা যে সকল কেতাব পাঠ করিত, তাহাতেই পরস্পরের সত্যতার প্রমাণ আছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা নিজেদের জেদ ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ শাস্ত্রকে অমান্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে সকল জাতির নিকট কোন কেতাব আসে নাই, তাহারাও না জানিয়া শুনিয়া দুন্য়ার অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে অসত্য ও অন্যায় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকে (১০২ টীকার সহিত মিলাইয়া পড়)। প্রকৃত পক্ষে তাহারা নিজেদের কেতাবকে অবলম্বন করিলে এই বিবাদের কোন কারণ থাকে না।

এমাম ফখরুদ্দিন রাজী এই আয়তের তফছিরে লিখিতেছেন—

و اعلم ان هذه الواقعة بعينها قد وقعت فى امة محمد صلعم فان كل طائفة تكفر الاخرى مع اتفاقهم على تلاوة القران -

—"দেখ ! ঠিক এই প্রকার ঘটনা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মতের মধ্যে ঘটিয়াছে, কারণ

তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অন্য সম্প্রদায়কে কাফের বলিয়া থাকে, অথচ কোর্‌আনকে আল্লার সত্য সনাতন বাণী বলিয়া সকলে সমবেত ভাবে পাঠ করিয়া থাকে।" (১—৬৮০)।

১০৫ আল্লার মছজিদ ঃ—

মছজিদ অর্থে ছেজদা করার বা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হওয়ার স্থান। যে স্থানে মানুষ আল্লার হুজুরে নিজের দেহ ও মনের ছেজদা নিবেদন করে, তাহাই আল্লার মছজিদ। এই স্থান-গুলিতে আল্লার ভজন হইবে, ইহাতেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু দুন্‌য়ায় চিরকালই এরূপ এক এক দল সঙ্কীর্ণমনা মানুষ বিরাজ করিয়া আসিয়াছে, যাহারা নিজেদের মিথ্যা ধার্ম্মিক-তার দাম্ভিকতায় অন্ধ হইয়া অন্য লোকদিগকে আল্লার মছজিদে তাঁহার জেকের বা ভজন করিতে দেয় না। তাহারা মনে করে, এইরূপে মছজিদের সম্মান রক্ষা করা হয়। ইহা ভুল, কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে—ইহাই হইতেছে প্রকৃত পক্ষে মছজিদকে ভিরান করার ও উৎসন্ন দেওয়ার চেষ্টা। হজরতকেও মক্কার মোশ্‌রেকগণ—কাবায় আল্লার এবাদৎ করিতে দেয় নাই। কিন্তু হজরত মদিনার মছজিদে খৃষ্টানদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে এবাদত করার অনুমতি দিয়াছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজ কাল এ দেশের মুছলমানদিগের মধ্যেও এই জঘন্য গোঁড়ামীর রোগ প্রবল ভাবে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে উদারতা প্রদর্শন ত দূরের কথা, সামান্য সামান্য মছলার মত-ভেদের জন্য আজ তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের মুছলমানকে মারিয়া ধরিয়া মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না! কোর্‌আনের শিক্ষার ও রছুলের আদর্শের ইহা অপেক্ষা গুরুতর অবমাননা আর কি হইতে পারে?

বায়তুল মোকদ্দছ ও কাবার মছজিদ লইয়া এহুদী, পার্সিক, খৃষ্টান ও মক্কার পৌত্তলিক-গণ যে মানসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের উপর অত্যাচার অবিচার করিয়া আসিতেছে, আয়তে সেই মানসিকতার নিন্দা করা হইয়াছে, এবং ইহা সকল যুগের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সাধারণ ভাবে প্রযুজ্য।

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে—যাহারা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মভীরু লোক, এবং প্রকৃত পক্ষে মছজিদে গিয়া আল্লার হুজুরে আত্মনিবেদন করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা যখন মছজিদে প্রবেশ করে, তখন আল্লার অনুভূতি তাহার মনঃপ্রাণকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, নিজের অন্তরের অন্তস্তলে লুক্কায়িত পাপপুঞ্জের উপর আল্লার প্রখর দৃষ্টি অনুভব করিয়া সে ভীত ও নিজের ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। মছজিদে গিয়া পরের দোষ ত্রুটী লইয়া কোন্দল পাকাইবার বা অন্যকে দণ্ড দিবার দুর্ব্বুদ্ধি তাহার থাকে না। মছজেদের সম্মান যাহারা করে, এইরূপে আল্লার হুজুরে ভীত নম্র মন লইয়া তাহাদের সেখানে প্রবেশ করা উচিত।

১০৬ **পূর্ব্ব ও পশ্চিম—আল্লার** ঃ—

পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, যে লোকগুলি আল্লার মছজিদ সমূহকে ভিরান করিয়া দিবার চেষ্টা করে, দুনয়াতেও তাহাদিগকে অপমানের দ্বারা দণ্ডিত করা হইবে। এই আয়তে বলা হইতেছে—এই দণ্ডের হাত হইতে পলাইয়া রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। পলাইয়া যাইবে কোথায় ? পূর্ব্ব ও পশ্চিম সর্ব্বত্রই আল্লার দৃষ্টি বিরাজমান। সুতরাং সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপক আল্লার দণ্ড হইতে পলাইয়া রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই।

১০৭ **আল্লার সন্তান** ঃ—

মুছলমান ব্যতীত প্রায় অন্য সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা খোদা তাআলার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। খৃষ্টানেরা যীশুকে "ঈশ্বরের একজাত পুত্র বা only begotten son" বলিয়া বিশ্বাস করাকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। আরবের পৌত্তলিকেরা ফেরেশ্‌তাদিগকে আল্লার কন্যা বলিয়া মনে করিত। এখানে এই সকল অযৌক্তিক-অন্ধবিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, আল্লাহ সমস্ত ত্রুটী হইতে মুক্ত ও মহিমময়। তাঁহার সন্তান কল্পনা করিলে যুগপৎভাবে তাঁহাতে নানা অভাব ও মানবীয় প্রবৃত্তির অস্তিত্বও স্বীকার করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার সন্তানের অভাব ও আবশ্যকতা আদৌ নাই। কারণ, স্বর্গে মর্ত্তে যাহা কিছু আছে-সে সমস্তেরই তিনি মালেক, আর সমস্তই তাঁহার আজ্ঞাবহ ও অধিকারভুক্ত।

১০৮ **বদী—কুন** ঃ—

বদী-শব্দ بدع ধাতু হইতে সম্পন্ন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নমুনা বা আলেখ্য যাহার নাই, এরূপ বস্তুর সৃষ্টি করাকে অভিধানে 'বেদ্‌অ' بدع বলা হয়। আল্লাহ সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ হইলে উহার স্পষ্টতর অর্থ এই হইবে যে, তিনি ঐ বস্তুর মূল উদ্ভাবক, এবং সে উদ্ভাবনায় তিনি কোন বস্তু ও বিষয়ের মুখাপেক্ষীও নহেন। (রাগেব)। সৃষ্টিকার্য্যে matter, soul বা প্রকৃতির সাহায্য ভিখারী তিনি নহেন, ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান তিনি, যে কোন বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় হয়—'সৃষ্টি হউক !' অমনি তাহা হইয়া যায়। একমাত্র তিনিই অনাদি এবং তিনি ব্যতীত আর সমস্তই সাদি, অর্থাৎ আত্মা ও প্রকৃতি প্রভৃতিও সেই সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্টি, ঐগুলি সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার শরীক বা অংশী কখনই নহে—এই অতি দরকারী সত্যটাও ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে।

১০৯ **নিদর্শন** ঃ—

হজরত রছুলে করিমের সমসাময়িক পৌত্তলিক ও এহুদীরা তাঁহাকে নিজের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য, কতকগুলি আজগৈবী নিদর্শন বা মো'যেজা উপস্থিত করিতে

বলিয়াছিল, ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। 'এই আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ঐ প্রকার আজগৈবী মো'যেজার দাবী করা মানুষের অজ্ঞতারই ফল। সন্দেহ ও অবিশ্বাস রোগে যাহাদিগের জ্ঞান ও বিবেক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্ব যুগেও সেইরূপ হঠকারী লোক বিদ্যমান ছিল এবং তাহারাও ঐ প্রকার অন্যায় দাবী নিজ নিজ রছুলগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল। নিজেদের মনের রোগকে ঢাকা দিবার জন্য এই হঠোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদিগের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু জ্ঞানী ও সত্যানুসন্ধিৎসু যাহারা, একিন বা বাস্তব প্রত্যয়ে উপনীত হওয়াই যাহাদের ধর্ম্মালোচনার প্রকৃত লক্ষ্য, তাহাদের জন্য আল্লার এই অনন্ত কোটি সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁহার কুদরত ও অপার মহিমার অনন্ত নিদর্শন বিদ্যমান আছে। যাহারা বলিতেছে—"আমাদের মাথার উপর আছমান ভাঙ্গিয়া পড়ুক"—তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করিব, পদ তলের একটী সবুজ তৃণকে যথাবথ ভাবে দর্শন করিলেই তাহারা আল্লার অনন্ত মহিমার নিদর্শন দেখিতে পারে।

হজরতের নবুঅতকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে তাঁহার সমসাময়িক একদল লোক ঐ প্রকার আজগৈবী নিদর্শন উপস্থিত করার দাবী করিয়াছিল। এই ও ইহার পরবর্ত্তী আয়তে তাহারও প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, মোহাম্মদ যে প্রকৃত পক্ষে আল্লার কালামের বাহক, ঐ কালামের শিক্ষা ও তাহার মধ্যকার সত্যই তাহার প্রমাণ। কোর্‌আনের আয়তগুলির অনুশীলন করিলে এবং তাহার বর্ণিত সত্যকে লাভ করার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ঐ সকল স্পষ্ট প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ১০৯ আয়তে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১১০ এহুদী ও খৃষ্টানদিগের মনোভাব :—

যুক্তি প্রমাণের বা শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা এহুদী ও খৃষ্টাণদিগকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। কারণ তাহারা নিজেদের অন্ধবিশ্বাসগুলিকেই ধর্ম্মের প্রধান উপকরণ ও অবলম্বন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং মুছলমানেরা যাবৎ তাহাদের অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইবে, এহুদী বা খৃষ্টান সম্প্রদায় তাবৎ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইবে না। ফলতঃ যে কাজে ও যে অবস্থায় যখনই দেখা যাইবে, এহুদী বা খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের লোকেরা মুছলমানদিগের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে—তখনই নিশ্চিত ভাবে মনে করিতে হইবে যে, সেখানে মুছলমানেরা এছলামের শিক্ষা ও হেদায়তকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এছলামের এই জ্ঞান, শিক্ষা ও হেদায়তকে ত্যাগ করিয়া এহুদ ও নাছারার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে মুছলমানদিগের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে এবং সে সর্ব্বনাশের হাত হইতে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

আয়তে প্রত্যক্ষতঃ হজরতকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ মুছলমানগণই উহার লক্ষ্যস্থল। বর্ণনার এই ধারা কোর্‌আনে বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। "পিতা মাতার সম্মুখে বিনয় সহকারে তুমি নিজকে অবনত করিয়া দিবে"—এই আয়ত প্রকাশ হওয়ার বহুদিন পূর্ব্বে হজরতের পিতামাতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আয়তে "তুমি" বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ হজরতকে সম্বোধন করা হইলেও, বস্তুতঃ তিনি তাহার লক্ষীভূত হইতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে ইহাদ্বারা হজরতের মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহার উম্মতকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়তেও এই ধারার অনুসরণ করিয়া মুছলমান সমাজ-কেই সম্বোধন করা হইতেছে।

১১১ যাহাদিগকে কেতাব দিয়াছি :—

১০৯ টীকায় এই আয়তের তাৎপর্য্যই বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সকল মুছলমান আল্লার কেতাব (কোর্‌আন মজিদ) প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা যথাযথ মনোনিবেশ সহকারে তাহার তেলাঅৎ করে—যথোচিত ভাবে তাহার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া থাকে, কোর্‌আনের সত্যতায় বিশ্বাস করার জন্য কোন অভিনব আজগৈবী নিদর্শনের আবশ্যক তাহাদের হয় না, এই কথাই এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। يتلونه حق تلاوته পদের অর্থ— (১) যাহারা যথাযথ ভাবে তাহার তেলাঅৎ (পাঠ) করিয়া থাকে, এবং (২) যাহারা যথাযথভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে—উভয়ই হইতে পারে। কার্য্যতঃ উভয় অর্থের ভাব ও লক্ষ্য এক।

"আমরা কোর্‌আনের বাহক"—এই বলিয়া দম্ভ করার কোনই সার্থকতা নাই। কোর্‌-আন হইতে উপকার লাভ করার জন্য প্রথম দরকার—গভীর অনুরাগ ও মুক্ত সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া ধীরভাবে শব্দের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাওয়ার। মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল শব্দগুলির আবৃত্তি করাতে—ছওয়াব যতই হউক না কেন—কোআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করার কোনই সুযোগ ঘটে না। মুছলমান সমাজের মধ্যে আবৃত্তির দ্বারা ছওয়াব অর্জ্জন করার আকাঙ্খা যতটা বিদ্যমান, অর্থ বুঝিয়া কোর্‌আনের ভাবে অভিভূত হওয়ার আগ্রহ তাহার শতাংশের এক অংশও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আয়তে يتلونه -এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার দ্বারা ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বে-আমল আলেমগণও, অর্থজ্ঞান থাকা সত্বেও, কোর্‌আনের দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারে না। কোর্‌আনের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওয়ার সার্থকতাই হইতেছে তাহার শিক্ষার অনুসরণ করাতে। পাঠক দেখিতেছেন—এখানে একই ব্যাপক শব্দের ব্যবহারে, উভয় জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের কথা এক সঙ্গে কেমন সুন্দরভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। অর্থবোধ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব, জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম অসম্পূর্ণ এবং কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান ব্যর্থ—বরং কর্ম্মই হইতেছে মানুষের জ্ঞানের সত্যকার পরিচায়ক। অর্থবোধের দ্বারা এই যে জ্ঞানের অভ্যুদয়

কর্ম্ম ব্যতীত কখনই তাহার পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। একটী ছাত্রকে সাহিত্যের হিসাবে একখানা পাটীগণিত পড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহার কোন শব্দের অর্থ বুঝিতে তাহার আর বাকি রহিল না। অথচ অঙ্ক কসার যে কর্ম্ম, তাহার সংশ্রবে তাহাকে যাইতে দেওয়া হইল না। এ অবস্থায় পাটীগণিতের শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে পারে—এই কারণে, কেহ কি তাহাকে অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞানী বলিতে পারিবেন?—অথবা দরকার হইলে ছাত্রটী খড়ি ধরিয়া অঙ্ক কসিয়া তাহার ফল আবিষ্কার করিতে কখনও কি সমর্থ হইবে? এই ছাত্রটীকে আবার যদি কোন বিদ্যালয়ের গণিত-শিক্ষকরূপে নিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যালয়ের হতভাগ্য ছাত্রদিগের যে দুর্দ্দশা হওয়ার কথা, বর্ত্তমানে বাংলার মুছলমানদিগের অবস্থা আজ সাধারণতঃ সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে আমাদের জন্য এলেম অপেক্ষা আমলের দরকার অধিক। এই আমলই জ্ঞানকে সকল প্রকার বিকার বিভ্রমের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে। আমরা যাহা পড়ি—তাহা শিখিতে পারি, এবং যাহা শিখি তাহা ভুলিয়া যাই না, এই আমল বা কর্ম্মসাধনারই বরকতে। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা কোর্‌আনের ফজিলত সম্বন্ধে যতই ওয়াজ করি না কেন, আর পক্ষান্তরে তাহার "দার্শনিক বৈজ্ঞানিক" ব্যাখ্যা করার জন্য যতই দাম্ভিকতা প্রকাশ করা হউক না কেন —আমল আমাদিগের মধ্য হইতে এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

কোর্‌আনকে এই প্রকারে অমান্য যাহারা করিবে, আল্লার দণ্ড হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমাদের এই কোর্‌আন-অমান্যরূপ কর্ম্মের ফল আল্লার দণ্ডরূপে আজ আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে! অনুতপ্ত হৃদয়ে কোর্‌আনের শিক্ষার নিকট আবার পূর্ব্বের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া দেওয়াই উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ইহা ব্যতীত মুছলমানের মুক্তি ও মঙ্গলের উপায়ন্তর নাই—এই কথাগুলি আলোচ্য আয়তে মুছলমান জাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পঞ্চদশ রুকু'

১২২ হে এহুদী জাতি ! যে ন্যা'মত (দ্বারা) আমি তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছিলাম এবং যেরূপে (সমসাময়িক-) বিশ্বের উপর তোমাদিগকে মহিমান্বিত করিয়াছিলাম-তাহা স্মরণ করিয়া দেখ !

١٢٢ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

১২৩ এবং সেই (ভয়ঙ্কর) সময় সম্বন্ধে সাবধান হও (যখন) কেহ কাহার কোনও উপকারে আসিবে না, এবং কাহারও পক্ষ হইতে কোন সুপারিসই মনজুর করা হইবে না, আর কাহারও নিকট হইতে কোন মুক্তিপণও গৃহীত হইবে না, এবং (অন্য·) কোন প্রকারেও তাহারা সাহায্য·প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।·

١٢٣ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

১২৪ আরও (স্মরণ করিয়া দেখ !) এবরাহিমকে যখন তাহার প্রভু কতিপয় বাণী·দ্বারা 'পরীক্ষা' করিলেন[১২২] এবং সে তাহা পূর্ণ-রূপে সমাধা করিল ; তিনি (তখন) বলিলেন — (হে এবরাহিম !) তোমাকে আমি লোক সমাজের আদর্শ (এমাম)

١٢٤ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِي ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ

করিয়া দিব। সে বলিল — আর আমার বংশধরগণের মধ্য হইতে! তিনি বলিলেন — অত্যাচারী জনগণকে আমার প্রতিশ্রুতি বর্ত্তাইতে পারে না।

١٢٥ وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ؕ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَا اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

১২৫ আর যখন আমরা এই গৃহকে লোক সমাজের জন্য সম্মিলন-স্থল ও শান্তিধাম (-রূপে প্রতিষ্ঠিত) করিলাম (তাহা স্মরণ কর) এবং 'মকামে এবরাহিম'কে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর, আরও (স্মরণ কর) আমরা এবরাহিম ও এছমাইলের প্রতি বিধান করিলাম যে — 'তওয়াফ'কারীদিগের ও 'এ'তেকাফ'কারীগণের এবং রুকূ'-ছেজদাকারীগণের নিমিত্ত আমার গৃহকে তোমরা পাক ছাফ করিয়া রাখিবা!

١٢٦ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

১২৬ আরও (স্মরণ কর) এবরাহিম যখন বলিয়াছিল — প্রভু হে! ইহাকে শান্তিময় নগরে পরিণত কর এবং ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে-তাহাদিগকে, মেওয়াজাত হইতে

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : قَالَ وَ
مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ
اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ : وَ
بِئْسَ الْمَصِيْرُ

উপজীবিকা দান কর ! আল্লাহ্ বলিলেন—আর অবিশ্বাসী যে (তাহাকে ইহকালে) কিছু দিন উপভোগ করিতে দিব—তাহার পর (পরকালে) তাহাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগে বাধ্য করিব, এবং (ইহা হইতেছে) অতি শোচনীয় পরিণতি ।

١٢٧ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا : اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ

১২৭ এবং এবরাহিম যখন এছমাইল-কে সঙ্গে লইয়া (কা'বা-) গৃহের ভিতগুলি (নির্ম্মাণ করিয়া) তুলিতেছিল, (তখন তাহারা প্রার্থনা করিতেছিল) প্রভু হে! (এই খেদ্‌মতকে) আমাদিগের পক্ষ হইতে কবুল কর![১২০] নিশ্চয় তুমিইত একমাত্র শ্রোতা, একমাত্র জ্ঞাতা ।

١٢٨ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ : وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا : اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ

১২৮ প্রভু হে ! আরও (প্রার্থনা), আমাদিগের উভয়কে তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী (মোছ্‌লেম) করিয়া দাও এবং আমাদিগের বংশধরগণের মধ্য হইতে তোমার প্রতি আত্ম-সমর্পণকারী একটী (মোছলেম) মণ্ডলী (পয়দা) করিও ! এবং আমাদের এবাদতের পদ্ধতিগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দাও ! এবং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ! নিশ্চয় তুমিইত পরম ক্ষমাশীল কৃপানিধান !

১২৯ প্রভু হে! আরও (প্রার্থনা), তাহাদের মধ্যে তাহাদিগের মধ্য হইতে (সেই) রছুলকে উত্থিত করিও, যিনি তোমার আয়তগুলি তাহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবেন আর তাহাদিগকে কেতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন, নিশ্চয় তুমিই ত পরম পরাক্রান্ত পরম প্রাজ্ঞ।

١٢٩ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

টীকা ঃ—

১১২ **এবরাহিমের "পরীক্ষা"** ঃ—

হজরত এবরাহিমকে আল্লাহ কি বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কি প্রকার জ্ঞান ও উপদেশ নিহিত ছিল এবং সেই জ্ঞান সাধনায় হজরত এবরাহিম কোন কোন মহিমার পরিচয় দিয়া মানব সমাজের আদর্শ বা এমামের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—কোর্‌আনের বিভিন্ন ছুরায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে অতি সংক্ষেপে তাহার একটু আভাষ দিয়া রাখিতেছি ঃ—

(১) হজরত এবরাহিমের প্রথম যৌবনের প্রধান সাধনা হইতেছে—তাঁহার মুক্ত জ্ঞান চর্চ্চা ও আকুল সত্যানুসন্ধিৎসা। এবরাহিম জন্মিয়াছিলেন একটী ঘোর পৌত্তলিক সমাজের পুরোহিত পরিবারে। চন্দ্র সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের এবং প্রস্তর নির্ম্মিত পুতুল বা ঠাকুর দেবতার পূজা করাকেই তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠতম পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। এই বংশপরম্পরাগত সংস্কার ও সর্ব্বব্যাপী পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও এবরাহিম তকলিদ বা অন্ধ অনুকরণের মোহে আবিষ্ট হন নাই। তিনি নিজের মুক্ত জ্ঞানবিবেক লইয়া ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নিভৃত নিশীথে পর্ব্বত প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া, কত বিনিদ্র রজনী তিনি অতিবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর এক শুভ প্রভাতে এবরাহিম ঘোষণা করিলেন—ক্ষণস্থায়ী এগুলি, উদয় অস্তের অধীন এগুলি, আমার ঈশ্বর কখনই নহে। এ সমস্তের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া—

আমি একাগ্রভাবে তাঁহার পানে প্রত্যাগত হইলাম, আছমান জমিনের আদি সৃষ্টিকারী যিনি, মোশ্‌রেক দলের অন্তর্ভুক্ত আমি নহি। আমার সমস্ত উপাসনা ও সমস্ত কোর্‌বান, আমার সমস্ত জীবন ও সমস্ত মরণ, সকল জগৎস্বামী আল্লার জন্য, তাঁহার শরিক কেহই নাই, ইহারই আদেশ আমাকে দেওয়া হইয়াছে, আর আমি হইতেছি প্রথম আত্মসমর্পণকারী-মোছলেম।

তিনি দেখেন—তাঁহার স্বজনেরা নিত্যই ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে, নির্ব্বাক নিস্পন্দ পুতুল ও প্রস্তর মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া তাহাদের স্তবস্তুতি করিতে থাকে, কত বিনয় সহকারে তাহাদিগের নিকট ইষ্ট প্রার্থনা করে, থালা ভরিয়া নানা উপাদেয় খাদ্য তাহাদিগকে ভোগ দেয়। বালক-এবরাহিম অন্য সকলের অনুপস্থিতিকালে একদিন ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—ভোগের থালা যেমনকার তেমনভাবে পড়িয়া আছে। তিনি ঠাকুরগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমরা এ সব খাইতেছ না কেন? সাড়া না পাইয়া তিনি আরও উচ্চস্বরে তাহাদিগকে উত্তর দিতে বলিলেন। কিন্তু তবুও ঠাকুরদের মুখে কোন সাড়া শব্দ নাই। তখন তিনি একখানা কুঠার লইয়া যথাসাধ্য কএকটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন আর কুঠারখানা বড় ঠাকুরের কাঁধে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বজনেরা ফিরিয়া আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—"আমাদের ঠাকুর দেবতাদের এমন সর্ব্বনাশ কে করিল?" বালক এবরাহিম বিদ্রূপস্বরে উত্তর করিলেন—সেজন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার কি? বড় ঠাকুর ত এখনও ছালামত আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না কেন? সহস্র কণ্ঠে বজ্রনিনাদে উত্তর হইল—"উহারা কি কথা বলিতে পারে?" হজরত এবরাহিম তখন গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—যাহারা কথা বলিতে পারে না, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজদিগকে রক্ষা করার শক্তিও যাহাদিগের নাই, এমন অপদার্থ জড়পিণ্ডগুলিকে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার আসনে বসাইয়া পূজা করা কি মানুষের পক্ষে উচিত! আজ আমি তোমাদিগের সকলকে জানাইয়া ঘোষণা করিতেছি—

"انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله -"

—"তোমাদিগের সহিত, এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যাহাদের পূজা তোমরা করিতেছ-তাহাদিগের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না" (৪—৬)।

সত্যকে পাওয়ার জন্য অন্তরের অন্তস্তলে নিহিত এই যে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসা, সেই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য আত্মবলিদানের এই যে কঠোরতর সাধনা, সত্যকে প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহাকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করার এই যে জীবন মরণ পণ, ইহাই হইতেছে হজরত এবরাহিমের প্রথম সাধনা ও প্রথম সিদ্ধি এবং ইহাই হইতেছে মুক্তিকামী মানবের প্রথম অনুকরণীয় স্বর্গীয় আদর্শ।

(২) হজরত এবরাহিমের দ্বিতীয় মহত্ব হইতেছে, সত্যের জন্য অকুতোভয়ে কঠোরতর রাজদণ্ডকে বরণ করিয়া লওয়ায়। তাঁহার কথা লইয়া দেশময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল, রাজা

হুকুম দিলেন—তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া সকল লোকের সম্মুখে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিতে। সেখানে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের ও সহস্র সহস্র দেশবাসীর সম্মুখে, যুবক এবরাহিম বজ্রকঠোর-স্বরে উত্তর করিলেন—"আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কি এমন সব (অপদার্থ ঠাকুর দেবতার) পূজা করিতে চাও, যাহারা তোমাদিগের একটুও উপকার বা ক্ষতি সাধন করিতে পারে না ? ধিক তোমাদিগকে, আর আল্লার স্থলে যাহাদের পূজা করিতেছ-তাহাদিগকে, তোমরা কি একেবারে অজ্ঞান !" (ছুরা আম্বিয়া ৫ রুকু)। তখন রাজার আদেশে এক ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত হইল এবং তাহার দাউ দাউ শিখা যখন প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছিল, তখন এবরাহিমকে বলা হইল—হয় নিজের মত ত্যাগ করিয়া তওবা কর, না হয় সম্মুখের ঐ অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও ! সত্যের সেবক এবরাহিম ইহাতে একটুও বিচলিত না হইয়া, সেই অনলকুণ্ডের ধারে দাঁড়াইয়া, শতগুণ অধিক উৎসাহের সহিত সত্যের ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সত্য সত্যই তাঁহাকে সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু তবুও তাঁহার ঈমান ও সত্যানুরাগ একবিন্দুও দুর্ব্বল হইতে পারে নাই।

ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে এমন অবিচলিত চিত্তে অত্যাচারী রাজার দণ্ডকে সানন্দে বরণ করিয়া লওয়া, বস্তুতঃই অতি কঠোর পরীক্ষা। হজরত এবরাহিম এই পরীক্ষায় চরম গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্য আল্লাহ তাঁহাকে সমস্ত মানব সমাজের জন্য সাধারণভাবে, এবং মোছলেম জাতির জন্য বিশেষরূপে, মহিমময় আদর্শ ও এমামরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন।

(৩) হজরত এবরাহিমের সাধকজীবনের এক আদর্শ হইতেছে—সত্যের জন্য তাঁহার দেশত্যাগ। সত্যকে গ্রহণ ও প্রকাশ করার একমাত্র অপরাধে তিনি নিজের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইলেন। নিঃস্ব নিসম্বল যুবকের পক্ষে এ অবস্থায় দিশাহারা হইয়া পড়ারই কথা। কিন্তু সত্যের যথার্থ সেবক হজরত এবরাহিম ইহাতেও বিচলিত হন নাই। কারণ তাঁহার জীবনযাত্রার লক্ষ্য ও মনজেলে মকছুদ পূর্ব্ব হইতেই অনাবিলভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি এই নূতন পরীক্ষার সময় স্বজনগণকে সম্বোধন করিয়া ভক্তিগদগদ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—اني ذاهب الى ربي سيهدين

—"আমি আমার প্রভুর পানে যাত্রা করিলাম—তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন" (৩৭—৯৭)। এই শব্দগুলির অন্তরালে যে গভীর বিশ্বাস, আত্মসত্যে যে দৃঢ় প্রত্যয়, এবং আল্লার প্রতি যে নির্ভর ও আত্মসমর্পণের ভাব লুকাইয়া আছে, তাহাই হইতেছে সাধকজীবনের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ।

(৪) হজরত এবরাহিমের শেষ বয়সের চরম পরীক্ষা ও পরম সার্থকতা হইতেছে—তাঁহার পুত্রবলিদানে। ভক্ত এবরাহিম আল্লাহকে বলিয়াছিলেন—আমি বিশ্বসংসারের সমস্ত

মায়ামোহের জাল ছিন্ন করিয়া একমাত্র তোমারই অনুগত হইয়াছি, আমার জীবন মরণের যথাসর্ব্বস্ব তোমার নামে উৎসর্গীত হউক ! তখন আল্লাহ বলিলেন—সব মায়া কাটাইয়াছ, আমাকে সব চাইতে অধিক ভালবাসিয়াছ, আচ্ছা বেশ ! তোমার মায়ামোহের প্রধান বাঁধন, তোমার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র অবলম্বন—তোমার এই যুবক পুত্র এছমাইলকে তবে আমার নামে কোর্‌বানী করিয়া ফেল ! ভক্ত-কুল-তিলক এবরাহিম তাহাই করিলেন—পুত্রের সম্মতি লইয়া অকম্পিত হস্তে তাহার গলায় ছুরি চালাইয়া দিলেন। আল্লার আর্‌শ-কুর্সি তখন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, আল্লার ফেরেশ্‌তাগণ তখন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—প্রভুহে ! বস্তুতঃই এবরাহিম তোমার সত্যকার প্রেমিক। এবং সে সময় স্বয়ং আল্লাহ এবরাহিমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"এবরাহিম ! সত্যই তুমি নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছ, এইরূপ সাধনার মধ্য দিয়াই সৎকর্ম্মশীল বান্দাদিগকে আমরা পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

কোর্‌আনে হজরত এবরাহিমকে ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে, মুছলমানের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মুছলমান আমরা, সেই আদর্শের কতটুকু অনুসরণ করিয়া থাকি, কোরআনের সত্যনিষ্ঠ পাঠকবর্গকে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের আরও অনুরোধ, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আয়তের শেষ অংশটা আর একবার পড়িয়া দেখুন :—"আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারী জনগণের প্রতি-বর্ত্তাইতে পারে না।"

নিরুপায় হইয়া আমরা ابتلا শব্দের অনুবাদ করিয়াছি—'পরীক্ষা'। আল্লাহ এবরাহিম-কে পরীক্ষা করিলেন-বাঙ্গলা ভাষার হিসাবে এই পদের এরূপ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এবরাহিম আদর্শ ও এমামরূপে মনোনীত হইবার যোগ্য কি না, তাহা আল্লার জানা ছিল না। তাই তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখার দরকার হইয়াছিল ! কিন্তু আরবী অভিধানের সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে—যেখানে ابتلى ক্রিয়ার কর্ত্তা আল্লাহ, সেখানে উহার অর্থ হইবে—আল্লাহ সেই ব্যক্তির মধ্যকার সৎ বা অসৎ গুণকে পূর্ণতা প্রাপ্ত বা প্রকাশমান করিয়া দিলেন, (Lane—রাগেব)। ফলতঃ এবরাহিমকে আল্লাহ 'এবতেলা' করিলেন—ইহার অর্থ এই যে, নানাবিধ বিপদ আপদের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া এবরাহিমের অন্তরের শক্তি ও ঈমানের বলকে তিনি পূর্ণ ও প্রকট করিয়া দিলেন। বাংলায় 'পরীক্ষা' বলিতে যে ভাবটী মনে আসে, কোর্‌আনের 'এবতেলা' শব্দে এখানে তাহার সহিত কোনই সংশ্রব নাই।

১১৩ কাবা গৃহ—মকামে এবরাহিম :—

আয়তে কা'বার যে দুইটী বিশেষণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। আল্লাহ বলিতেছেন—আমি কা'বাকে তোমাদিগের জন্য "মাছাবাহ্" করিয়া

দিয়াছি। অভিধানে বর্ণিত হইয়াছে :—

المثاب مجتمع الناس بعد تفريقهم - موارد - مصباح -

—"বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ার পর মানুষ যে স্থানে পুনরায় সম্মিলিত হইতে পারে, তাহাকে 'মাছাব' বলা হয়" (মাওয়ারেদ, মেছবাহ)। ছওয়াব বা পুরস্কার প্রাপ্তির স্থানকেও 'মাছাবাঃ' বলা যাইতে পারে। মুছলমান জাতি নানা সমাজে নানা সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন ও দুন্‌য়ার দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ার পর, আবার তাহারা এই গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া সম্মিলিত হইবে—বংশের ও বর্ণের, ভাষার ও ভূগোলের সব ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া, দলাদলির সব কোন্দল কোলাহলকে পরাজিত করিয়া, আল্লার বান্দাগণ এই গৃহের ছায়ায় দাঁড়াইয়া, আবার নিজের ভাইকে সত্যকার মুছলমানরূপে আলিঙ্গন দিতে পারিবে। মোছলেম জগতের কেন্দ্রগুলির অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, গর্ব্বের-গৌরবের, আশার-আনন্দের সমস্ত উপকরণকেই আজ তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে—মরণের নিরাশাকে স্বীকার করিয়া লইয়া শেষ ধ্বংসের অপেক্ষায় যেন সকলে কর্ম্মবিমুখ হইয়া বসিয়া আছে! কিন্তু কোর্‌আন আল্লার নিকট হইতে আশার বাণী বহন করিয়া আজও মুছলমানকে শুনাইতে চাহিতেছে—আমি তোদের শক্তিকেন্দ্র আর কা'বা তোদের সম্মিলনকেন্দ্র। আবার ইহাকে আঁকড়াইয়া ধর, পূর্ব্বের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে।

কা'বাকে আল্লাহ শান্তিধামও করিয়াছেন। হিংসার ভাব, অশান্তির ভাব কা'বার ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারে না। বাহিরের শান্তির সঙ্গে সঙ্গে এখানে সন্ধান পাওয়া যাইবে আত্মার সত্যকার শান্তির। আমরা পূর্ব্বে মনে করিতাম—হজ্জের মধ্যে বিশ্ব-মোছলেম জাতীয়তার শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা। কিন্তু নিজে সেখানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভের পর আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে—এই আত্মার শান্তি সাধনাই হজরতের এবং কা'বা শরীফের সব চাইতে বড় কথা।

কা'বা প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে 'মকামে এবরাহিম' বা এবরাহিমের দাঁড়াইবার স্থান বলিয়া একটী জায়গা আছে, তওয়াফ করার পর এখানে আসিয়া দুই রকআৎ নফল নামাজ পড়িতে হয়। হজরত রছুলে করিমের সময় সকলেই এই স্থানটীকে 'মকামে এবরাহিম' বলিয়া জানিতেন, চিনিতেন। ইহাই যে কোর্‌আনের বর্ণিত 'মকামে এবরাহিম', স্বয়ং হজরতের কথা ও কাজের দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে—বোখারী মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে (কছির)। বড়ই দুঃখের বিষয়, তফ্ছিরের রাবীগণ তত্রাচ তাহার বিপরীত নানা অসংলগ্ন মন্তব্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। সে যাহা হউক, এই 'মকামে এবরাহিম'কে মোছাল্লা বা নামাজের স্থান করিবার জন্য কোর্‌আনে মুছলমানদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, নির্দ্ধারিত এই 'মোছাল্লা'কে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য চারিটী স্থানে চারিটী স্বতন্ত্র

করা হ... তোমরাও ... সেই এক

'মোছাল্লা' তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। চারি মজহাবের চারিজন এমাম এই চার মোছাল্লা হইতে যথাক্রমে পর পর নামাজ পড়াইয়া যাইতেন। ফলে বিশ্ব-মোছলেমের সম্মিলনস্থল হওয়ার পরিবর্ত্তে, কা'বাই মুছলমানদিগের আত্মবিচ্ছেদের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া যায়। কএক বৎসর হইতে রাজা এবনে-ছউদের চেষ্টায় ঐ মোছাল্লাগুলি উঠাইয়া দিয়া সকলে এখন মকামে এবরাহিমের মোছাল্লায় সমবেত হইতেছেন; এখন সকল মতের ও মজহাবের লোক একই এমামের সঙ্গে একই জমাআতে নামাজ পড়িয়া থাকেন।

১১৪ তওয়াফ, এ'তেকাফ প্রভৃতি :—

'তওয়াফ' অর্থে প্রদক্ষিণ। হজ উপলক্ষে বা অন্য সময় কা'বার 'তওয়াফ' করার ব্যবস্থা আছে। 'হ'জরে-আছঅদ' হইতে আরম্ভ করিয়া সাতবার কা'বা গৃহের প্রদক্ষিণ করিতে হয়, ইহাই 'তওয়াফ'। নরনারী নির্ব্বিশেষে মুছলমানেরা এই তওয়াফে যোগ দিয়া থাকেন, বার মাস ও ২৪ ঘণ্টাই তওয়াফ চলিতে থাকে, কোন সময় কোন অবস্থায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বিরাম হয় না। হাজার হাজার কণ্ঠের কলনিনাদে আল্লার নামের অনন্ত অফুরন্ত জয়জয়কারে কা'বার প্রাচীর প্রাঙ্গণ সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া আছে। আল্লার গুণগান ও নিজের পাপ স্বীকার এবং তজ্জন্য তাঁহার হুজুরে ব্যাকুল প্রাণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই তওয়াফের প্রধান অঙ্গ।

বাহিরের সমস্ত কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া, সংসারের সকল বৈষয়িক ব্যাপারকে বর্জ্জন করিয়া, নীরবে নিভৃতে আল্লার ধ্যান ধারণায় তন্ময় হইয়া যাওয়াকে, এছলামের পরিভাষায় এ'তেকাফ বলা হয়। রোজার সময় যে এ'তেকাফের ব্যবস্থা আছে, অনেকেই বোধ হয় তাহা অবগত আছেন। কা'বায়ও এই প্রকার এ'তেকাফের ব্যবস্থা আছে। হজরত এবরাহিম ও হজরত এছমাইলকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তওয়াফ এ'তেকাফ ও নামাজ নিরত সাধকদিগের জন্য আমার গৃহকে তোমরা বাহিরের ও ভিতরের সকল প্রকার কলুষ হইতে পাক ও ছাফ করিয়া রাখিবা। বাহিরের কলুষ হইতেছে ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতি, আর ভিতরের কলুষ হইতেছে শেরেক বা গয়রুল্লার পূজা।

বাইতুল্লাহ বা আল্লার ঘর অর্থে আল্লার এবাদৎ করার ঘর, আরবী সাহিত্য, অভিধান, অলঙ্কার ও শাস্ত্র বিধানের ইহাই সমবেত মীমাংসা। আল্লাহ মছজিদের চতুঃসীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, ঐ পদের এ অর্থ গ্রহণ করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না—অতি নিরেট মুছলমানও এ ধারণা পোষণ করিতে লজ্জিত হয়। শৃঙ্খলার সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এবং রৌদ্র বৃষ্টি হইতে নিরাপদ হইবার জন্যই মুছলমানের মছজিদ প্রতিষ্ঠা। আল্লার জমিনের সর্ব্বত্রই মুছলমানের মছজিদ, হজরত রছুলে করিম স্বয়ং এ কথা বিধান দিয়াছেন।

করিয়া

১১৫ **এবরাহিমের প্রার্থনা :—**

এই আয়তে হজরত এবরাহিমের একটী প্রার্থনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তরে হজরত এছমাইলকে অধিষ্ঠিত করার পর তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—হে আল্লাহ! এই অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তরকে নগরে—ও শান্তিময় নগরে—পরিণত করিও এবং ঐ নগরের মো'মেন অধিবাসীবর্গকে মেওয়াজাত হইতে উপজীবিকা প্রদান করিও! আল্লাহ হজরত এবরাহিমের প্রথম দোওয়া সম্পূর্ণভাবে কবুল করিয়াছেন—মক্কা বস্তুতঃই নগরে পরিণত হইয়াছে, পাপতাপদগ্ধ মানবের জন্য তাহা শান্তিধাম হইয়া আছে। কিন্তু হজরত এবরাহিমের দ্বিতীয় দোওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়া দেন যে, অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীরাও আমারই বান্দা। তাহাদিগকে রুজী না দিলে আমার রাজ্জাক নামের মহিমা খর্ব্ব হয়। সুতরাং দুনয়াতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে আমি সকলকেই রুজী দান করিব। তবে কর্ম্মফল ভোগের স্থান যে পরকাল, সেখানে অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

১১৬ **পিতা পুত্রের প্রার্থনা :—**

১২৭ হইতে ১২৯ আয়ত পর্য্যন্ত হজরত এবরাহিম ও হজরত এছমাইলের যে সকল প্রার্থনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত। জগতের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করার সময়, এই মহিমান্বিত পিতা-পুত্রের মনোপ্রাণ যে ভাবে অভিভূত হইয়াছিল এবং এই প্রার্থনার অক্ষরে অক্ষরে যে ভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে—এছলামের পরিভাষায় তাহারই নাম হইতেছে— للہیت লিল্লাহিয়ৎ। সমস্ত খেদমত, সমস্ত এবাদৎ একমাত্র 'খোদার ওয়াস্তে' করা হইবে। তিনি কবুল করিলেই তাহা সার্থক, অন্যথায় তাহা ব্যর্থ পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই পিতা পুত্রে গৃহনির্ম্মাণের সময় গৃহস্বামীকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেনে—প্রভু হে! কা'বা নির্ম্মাণের খেদমতকে তুমি কবুল কর!

১১৭ **ঐ দ্বিতীয় প্রার্থনা :—**

এখানে চারিটী বিষয় তাঁহারা আল্লার হুজুরে খাচ্ছা করিতেছেন :—(১) আমরা উভয় পিতা পুত্রে যেন তোমাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করিতে পারি—তুমি আমাদিগকে সে শক্তি প্রদান কর। মূলে 'মোছলেম' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ঐরূপে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করে যে-সেই মোছলেম। বর্ণিত এছলাম বা আত্মসমর্পণ খুবই কঠিন কাজ, তাই এই আত্মসমর্পণের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্বশক্তিমানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করা হইতেছে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কোর্‌আন আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে—তোমরাও ঐরূপে এছলামের বা আত্মসমর্পণের সাধনায় লিপ্ত হও, আর সিদ্ধির জন্য সেই একমাত্র শক্তিকেন্দ্র হইতে তওফিক-ভিক্ষা করিতে থাক। (২) তাঁহারা আরও,

বলিতেছেন—আমাদের বংশধরদিগের মধ্যে একটী মোছলেম-মণ্ডলী তুমি পয়দা করিও! হজরত এবরাহিম ও হজরত এছমাইলের বংশধরগদিগের মধ্যে, আজ হইতে সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে সেই নামেই ঐ মণ্ডলীর উত্থান হইয়াছিল। আজও আমরা সেই নামকে গৌরবের সহিত বহন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বস্তুতঃ আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন স্তরে, সেই আত্মসমর্পণের কোন একটু প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি ? (৩) পথের চেষ্টায় বাহির হইয়া পথের সাথীকে ডাক দিতে হয়। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে সেই সাথী 'নুর'রূপে প্রকট হইয়া পথ দেখাইয়া দেন। ছুরা ফাতেহার তফছিরে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানেও পিতা পুত্রে সমকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছেন—তুমিই আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দাও! পথ যাহারা দেখিতে চায়, এই প্রার্থনাই তাহাদের প্রধান সম্বল হওয়া উচিত। (৪) পথ খুঁজিতে, পথ দেখিতে ও পথ চলিতে নানা বিভ্রমের ফলে সর্ব্বদা ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে বিনয়-অবনত-মস্তকে সেই পরম ক্ষমাশীল করুণানিধানের সন্নিধানে সর্ব্বদাই নিজকে অপরাধী বলিয়া মনে করা, সে জন্য তাঁহার হুজুরে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তাউওয়াব (পরম ক্ষমাশীল) ও রহিম (করুণানিধান) নামের মহিমা-স্মরণে আশান্বিত হইয়া থাকা—মোছলেম-জীবনের একটী প্রধানতম কর্ত্তব্য।

১১৮ চরম প্রার্থনা :—

মহিমান্বিত পিতা-পুত্রের ইহাই হইতেছে, চরম প্রার্থনা। এখানে তাঁহারা নিজেদের বংশধরগণের মধ্যে তাহাদিগের মধ্যকার একজন নবী পয়দা করার জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই প্রার্থনার কাম্য "সেই মহানবী" হইতেছেন—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তরের সেই শান্তিময় নগরে এছমাইল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, যিনি মোছলেম উম্মতের নিকট আল্লার বাণীগুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই রছুলের চারিটী গুণের বিষয় হজরত এবরাহিমের মোনাজাতে বর্ণিত হইয়াছে—(১) সেই রছুল নিজে আল্লার আয়তগুলির আবৃত্তি করিবেন, কিন্তু আবৃত্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, (২) যে কেতাবে আয়তগুলি লিখিত আছে, সেই কেতাব অর্থাৎ কোরআনের মর্ম্ম ও অর্থও তিনি সকলকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। (৩) তাহার পর কোরআনের প্রত্যেক শিক্ষার স্তরে স্তরে যে সকল হেকমত বা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, সে সমস্তও তিনি শিক্ষা দিবেন—এবং (৪) এই সকল শিক্ষার দ্বারা নিজের উম্মৎকে তিনি দিন-দুনয়ার এবং ভিতর ও বাহিরের সকল প্রকার কলঙ্ক ও কলুষ হইতে, সকল প্রকার অশুচি ও মলিনতা হইতে পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। হজরত রছুলে করিমের ছহি হাদিছগুলিতে আমরা হেকমতের সন্ধান পাইতে পারিব।

ষোড়শ রুকু'

এছলাম বা আত্মসমর্পণ

১৩০ এবং নিজকে ধ্বংস করিয়াছে যে, এবরাহিমের (প্রবর্ত্তিত) ধর্ম্মপথ হইতে সে ব্যতীত আর কে বিমুখ হইতে পারে ? অথচ দুন্‌য়াতে তাহাকে আমরা পরিশুদ্ধ করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে সাধুসজ্জনগণের দলভুক্ত।

١٣٠. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ، وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

১৩১ তাহার প্রভু যখন তাহাকে বলিলেন—"আত্মসমর্পণ কর !" সে বলিল — "সর্ব্বজগৎস্বামীর প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম !"

١٣١ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ، قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১৩২ এবং নিজপুত্রগণকে এবরাহিম ও য়্যা'কুব ঐ কথারই অছিয়ৎ করিয়াছিল—"বৎসগণ ! তোমাদিগের কল্যাণের জন্য আল্লাহ ধর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, অতএব (সাবধান) মোছলেম ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।

١٣٢ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ، يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ۞

১৩৩ তোমরা কি উপস্থিত ছিলে-য়্যাকুবের মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়াছিল ? যখন সে নিজ-পুত্রগণকে বলিয়াছিল—'আমার পর তোমরা কিসের এবাদৎ করিবা ?' তাহারা (উত্তরে) বলিয়াছিল — আমরা তোমার ঈশ্বরের এবং তোমার পিতৃ-পুরুষগণের — এবরাহিমের, এছমাইলের ও এছহাকের— সেই 'এক ও অভিন্ন' ঈশ্বরের এবাদৎ করিব, আর তাঁহাতেই আমরা আত্মসমর্পিত।

١٣٣ أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابرهم و اسمعيل و اسحق الها واحدا ، ونحن له مسلمون

১৩৪ সে ছিল এক মণ্ডলী, অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে — তাহাদিগের কর্ম্ম তাহাদিগের জন্য আর তোমাদিগের কর্ম্ম তোমাদিগের জন্য, অধিকন্তু তাহাদিগের কৃতকর্ম্মের ('কোন কৈফিয়ৎ) তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

١٣٤ تلك امة قد خلت ، لها ما كسبت و لكم ما كسبتم ، و لا تسئلون عما كانوا يعملون

১৩৫ তাহাঁরা (মুছলমানদিগকে) বলে —'তোমরা এহুদী বা খৃষ্টান হইয়া যাও, (তাহা হইলে) সুপথ প্রাপ্ত হইতে পারিবা।' বলিয়া দাও — 'কখনই না',

١٣٥ و قالوا كونوا هودا او نصرى تهتدوا ، قل بل ملة ابرهم

حَنِيفًا : وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

একনিষ্ঠ এবরাহিমের ধর্ম্মপথ (আমরা অনুসরণ করি), আর তিনি মোশ্‌রেকদিগের দলভুক্ত ছিলেন না।

١٣٦ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ : لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ : وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

১৩৬ (হে মুছলমানগণ !) । বলিয়া দাও — আমরা আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আর আমাদিগের প্রতি যে বাণী সমাগত হইয়াছে - তাহাতে, এবং মূছা ও ঈছা যাহা প্রদত্ত হইয়াছিলেন - তাহাতে, এবং (ইহা ব্যতীত অন্য) সমস্ত নবী তাঁহাদিগের প্রভুর পক্ষ হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছেন-তাহাতে (বিশ্বাস করি) ; তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে কোন প্রভেদ আমরা করি না, এবং তাঁহাতেই আমরা আত্ম-সমর্পিত।

١٣٧ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

১৩৭ অতএব তোমরা যাহাতে বিশ্বাস করিয়াছ-তাহারাও যদি তদনুরূপ বিশ্বাস করে, তবে তাহারা পথ পাইয়া গেল, পক্ষান্তরে যদি পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে (প্রতিপন্ন হইবে যে,) নিশ্চয়

তাহারাই হইতেছে কলহ-পরায়ণ। এ অবস্থায় তাহাদের সম্বন্ধে তোমার পক্ষে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট হইবেন—এবং তিনিই ত সম্যক শ্রোতা সম্যক জ্ঞাতা।

هُمْ فِي شِقَاقٍ ؛ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১৩৮ (আমরা গ্রহণ করি) আল্লার "সংস্কার" !—আল্লাহ্‌ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর "সংস্কার" কাহার ? আর আমরা একমাত্র তাঁহারই উপাসক।

١٣٨ صِبْغَةَ اللّٰهِ ؛ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ، وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ

১৩৯ বল — তোমরা কি আল্লাহ্‌-সম্বন্ধে আমাদিগের সহিত কলহ করিতে চাও ! অথচ আমাদিগের ও তোমাদিগের (সকলের) একমাত্র প্রভু তিনি ! অধিকন্তু আমাদিগের কৃতকর্ম্ম আমাদিগের জন্য এবং তোমাদিগের কৃতকর্ম্ম তোমাদিগের জন্য,—আর তাঁহারই একনিষ্ঠ উপাসক আমরা।

١٣٩ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

১৪০ তোমরা কি বলিতে চাও যে—এব্‌রাহিম, এছমাইল, এছহাক, য়্যা'কুব ও গোত্র সমূহ এহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন ? বল—তোমরা সমধিক জ্ঞাত — না আল্লাহ ? আর সেই ব্যক্তি

١٤٠ أَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا اَوْ

نصرى ، قل ءانتم اعلم ام الله ، و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ، و ما الله بغافل عما تعملون

অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে (হইতে পারে) ?—যাহার কাছে আল্লার নিকট হইতে সমাগত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান- অথচ সে তাহা গোপন করে ! এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন ।

১৪০ تلك امة قد خلت ، لها ما كسبت و لكم ما كسبتم ، و لا تسئلون عما كانوا يعملون

১৪১ সে ছিল এক মণ্ডলী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের কৃতকর্ম্ম তাহাদিগের জন্য আর তোমাদিগের কৃতকর্ম্ম তোমাদিগের জন্য, তাহাদিগের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদিগকে (কোন প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করা হইবে না ।

টীকা :—

১১৯ **নিজকে ধ্বংস করা :—**

মূল আয়তে এখানে سفه نفسه পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ—নিজকে উপেক্ষা ও অবমাননা করা, নিজকে ধ্বংস করা, আত্মবিস্মৃত হওয়া। (লেছান, রাগেব, 'বায়জাভী)। এখানে ব্যাপকভাবে সমস্ত ভাবই গ্রহণীয়। এহুদী, খৃষ্টান ও আরবের পৌত্তলিকগণ সকলেই হজরত এবরাহিমকে নিজেদের কুলপতি বলিয়া স্বীকার করিত এবং তাঁহাকে লইয়া অহঙ্কার ও বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু বস্তুতঃ কাজের সময় তাঁহার শিক্ষার ও আদর্শের অনুসরণ তাহারা কেহই করিতে চাহিত না। হজরত এবরাহিমের প্রথম আদর্শ—ভাবের রাজ্যে। এখানে তিনি পণ্ডিত-পুরোহিতদিগের বিকৃতশিক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, সত্যকে পাইবার জন্য মুক্ত জ্ঞানবিবেক লইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছেন এবং তাহার ফলে গতানুগতি ও

অন্ধবিশ্বাসের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত মোছলেমরূপে পূর্ণ তাওহিদকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। কিন্তু এহুদীরা তাঁহার সে আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের আলেম ও ফকিরদিগকে, اربابا من دون الله আল্লার পরিবর্ত্তে, ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিতেছে। এই আয়তের তফছিরে স্বয়ং হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন—এহুদীদিগের আলেম ও পীর ফকিরেরা যে বিষয়কে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেয়, তাহারা তাহাকে হারাম বলিয়া গ্রহণ করে—পক্ষান্তরে যে বিষয়কে তাহারা হালাল বলিয়া ব্যবস্থা দেয়, এহুদীরা তাহাকে হালাল বলিয়া মানিয়া লয়। বস্তুতঃ আল্লার কেতাবে তাহা ঐরূপ হালাল বা হারাম কি না, সে বিচার তাহারা করে না, করিতে চায় না—এমনকি, করাকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। ইহাই হইতেছে এহুদীদিগের আল্লার পরিবর্ত্তে আলেম ও পীর ফকিরদিগকে ঈশ্বর বানাইয়া লওয়া। (ছুরা তওবা, ৩১ আয়তের তফছির দ্রষ্টব্য)।

হজরত এবরাহিমের প্রধান শিক্ষা তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ। সকল প্রকারের পৌত্তলিকতা ও অংশীবাদকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া, তিনি সকল বিশ্বের একমাত্র মালেকের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা যীশুকে, পবিত্রাত্মাকে, এমনকি যীশু-জননী মেরীকে পর্য্যন্ত, সেই মালেকের সহিত সমান অংশী করিয়া লইয়া ত্রিত্ববাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

তাওহীদের একনিষ্ঠ সেবক হজরত এবরাহিমের সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছিল—পুতুল পূজার প্রতিবাদে। সেগুলিকে বর্জ্জন করাতেই তাঁহার সেই লোমহর্ষণ অনল পরীক্ষা। পৌত্তলিকতার সকল কলুষ হইতে পাক ছাফ থাকিয়া এছমাইলের বংশধরেরা সেই এক অদ্বিতীয় ও নিরাকার প্রভুর এবাদত করিবে—এই জন্যই তিনি পুত্রকে লইয়া আবু কোবায়ছের মুক্ত প্রান্তরে কা'বা গৃহের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই এছমাইলের বংশধর কোরেশরাই এবরাহিমের নির্ম্মিত সেই কা'বায় ৩৬০টী প্রতিমা ও প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহাদের পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

ফলতঃ এবরাহিমকে লইয়া যাহারা গর্ব্ব ও কোন্দল করিতেছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মপথ এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুণ্য আদর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে মানবজীবনের সকল দিক দিয়া তাহারা সকলেই নিজদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

হজরত এবরাহিম কুলপতি—সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে, এইরূপ সন্দেহ হয় ত কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। সেই জন্য আয়তের শেষভাগে এবং তাহার পরবর্ত্তী কতকগুলি আয়তে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার মূল নীতি এবং তাঁহার নবীজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্ত করিয়া দিয়া বলা হইতেছে—মানুষ অনুসরণ করিবে সেই নীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলির।

১২০ **ছলাম বা আত্মসমর্পণ :—**

"আছলেম" এছলাম মছদর হইতে সম্পন্ন, উহার অর্থ—আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অন্যের অনুগত করিয়া দেওয়া। আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ কর, ইহার অর্থ—নিজের সমস্ত ইচ্ছা ও কর্ম্মকে আল্লার ইচ্ছা ও আদেশের অধীন করিয়া দাও! এইরূপে মানবজীবনের সমস্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে আল্লার ইচ্ছা ও আদেশের নিকট বলিদান করিতে পারে যে, সেই মোছলেম। এই আয়তে এবং ইহার পরবর্ত্তী ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৬ আয়তে এই আত্মসমর্পণের শিক্ষাকেই নানা দিক দিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। হজরত এবরাহিমের অন্তরে সত্যজ্ঞানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল—"আত্মসমর্পণ কর!" এবরাহিমের অন্তরাত্মা দ্বিধামাত্র না করিয়া সে আহ্বানের সাড়া দিয়া বলিয়াছিল—সকল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা পোষণকর্ত্তা সেই পরমপ্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম। এই এছলাম বা আত্মসমর্পণই হইতেছে ধর্ম্মের সার কথা। দুন্‌য়ার সকল নবী ও রছুল বিশ্বমানবকে এই এছলামের প্রতি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্ণরূপ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয় হজরত এবরাহিমের আমল হইতে এবং পূর্ণতা লাভ করে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার দ্বারা।

১২১ **অছিয়ৎ :—**

মৃত্যুকালে মানুষের যে চরম কথা, তাহাকে 'অছিয়ৎ' বলা হয়। নিজের জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে যাহা সত্য, এই সময় অতি বড় পাষণ্ডেরাও তাহা গোপন করিতে চায় না। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, হজরত এবরাহিম ও হজরত য়্যাকুবের চরম কথা হইতেছে—এছলাম। মোছলেম-জীবনের কোন স্তরই যেন আত্মসমর্পণের এই সাধনা বর্জ্জিত না হয়।

১২২ **য়্যাকুবের প্রশ্ন :—**

হজরত য়্যাকুবের এই প্রশ্ন এবং তাঁহার পুত্রগণের এই উত্তর বস্তুতঃ এছলামের বায়আৎ ব্যতীত আর কিছু নহে। হজরতের সমসাময়িক এহুদী ও খৃষ্টানেরা প্রকাশ করিত—হজরত য়্যাকুব এ বায়আৎ গ্রহণ করেন নাই। তাই তাহাদের প্রতিবাদে আয়তের প্রথমাংশে বলা হইতেছে—তোমরা এই ঘটনাকে অস্বীকার করিতেছ কোন্ প্রমাণের বলে? তোমরা কি য়্যাকুবের মৃত্যুসময় সেখানে উপস্থিত ছিলে? বস্তুতঃ হজরত য়্যাকুব যে নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রগণকে ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ যে সে প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, এহুদীদিগের পুরাতন পুথি পুস্তক হইতে এখন তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাইবেল (Genesis XILX 2) আদি পুস্তক ৩৫-২ পদে এই অছিয়তের আভাষ পাওয়া যায় এবং উহারই ব্যাখ্যায় Mid. Rubbah পুস্তকে যে বর্ননা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই প্রশ্ন-উত্তরের কথা সম্যকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

১২৩ **পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে অহমিকতা** :—

'আমরা অমুক নবীর বংশধর, আমরা অমুক রছুলের উম্মৎ এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে এমন এমন মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই অহমিকতার আবশ্যক বা সার্থকতা কিছুই নাই। নবী, রছুল ও মহাপুরুষগণের সাধনার অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অনুরূপ আমল করাতেই প্রকৃত সফলতা। কারণ, অন্যের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ কেহই করিতে পারে না। আমাদের কাজের কৈফিয়ৎ আমাদিগকে দিতে হইবে, আমাদের কর্ম্মের ফলাফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। এহুদী ও খৃষ্টানেরা নিজেদের পূর্ব্ববর্ত্তী নবী ও রছুলগণের শিক্ষার অনুসরণ করে না, বরং নানারূপ অনাচারে লিপ্ত হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণই তাহারা করিয়া যায়। অথচ সেই নবী-রছুলগণের নাম করিয়া তাহারা কেবলই অহমিকতা প্রকাশ করিতে থাকে। আয়তে এই আচরণের প্রতিবাদ করা হইতেছে।

১২৪ **সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা** :—

এহুদীরা বলে—তোমরা খৃষ্টান হও, তাহা হইলে ধর্ম্মপথ প্রাপ্ত হইবে। খৃষ্টানেরাও ঐরূপে মুছলমানদিগকে খৃষ্টান হইতে বলে। কোর্‌আন মুছলমানকে শিখাইয়া দিতেছে—এ সব সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামীর স্থান এছলামে নাই। ঐ সকল সঙ্কীর্ণগণ্ডীর কোন ধারই আমরা ধারি না। একনিষ্ঠ এবরাহিম আল্লার যে উদার মহান ও সর্ব্ব সমন্বয়ী এছলামরূপ বিশ্বধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুসরণ করি, আমরাও সেই সকল-বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের একমাত্র কর্ত্তা আল্লাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি।

১২৫ **এছলামের উদারতা** :—

পূর্ব্ব আয়তে, এছলামকে উদার বিশ্বধর্ম্ম বলা হইয়াছে, এই আয়তে সেই উদারতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এখানে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের বিদিত নবীগণের নাম স্তরে স্তরে বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ইঁহারা আল্লার নিকট হইতে যে শিক্ষা ও যে বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি ;—তাহাদিগের অবিদিত অন্য সমস্ত নবী আল্লার নিকট হইতে যে সব বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্রতিও আমাদের সমান বিশ্বাস। একজনকে বা দুই একজনকে গ্রহণ করিয়া আল্লার আর সমস্ত নবীকে অস্বীকার করাতেই দুন্‌য়ায় ধর্ম্মের নামে যত অকল্যাণের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই সঙ্কীর্ণতাকে ধর্ম্মের নামে চালাইবার ফলে আজ যেন ধর্ম্মই বিশ্বমানবের পক্ষে একটা বিভীষিকায় পরিণত হইয়াছে। তাই সেই বিশ্বধর্ম্মের বাহক-মুছলমান কোর্‌আনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ঘোষণা করিতেছে—"আল্লার নবীদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ আমরা করি না।" —অর্থাৎ সকলকেই সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করাই এছলামের স্পষ্ট শিক্ষা, এবং সেই সমস্ত

নবী ও রছুলদিগের সকল শিক্ষার চরম লক্ষ্য যে আল্লাহ—তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাই তাহার পরম সাধনা।

১২৬ **আল্লাই যথেষ্ট :—**

উপরের আয়তে যে শিক্ষা ও সাধনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিলেই লোকে সত্যকার মুক্তিপথ লাভ করিতে পারিবে। এহুদী ও খৃষ্টানেরা যদি এই উদার সমন্বয়কে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা ধর্ম্ম চায় না—চায় বিচ্ছেদ ও বিসম্বাদ। কিন্তু তাহাতে হজরত মোহম্মদ মোস্তফার সত্যপ্রচারে এবং সত্যপ্রতিষ্ঠায় কোন বিঘ্ন হইবে না। যে সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে কর্ত্তব্যের এই গুরুভার দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এবং সেই আল্লার সাহায্যই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, মানুষের মুখাপেক্ষী তাঁহাকে হইতে হইবে না। এখানে এহুদী ও খৃষ্টানদিগকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, দুন্য়ার সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহা সমানভাবে প্রযুজ্য। মুছলমান কোর্‌আনের এই মহাসমন্বয়কে দুন্য়ার সকল ধর্ম্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মিলনের আহ্বানকে সর্ব্বদাই জাগ্রত করিয়া রাখিবে।

১২৭ **আল্লার সংস্কার :—**

খৃষ্টান ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা দীক্ষার সময় বাপ্তিস্মা, জলসংস্কার, উপনয়ন সংস্কার প্রভৃতি করিয়া থাকে। এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হইতেছে—বাহিরের এই সব সংস্কার অনর্থক। উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে আল্লাহকে গ্রহণ কর, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্য ধর্ম্মকে অবলম্বন কর। আগুন, পানি ও উপবীত দিয়া আত্মার বাপ্তিস্মা হয় না, মছলমান আমরা তাহা গ্রহণ করি না। আমরা করিতে চাই আল্লার দ্বারা আত্মার বাপ্তিস্মা। আয়তের শেষভাগে মুছলমানের প্রধান স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইতেছে। মূলে এখানে 'মোখলেছুন' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা 'এখলাছ' মছদর হইতে সম্পন্ন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা একমাত্র আল্লার এবাদৎ করি এবং তাঁহার এবাদতে আর কাহাকেও শরিক করি না। যাহারা আল্লাহকে স্বীকার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গয়রুল্লাহতেও আল্লার কোন গুণ বা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কোন উপকার লাভের বা অপকার হইতে রক্ষা পাওয়ার আশায় তাহার শরণাপন্ন হয়, সে 'মোখলেছ' নয়—'মোশ্‌রেক'। আজ আমাদের সমাজের হাজার হাজার নরনারী প্রতিদিন নানা সূত্রে এই এখলাছের মাথায় লগুড়াঘাত করিতেছে, অথচ মুছলমান বলিয়া গর্ব্ব করিয়াও যাইতেছে!

১২৮ **গণ্ডী তুলিয়া দাও :—**

এহুদীরা বলিতেছে—এহুদী হও, নচেৎ নাজাৎ বা মুক্তি পাইবে না। খৃষ্টানেরাও বলিতেছে—খৃষ্টান হও, নচেৎ মুক্তি পাইবে না। তাই তাহাদিগকে বলা হইতেছে—যে

সকল নবীর দোহাই দিয়া এবং যাঁহাদের নামকরণে তোমরা আল্লার উদার বিশ্বধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেছ, সেই নবীগণ কি এহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন ? তাহা ত কখনই নয়। তবে তাঁহাদের নামে এই প্রকার নূতন গণ্ডী না কাটিয়া তাঁহারা সকলেই আল্লার যে উদার মহান এছলামের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এক একজন এমাম বা অলিউল্লার নামে মুছলমানদিগের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধেও এই কথা। এই আয়ত অনুসারে, তাঁহাদিগকেও বলা যাইতে পারে—আইস ভাই ! আমাদের এই ভক্তি-ভাজন এমাম ও অলিগণ সকলে যে এছলামধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহারই অনুসরণ করি। তোমাদের আবিষ্কৃত নূতন গণ্ডীগুলিতে নিজকে আবদ্ধ না করিলে যদি মুছলমানের মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তোমাদের আদর্শ-সেই এমাম ও অলিরাও ত নাজাৎ পাইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা ত তোমাদের ঐ সকল গণ্ডী সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন !

দ্বিতীয় পারা

—০০০—

সপ্তদশ রুকু

কেবলা-পরিবর্ত্তন ও তাহার পরীক্ষা

১৪২ সيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ط قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞

১৪২ নির্ব্বোধ লোকগুলি শীঘ্রই বলিয়া উঠিবে — মুছলমানগণ যে কেবলার উপর (সম্মিলিত হইয়া-) ছিল, তাহাদিগকে নিজেদের সেই কেবলা হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিল - কিসে? বলিয়া দাও—পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমস্তই ত আল্লার; তিনি যাহাকে ইচ্ছা, সরল পথে পরিচালিত করেন।

১৪৩ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط وَمَا جَعَلْنَا

১৪৩ এবং এই প্রকারে তোমাদিগকে আমরা এক মধ্যস্থ জাতি (-রূপে প্রতিষ্ঠিত) করিলাম — যেন তোমরা বিশ্বমানবের (মুক্তি-সাধনার) সহায় হও, আর রছুল হন তোমাদের সহায়। এবং (হে মোহাম্মদ!) তোমার পূর্ব্ব অবলম্বিত দিককে যে আমরা কেবলা করিয়া দিয়াছিলাম,

الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ الرَّحِيمُ

তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে—রছুলের (প্রকৃত) অনুগত যে ব্যক্তি-তাহাকে, — নিজের দুই পাদমুলের উপর (ভর দিয়া) ঘুরিয়া দাঁড়ায় যে-তাহা হইতে, বাছাই করিয়া দেই — এবং নিশ্চয়ই ইহা ছিল খুবই কঠিন (-পরীক্ষা), তবে আল্লাহ্ যাহাদিগকে হেদায়ৎ করিয়াছেন (তাহাদের পক্ষে উহা সহজ হইয়া ছিল), আর আল্লাহ্ ত তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে চান না (বরং পরীক্ষার দ্বারা তাহাকে নির্ম্মল ও সুদৃঢ় করিয়া দিতে চান, কারণ) আল্লাহ হইতেছেন মানবের প্রতি নিশ্চয়ই বাৎসল্য পরায়ণ-করুণানিধান।[১০২৫]

১৪৪ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ

১৪৪ সময় সময় আকাশের দিকে তোমার উন্মুখদৃষ্টি আমরা লক্ষ্য করিতেছি, অতঃপর নিশ্চয় তোমাকে এমন এক কেবলার পানে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব-যাহাতে তুমি পরিতুষ্ট হইবা;[১০২৬]— অতঃপর ‘ মছজিদুল-হারামের ’ দিকে নিজের মুখ ফিরাও ; আর

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

তোমরাও (হে মুছলমানগণ !) যে কোন স্থানে অবস্থান কর না কেন — তাহারই পানে মুখ ফিরাইবা ;[১৩১] আর কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে যাহারা-তাহারা উত্তম-রূপে অবগত আছে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে (সমাগত) সত্য ; আর আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

١٤٥ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ج وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِينَ

১৪৫ এবং যাহারা কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে - যদ্যপি তুমি তাহা-দিগের নিকট প্রত্যেক নিদর্শনটী উপস্থিত করিয়া দাও - তত্রাচ তোমার কেবলার অনুসরণ তাহারা (কখনই) করিবে না, আর তুমিও (ন্যায়তঃ) তাহা-দিগের কেবলার অনুসরণ করিতে পার না, পক্ষান্তরে পরস্পর তাহারাও একে অন্যের কেবলার অনুসরণ করে না ǂ ; এবং তোমার নিকট জ্ঞান সমাগত হওয়ার পর তুমি যদি তাহাদিগের অভিপ্রায়গুলির অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে তুমি তখন অত্যাচারী-দিগের অন্তর্ভুক্ত হইবা।

ǂ এহুদারা যেরূশেলমের দিকে ও খ্রীষ্টানেরা পূর্ব্বমুখী হইয়া উপাসনা করিত। (মুয়র ১০৯ পৃষ্ঠা টীকা)।

১৪৬ যাহাদিগকে আমরা কেতাব দিয়াছি, ইহাকে তাহারা (সম্যকরূপে) চিনিতেছে-ঠিক যেন আপনাপন পুত্রদিগকে চিনিয়া থাকে ; এবং (অবস্থা এই যে) উহাদিগের মধ্যকার একদল নিশ্চয়ই সত্যকে জ্ঞাতসারে গোপন করিয়া ফেলিতেছে[১৩]।

١٤٦ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ط وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

১৪৭ সত্য তোমার প্রভুর নিকট হইতে (সমাগত), অতএব তুমি যেন কদাচ কলহ পরায়ণদিগের দলভুক্ত হইও না।

١٤٧ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۞

টীকা :—

১২৯ নির্ব্বোধ লোকগুলি :—

পূর্ব্ব রুকু'র ১০৩ আয়তে এই নির্ব্বোধ লোকগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত এবরাহিমের ধর্ম্মপথ হইতে যাহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছে, সেই নির্ব্বোধ আত্মবিস্মৃত লোকগুলিই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কা'বাকে কেবলা হইতে দেখিয়া ঐরূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিল।

১৩০ কেবলা :—

মানুষ যে দিকে মুখ ফিরায়, অভিধানে সেই দিককে তাহার কেবলা বলা হয়, (কবির ২—৪)। 'শরিয়তের পরিভাষায় যে দিকে—অথবা (মতান্তরে) যে স্থানের দিকে—মুখ করিয়া নামাজ পড়া হয়, তাহাকে 'কেবলা' বলা হয়। হজরত রছুলে করিম মক্কায় অবস্থান কালে, এবং মদিনায় আসিয়া দেড় বৎসর পর্য্যন্ত, বায়তুল মোকাদ্দছ বা যেরুশেলমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। তাহার পর কা'বাকে কেবলা করিয়া নামাজ পড়ার আয়ত অবতীর্ণ হইলে, তদনুসারে বায়তুল মোকাদ্দছকে ত্যাগ করিয়া কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৪২ ও ১৪৩ আয়ত ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে নাজেল হইয়াছিল। প্রথম আয়তে অছুল বা Principle-এর হিসাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, পূর্ব্ব

বা পশ্চিম বলিয়া কোন দিকের আসলে কোন বিশেষত্ব নাই। সব দিকই যখন আল্লার, তখন অছুলের হিসাবে সব দিকই সমান। তবে তিনি যদি নামাজের জন্য কোন একটা দিক নির্ণয় করিয়া দেন, অথবা একটা দিকের পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য দিকে মুখ করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে তাঁহার কোন একটা মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। ১৪৩ আয়তে সেই মঙ্গল উদ্দেশ্যের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১৩১ এইরূপে-মধ্যস্থ-সহায় :—

আয়তের প্রথমেই كذلك শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহার অর্থ—এইরূপে, সেমতে, thus, ইত্যাদি। 'এইরূপে আমরা তোমাদিগকে এক মধ্যস্থ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম' —অর্থাৎ, যেরূপে তোমাদিগকে আমরা এক নিরপেক্ষ সর্ব্বসমন্বয়ী কেবলা দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছি, সেইরূপ তোমাদিগকে ন্যায়নিষ্ঠ নিরপেক্ষ সর্ব্বসমন্বয়ী মধ্যস্থ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। সকল প্রকারের দল, মণ্ডলী বা জমাআৎকে 'উম্মৎ' বলা হয়। এখানে উম্মৎ বলিতে এছলামধর্ম্মের অনুগত জমাআৎ বা মোছলেমসঙ্ঘকে বুঝাইতেছে। এখানে উম্মতের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে وسطا বলিয়া। 'ওয়াছৎ' শব্দের আধিভানিক অর্থ, দুই চরম সীমার মধ্যস্থ ব্যক্তি বা বিষয়। ব্যবহারে উহার অর্থ—নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারক। সেই জন্য উভয় আভিধানিক ও ব্যবহারিক ভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমি উহার অনুবাদ করিয়াছি 'মধ্যস্থ' বলিয়া। এইরূপে মধ্যস্থ কেবলা দিয়া এক মধ্যস্থ জাতিকে ধর্ম্ম-সংঘর্ষ-জর্জ্জরিত দুন্য়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে—যেন তাহারা সমস্ত ধর্ম্মসংঘর্ষের সমন্বয় করিয়া দিয়া বিশ্বমানবের মুক্তিসাধনায় সহায় হইতে পারে। মূলে এখানে شهداء শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উহার একবচন 'শহীদ'—উপস্থিত, সাক্ষী, সহায় এবং এমামকে শহীদ বা আদর্শ বলা হয়, (রাগেব, বয়জাভী ও কবির ২৪ আয়তের তফছির, জরির ১—১৩০ প্রভৃতি)। হজরতের শিক্ষা ও আদর্শ মুছলমানকে এই সাধনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং তাঁহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিক্ষিপ্ত ও কলহরত বিশ্বমানবকে জ্ঞান ও মুক্তিসাধনার এক মিলনক্ষেত্রে সমবেত হইতে সহায়তা করিতে থাকিবে—সেই মুছলমান। কা'বাকে কেবলা করার এবং মোছলেমমণ্ডলীকে এক ন্যায়নিষ্ঠ নিরপেক্ষ ও মধ্যস্থ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ইহাই উদ্দেশ্য। পরকালের বিচারক্ষেত্রেও যে তাহারা আল্লার হুজুরে নিজেদের এই সাধনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, বোখারী, তির্ম্মিজি প্রভৃতি গ্রন্থে একটী হাদিছের দ্বারা তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে (মনছুর ১—১৪৪)।

১৩২ পূর্ব্ব কেবলা পরিবর্ত্তনের হেতু :—

মক্কায় অবস্থানকালে এবং মদিনায় আসার পর দেড় বৎসর পর্য্যন্ত, হজরত রছুলে করিম মুছলমানদিগকে লইয়া বায়তুল-মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। সে সময়

কোরেশ ও অন্যান্য আরবগোত্রের পৌত্তলিকগণই সাধারণতঃ এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা কারণে ধর্ম্মমন্দির বলিয়া তাঁহারা কা'বাকে সম্মান দান করিতেন, বাইতুল-মোকাদ্দছের কোন গুরুত্ব বা সম্মান তাঁহাদের নিকট ছিল না। কিন্তু হজরত ব্যবস্থা দিলেন—বায়তুল-মোকাদ্দছকে' কেবলারূপে গ্রহণ করিয়া সকলকে তাহার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। ইহাতে তাঁহাদের পুরুষ পুরুষানুক্রমিক সমস্ত ভাব, বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর যে কঠিন আঘাত লাগিল, তাহাতে নবদীক্ষিত মুছলমানগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মিথ্যা-বাদী কপটগুলি এই পরীক্ষার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল—এছলামকে বর্জ্জন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাঁহারা ছিলেন সত্যকার ঈমানদার, আল্লার প্রদত্ত হেদায়তকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহারা হজরত রছুলের ব্যবস্থার নিকট সন্তুষ্টচিত্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ফলে, বায়তুল-মোকাদ্দছকে কেবলারূপে নির্দ্ধারণ করার কঠোর পরীক্ষার দ্বারা মছলমানদিগের মধ্য হইতে মোনাফেকদিগকে বাছাই করিয়া ফেলা হইল। আয়তের শেষভাগে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, দুন্য়ার সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ বাৎসল্য পরায়ণ ও করুণা নিধান। তাঁহার সেই করুণা ও বাৎসল্যের ফলে, বিশ্বমানবের মহা মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে মিথ্যাকে সত্য হইতে বাছাই করিবার জন্য, তিনি এই প্রকার পরীক্ষা পাঠাইয়া থাকেন। কে আল্লার রছুলের সত্যকার আজ্ঞাবহ আর কে স্বার্থ বা সংস্কারের পূজক, এই সকল পরীক্ষার দ্বারা তাহার যাঁচাই বাছাই হইয়া যায়। এইরূপ বাছাই করিয়া দেওয়াই আল্লার করুণা গুণের ধর্ম, অন্যথায় কপটদিগের সংমিশ্রণে সত্যের যথাযথ সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া সত্যকার মুছলমানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

১৩৩ হজরতের প্রার্থনা :—

'আকাশের পানে উন্মুখ দৃষ্টি'—অর্থে আল্লার নিকট হজরতের প্রার্থনা এবং প্রতিশ্রুত কেবলাকে লাভ করার জন্য তাঁহার আগ্রহ। পূর্ব্বে ১৪২ ও ১৪৩ আয়তে আল্লাহ তাআলা হজরতকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি মুছলমানদিগের জন্য এক 'মধ্যস্থ' নিরপেক্ষ ও সর্ব্বসমন্বয়ী কেবলা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন—এবং সেমতে মোছলেম মণ্ডলীকে তিনি এক সর্ব্বসমন্বয়ী মধ্যস্থ জাতিরূপে দুন্য়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাই ছিল রহমতুল-লিল-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফার নবীজীবনের প্রধানতম সাধনা। তাই ঐরূপ প্রতিশ্রুতি লাভ করার পর, সেই অভিপ্সিত কেবলাকে লাভ করার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া তিনি আল্লার হুজুরে প্রার্থনা করিতে এবং উন্মুখভাবে সেই আদেশের অপেক্ষা করিতে থাকেন (এবনে মাজা, নাছাঈ, প্রভৃতি)। আলোচ্য আয়তের প্রথম ভাগে ১৪২ ও ১৪৩ আয়ত নাজেল হওয়ার পরের এবং ১৪৪ আয়ত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বের সেই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। বিশ্বমানবের, বিশেষতঃ সমগ্র আরবের সকল ধর্ম্ম সমস্যার চরম সমাধান হইবে

যে কেবলার দ্বারা, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা নিজ নবীজীবনের প্রধান সাধনাকে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, প্রতিশ্রুত কেবলা লাভে তাঁহার পরিতুষ্ট হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ। ইহার পরেই নূতন কেবলার আদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

১৩৪ **মছজিদুল-হারাম—নূতন কেবলা :—**

'মছজিদুল-হারাম' অর্থে কা'বা ও তৎসংশ্লিষ্ট নামাজের স্থান। সমস্ত অন্যায় অপকর্ম্ম ও সকল প্রকারের হিংসার কাজ এই মছজিদে নিষিদ্ধ—এমন কি, বাহিরে হারাম নহে-এরূপ অনেক কাজও সাবধানতা বশতঃ এখানে হারাম করা হইয়াছে। এই জন্য উহাকে মছজিদুল-হারাম বলা হইয়াছে। ভাবার্থে উহার অর্থ "সম্মানিত-মছজিদ"ও হইতে পারে। "মছজিদের দিকে মুখ ফিরাও"—অর্থাৎ যে দিকে কা'বা আছে, তোমরাও সেই দিক পানে মুখ করিয়া নামাজ পড়। ঠিক কা'বাকে সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়িতে হইবে, আয়তের এ তাৎপর্য্য কখনই গৃহীত হইতে পারে না। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হইলে شطر শব্দ আনিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। হজরতের ছাহাবা, তাবেয়ীন এবং মুছলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রায় সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য তফছির কবির (২—২৩ হইতে) ও হাদিছের টীকাগুলি দ্রষ্টব্য।

১৩৫ **নূতন কেবলার সত্যতা :—**

"যাহারা কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে"-পদে এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতিকে বিশেষতঃ এহুদীদিগকে বুঝাইতেছে। কারণ মদিনায় কেবলা সম্বন্ধে বিসম্বাদ প্রধানতঃ তাহারাই উপস্থিত করিয়াছিল। ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য-পদে, "ইহা" সর্ব্বনাম, পূর্ব্বপদে বর্ণিত কেবলা বা রছুল উভয়কে বুঝাইতে পারে। তবে প্রথমটাই অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ আয়তে কেবলা সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছে। এক সময় বায়তুল-মোকাদ্দছ স্থলে কা'বাই যে বিশ্বাসীমণ্ডলীর কেবলা হইবে, ইহা পূর্ব্বেই এহুদী ও খৃষ্টানগণকে তাহাদের নবীদিগের মারফতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যকার একদল—অর্থাৎ পণ্ডিত ও পুরোহিত দল, জ্ঞাতসারে তাহা গোপন করিয়া ফেলিতে উৎসুক! নিজেদের মতের বিপরীত হইলে এই প্রকারে ধর্ম্মপুস্তকে পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করাকে তাহারা চিরকালই Pious fraud বা সাধুপ্রবঞ্চনা বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তত্রাচ বর্ত্তমান বাইবেলে এই আয়তের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটা নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১) হগয় Haggai নবীর পুস্তকে ২য় অধ্যায়ে ৭ম—৯ম পদে বর্ণিত হইতেছে :—

I will shake all nations, and the Desire of all nations shall come : and I will fill this house with Glory, saith the Lord of hosts. ......

The Glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of the host ; and in this place I will give peace, saith the lord of host.

اُس پچھلے گھـــر کا جلال پہلے گھر کے جلال سے زیادہ ھوگا رب الافواج فرماتا ھے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشونگا ' رب الافواج فرماتا ھے -

انه عظيما يكون مجد هذا البيت الاخير اكثر من الاول يقول رب الجنود و في هذا المكان اعطى السلام يقول رب الجنود -

বাঙ্গলায় ইহার বিকৃত অনুবাদ করা হইয়াছে ঃ—

"এবং সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জক আসিবেন, আর আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। ...... **এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে,** ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন ; আর এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব। ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"

"এই পরবর্ত্তী গৃহের মহিমা প্রথম হইতে অধিকতর হইবে" পদের স্থানে অনুবাদ করা হইতেছে—"এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে।" বাইবেলে দুইটী স্বতন্ত্র গৃহের কথা বর্ণনা করা হইতেছে এবং প্রথমে যে গৃহকে কেবলা করা হইয়াছিল, তাহার মহিমা অপেক্ষা পরবর্ত্তী গৃহের মহিমা বা প্রতাপ যে গুরুতর হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বাইতুল-মোকাদ্দছ ও কা'বার স্পষ্ট বর্ণনা দেখিয়া অনুবাদকেরা এই প্রকার কারসাজী করিয়াছেন।

মূল এবরানীতে এখানে حمدث শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাও আরবীর ন্যায় حمد 'হাম্‌দ' ধাতু হইতে সম্পন্ন, মোহাম্মদ ও আহমদ নামও এই একই ধাতু হইতে সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এখানে হজরতের নামের প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু যীশুখৃষ্টের নামের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। যীশুর চরিতকার মথি, সমস্ত তওরাত এবং পুরাতন নিয়মের যাবতীয় পুথি পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া, সঙ্গত বা অসঙ্গতভাবে যীশু সম্বন্ধে যেখানে যেটুকু ভবিষ্যদ্বাণীর সন্ধান পাইয়াছেন, এহুদীদিগের কাএল করার জন্য সে সমস্তই নিজের পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হাগগী নবীর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে তিনি বাদ দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত যীশুখৃষ্টের কোনই সম্বন্ধ নাই। বিখ্যাত পাদ্রী গড-ফ্রি-হিগেন্স এই সব কারণে রেভারেণ্ড পার্কহার্ষ্টের বরাত দিয়া বলিতেছেন—এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশু সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে না, বরং ইহাদ্বারা ভবিষ্যতের সেই আগন্তুকের সংবাদ দেওয়া হইতেছে, স্বয়ং যীশু যাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।

(২) মক্কার আর এক নাম—'বক্কা'। ছুরা আলে-এমরানের ৯৫ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে :— ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا - الاية

—"নিশ্চয় মানবের মঙ্গলার্থে প্রতিষ্ঠিত প্রথম গৃহ হইতেছে সেইটী—যাহা বক্কাতে অবস্থিত এবং যাহা blessed বা বরকত প্রাপ্ত, ইত্যাদি।" মক্কার আর একটী নাম যে বক্কা এবং এই বক্কা নামও যে আরবদিগের নিকট খুবই সুপরিচিত ছিল, সেল পামার প্রভৃতি খৃষ্টান-অনুবাদকগণ তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সমস্ত আরবীয় ভূগোল ও সাহিত্য তাহার প্রমাণে পরিপূর্ণ। (৩—৯৯ আয়তের টীকা দ্রষ্টব্য)। বাইবেলে এই বক্কা-উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত ও বরকত প্রাপ্ত বায়তুল্লার কথা আজও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। 'জবুর' বা গীত সংহিতায় হজরত দাউদ বলিতেছেন :—

فطوبي للسكان في بيتـــك وامي الابد يسبحونك - مغبوط هو الرجل الذي نصرته من عندك ' مطالع في قلبه يضع - في وادي البـــكا في المـــكان الذي وضعته فيه لان البركات يعطيها واضع الناموس -

مبارك وه هيں جو تيرے گهر ميں بستے هيں ' وه سدا تيري ستايش كرينگے - مبارك وه انسان جس ميں قوت تجهه سے هے ' ان كے دل ميں تيري راهيں هيں ' وه بكا كي وادي ميں گذر كرتے هوئے اسے ايك كنـواں بنانے - پهلـــي برسات اسے بركتوں سے ڈهانپ ليتي -

Blessed are they that dwell in Thy house: they will be still praising Thee. Blessed is the man whose strength is in Thee; in whose heart are ways of them. Who passing through the valley of Bacca make it a well; the rain also filleth the pools.†

বাইবেলের অনুবাদে ক্রমে ক্রমে কিরূপ বিকার ঘটিতেছে, নিম্নের উদ্ধৃতাংশে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। উপরের পদগুলির বাঙ্গলা অনুবাদে বলা হইতেছে :—"ধন্য তাহারা যাহারা তোমার গৃহে বাস করে, তাহারা সতত তোমার প্রশংসা করিবে। ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার বল তোমাতে, **(সিয়োনগামী) রাজপথ** যাহার হৃদয়ে রহিয়াছে। তাহারা **ক্রন্দনের তলভূমি** দিয়া গমন করতঃ তাহা উৎসে পরিণত করে : প্রথম বৃষ্টি তাহা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে।" (৮৩, ৪—৬ পদ)।

(৩) قوة الامم تاتي اليك —

اقطار الجمال تغشيك نجايب مديان و عيفا ياتون من سبا جميعهم بذهب

---

† Well বা কূপ হইতে 'জমজম'-কূপকে বুঝাইতেছে।

و لبان متخاسرین بتسبحة للرب ۔ کل مواشی قیدار یجمع الیک کباش نبایوت تخدمک یقربون علی مذبحی المستغفر و بیت بهای اجمده ۔

(الاصحاح الستون ۷ ـ ٦)

The multituedes of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah ; all they from Sheba shall come : they shall bring gold and incense, and they shall shewforth the praises of the Lord. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto Thee, the rams of Nebaioth shall minister unto Thee : they shall come up with acceptance on mine altar, I will glorify the house of my glory.

اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور عیفا کی سانڈنیاں آکے تیرے گرد بیشمار ہونگی ' وہ سب جو سبا کے ہیں ' آوینگے ' وہ سونا لبان لاوینگے ' اور خداوند کی تعریفوں کی بشارتیں سناوینگے ' قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہونگی ' نبیط کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہونگے ' وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائینگے ' اور میں اپنی شوکت کے گھر کو بزرگی دونگا ۔

"তোমাকে আবৃত করিবে উষ্ট্রযুথ, মিদিয়নের ও ইফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ ; শিবাদেশ হইতে সকলেই আসিবে ; তাহারা স্বর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে। কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকট একত্রিত হইবে, নবায়তের মেষগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে ; তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার **ভুষণ স্বরূপ গৃহ বিভুষিত করিব।"**

(যিশাইয় ৬০, ৬—৭ পদ) ।

মিদিয়ন, ইফা, কিদার, নবিত প্রভৃতি যে সকল নাম এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত হজরত এবরাহিমের পুত্র বা পৌত্রগণের নাম। ইঁহারা সকলে আরব দেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং মেনাকে কোর্‌বানগাহ বা যজ্ঞবেদীরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। কা'বা যে ভবিষ্যতে কেবলারূপে নির্ব্বাচিত হইবে, তাওরাতের এই সমস্ত বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। এহুদীরা এই সমস্ত কথা গোপন করিত।

তফছিরের রাবী আবুল আলিয়া এবং জয়দ-বেন-আছলমের পুত্র আবদুর্‌রহমান এই আয়তের তফছির প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, যাহা ভিত্তিহীন ও ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। আবুল-আলিয়া বলিতেছেন—হজরত রছুলে করিম, জিব্রাইলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ আমাকে এহুদীদের কেবলার পরিবর্ত্তে অন্য কোন কেবলা দান করুন—ইহা আমার একান্ত আকাঙ্খা। জিব্রাইল বলিলেন—কি করিব, আমিও তোমার

মত আজ্ঞাবহ বান্দা, তুমি খোদার নিকট এজন্য দোওয়া কর! তাহাতে তিনি দোওয়া করিলেন, এবং তাহার ফলে কেবলা পরিবর্তন হইয়া গেল, ইত্যাদি। (মন্‌ছুর ১—১৪২)। কিন্তু এই আবু-আলিয়া তাবেয়ী মাত্র, হজরতকে দর্শনও করেন নাই। স্তুতরাং হেজরতের দ্বিতীয় সনের ঘটনা, বিশেষতঃ জিব্রাইলের সহিত হজরতের কথোপকথনের ব্যাপার অবগত হওয়ার কোন স্তুযোগই তাঁহার ঘটে নাই।

এই আবুল-আলিয়া ও আবতুর্‌রহমান আর এক বর্ণনায় বলিতেছেন যে, হজরত রছুলে করিম বাইতুল-মোকাদ্দছকে কেবলারূপে গ্রহণ করিয়া এহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন (ফৎহুল্‌বারী ১—৩৪০)। আবুল-আলিয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। আবতুর্‌রহমানের নাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে হাফেজ এবনে হজর وهو ضعيف, "এবং তিনি জঈফ" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই আবতুর্‌রহমানের পিতা তাবেয়ী ছিলেন, অর্থাৎ হজরতের ছাহাবীদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার এক শতাব্দীরও পরে তাঁহার জন্ম হয়, এবং ১৮২ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। বহু ভিত্তিহীন হাদিছ ইহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হাদিছের এমামগণ তাঁহাকে একবাক্যে জঈফ ও অবিশ্বস্ত বলিয়াছেন। তিনি যে নিজের ইচ্ছা মত কোর্‌আনের তফছির করিতেন, একথাও এমামগণ বলিয়া দিয়াছেন (একমাল, খোলাছা, মীজান)।

সেল, পামার, রডওয়েল প্রভৃতি কোর্‌আনের ইংরাজী অনুবাদকগণ এবং মুয়র হজরতের জীবনীতে (১৮৯ পৃষ্ঠা) ও মেজর ওসবরণ তাঁহার Islam under Arabs পুস্তকে (৫৮ পৃষ্ঠা) পাদ্রী হিউজ Dictionary of Islam পুস্তকে (২—৪৮০) এই সকল ভিত্তিহীন বর্ণনাকে উপলক্ষ করিয়া, কেবলা পরিবর্তনকে হজরতের একটা 'নূতন অভিসন্ধি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যগুলির সার এই যে, মক্কায় অবস্থান কালে মোহাম্মদের কোন কেবলা ছিল না, যাহার যে দিকে ইচ্ছা নামাজ পড়িত। মদিনায় আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় এহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজের মতে আনিবার জন্য তিনি বায়তুল-মোকাদ্দছকে কেবলা করিয়া লইলেন। সে সময় পর্য্যন্ত এহুদীদিগের প্রতি মোহাম্মদ খুব বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি এহুদীদিগের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন, তখন আবার মক্কার পৌত্তলিকদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য, বায়তুল-মোকাদ্দছকে ত্যাগ করিয়া কা'বাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিলেন।

সকলেই অবগত আছেন—মদিনায় যাওয়ার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে হজরতের নবুয়ৎ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সময় তাঁহার উপর অবিরামভাবে কোর্‌আন অবতীর্ণ হইতে থাকে। ফাতেহা ছুরা মক্কায় অবতীর্ণ, এমন কি মুয়র প্রভৃতি খৃষ্টান লেখকগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, এই ছুরাটী মোহাম্মদের নবীজীবন লাভের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ফাতেহা বা প্রথম ছুরার ৭ম আয়তে এহুদীদিগকে 'মগজুব' বা অভিশপ্ত জাতি বলা হইয়াছে। মদিনায় আসার পর হজরত প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক নামাজে ঐ ছুরা পাঠ করিতেন, এবং মুয়র

সাহেবের কথা মতে, এহুদীরা মদিনার মছজিদে নামাজের সময় উপস্থিত থাকিত। সুতরাং ঐ তীব্র অভিমত তাহারা নিত্যই হজরতের মুখে শ্রবণ করিত। অতএব হজরত যে এহুদী-দিগের সন্তোষ অসন্তোষের কোন পর্‌ওয়া না করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে সত্য প্রচার করিতেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত, হজরত যে মক্কায় অবস্থান কালেও বায়তুল-মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন, তাঁহার ছাহাবাদিগের মুখে তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি (ফৎহুল্‌বারী ১—৩৪০, মন্‌ছুর ১—১৪৪)। খৃষ্টান লেখক-গণের মন্তব্যগুলি যে কতদূর ভিত্তিহীন, এই দুইটী প্রমাণের দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্যর উইলিয়ম মুয়র এই প্রসঙ্গে যে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে may ও perhaps প্রভৃতি কাল্পনিক অনুমানের উপর। তাহার পর সেই অনুমানকে ভিত্তি করিয়া তিনি অসম সাহসিকতার সহিত নিতান্ত দৃঢ়তা সহকারে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন।

কা'বাকে কেবলা করিয়া মক্কার পৌত্তলিকদিগকে সন্তুষ্ট করাই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সেজন্য ১৪॥ বৎসর অপেক্ষা করার কোনই কারণ ছিল না। হজরতের ও মুছলমান সমাজের কঠোর অগ্নি পরীক্ষা আরম্ভ হয় সেই খানে। 'মোহাম্মদ আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম ও কা'বার সম্মান নষ্ট করিয়া দিতেছেন'—ইহাই ছিল তাহাদের মূল অভিযোগ। স্বয়ং হজরত ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ সেই সময় নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কোরেশদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছিলেন। সে সময় হজরত কোরেশের সমস্ত প্রলোভন ও উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়া কিরূপ দৃঢ়তার সহিত সত্যপ্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার জীবনী পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু হেজরতের ১৮ মাস পরে, যখন মদিনা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সমস্ত পৌত্তলিক আরবগণ সকলেই মুছলমান হইয়া গিয়াছে, মদিনা আক্রমণের জন্য কোরেশগণ যখন নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া প্রস্তুত হইতেছে, বদর সমরের সেই অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে তিনি কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গেলেন এহুদীদিগকে চটাইয়া! অথচ ইহাই ছিল এহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখার আসল সময়। কোরেশদিগের আক্রমণের সময়, এহুদী সমাজের বিদ্রোহের আশঙ্কাই ছিল মুছলমানদিগের চিন্তার প্রধান কারণ। ফলে পাঠক দেখিতেছেন—যখন কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করার দরকার ছিল, তখন কা'বাকে বাদ দিয়া বায়তুল-মোকাদ্দছকে কেবলা করা হইতেছে। আবার এহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করার চরম আবশ্যকতা যখন উপস্থিত, সে সময় বায়তুল-মোকাদ্দছকে ত্যাগ করিয়া কা'বাকে কেবলা করা হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা ছিল যথাক্রমে পৌত্তলিক আরব ও মদিনার এহুদীদিগের মধ্য হইতে দীক্ষিত মুছলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষা। স্যর উইলিয়ম মুয়রের ইংরাজী-মানসিকতা ইহার মধ্যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নূতন 'পলেসী' ও অভিসন্ধি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ন্যায় যুক্তি ও ঐতিহাসিক সত্য, ইহাকে জঘন্য বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করিতে পারিবে না।

১৩৬ **কলহ পরায়ণ ঃ—**

'এমৃতেরা' শব্দের অর্থ সন্দেহভাবে কলহ কোন্দল করা, শুধু কলহ ও বাক্‌বিতণ্ডা করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (রাগেব, ছূরা কহফ— فلا تمار فيهم)। এখানে হজরতকে বলা হইতেছে ঃ— সত্য আল্লার নিকট হইতে সমাগত হইয়াছে, তাহাকে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া দেওয়া ও নিজে তাহার অনুসরণ করাই নবীর কাজ। তাহাকে জয়যুক্ত করার ভার আল্লার উপর, যাঁহার নিকট হইতে তাহা সমাগত হইয়াছে। আল্লার নির্দ্ধারিত এই সর্ব্বসমন্বয়ী কেবলার অনুসরণ না করিয়া, যাহারা উল্টা তোমার সহিত কলহ কোন্দল বাধাইতে আইসে, তাহাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া, তোমার পক্ষে উচিত নহে। হজরত‑রছুলে করিম হইতেছেন তাঁহার উম্মতের আদর্শ, সুতরাং উম্মতকেও সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে।

অষ্টাদশ রুকু'

১৪৮ এবং প্রত্যেকেরই এক একটা লক্ষ্য আছে-সে তাহার অভিমুখী হইবে, অতএব তোমরা (হে মুছলমানগণ !) সৎকর্ম্মে অগ্রবর্ত্তী হওয়ার চেষ্টা করিতে থাক ; তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান করিতে থাক না কেন- আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে (একত্র) সমবেত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয় সর্ব্বশক্তিমান।

١٤٨ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا ط إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১৪৯ আর তুমি যে কোন স্থান হইতে বাহির হও না কেন—মছজিদুল-হারামের দিকে নিজের মুখ ফিরাইবে ; এবং বস্তুতঃ ইহা তোমার প্রভুর নিকট হইতে (সমাগত) ধ্রুব সত্য, আর তোমাদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ উদাসীন নহেন।

١٤٩ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

১৫০ এবং (আবার বলিতেছি) তুমি যে কোন স্থান হইতে বাহির হও না কেন - নিজের মুখ মছজিদুল - হারামের দিকে

١٥٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ق إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ق فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ق وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ফিরাইবে ; আর তোমরাও (হে মুছলমানগণ !) যে কোন স্থানে অবস্থান কর না কেন- উহারই দিকে নিজেদের মুখ ফিরাইবে — যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকের কোনই যুক্তি না থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যকার অত্যাচারী যাহারা (তাহারা অবশ্য কিছুতেই নিরস্ত হইবে না), অতএব তাহাদিগকে তুমি ভয় করিও না-বরং ভয় করিও আমাকে — আর যেন তোমাদিগের প্রতি নিজের ন্যা'মৎ (প্রসাদ)কে আমি পূর্ণ পরিণত করিয়া দেই — আর যেন তোমরা লক্ষ্যে উপনীত হইয়া যাইতে পার।[১৮০]

১৫১ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

১৫১ যেমন — আমরা তোমাদিগের মধ্যে তোমাদিগের মধ্য হইতে সেই (বিশিষ্ট) রছুলকে প্রেরণ করিয়াছি - যিনি তোমাদিগের নিকট আমাদিগের আয়তগুলির আবৃত্তি করিতেছেন এবং (তদ্দ্বারা) তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন, এবং তোমাদিগকে কেতাব ও হেকমৎ শিক্ষা দিতেছেন, এবং তোমাদিগকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দিতেছেন -তোমরা যাহা অবগত হইতে সমর্থ ছিলে না।

১৫২ অতএব আমাকে স্মরণ করিতে থাক - আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার হুজুরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিও - আর (সাবধান !) আমার কৃতঘ্নতা করিও না।

١٥٢ فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ع

টীকা :—

১৩৭ সৎকর্ম্মে প্রতিযোগীতা :—

দুনয়্যার সকল ধর্ম্মসমাজের সকল কর্ম্ম ও সাধনার এক একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্যই তাহাদের জাতীয় জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। সেই লক্ষ্য যত ছোট ও যত নীচু হইবে, তাহাদের চলার পথও ততই নগণ্য ও সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে সেই লক্ষ্য যতই উচ্চ ও মহান হইবে, তাহাদের গতিপথও সেই পরিমাণে বিশাল ও মহৎ হইতে বাধ্য। পূর্ব্ব রুকর শেষ আয়তে কলহ-কোন্দল পরিত্যাগ করিয়া আল্লার নিকট হইতে সমাগত সত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরই এই আয়তে বলা হইতেছে যে, অন্য সমাজ বা অন্য জাতির গতিপথ সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন সার্থকতা তোমাদিগের নাই। সকলে নিজেদের ক্ষুদ্র লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মুছলমানের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য হইতেছে —উচ্চতম, বিশালতম ও মহত্তম। মহা নবীর পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত মুছলমান, জগতের একমাত্র নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ ও মধ্যস্থ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ধর্ম্মের নামকরণে নির্দ্ধারিত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীগুলিকে মুছিয়া ফেলিবে। তাহার সাধনার ফলে সকল মানুষ সকল কণ্ঠে বলিবে—এক ধর্ম্ম এক জাতি, সকলেই এক মানুষ আমরা, আর আমাদের সকলের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের সকল গতিপথের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছেন—আমাদের সকলের মালেক আল্লাহ। বিশ্বমানবকে এই সমন্বয় সাধনায় সাহায্য করার জন্যই আল্লাহ তাআলার মঙ্গলইচ্ছা মুছলমানকে এক মধ্যস্থ সাধক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে (১৪৩ আয়ত). এবং কা'বা ও কেবলা হইতেছে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটা উপলক্ষ্য।

এই মহান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প যাহার আছে—কথার কোন্দল পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 'খায়রাৎ' বা যাবতীয় সৎ ও মহৎ

কর্মের সাধনায় তাহাকে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে, চরিত্র মাহাত্ম্যে নিজকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই সে নিজের মোছলেম জীবনে আল্লার মঙ্গল-ইঙ্গিতকে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে। পক্ষান্তরে এদিক দিয়া যদি তাহাদের পতন হয়, তাহা হইলে শুধু নিজেদের কেবলার দোহাই দিয়া বড় হইয়া থাকা, অথবা নিজেদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়া মুছলমানের পক্ষে কথনই সম্ভবপর হইবে না।

১৩৮ **কেবলার উদ্দেশ্য** :—

জাতির সাধনাকে সফল করার জন্য তাহার যেমন একটা সাধারণ ও সমবেত লক্ষ্য থাকা দরকার, সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় সাধনার সফলতার ও স্থায়ীত্বের জন্য সেইরূপ একটা সাধন-কেন্দ্রেরও আবশ্যক। কেন্দ্র ব্যতীত জমাআৎ বা সঙ্ঘের অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা, আবার সঙ্ঘ ব্যতীত শক্তির কল্পনাও অসম্ভব। তাই কা'বাকে মোছলেম উম্মতের কেবলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন এই কা'বাকে অবলম্বন করিয়া তাহারা সর্ব্বদাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। বস্তুতঃ আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিচ্ছেদের এই চরম অবস্থাতেও, একমাত্র এই কা'বাই মুছলমানকে এক অখণ্ড জাতিরূপে আজিও ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাই এছলামের চরম আদেশ—কা'বার অনুসরণকারী ব্যক্তি ও জাতিদিগের মধ্যে কাহাকেও কাফের বলিতে নাই।

স্যর উইলিয়ম মুয়র, এই উপলক্ষে নিতান্ত অসম সাহসিকতার সহিত বলিতেছেন :— From this time ... Islam bounds itself up with the worship of Ka'ba. অর্থাৎ 'এই সময় হইতে এছলাম নিজকে কা'বার পূজা করিতে বাধ্য করিয়া লইল, (১০৯ পৃষ্ঠা)।' এই প্রকার অজ্ঞতার কথা সময় সময় অন্যান্য অমুছলমান লেখকদিগের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতা বা বিদ্বেষের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূজার জন্য কএকটা বস্তুর আবশ্যক হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, পূজ্য বস্তুতে কোন অসাধারণ ঐশিক শক্তি ও মহিমার কল্পনা করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, পূজাকারী মুখে পূজ্যবস্তুর সেই সব শক্তি ও মহিমার গুণকীর্ত্তন করিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, নিজের মনস্কামনাকে সফল করিয়া দেওয়ার জন্য সে পূজ্যবস্তুর নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এছলামের সমস্ত সাহিত্যের এবং মুছলমানের সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এমন একটি বর্ণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাদ্বারা ঘুণাক্ষরে ইহার কোন একটারও সামান্য সমর্থন হইতে পারে। মুছলমান কা'বার সম্মান করে—আল্লার এবাদতের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুনয়ার সর্ব্বপ্রথম মছজিদ বলিয়া, তওহীদের অন্যতম সাধক হজরত এবরাহিমের স্মৃতি বলিয়া, এবরাহিমের এছমাইলের মুছার ঈছার ও অন্যান্য নবীগণের আকুল প্রার্থনা ও মহীয়সী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশস্থল বলিয়া, বিশ্ব-মোছলেম জাতীয়তার একমাত্র শক্তিকেন্দ্র বলিয়া।

১৩৯ **আল্লাহ উদাসীন নহেন :—**

এই আয়তের প্রথম ভাগে হজরতের প্রতি কা'বাকে কেবলারূপে গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাঁহার উম্মত সেই আদর্শকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিবে-ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে এই কেবলার ও তাহার মূলীভূত শিক্ষার প্রতি মুছলমান সমাজ কিরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, আয়তের শেষভাগে তাহার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দুনয়ার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মুছলমান সব বিরোধ সব ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া এক অখণ্ড মহাসঙ্ঘরূপে কা'বার ছায়াতলে সমবেত হইয়া এক আল্লার এবাদত করিবে, ইহাই কেবলা প্রতিষ্ঠার প্রধানতম শিক্ষা। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই কা'বার মছজিদকে তাহারা সর্ব্বপ্রধান বিচ্ছেদকেন্দ্রে পরিণত করিয়া লইল—'মকামে-এবরাহিম'কে বর্জ্জন করিয়া নামাজের জন্য চারি মোছাল্লা ও চারি জমাআৎ কাএম হইয়া গেল! শুধু ইহাই নহে, ইহার প্রতিবাদ করাকেই তাহারা এছলামের চরম অবমাননা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের কথা আর কি হইতে পারে?

১৪০ **কেবলা গ্রহণের সুফল :—**

অধিকতর তাকিদের জন্য এই আয়তে আবার রছুল ও তাঁহার উম্মতকে এক সঙ্গে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—স্বদেশে প্রবাসে, সকল স্থানে সকল সময়, নিজেদের এই শক্তিকেন্দ্রের অভিমুখী হইবে। আয়তের শেষার্দ্ধে "যেন" বলিয়া এই কেবলা গ্রহণের তিনটী উদ্দেশ্যের কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। (১) এই কেবলা গ্রহণের পর, ন্যায় ও যুক্তির হিসাবে তোমাদিগের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিবে না। কারণ, (ক) ইহাই হইতেছে আল্লার এবাদতের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুনয়ার প্রথম মছজিদ। (খ) হজরত এবরাহিমের ও অন্যান্য নবীগণের প্রার্থনা ও ভবিষ্যদ্বাণী এই কেবলাতেই পূর্ণ ও সত্য হইয়া যাইতেছে। (গ) এছলামের প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র আরবের এহুদী, পৌত্তলিক, খৃষ্টান ও মুছলমান অর্থাৎ সকলেই হজরত এবরাহিমকে Patriarch বা কুলপতি বলিয়া এবং কা'বাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ধর্ম্মমন্দির বলিয়া স্বীকার করে। (২) তোমরা এই কেবলা গ্রহণের শিক্ষাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিলে আল্লাহ তাঁহার ন্যা'মৎ বা প্রসাদকে তোমাদিগের প্রতি পূর্ণপরিণত করিয়া দিবেন। নবুঅৎ ও রাজত্ব হইতেছে মানুষের প্রতি আল্লার প্রধান ন্যা'মৎ (৫০ টীকা দেখ)। (৩) পূর্ব্ব রুকু'গুলিতে মুছলমানের যে সাধনা ও লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হইতেছে—তোমরা কা'বাকে অবলম্বন করার ফলে, মোছলেমজীবনের সেই সাধনার মধ্য দিয়া নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবা।

১৪১ **যেমন … রছুল প্রেরণ করিয়াছি :—**

আল্লার প্রধান ন্যা'মৎ দুইটী—নবুঅৎ ও রাজত্ব। এই ন্যা'মতের পূর্ণতার সহিত মানুষের দিন দুনয়ার সব মঙ্গলই পূর্ণ হইয়া যায়। কেবলাকে অবলম্বন করিলে মুছলমানের উপর আল্লার এই ন্যা'মতই পূর্ণ পরিণত হইয়া যাইবে। যে রছুলকে আল্লাহ মুছলমানদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাতে নবুঅতের ন্যা'মৎ চরম ও পরমরূপে পূর্ণ হইয়া যাইবে। কা'বাকে জাতীয় জীবনের সম্মিলনকেন্দ্র ও কেবলারূপে গ্রহণ করিলে আল্লার দ্বিতীয় ন্যা'মতটীর অধিকারীও তাহারা হইতে পারিবে। হইয়াছিলও তাহাই। এই শক্তিকেন্দ্রকে ভুলিয়া গিয়াই বিশ্বমোছলেম জাতীয়তার মেরুদণ্ড আজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আবার যদি তাহারা আল্লার প্রতিষ্ঠিত এই مثابة বা সম্মিলনকেন্দ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের অতীত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

১৪২ **জেক্‌র্—শোক্‌র্ :—**

মূলে 'জেক্‌র' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। বাচনিক ও মানসিক উভয় প্রকারে আল্লার মহিমা স্মরণ করাকে 'জেক্‌র' বলা হয়। ইহাই হইতেছে মানসিক শান্তি লাভের পরম উপকরণ। 'মোনাফেকীন'-ছুরায় মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—

يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم و لا اولادكم عن ذكر الله -

—"হে মো'মেনগণ! তোমাদিগের ধনসম্পদ আর তোমাদিগের সন্তান সন্ততিগুলি যেন তোমাদিগকে আল্লার জেক্‌র হইতে সম্মোহিত করিয়া রাখিতে না পারে।" ছুরা রা'আদে বর্ণিত হইয়াছে— الا بذكر الله تطمئن القلوب

—"জানিয়া রাখ, আল্লার স্মরণেই অন্তরাত্মা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে।"

জাতির কথা, তাহাদের শিক্ষা ও সাধনার কথা, তাহাদের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা এবং তাহাদের নিকট প্রেরিত নবীর পরিচয় বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পর, এখান হইতে মোছলেম-জীবনের কএকটী বিশিষ্ট সাধনার কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। সেগুলি ছিল জাতীয় জীবনের বর্জ্জনীয় বিষয়, কারণ সেই দোষগুলিকে অর্জ্জন করাতেই জাতির হিসাবে তাহাদের পতন হইয়াছিল। অতঃপর মুছলমানকে তাহার অর্জ্জনীয় গুণগুলির কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। সুস্থ ও সবল দেহের জন্য মারাত্মক কুপথ্যগুলির বর্জ্জন যেমন দরকার, পুষ্টিকর সুপথ্য গ্রহণ করাও তদ্রূপ আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে জেকেরের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর আল্লার হুজুরে 'শোক্‌র' করিতে আদেশ করা হইয়াছে। 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ'—'শোক্‌র'-শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ নহে। আল্লার ন্যা'মতগুলির 'শোক্‌র' করিবে, ইহার পূর্ণ অর্থ—সেই ন্যা'মৎ ও সম্পদগুলি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মনে মুখে তাঁহার সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই

ন্যা'মতগুলির সদ্ব্যবহার করিবে। তাহার অপব্যবহার করিলে অথবা ব্যবহার না করিয়া সেগুলিকে পণ্ড করিয়া দিলে. তাঁহার দানের 'কোফরান' বা কৃতঘ্নতা করা হয়। কোর্‌আনে অন্যত্র বলা হইয়াছে—

ولئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد ـ ٠

—"যদি তোমরা 'শোক্‌র-গোজার' হও-তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আরও অধিক ন্যা'মত দান করিতে থাকিব, পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতঘ্নতা করিতে থাক, তবে (জানিয়া রাখ) আমার দণ্ড নিশ্চয় খুবই কঠিন।" (ছূরা এবরাহিম)। হজরত রছূলে করিম প্রত্যেক নামাজের পর দোওয়া করিতেন—

اللهم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ـ

—"হে আল্লাহ! তোমার জেক্‌র করিতে, তোমার শোক্‌র করিতে এবং তোমার যথাযথ এবাদৎ করিতে আমাকে সাহায্য কর!" (বোখারী. মোছলেম প্রভৃতি)। আল্লাহকে কথায় কাজে ও অন্তরে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ন্যা'মতগুলির সদ্ব্যবহার করিতে থাকিলে, তোমার মোছলেমজীবনের সাধনাগুলি সিদ্ধ করিতে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিতে থাকিবেন—'আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব'—পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

উনবিংশ রুকু'

১৫৩ হে মো'মেনগণ ! তোমরা ধৈর্য্য ও প্রার্থনা দ্বারা শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে থাকিও, নিশ্চয় ধৈর্য্যশীলদিগের সাথী হইতেছেন আল্লাহ্।[১৭৩]

١٥٣ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৫৪ এবং 'আল্লার পথে, নিহত হয় যাহারা-তাহাদিগকে মৃত বলিয়া আখ্যাত করিও না। না-না, তাহারা জীবিত, তবে তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।[১৭৪]

١٥٤ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

১৫৫ আর নিশ্চিত (জানিয়া রাখ) —কথঞ্চিত ভীতি দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা, এবং অর্থহানি, প্রাণহানি ও শস্যহানিদ্বারা আমরা তোমাদিগকে অবশ্য পরীক্ষা করিব।[১৭৫] এবং সেই সব ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে সুসংবাদ দান কর—

١٥٥ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৫৬ —নিজেদের উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে, যাহারা বলিয়া

١٥٦ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ

قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

থাকে ঃ—বস্তুতঃ আমরা সকলেই ত আল্লার আর নিশ্চয় আমরা সকলেই ত তাঁহারই পানে ফিরিয়া যাইব।[১৫৬]

১৫৭ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

১৫৭ তাহারাই (হইতেছে আদর্শ মুছলমান), তাহাদের প্রতি-তাহাদিগের প্রভুর নিকট হইতে অনন্ত আশীর্ব্বাদ ও (অনন্ত) করুণা এবং প্রকৃত 'হেদায়ত' ইহারাই প্রাপ্ত হইয়াছে।[১৫৭]

১৫৮ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝

১৫৮ নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' হইতেছে আল্লার (মনোনীত) নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি (কা'বা-) গৃহের হজ অথবা ওমরা সম্পাদন করে -তাহার পক্ষে এই দুয়ের মধ্যে গমনাগমন করাতে কোন পাপ বর্ত্তায় না, আর কেহ যদি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন সৎকর্ম্ম সম্পাদন করে তবে (তাহা ব্যর্থ যাইবে না, কারণ) আল্লাহ্ হইতেছেন কদর্‌দান সর্ব্বজ্ঞ।[১৫৮]

১৫৯ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ

১৫৯ যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়ত আমরা প্রকাশ করিয়াছি-সেগুলিকে লোকসমাজের মঙ্গলের জন্য কেতাবে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দিবার পরও

مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ

তাহা গোপন করিয়া রাখিতে চায় যাহারা[১২৯] — তাহাদিগকেই আল্লাহ্ লা'নৎ করেন আর সমস্ত লা'নৎকারী তাহাদিগকে লা'নৎ করিয়া থাকে।

১৬০ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১৬০ তবে অনুতপ্ত হয় যাহারা এবং (আত্ম-) সংশোধন করে যাহারা এবং(সত্যকে) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেয় যাহারা[১৩০] — আমি তাহাদিগের অনুতাপ গ্রহণ করিব—আর আমিই হইতেছি অনুতাপগ্রহণকারী কৃপানিধান.

১৬১ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ

১৬১ নিশ্চয় যাহারা (সত্যকে) অমান্য করে এবং অমান্যকারী-অবস্থা-তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটে— সেই ত তাহারা - যাহাদিগের উপর আল্লার ও ফেরেশ্‌তাগণের ও সকল মানবের লা'নৎ[১৩১]!

১৬২ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

১৬২ তাহাতে তাহারা চিরস্থায়ী— তাহাদিগের দণ্ডহ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবসর প্রদান করা হইবে না।

১৬৩ আর তোমাদিগের ঈশ্বর হইতেছেন-এক ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর নাই-করুণাময় কৃপানিধান (তিনি)।

টীকা :—

১৪৩ ধৈর্য্য ও প্রার্থনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় :—

পূর্ব্বের রুকু'গুলিতে মুছলমানকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার নিজের প্রতি, বিশ্বমোছলেমের প্রতি ও বিশ্বমানবের প্রতি কি গুরুতর কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে। এই রুকু'তে বলা হইতেছে যে, সে মহীয়সী সাধনাকে সিদ্ধ করিতে হইলে মুছলমানকে কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কেবল মুখের কথা বা খোশ্‌খেয়ালের দাবীতে মোছলেম জীবনের সে সাধনা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রথম আবশ্যক হয় 'ছবর' বা ধৈর্য্যশীলতা গুণের। কর্ম্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহাতে বিচলিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইবার চেষ্টার নামই 'ছবর'। আমি কোন কাজ করিব না, কোন সাধনা ও পরীক্ষার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করিব না, তাহার পর নিজের এই কর্ম্ম বিমুখতার ফলে যে দৈন্য দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, কাপুরুষের মত চুপ করিয়া তাহা বহন করিয়া যাইব আর মনে করিব, ছবর করিয়া অশেষ পুণ্যের ভাগী হইতেছি—বস্তুতঃ কোর্‌আনের বর্ণিত ছবর ইহা কখনই নহে, বরং ইহাই হইতেছে মানবজীবনের আসল লা'নৎ।

কিন্তু মানুষের মন নানা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সব সময় দুর্ব্বলতার হাত এড়াইতে পারে না। তাই এই আয়তে মুছলমানকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তুমি নিজের জীবন-সাধনায় এই অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিবে—শক্তির মূল আধার আল্লাহ হইতে। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার অবিচলিত সঙ্কল্প লইয়া, সেই সঙ্কল্পকে সার্থক করার জন্য তুমি তাঁহার হুজুরে প্রার্থনা করিতে থাকিবে। তাহা হইলে তিনিই আসিয়া তোমার এ যাত্রাপথের সাথী হইবেন (৪৫ আয়তের টীকা দেখ)।

১৪৪ চিরজীবী শহীদ :—

আল্লার পথ-অর্থে, আল্লার নির্দ্ধারিত ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ, কর্ত্তব্যের পথ। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় সাধারণতঃ ইহা জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়তে বলা হইতেছে যে, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা হইতেছে কর্ত্তব্য পালনে, সত্যের সেবায়।

সুতরাং ইহার জন্য জীবনদান করিল যে সাধক, তাহার জীবন নষ্ট হইল না—সার্থক হইল। তাহার এই আত্মদানের মঙ্গল আদর্শ চিরজীবন্ত চিরজাগ্রত থাকিয়া কোটী কোটী মানব-প্রাণকে যুগে যুগে কর্তব্যের কোর্‌বানগাহে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকিবে। এমন ভাবে আত্মদান করিয়া যায় যে শহীদ, তাহাকে মৃত বলিতে নাই, বরং নিজের সাধনা ও কীর্তির মধ্য দিয়া সে জীবিত হইয়া আছে। কিন্তু নানা মায়ামোহে আত্মবিস্মৃত মানব ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না—বুঝিয়া লইতে চাহে না। পক্ষান্তরে শহীদের শোণিত তর্পণকে উপলক্ষ করিয়া, ব্যক্তির মরণ বরণকে সম্বল করিয়াই তাহাদের জাতি দুন্‌য়াতে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে।

আয়তে এই পরীক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রধানতম হইতেছে—প্রাণহানি। মোছলেম সাধক সত্যের প্রতিষ্ঠা বা মিথ্যার প্রতিবাদের জন্য দণ্ডায়মান হইল, আর শয়তানের খড়্গ আসিয়া তাহার নশ্বর দেহটাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। সাধক তখন শহীদরূপে আত্মদান করিয়া অবিচলিত চিত্তে শয়তানের খড়্গকে জয় করিয়া লইবে, ব্যর্থ করিয়া দিবে। দুন্‌য়ার সব সত্যকে, সকল জ্ঞানকে এইরূপে ঘাতকের তরবারী-ছায়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। মুছলমান যদি প্রথম হইতে তরবারীকে খোদার ন্যায় ভয় করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে মোছলেমজীবনের কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা তাহার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে না। মোছলেমভারতের সাধকশিরোমণি মির্জা মজহরে জানে-জানাঁ তাই ঘাতকের খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হৃৎপিণ্ডকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, আনন্দে গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিয়াছিলেন—

بنا کردند خوش رسمے بخون و خاک غلطیدن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

১৪৫ পরীক্ষার স্বরূপ :—

আল্লার পথে মোছলেমসাধকের সম্মুখে পরীক্ষার বিভীষিকা উপস্থিত হওয়া সুনিশ্চিত। এই জন্য তাকিদের 'লাম' ও 'নূন' উভয় বর্ণই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত, কেবল মুখের দাবীতে আল্লার নিকট মুছলমান বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না—এই সত্যকে কোর্‌আন মুছলমান সাধকের মনে পুনঃপুনঃ জাগরুক করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে (২৯ ছুরা ১-২ আয়ত, প্রভৃতি)।

পরীক্ষার প্রথম উপকরণ হইতেছে—ভয়। আত্মসত্যে সম্পূর্ণ আস্থা না থাকায় এবং নিজকে কার্যতঃ ফলাফলের মালেক মনে করিয়া লওয়ায়, জেহাদের নামে মানুষের মনপ্রাণ নানাবিধ বিপদের কল্পনায় শিহরিয়া উঠে। এই অবস্থায় কর্তব্য হইতে স্খলিত হওয়া আর মুছলমানের খাতা হইতে নিজের নাম কাটাইয়া লওয়া একই কথা। কারণ, কোর্‌আনেই

বলিয়া দেওয়া হইতেছে :— বিশ্বমানবের নিকট আল্লার পয়গামগুলি পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাদের সাধনা, তাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকে و لا يخشون احدا الا الله এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও তাহারা ভয় করে না (ছুরা আহজাব ৩৯)। ফলে তাওহীদের শিক্ষা অনুসারে, যেখানে কোন ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় বা ভাব আল্লার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যপথ হইতে তোমাকে বারিত করিয়া রাখে, সেখানে তুমি কার্য্যতঃ আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া সেই ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় বা ভাবকেই নিজের কর্ম্ম ও ভাবের নিয়ন্ত্রতা বলিয়া, খোদা বলিয়া, গ্রহণ করিয়া লও। ভয় দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিব—অর্থাৎ সে সময় যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়, আর যাহারা আল্লার ভয় ত্যাগ করিয়া ও গায়রুল্লার ভয়ে ভীত হইয়া সে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়—সেই দুই দলকে পৃথক করিয়া দিব। ('পরীক্ষা' শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ১১২ টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

ক্ষুধা-অর্থে খাদ্যের অভাব, রুজীর অভাবকে বুঝাইতেছে। অনেক সময় মানুষ জানিয়া শুনিয়াও সত্যকথা প্রকাশ করিতে এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে—কেবল পেটের দায়ে। অনেক বড় বড় উপাধিধারী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমকে, এছলামের ঘোর বিপদের সময় কেবল চাকরীর খাতিরে এবং নিজেদের "রুজীর মালিক"গণকে সন্তুষ্ট করার আশায়, ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ফৎওয়া প্রকাশ করিতে, কোর্‌আনের অর্থ বিপর্য্যয় ঘটাইতে দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এই দুর্ব্বলতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কিন্তু এখানে কোর্‌আন স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে—সত্যকার মুছলমান যে, এই পেটের দায় ও রুজীর ভয় তাহাকে মোছলেমজীবনের সাধনা হইতে কখনই স্খলিত করিতে পারে না।

এইরূপে আয়তের শেষভাগে ধনজনের ক্ষতির কথা বলা হইয়াছে। জেহাদে লিপ্ত হওয়ার ফলে এই ধনজনের প্রচুর ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। জাকাত ও ওশর প্রভৃতি প্রদান করিতেও অনেক ধনের ক্ষতি হইয়া থাকে। ثمرة শব্দের অর্থ ফলশস্য, ভাবার্থে সন্তান-সন্ততির জন্যও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। এমাম শাফেয়ী, শাহ আবদুল আজিজ প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—ধন বলিতে ফলশস্যকেও বুঝায়, ধনের কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। সুতরাং আবার ثمرة শব্দের ফলশস্য অর্থ গ্রহণ করিলে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। অতএব এখানে উহার অর্থ—সন্তান সন্ততি (ফৎহুল বয়ান ১—২০৫, আজিজী ১—৩৮৪ প্রভৃতি)। অর্থাৎ শয়তানের সহিত সত্যের এই যে সংঘর্ষ, মুছলমান হইবে তাহার সৈনিক, এবং সে জন্য তাহাকে যেমন সর্ব্বদাই আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, সেইরূপ এই পরীক্ষার আহবে তাহাকে অনেক সময় বিসর্জ্জন দিতে হইবে তাহার ধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বজনগণকে, প্রাণাধিক সন্তানগুলিকে। এইরূপে সত্যের জন্য আল্লার নামে নিজের যথা-সর্ব্বস্বকে বিসর্জ্জন দিতে পারে যে, সেই হইবে পরীক্ষায় পাস করা সত্যকার মুছলমান। ছাহাবাগণের জীবনইতিহাসের প্রত্যেক স্তরে আত্মবিসর্জ্জনের এই স্বর্গীয় আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া

আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যেখানে লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, 'বান্দা' সেখানে সাধকের কর্ম্মপথকে কখনই অধিকার করিয়া বসিতে পারে না।

آں کس کہ ترا بخواست جاں را چہ کند　　فرزند و عیال و خانماں را چہ کند ؟
دیوانہ کنی، ہر دو جہانش بخشی　　دیوانۂ تو ہر دو جہاں را چہ کند ؟

১৪৬ **'ইন্না-লিল্লাহে' বলা** :—

কোন বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে ছাবের বান্দাগণ, ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন বলিবে—আয়তে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার গুণ ও মহিমা বহু ছহি হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত রছুলে করিম ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহার সমান মূল্যবান বিষয় ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই (ফৎহুল বয়ান ১—২০৬)। বিপদ আপদের সময় মুছলমানেরা সাধারণতঃ এই ইন্না-লিল্লাহে পদটীর আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু অশেষ পরিতাপের কথা এই যে, অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায়, ইহার মূল শিক্ষা ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় না। তাই এই অপূর্ব্ব অনুপম ন্যা'মৎটী ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

এখানে 'লিল্লাহে' শব্দের প্রথমে যে লাম বর্ণ আছে, আরবীতে তাহাকে লামে-তাম্‌লিক বলা হয়, উহা অধিকার ও স্বামিত্ব অর্থব্যঞ্জক। অতএব "ইন্না-লিল্লাহে—" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য :—আমাদের সকলের অধিকারী ও মালেক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং মালেকের ইচ্ছায় কাজ হইবে, দাসের ইচ্ছার কোন স্থান সেখানে নাই। আমাদের সকলের এবং আমাদের যথাসর্ব্বস্বের একমাত্র মালেক যে মঙ্গলময় জ্ঞানময় আল্লাহ, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় সানন্দচিত্তে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

শেষভাগে বলা হইতেছে :—'অ ইন্না এলায়হে রাজেউন', অর্থাৎ আমরাও ত তাঁহারই পানে ফিরিয়া যাইব। অর্থাৎ যে মৃত বা নিহত বান্দার জন্য আমরা দুঃখে ম্রিয়মান ও শোকে অধীর হইয়া পড়িতেছি, সে ত সেই করুণাসিন্ধুর কাছেই গিয়াছে—সমস্ত সৃষ্টি যার কুদ্‌রত ও করুণার একটা সামান্য বিন্দুমাত্র। অতএব তাহার জন্য ম্রিয়মান হওয়ার বা শোক করার কোনই কারণ নাই। অধিকন্তু তাহার সহিত আমাদের এ বিচ্ছেদ ত চিরবিচ্ছেদ নহে। জীবন যবনিকা ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ত তাঁহারই পানে ফিরিয়া যাইব। "ফিরিয়া যাইব"—অর্থাৎ মূলে আমরা আসিয়াছি সেখান হইতে, তাহাই আমাদের আদি নিবাস-শান্তিনিবাস। সেখানে যে ফিরিয়া যায়, তাহার জন্য অধীর হইয়া কর্ত্তব্য-বিস্মৃত হওয়া জ্ঞানী মানুষের পক্ষে উচিত নহে।

১৪৭ **ধৈর্য্যশীলতার পুরস্কার** :—

১৫৩ হইতে ১৫৬ আয়ত পর্য্যন্ত ছবর বা ধৈর্য্যশীলতার যে পরীক্ষার বিষয় বলা হইয়াছে এই আয়তে তাহার পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হইতেছে। আল্লার অনন্ত করুণা ও অনন্ত

আশীর্ব্বাদ লাভ করার অধিকারী একমাত্র তাহারাই এবং প্রকৃত হেদায়তপ্রাপ্ত তাহারাই। অর্থাৎ সত্যের সেবায় কর্ম্মক্ষেত্রে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়ে যাহারা, প্রাণের ক্ষতি, ধনজনের ক্ষতির আশঙ্কায় ভীত ও বিচলিত হইয়া মোছলেমজীবনের প্রকৃত সাধনাকে বর্জ্জন করিয়া বসে যাহারা, আল্লার আশীর্ব্বাদ লাভের সম্ভাবনা তাহাদের নাই, অধিকন্তু প্রকৃত হেদায়ত হইতে তাহারা বহুদূরে অবস্থিত।

যে কাজে পরীক্ষার আঁচ নাই, যেখানে ধনজনের ক্ষতির আশঙ্কা নাই, সেখানে জাতীয়তা ও ধার্ম্মিকতার আস্ফালন করা খুবই সহজ। তাই কপট মোনাফেকের দলও এরূপ ক্ষেত্রে নিজদিগকে মুছলমানরূপে প্রকাশ করিতে, পরহেজগারীর স্পর্দ্ধা দ্বারা জাতির চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিতে সর্ব্বদাই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু জাতির ও ধর্ম্মের জন্য যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন প্রকার আশঙ্কা আছে, সেখানে তাহারা মছলেহৎ ও দূরদর্শিতার শয়তানী দর্শন আওড়াইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া যায়—জাতির অন্যান্য ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত সম্মোহিত ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা পাইতে থাকে। এই কারণে জাতির মঙ্গলের জন্য সকলের সম্মুখে ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়ারও আবশ্যক হইয়া থাকে। কোর্‌আনে পুনঃপুনঃ ইহাকেই পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, (৩য় ছুরা ১৩৪-৩৫, ১৪৮, ১৬০ আয়ত, ইত্যাদি)।

১৪৮ **ছাফা ও মার্‌ওয়া :—**

বায়তুল্লাহ বা কা'বা-গৃহের নিকটবর্ত্তী দুইটী পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাম ছাফা ও মারওয়া। ইহারই তলভূমির নাম ওয়াদী-এবরাহিম এবং এই তলভূমিতেই কা'বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং হজরত এবরাহিম ও হজরত এছমাইলের সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির স্মৃতি এই পর্ব্বত দুইটীর সহিত জড়ীভূত হইয়া আছে। হজ বা ওমরাও হইতেছে এই প্রাতস্মরণীয় পিতাপুত্রের সন্তানবলিদানের ও আত্মবলিদানের একটা স্মৃতিসাধনা। অতএব এ সময় যদি কেহ ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যে গমনাগমন করিয়া নিজের মধ্যে তাঁহাদের আদর্শকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে চায়, তাহাতে কোন দোষ নাই।

এছলামের পূর্ব্বে আরবের পৌত্তলিকদিগের মধ্যে ছাফা ও মারওয়ার তওয়াফ করা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। একদল লোক ঐ দুই পাহাড়ে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বোৎগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তওয়াফ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিত। মদিনার লোকেরা তাহাদের মানাৎ নামক বিগ্রহের প্রতি সম্মানের জন্য এহরামের অবস্থায় ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করাকে অসঙ্গত বলিয়া মনে করিত। এছলামের পর মুছলমানেরা মনে করিতে লাগিলেন—এই ছাফা মারওয়ার তাওয়াফ পৌত্তলিকতার একটা স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল মতভেদের নিরাকরণ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই তাওয়াফকে দোষের কথা মনে করা ভুল। এই তাওয়াফ ওয়াজেব হওয়া

না হওয়া সম্বন্ধে এমামদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ এমাম ও অধিকাংশ প্রমাণ ওয়াজেব হওয়ার অনুকূলে বলিয়া মনে হয়। মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়শা ব্যাকরণের দিক দিয়া ইহার যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। এ সম্বন্ধে একত্রে সমস্ত হাদিছ, তফছির দোর্‌রুল-মনছুর ১—১৫৯-৬১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এমামগণের মতভেদের বিচারের জন্য তফছির কবির ২—৬৫, ৬৬ এবং বিভিন্ন মতের ফেকার কেতাবগুলি দ্রষ্টব্য।

ছুরা বকরার ২৪ রুকু'তে জেহাদের ও হজের আয়তগুলিকে একসঙ্গে পরস্পর সংমিশ্রিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানেও শাহাদত ও ঈমানের অনল পরীক্ষার বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে, বাহ্যতঃ অসংলগ্নভাবে, সেইরূপ হজ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এ দু'য়ের শিক্ষার ও সাধনার মধ্যে একটা গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। হজের সঙ্গে জেহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ত কা'বাকে কেন্দ্র করিয়া মোছলেম জাহানের এই সাম্বৎসরিক সম্মিলনের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ আলোচ্য আয়তটী আদৌ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বর্ণিত হয় নাই। উপরের আয়তগুলিতে আছে পরীক্ষায় ধৈর্য্যধারণের আর আল্লার পথে নিজকে কোর্‌বান করিয়া দেওয়ার উপদেশ, আর এই আয়তে উপস্থাপিত করা হইতেছে তাহার মহত্তম আদর্শ।

১৪৯ সত্যকে গোপন করা ঃ—

আল্লাহ তাঁহার কেতাবে যে সকল সত্য বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন, তাহা গোপন করা ব্যক্তির জীবনে মহাপাপ এবং জাতির জীবনে চরম অভিশাপ। পণ্ডিতেরা এই সকল সত্যকে গোপন করিতে চান—বিপদ আপদের ভয়ে ভীত হইয়া। এ ক্ষেত্রে যে সব ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহারা করিয়া থাকেন, তাহা উপরের আয়তগুলিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "যে অবস্থায় ও যে সময় জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য আল্লার কেতাবের যে হুকুমটী প্রকাশ করার দরকার, তাহা প্রকাশ না করার নামই কেৎমান বা গোপন করা।" (কবির ২—৬৮)। এই সত্য গোপনরূপ কাপুরুষতার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে—আল্লার অভিশাপ। আল্লার ন্যায়বিধান ঐ প্রকার কর্ম্মের জন্য ঐ প্রকার ফল নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে বলিয়া উহা আল্লার অভিশাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পার্থিব জীবন সম্বন্ধে 'আল্লার লা'নৎ'-পদের ব্যবহার হইলে উহার অর্থ হইবে ঃ—

انقطاع من قبول رحمته و توفيقه -

—আল্লার করুণা ও তাঁহার সাহায্য লাভের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হওয়া (রাগেব)। অভিশাপ বা curse ইহার ঠিক অনুবাদ নহে, সেই জন্য আমি মূল লা'নৎ শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

আয়তের শেষভাবে বর্ণিত "সমস্ত লানৎকারী"-পদে ফেরেশ্‌তা ও মানবকে বুঝাইতেছে, ১৬১ আয়তে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১৫০ তওবার স্বরূপ ঃ—

তাওবা বা অনুতাপ কেবল মুখের কথায় সম্পন্ন হয় না। এজন্য অন্তরে সত্যকার অনুতাপ হওয়া চাই, যে সব পাপের জন্য অনুতাপ সে সম্বন্ধে নিজকে সংশোধন করিয়া লওয়া চাই, যে কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য অনুতাপ-পুনরায় তাহা পালন করা চাই।

১৫১ খালেদীন—চিরস্থায়ী দণ্ড ঃ—

আল্লাহ মানুষকে তাহার দীর্ঘজীবন ধরিয়া তওবার সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ সুযোগকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা আজীবন আল্লার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যগুলিকে অমান্য করিয়া চলিবে, এই জীবনের চিরস্থায়ী বিদ্রোহের জন্য পরজীবনে চিরস্থায়ী দণ্ড তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। 'খালেদীন'-খলুদ হইতে সম্পন্ন, বাংলায় 'চির' বলিতে যাহা বুঝায়, খলুদের ঠিক তাৎপর্য্য তাহাই।

মূলতঃ এহুদীদিগের প্রসঙ্গে এই অভিশাপের কথা বলা হইয়াছে। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণে এই অভিশাপের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সদাপ্রভু বলিতেছেন ঃ—"কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর ··· সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি আদেশ ··· পালন না কর, তবে এই সমস্ত অভিশাপ ··· তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে শাপগ্রস্ত হইবে ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবে। তোমার চুপড়ি ও ময়দার কাঠুয়া শাপগ্রস্ত হইবে, তোমার ভূমির ফল, তোমার গরুর বৎস ও তোমার মেষীদের শাবক শাপগ্রস্ত হইবে। ভিতরে আসিবার সময় তুমি শাপগ্রস্ত ও বাহিরে যাইবার সময় তুমি শাপগ্রস্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তোমার সংহার ও হঠাৎ বিনাশ না হয়, তাবৎ ··· সদাপ্রভু তোমার উপরে অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন। (১৫ হইতে ২০ পদ)।

১৫২ তাওহীদ ঃ—

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আগমনের উদ্দেশ্য ১৫১ আয়তে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার অনুসরণ করিতে হইলে মুছলমানকে প্রথম হইতেই ধৈর্য্যশীল হইয়া, সকল প্রকার ক্ষতি ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতে হইবে। এই আয়তে ও ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় আয়তে সেই আল্লার রছুলের মারফতে প্রেরিত পয়গামগুলির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

এছলামের প্রধান শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে—তাওহীদ বা একত্ববাদ। এছলামের আবির্ভাবের সময় দুনয়ার পুথিপুস্তকে স্থানে স্থানে একত্ববাদের প্রমাণ বিদ্যমান

থাকিলেও, বিশ্বমানব বাস্তব ক্ষেত্রে সে একত্ববাদকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া বা মারাত্মকরূপে বিকৃত করিয়া সৃষ্টি আর সৃজনকর্ত্তার ব্যবধানকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছিল। "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান আছেন, সকল শক্তির পূর্ণতম ও একমাত্র আকররূপে বিরাজমান আছেন। তাঁহার জাত বা স্বত্বার শরিক যেমন অন্য কেহ নাই এবং অন্য কেহ হইতে পারে না, সেইরূপ তাঁহার ছেফাত বা ঐশিক গুণের শরিকও অন্য কেহ নাই এবং হইতে পারে না। তিনি ছামাদ অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ ও বেনায়াজ, সুতরাং সৃষ্টিতে আর সৃষ্টিকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করাতে প্রকৃতি Soul, Matter বা অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী তিনি নহেন। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের এবং আলোক ও আঁধার প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর একমাত্র মালেক তিনি, তাহার জন্য অন্য কোন কর্ত্তা নাই। মানব যেমন কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরত্বের একটু সামান্য অংশও প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই প্রকার অবতাররূপে মানব আকারে আত্মপ্রকাশও তিনি কখন করেন না। বিশ্বজগতের এক তিলার্দ্ধ পরিমাণ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাই। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে কোন প্রকারে ঐ প্রকার ক্ষতি বা উপকার করার অধিকারী বলিয়া মনে করিলে তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করা হয়। আল্লাহকে এক, অদ্বিতীয় ও সকল শক্তির একমাত্র আকর বলিয়া স্বীকার করিয়াও মানুষ কোন মঙ্গলকে লাভ করার অথবা কোন অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ঠাকুর দেবতা এবং পীর ও আওলিয়ার শরণ গ্রহণ করে, তাহাদের সুপারিস লইয়া আল্লার হুজুরে উপস্থিত হইবার বাহানায়। কোর্‌আনে পুনঃ পুনঃ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে—স্বর্গ মর্ত্তের কোন ব্যাপারই আল্লার অগোচর নহে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। কোন কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁর সুপারিসের দরকার হয় মনে করিলে, তাঁর এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ও করুণাময় গুণকে অস্বীকার করা হয়, সুতরাং ইহাও তাওহীদের বিপরীত শিক্ষা।

বিংশ রুকু'

—০০০—

১৬৪ নিশ্চয় গগনমণ্ডলের ও পৃথীবির স্বজনে—এবং রজনীর ও দিবসের আবর্ত্তনে — এবং পোত সমূহে—মানুষের হিতার্থে যাহা সাগরজলে বহিয়া যায় — এবং মেঘপুঞ্জ হইতে আল্লাহ্ যে বারিধারা অবতীর্ণ করেন, পরে তাহাদ্বারা পৃথিবীকে তাহার মৃত্যুর পর (যেরূপে) পুনর্জীবিত করেন, এবং সেখানে সকল প্রকার জীবজন্তুকে (যেরূপে) সম্প্রসারিত করেন-তাঁহাতে, এবং বায়ুরাশির গতি পরিবর্ত্তনে, আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ বশীকৃত জলদপুঞ্জে—জ্ঞানবান সমাজের জন্য অসংখ্য নিদর্শন (নিহিত) রহিয়াছে[১২৩]।

١٦٤ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ص وَ تَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

১৬৫ অথচ একশ্রেণীর লোক আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে (তাঁহার) 'শরীক ও প্রতিদ্বন্দ্বী'রূপে গ্রহণ করে = আল্লাহ্‌কে যেরূপ প্রেম

١٦٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

করা উচিত তাহারা সেইরূপ প্রেম উহাদিগকে করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লার প্রেম সম্বন্ধে দৃঢ়তর তাহারাই। আর অত্যাচারীর দল যখন (আল্লার) দণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে, তখন যদি তাহারা ভাবিয়া দেখে (তাহা হইলে বুঝিতে পারে) যে, শক্তি সমস্তই আল্লার অধিকারভুক্ত, আর (ইহাও বুঝিতে পারিত) যে, আল্লাহ্ (অত্যাচারীদিগের প্রতি) কঠোর দণ্ডদাতা।

١٦٦ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○

১৬৬ যাহাদিগের অনুসরণ করা হয় -তাহারা যখন অনুসরণকারীদিগের (কৃতকার্য্যের) সহিত নিজেদের সম্বন্ধসংশ্রব অস্বীকার করিবে, আর দণ্ডকে তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, এবং তাহাদের সমস্ত (যোগ-) সূত্র যখন ছিন্ন হইয়া যাইবে।

١٦٧ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا

১৬৭ -আর অনুসরণকারীরা বলিবে:—হায়! একটীবার ফিরিয়া যাওয়া যদি আমাদের পক্ষে (সম্ভব) হইত, তাহা হইলে

كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ط ذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخٰرِجِينَ مِنَ النَّارِ ع

আমরাও উহাদের সংশ্রবমুক্ত হইতাম যেমন করিয়া উহারা (আজ) আমাদের সহিত নিজেদের সংশ্রব অস্বীকার করিল; এই প্রকারে আল্লাহ্ তাহাদিগের কর্ম্মগুলিকে গভীর মনস্তাপরূপে তাহাদিগকে প্রদর্শন করাইয়া থাকেন; (সেই) অগ্নি হইতে তাহারা বহির্গত হইতে পারিবে না।

টীকা:—

১৫৩ সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্ত্তার নিদর্শন:—

পূর্ব্ব আয়তে আল্লার একত্ববাদ বর্ণনা করিয়া দিবার পর এই আয়তে বলা হইতেছে যে, আল্লার এই বিশাল সৃষ্টি, সৃষ্টির এই অনন্ত বৈচিত্র্য এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা নিয়মের শাসন—এ সমস্তই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে যে, এই সৃষ্টির কর্ত্তা ও এই নিয়মের নিয়ামক একজন আছেন। জ্ঞানবান লোকেরাই এই সত্যকে যথাযথভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে। কোন শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে সৃষ্টি ও তাহার নিয়ম হইতে কর্ত্তা ও নিয়ামকের সন্ধান পাইতে সমর্থ হন, অন্যত্র তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে:—

ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لايات لاولى الالباب - الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات و الارض ' الاية -

—"নিশ্চয় স্বর্গ ও মর্ত্তের সৃষ্টিতে এবং দিবা ও রজনীর আবর্ত্তনে (সেই) জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের জন্য অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে—যাহারা দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় (সকল অবস্থায়) আল্লার ধ্যান করিয়া থাকে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে (ধীরভাবে) চিন্তা করিয়া দেখে ......।"

(আলে-এমরান ১৮৯-৯০)।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঐ সকল নিদর্শনের দ্বারা আল্লার অস্তিত্বের প্রমাণ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ সৃষ্টিকে যিনি যত বেশী করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন, আল্লার অস্তিত্বকে তিনি ততই নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ছুরা আলে-এম্‌রানের আয়তে বলা হইতেছে যে—আল্লাহকে পাইতে হইলে জ্ঞান চাই, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীলতা চাই এবং এ সকলের পূর্ব্বে চাই ভাবুকের মন ও মস্তিষ্কের সকল প্রান্তে সত্যকে পাইবার একটা অবিচল সঙ্কল্প, একটা জ্বালাময় আগ্রহ। এই জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা লইয়া, এই সঙ্কল্প ও আগ্রহকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইলে আল্লার অস্তিত্বের ও একত্বের উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে। যাঁহাদের অন্তকরণে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বর্ত্তমান, তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কোর্‌আনের নির্দ্দেশ মতে ধ্যানের ও ভাবুকতার আশ্রয় গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই সব সন্দেহ সংশয়ের নিরাকরণ হইয়া যাইবে। বস্তুজগতের বা জ্ঞানজগতের একটা সামান্য কোন কিছুকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কত আয়োজন উপকরণ ও চেষ্টা চরিত্রের দরকার হয়, আর 'আকবর' বা সব অপেক্ষা বৃহত্তর যে আল্লাহ, তাঁকে পাওয়ার জন্য কোন প্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, একটা অভিমত গঠন করিয়া লওয়া কি সঙ্গত হইতে পারে ?

১৫৪ **আল্লার প্রেম—নরপূজা** :—

আল্লার নিদর্শন সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা সত্তেও কতকগুলি লোক অন্য ব্যক্তি বা বস্তুকে কার্য্যতঃ আল্লার শরিকরূপে গ্রহণ করে—অর্থাৎ যে প্রকার প্রেম আল্লাহকে করা উচিত, গয়রুল্লাহেকে সেই প্রকার প্রেম তাহারা করিয়া থাকে। ফলে গয়রুল্লার প্রেম যখন আল্লার প্রেমের উপর প্রবল হইয়া উঠে, তখনই মোছলেম জীবনের অপচয় ঘটিয়া যায়। সেই জন্য বলা হইতেছে—মো'মেন যাহারা, আল্লার প্রেমই তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া আছে। যে সত্যকার প্রেমিক, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ইচ্ছা প্রভৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া সে নিজকে সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের ইচ্ছার অধীন করিয়া ফেলে এবং এই অধীনতাতেই সে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। দুন্‌য়ার এক একটা নিকৃষ্ট ও অস্থায়ী প্রেমের আকর্ষণে মানুষ লোকলজ্জা, রাজদণ্ড, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া যায়, নিজের প্রাণকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। অতএব আল্লার প্রেমে কতদূর তন্ময় হওয়া আবশ্যক, সেই মহান প্রেমাস্পদের হুজুরে কিরূপে নিজের সমস্ত ইচ্ছা ও সমস্ত বাসনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু একশ্রেণীর ভ্রান্তমানব আল্লাহ অপেক্ষা গয়রুল্লার প্রেমকে নিজেদের বাস্তবজীবনে বড় করিয়া গ্রহণ করে। তাই যেখানে যেখানে এই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেখানে তাহারা আল্লার প্রেমকে বিসর্জ্জন দিয়া এবং গয়রুল্লার প্রেমকে সে আসনে বসাইয়া দিয়া তাহার পূজা করে। এইটাই

হইতেছে শেরেকর মূলবীজ, এবং দৈহিক শের্ক অপেক্ষা এই মানসিক শের্কটা অত্যন্ত গুরুতর, অতিশয় ব্যাপক ও মারাত্মক।

যে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ভাব এইরূপে বান্দাকে তাহার মালেক হইতে দূরে সরাইয়া দেয়, তাহাই হইতেছে তাহার 'নেদ্দ' (নেদ্দূন—২৭ টীকা)। এই ভাবে ঠাকুর বিগ্রহ, মানুষের প্রবৃত্তি ও বাসনা যেমন নেদ্দ-পদবাচ্য—সেইরূপ অন্ধ অনুকরণকারীর পক্ষে তাহার মিথ্যা পীরপুরোহিত ও নায়ক 'নেদ্দ' হইয়া বসে। ঠিক এইরূপ প্রসঙ্গে আহজাব ছুরায় বলা হইতেছে :—

و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيلا ۔

—"আর (দণ্ডকে প্রত্যক্ষ করিয়া) তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদিগের নায়কগণের ও প্রধানদিগের অনুসরণ করিয়াছিলাম, ফলে তাহারাই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছিল (৬৭ আয়ত)। অন্যত্র বলা হইয়াছে :—

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله ۔

—"আল্লাহকে ছাড়িয়া, নিজেদের আলেম ও ফকিরদিগকেই তাহারা প্রভু বানাইয়া লইয়াছে" (ছুরা তাওবা ৩১)। উপসংহারের সহিত মিলাইয়া পড়িলে জানা যায় যে, এখানে এই নায়ক, প্রধান, পণ্ডিত ও ফকিররূপী মানুষ-নেদ্দদিগের কথাই বলা হইতেছে। ব্যাকরণ ও অন্যান্য যুক্তির হিসাবেও ইহাই সঙ্গত অভিমত (কবির ২—১০৫)।

মুছলমানের সাধনাকে এই নরপূজার কলুষ হইতে সম্পূর্ণভাবে পাকছাফ করিয়া দেওয়াই কোর্‌আনের সব শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এই শিক্ষা হইতে মুছলমান সমাজ সাধারণতঃ আজ বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আজ মুছলমানসমাজের নিকট আল্লার কোর্‌আনকে বা তাঁহার রছুলের হাদিছকে পেশ করিয়া পার পাওয়ার কোন উপায় নাই। কোর্‌আন বা হাদিছের সেই আদেশ নিষেধ তাহাদের দলস্থ এমাম আলেম ও পীর ফকিরদিগের সমর্থন না পাইয়া থাকিলে, সে কখনই তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না।

১৫৫ অন্ধভক্তের দুরবস্থা :—

এই অন্ধ অনুকরণের সূত্রপাত করা হয়, সাধারণতঃ যে সব মহাজনদিগের নাম করিয়া, তাঁহারা কিন্তু মানুষকে চিরকালই নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ হইতে নিষেধ করিয়াই আসিয়াছেন। তাই মহা বিচারের সময় তাঁহারা আল্লার হুজুরে নিবেদন করিবেন যে, এই হতভাগাগুলির কৃতকার্য্যের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ সংশ্রব কস্মিন-কালেও ছিল না (২৫—১৮, ১৯)। এইরূপে হজরত ঈছা উত্তর করিবেন :—তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, তাহার অতীত অন্য কোন কথা আমি উহাদিগকে বলি নাই—

আমি বলিয়াছিলাম اعبدوا الله ربي و ربكم —"আমার ও তোমাদের সকলের মালেক যে আল্লাহ-তাঁহারই এবাদত করিতে থাকিবা" (৫—১১৭)।

১৫৬ নরপূজকের পরিণাম :—

এই নরপূজক জালিমের দল নিজেদের অসহায় অবস্থা ও কঠোর কর্ম্মফলকে প্রত্যক্ষ করিয়া গভীর মনস্তাপ সহকারে বলিতে থাকিবে—একবার যদি দুন্য়ায় ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই শ্রেণীর নরপূজার সংশ্রব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া আল্লার এবাদতে লিপ্ত হইতাম। কিন্তু এ মনস্তাপ তখন আর কোন কাজে আসিবে না। কারণ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র হইতেছে এই জীবন, পরজীবন হইতেছে সেই কর্ম্মের ফলভোগ করার স্থান।

একবিংশ রুকু'

খাদ্যাখাদ্য বিচার

১৬৮ হে মানব! পৃথিবীতে যে সব বস্তু আছে-তাহার মধ্য হইতে বৈধ - বিশুদ্ধ[১৭৭] যাহা, তাহাই তোমরা ভক্ষণ করিও! আর শয়তানের পদাঙ্কগুলির অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে হইতেছে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

١٦٨ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّـاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ط إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

১৬৯ সে'ত তোমাদিগকে কেবলই আদেশ দিয়া থাকে—অসৎ ও অশ্লীল কার্য্যে (লিপ্ত হইতে) এবং জ্ঞানের হিসাবে তোমাদের অগোচর যাহা - আল্লার প্রতি তদ্রূপ (অন্যায়) কথা বলিতে।

١٦٩ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُـولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَـا لَا تَعْلَمُونَ ۝

১৭০ এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয়ঃ— আল্লাহ্ যাহা অবতারণ করিয়াছেন - তাহার অনুসরণ করিতে থাক! তাহারা বলেঃ—না, আমরা নিজেদের পিতৃ-পিতামহাদিকে যাহার উপর পাইয়াছি-তদ্ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করিব[১৭৮] না। যদ্যপি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুই

١٧٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُـوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَـآ أَلْفَيْنَـا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ط أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ

না বুঝিয়া থাকে অথবা সৎপথ না পাইয়া থাকে তবুও কি? (-তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে?)।

لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১৭১ আর অমান্যকারীদিগের উপমা—যেমন এক (ব্যক্তি) চীৎকার করিয়া এমন (অজ্ঞান-) দিগকে আহ্বান করিতেছে, ডাক ও চীৎকার (শ্রবণ) ব্যতীত আর কিছুই যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না — বধির - মুক - অন্ধ তাহারা, অতএব তাহারা জ্ঞান-লাভ করে না।

১৭১ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১৭২ হে মো'মেনগণ! যে সকল বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদিগকে দান করিয়াছি - তাহা ভোগ করিও এবং আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিও-তাঁহারই মাত্র এবাদৎ যদি তোমরা করিয়া থাক।

১৭২ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১৭৩ তোমাদিগের প্রতি তিনি ত কেবল হারাম করিয়াছেন মৃত ও রক্ত ও শূকরমাংস এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যের জন্য ঘোষিত (ও উৎসর্গিত) হয় যাহা;— তবে নিরুপায় হইয়া

১৭৩ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

পড়ে যে ব্যক্তি— অথচ সে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী নহে - তাহার উপর কোন পাপ বর্ত্তায় না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা-শীল করুণানিধান।[১৬১]

১৭৪ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

১৭৪ যাহারা আল্লার অবতীর্ণ কেতাব হইতে কতকাংশ গোপন করে এবং তাহার পরিবর্ত্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করিয়া থাকে, নিশ্চয় তাহারা ত কেবল আগুন দিয়াই নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে, অধিকন্তু কিয়ামতের দিনে তাহাদিগের সহিত আল্লাহ্ কথা কহিবেন না, তাহাদিগকে তিনি পরিশুদ্ধও করিবেন না ; আর তাহাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড।

১৭৫ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ج فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

১৭৫ ইহারাই ত হেদায়তের বিনিময়ে ভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তিকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে —অতএব (নরকের) অগ্নি সম্বন্ধে কতই না ধৈর্য্যশীল ইহারা।[১৬৩]

১৭৬ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ

১৭৬ ইহার কারণ[১৬৪] এই যে, কেতাবকে আল্লাহ্ সত্যসহকারে অবতীর্ণ

করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রভেদ ঘটায় যাহারা - বস্তুতঃ তাহারা নিশ্চয় অতি অসঙ্গত পক্ষপাতে (লিপ্ত হইয়া) আছে।	بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ع

টীকা :—

১৫৭ **বৈধ-বিশুদ্ধ** :—

বিশ্বমানবের মঙ্গল ও মুক্তির উদ্দেশ্যে মুছলমানকে এক মহাজাতিরূপে গঠন করার জন্য তাহার নিকট কোর্‌আন ও রছুল প্রেরিত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে জ্ঞানের ভাবের ও কর্ম্মের দিক দিয়া মুছলমানের অর্জ্জনীয় ও বর্জ্জনীয় যাহা, পূর্ব্বের রুকু'গুলিতে ক্রমাগত তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই আয়তে সেই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, এত বড় একটা বিরাট সাধনা লইয়া যে জাতি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইবে, তাহাকে সর্ব্বদাই খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলিতে হইবে। কারণ মানুষের শরীরের স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও মস্তিষ্কের সাত্ত্বিকতা প্রধানতঃ তাহার খাদ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

খাদ্য সম্বন্ধে এখানে দুইটী মূল নীতির কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। "যাহা বৈধ এবং যাহা বিশুদ্ধ"—কেবল সেইরূপ খাদ্যই মুছলমানের পক্ষে গ্রহণীয়। এই দুই গুণের বা তাহার মধ্যকার কোন একটীর অভাব যে খাদ্যে আছে, মুছলমানের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। ছাগলের মাংস মূলতঃ নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ, কিন্তু অন্য কাহারও ছাগল চুরি করিয়া আনিলে, বিশুদ্ধ হওয়া সত্তেও, তাহার মাংস তোমার পক্ষে অখাদ্য। কারণ তাহা বৈধ উপায়ে সংগৃহীত হয় নাই। পক্ষান্তরে তুমি শীকারের জন্য একটী কুকুর খরিদ করিলে, কুকুর তখন তোমার বৈধ-সম্পত্তি, কিন্তু তত্রাচ তাহার মাংস তোমার পক্ষে হারাম। কারণ মূলতঃ তাহা অশুদ্ধ। এই ভাবটা বুঝাইবার জন্য 'হালাল ও তৈয়ব' বা বৈধ ও বিশুদ্ধ-এই দুইটী বিশেষণ এক সঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এ ক্ষেত্রেও শাস্ত্রের সম্মান অপেক্ষা সংস্কারের সম্মোহনকেই মুছলমানেরা আজ বড় করিয়া ধরিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কোন মুছলমান (খোদা না-খাস্তা) শূকরের মাংস খাইয়াছে, এ কথা শুনিলে দশ গ্রামের মুছলমান লাঠি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে, বিশেষ উত্তেজনা ও আগ্রহের সহিত তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিবে, তাহার আগুন পানি বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু নানা মিথ্যা

অন্যায় ও অত্যাচারের মধ্যবর্ত্তিতায় অবৈধ উপায়ে যে অর্থ ও সম্পত্তি আমরা হস্তগত করিয়া থাকি, তাহা লইয়া সমাজে একটুও উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে দেখা যায় না।

আয়তের শেষভাগে শয়তানের পদলেখার অনুসরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার বিশদ পরিচয় পরবর্ত্তী আয়তে দেওয়া হইয়াছে। মানুষের পক্ষে যাহা হারাম নহে, তাহাকে হারামে পরিণত করিয়া দেওয়াও শয়তানের একটা লক্ষণ—এই মর্ম্মের একটী হাদিছ ছহি মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে (কছির ১—৩৭৮)।

১৫৮ পূর্ব্বপুরুষের অন্ধ-অনুকরণ ঃ—

জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও মারাত্মক রোগের কথা এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার কেতাবে মানুষের পক্ষে করণীয় অকরণীয় সব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। জীবনের সকল স্তরে সেই কেতাবের অনুসরণ করিয়া চলাই মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু মানুষ মুখে ধার্ম্মিকতার যতই দাবী করুক না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা আল্লার কেতাবকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলার জন্য সর্ব্বদাই দৃঢ়সঙ্কল্প। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আল্লার কেতাব বা স্বর্গীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যদর্শন হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্বপুরুষের নামকরণে আল্লার কেতাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। দুন্‌য়ার সমস্ত ধর্ম্মসমাজের পতন হইয়াছে প্রধানতঃ এই কারণে।

বর্ত্তমান সময় মুছলমানজাতির সর্ব্বগ্রাসী অধঃপতনের কারণও এই পূর্ব্বপুরুষপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুছলমান আজ নিজকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে এবং তাহার মধ্যকার প্রত্যেক দলে সচল হইয়া আছে, নিজ নিজ দলের নির্ব্বাচিত এমাম ও আলেম-দিগের মতামত। আল্লার কোর্‌আন ও তাঁহার রছুলের হাদিছ সেখানে একেবারে অচল। কারণ, সে সম্বন্ধে যাহা ভাবিবার বুঝিবার ও বলিবার ছিল, বোজর্গানে দিন ও ছলফে ছালেহীন সে সব ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিয়া গিয়াছেন! এখন তাঁহাদের তকলিদ বা অন্ধ অনুকরণ করিয়া যাওয়াই মুছলমানের পক্ষে ওয়াজেব। অন্যথায় খাঁটি মুছলমান ও ছুন্নৎজমাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করার তাহার আর কোনই অধিকার থাকিবে না। যাঁহারা মুখে এই তকলিদকে অস্বীকার করিয়া অন্যপক্ষকে নানা প্রকার তীব্রভাষায় আক্রমণ করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহারাও আর সকলের ন্যায় তকলিদের মায়ামোহে সমানভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন। প্রথম পক্ষ 'এমামগণের তকলিদ' বলিয়া যাহা করিতেছেন, দ্বিতীয় পক্ষও 'ছলফে ছালেহীনের এত্তেবা' বলিয়া ঠিক সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, প্রথম পক্ষ ইহা স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কথার বেলায় অস্বীকার করেন, অথচ অন্ধ-মোকাল্লেদ উভয়ই।

আয়তে আল্লার কেতাব সম্বন্ধে এই অন্ধ-অনুকরণের বিশেষ করিয়া প্রতিবাদ করা হইতেছে। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, মুছলমান কোর্‌আনের তফছির সম্বন্ধেই পূর্ব্ব-পুরুষের অন্ধ অনুকরণকে অধিকতর নির্ম্মমতার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। পূর্ব্বযুগের যে কোন লোকের যে কোন মত তফছিরের কেতাবে আরবী অক্ষরে স্থানলাভ করিয়াছে, এখন কোর্‌আন বলিতে বুঝায় কেবল তাহাই। সে লোকটীর কথা যতই প্রমাণহীন বা প্রমাণ বিরুদ্ধ হউক না কেন, অথবা ব্যক্তিগতভাবে তিনি যতই অবিশ্বস্ত হউন না কেন— তাহাতে কিছুই আসে যায় না। দুনয়ার সমস্ত জ্ঞান সমস্ত যুক্তি, আরবী সাহিত্যের, আরবী ব্যাকরণ অলঙ্কারের সমস্ত নজির ও সমস্ত প্রমাণ, এবং এছলামের সমস্ত ওছূল সমস্ত নীতি, তাহার প্রতিবাদ করিলেও তাহাতে বিচলিত হওয়ার হেতু নাই। কারণ, ইহা হইতেছে ছলফের (=পূর্ব্বপুরুষদের) তফছির! আয়তে এই 'ছলফ' বা পূর্ব্বপুরুষ-পূজারই প্রতিবাদ করা হইতেছে। পূর্ব্ব আয়তে শয়তানের যে পদলেখার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই পূজাও তাহার অন্তর্গত, সেই জন্য উহার অব্যবহিত পরেই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৫৯ يَنْعِقُ -পালরক্ষকের চীৎকার :—

পালরক্ষক নিজ পশুদিগকে পরিচালন করার জন্য যে শব্দ করে, তাহাকে نَعِقٌ বলা হয় (রাগেব, কবির)। পূর্ব্ব আয়তে আল্লার কেতাবের অনুসরণ করার ও পিতৃপুরুষের অন্ধ-অনুকরণ না করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ আদেশকে অমান্য করিয়া যাহারা পূর্ব্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হইয়া থাকে, একটা সর্ব্বজনবিদিত উপমা দিয়া তাহাদের অবস্থার শোচনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। তাহারা হইতেছে অজ্ঞান পশুর সমান, রাখালের শব্দ আর চীৎকার মাত্র তাহারা শুনিয়া থাকে, কিন্তু সেই শব্দের মর্ম্ম তাহারা আদৌ অবগত হয় না। এখানে পালরক্ষক অর্থে আল্লার রছুলকে বুঝাইতেছে—অর্থাৎ এই অজ্ঞ অন্ধ-মোকাল্লেদগুলি রছুলের শিক্ষার তাৎপর্য্য আদৌ বুঝিতে পারে না, তাহার অনুসরণও ইহারা করিতে চায় না, কারণ বধির-মূক-অন্ধ তাহারা। লোকে স্বেচ্ছায় আল্লার কেতাব বা সেই পালরক্ষকের বাণী তাহাকে বুঝাইয়া দিতে আসিলে সে তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, কারণ সত্যশ্রবণ দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করিয়া বসাতে তাহার স্বাভাবিক শক্তিকে সে হারাইয়া বসিয়াছে। অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, কারণ সত্যভাষণের স্বাভাবিক শক্তির অব্যবহারে এখন তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। নিজে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা লাভ করারও কোন সম্ভাবনা তাহাদের নাই। কারণ দীর্ঘকাল চোখ বন্ধ করিয়া অন্যের অন্ধ অনুকরণ করিয়া আসাতে সত্যদর্শনের স্বাভাবিক শক্তিকে সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই তিনটা ছিল সত্যজ্ঞান-লাভের পন্থা, এ সমস্তকে হারাইয়া ফেলার ফলে তাহাদের পক্ষে ইহার কোন সম্ভাবনা আর নাই।

১৬০ জ্ঞানের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ :—

এবাদতের জন্য সত্যজ্ঞানের দরকার, উপরের কএকটী আয়তে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সত্যজ্ঞান লাভের জন্য যে বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণের আবশ্যক, আলোচ্য আয়তে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, তোমরা যদি একমাত্র আল্লারই পূজক হও, তাহা হইলে একমাত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকা তোমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

১৬১ হারাম চতুষ্টয় :—

যে খাদ্য বিশুদ্ধ নহে এবং যে খাদ্যের আয়োজনের দ্বারা একমাত্র আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া থাকার মনোভাব নষ্ট হইয়া যায়, এই আয়তে তাহার মধ্যকার প্রধান কএকটী বস্তুর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথম তিনটী হইতেছে মূলতঃ অশুদ্ধ খাদ্য, সুতরাং মানুষের পক্ষে তাহা সর্ব্ব অবস্থায় হারাম। চতুর্থটী হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অখাদ্যের একটা নজির।

যে জীবকে জবাই করা হয় না, আপনা আপনি মরিয়া যায়, মৃত বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। মাছ ও পঙ্গপাল এই আদেশ হইতে বর্জ্জিত, হজরতের এক হাদিছ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে (বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি)। যে মাছ পানিতে থাকার অবস্থায় আপনা আপনি মরিয়া যায়, এমাম আবুহানিফা প্রমুখ কতিপয় এমাম ও আলেমের মতে তাহা হারাম বা নিষিদ্ধ। এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেম ও এমামগণের মতে তাহা হালাল। ছুরা আন্‌আম এই ছুরার পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে ঠিক এই প্রসঙ্গে دما مسفوحا বলা হইয়াছে (১৪৬)। সুতরাং রক্ত অর্থে কেবল সেই রক্তকে বুঝাইবে যাহা বহিয়া বাহির হয়, মাংসের সঙ্গে যে রক্ত লাগিয়া থাকে, তাহা হারাম নহে। মাংস বলিতে, মাংস চর্ব্বি প্রভৃতি সমস্ত ভোজ্য অংশকে বুঝায়। এই ভাবে শূকর মাংসকে হারাম করা হইয়াছে।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বা কল্পিত ঠাকুর দেবতা বা ভূত প্রেত প্রভৃতির নামে যে কোন বস্তুকে নজর, নায়াজ, ভোগ বা উৎসর্গরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হারাম। এখানে শুধু পশুপক্ষী বলি বা উৎসর্গের অর্থ লইলে আয়তের ব্যাপক অর্থকে সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া হইবে। একদল 'মুছলমান' মজার, দরগা, স্থান, নজর, হাজত ও নেয়াজ বলিয়া স্পষ্ট বোৎপূজার যে কেন্দ্রগুলি গড়িয়া লইয়াছে—তাহাকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল খাদ্য উৎসর্গ করা হয়, তাহাও নিশ্চিত হারাম। এই প্রকারে যে পশুপক্ষীকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে জবাই করা হয়, সেই পশু পক্ষী আসলে হালাল হইলেও এই কারণে তাহার মাংস হারাম হইয়া যায়। ঠিক এইরূপ, কোন পশু পক্ষীকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য

কোন ঠাকুর দেবতা বা পীর আওলিয়ার নামে উৎসর্গ করিলে, জবাই করার সময় আল্লার নাম করিলেও তাহা হারাম হইবে। 'ওহেল্লা' اهل শব্দের অর্থ—উচ্চ শব্দ করা ও ঘোষণা করা। উহার সঙ্গে "জবাই করিবার সময়"-এই শর্ত্ত যোগ করিয়া দিলে, বস্তুতই কোর্‌আনের 'তাহরিফ' করা হইবে (আজিজী ১—৪১৬)।

যে জীবজন্তু গয়রুল্লার নামে উৎসর্গীত হয়, তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে শেরেক বা অংশীবাদের সমর্থন করা হয়, এই জন্য তাহা হারাম হইয়াছে। রক্ত, মৃত জীবজন্তুর মাংস ও শূকর মাংস ভক্ষণ করিলে, তাহাদ্বারা মন ও মস্তিস্কের শুচিতা ও সাত্বিকতা নষ্ট হইয়া যায় এবং পাশবিক ভাব প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে, এই জন্য ঐগুলিকে হারাম করা হইয়াছে।

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি এরূপভাবে নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, ঐ নিষিদ্ধ ভক্ষণ না করিলে তাহার প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা হয়। অথচ সে বিদ্রোহভাবে তাহা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে না এবং সে আশঙ্কা দূর হইয়া গেলে পুনরায় তাহা ভক্ষণের ইচ্ছাও সে রাখে না। এরূপ অবস্থায় প্রাণরক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু মাত্র নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে তাহার প্রতি কোন দোষ বর্ত্তায় না। এই আয়ত হইতে শরিয়তের একটা অতি আবশ্যকীয় ওছুল বা নীতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। মুছলমান ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে যদি এমন প্রকারে বিপন্ন ও নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, কোন একটা নিষিদ্ধ বস্তুকে গ্রহণ না করিলে তাহার ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবন রক্ষা পাওয়া যথার্থই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সে অবস্থায় এবং মাত্র সে অবস্থা বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত, সেই নিষিদ্ধ বস্তুকে গ্রহণ করাতে তাহার কোন পাপ হয় না।

কতক বস্তু এহুদীদিগের প্রতি মূলতঃ হারাম ছিল, এবং আর কতকগুলি মূলে হারাম না থাকিলেও, তাহাদের নানা দুষ্কর্ম্মের দণ্ডস্বরূপে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (৬—১৪৭)। কতকগুলি জিনিষকে তাহারা তাওরাত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে স্বেচ্ছাক্রমে নিজেদের উপর হারাম করিয়া লইয়াছিল। শেষের দুই প্রকার বস্তুকে কোর্‌আন মুছলমানের জন্য নিষিদ্ধ করে নাই বলিয়া এহুদীরা বাদ প্রতিবাদ জুড়িয়া দেয়। এখানে তাহাদিগের উত্তরে তাওরাতে মূলতঃ নিষিদ্ধ বস্তুগুলির উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে—তাওরাতে'ত তোমাদিগের জন্য কেবল এই কয়টী বস্তুকে হারাম করা হইয়াছিল। আয়তে কেবল শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য ইহাই। পরবর্ত্তী আয়তগুলিও মুখ্যতঃ এহুদীদিগের প্রসঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেল পুরাতন নিয়ম বা তাওরাতের লেবীয় পুস্তকে শূকরমাংস, মৃত জীবজন্তুর মাংস ও রক্তকে নিষিদ্ধ বা হারাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার জন্য যথাক্রমে ঐ পুস্তকের ১১—৬, ১৭—১৫ ও ৭—২৬ পদ দ্রষ্টব্য।

১৬২ **কতকাংশ গোপন করা** :—

নিজের স্বার্থ ও সংস্কারের প্রতিকূল যাহা নহে, সেইগুলি ব্যক্ত করে এবং যেগুলিদ্বারা

তাহাদের স্বার্থে বা সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে, আল্লার কেতাবের সেই বাণীগুলি তাহারা গোপন করিয়া ফেলে। যেখানে যে বিষয় প্রকাশ করার দরকার, সেখানে চুপ করিয়া থাকিয়া অথবা আল্লার কালামের বিকৃত অর্থ করিয়া নিজেদের ও নিজেদের শিষ্য সেবকগণের স্বার্থ ও সংস্কারকে অক্ষুন্ন রাখিতে চায়।

১৬৩ **ক্ষমা ও হেদায়ত** :—

আল্লার ক্ষমা ও সত্যপথ তাহাদের হস্তগত ছিল, নচেৎ তাহারা তাহা বিক্রয় করিবে কি করিয়া? অর্থাৎ তাহারা ইচ্ছা করিয়াই আল্লার সত্যপথকে পরিত্যাগ করিয়া গোম্‌রাহী ও ভ্রষ্টতাকে তাহার পরিবর্তে গ্রহণ করিল—যে কাজের ফলে আল্লার ক্ষমা ও করুণালাভ করা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এমন কাজে লিপ্ত হইল, কঠোরদণ্ডই যাহার স্বাভাবিক প্রতিফল। এই সমস্ত অনাচারের জন্য পরকালে আগুনের আজাব বা দোজখ ভোগ তাহাদিগকে নিশ্চয় করিতে হইবে। অথচ এই আত্মবিস্মৃত হতভাগ্যগুলি সে ভাবনা একবারও করিতেছে না, সেজন্য তাহাদের মন আদৌ অধীর হইয়া উঠে না। যেন দোজখের আগুন সহিয়া লওয়ার মত ধৈর্য্য-শক্তি তাহারা অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে, তাই নির্ভাবনায় পাপাচার করিয়া যাইতেছে।

১৬৪ **'ইহার কারণ'** :-

এই রুকু'র ১৭০ হইতে ১৭৫ আয়ত পর্য্যন্ত মুখ্যতঃ এহুদী আলেম ও এহুদ জাতির যে সব কুকীর্ত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাদের সেই সমস্ত অনাচারের কারণ এই আয়তে বর্ণিত হইতেছে। আল্লার কেতাবে প্রভেদ ঘটায়, অর্থাৎ—"তাহারা আল্লার কেতাবের বিকৃত অর্থ করে, অথবা তাহার সহজ সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া জটিল অর্থ গ্রহণ করে" (রাগেব)।

দ্বাবিংশ রুকু'

প্রকৃত পুণ্য কি ?—দানের ব্যবস্থা

১৭৭ তোমরা পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইবে-ইহাই পুণ্য নহে, বরং পুণ্যবান সেই ব্যক্তি-যে আল্লাতে বিশ্বাস করে এবং পরকালে, ফেরেশ্‌তাগণে, সমস্ত কেতাবে ও সমস্ত নবীগণে বিশ্বাস রাখে); আর (যে ব্যক্তি) আল্লার প্রেম বশে আত্মীয় স্বজনগণকে, পিতৃহীন-দিগকে, কাঙ্গালদিগকে, (দুস্থ) পথিকবর্গকে, প্রার্থীদিগকে ও দাসত্ব মোচনার্থে ধনসম্পদ দান করিয়া থাকে ;— এবং (যে ব্যক্তি) নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে আর জাকাত প্রদান করিতে থাকে ; - এবং কাহার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে নিজেদের প্রতিজ্ঞা যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়া থাকে যাহারা ; আর	١٧٧ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَي الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰي وَالْيَتٰمٰي وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَي الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَ

الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ

অভাবে বিপদে ও রণবিভীষিকায় ধৈর্য্যশীল যাহারা ; — তাহারাই হইল সত্যবাদী, এবং তাহারা - একমাত্র তাহারাই হইতেছে পরহেজগার[১৭৭]।

١٧٨ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط
اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ
مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ
بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ج فَمَنِ اعْتَدٰى
بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

১৭৮ হে মো'মেনগণ ! নিহত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে দণ্ডের ব্যবস্থা তোমাদিগের প্রতি অপরিহার্য্য করা হইল;—স্বাধীনের পরিবর্ত্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্ত্তে দাস এবং নারীর পরিবর্ত্তে নারী ; কিন্তু কাহাকে যদি তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে কিছু মাফ করিয়া দেওয়া হয়, তবে সঙ্গতভাবে তাগাদা করা ও সততা সহকারে তাহার (প্রাপ্য) পরিশোধ করা (উভয় পক্ষের) কর্ত্তব্য ; ইহা হইতেছে তোমাদিগের প্রভুর পক্ষ হইতে লাঘব ও করুণা ; কিন্তু ইহার পরে সীমালঙ্ঘন করিবে যে—যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাহার জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে

১৭৯ এবং, হে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ! এই দণ্ডদানে তোমাদের জন্য জীবন—যেন তোমরা সংযমশীল হইতে পার।[১৬৭]

١٧٩ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৮০ তোমাদের প্রতি অপরিহার্য্য করা হইল:—যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যু (আসন্ন হইয়া) আসে, সে যদি ধনসম্পদ ছাড়িয়া যাইতে থাকে, তবে পিতা মাতা ও স্বজনগণের জন্য যথাযথভাবে অছিয়ৎ (সে যেন করিয়া যায়); পরহেজগার-লোকদিগের প্রতি এই কর্ত্তব্য (-পালনের আদেশ দেওয়া) হইতেছে।[১৬৮]

١٨٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

১৮১ পরন্তু অছিয়ৎ শ্রবণের পর যদি কেহ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, তবে তাহার পাপ কেবল ঐ পরিবর্ত্তনকারীদিগের উপর (বর্ত্তাইবে); নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যকরূপে শ্রোতা, সম্যকরূপে জ্ঞাতা।

١٨١ فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৮২ তবে, অছিয়ৎকারী ভুল বা অন্যায় করিতেছে বলিয়া কাহারও যদি আশঙ্কা হয়, ফলে সে যদি তাহাদিগের মধ্যে

١٨٢ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ

মিটমাট করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল কৃপানিধান।
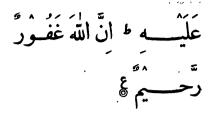
টীকা :—

১৬৫ প্রকৃত পুণ্য কি ?—

আল্লাহ তাঁহার কেতাবে যে সকল সত্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, একদল পণ্ডিত পুরোহিত্ কিরূপে তাহার কতকাংশ গোপন করিত, কিরূপে তাহাতে প্রভেদ ঘটাইত, এবং ইহার ফলে ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা ও সাধনাকে তাহারা কিরূপে বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, পূর্ব্ব রুকু'র শেষভাগে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত পুণ্য কি, সত্যকার পুণ্যবান ও পরহেজগার কে, এবং ধার্ম্মিকতার দাবীতে কার্য্যক্ষেত্রে সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কাহারা—এই আয়তে তাহার লক্ষণগুলি অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথমে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া এবাদত করাতে মূলতঃ কোন পুণ্য নাই। "ইহাই পুণ্য নহে"—অর্থে, কেবল ইহাই পুণ্য নহে, অথবা প্রকৃত পুণ্য ইহা নহে। প্রকৃত পুণ্য যে ব্যক্তি লাভ করিতে চায় এবং সত্যকার দিন্দার পর্হেজগার হওয়ার সঙ্কল্প যাহার আছে, তাহাকে যে বিশ্বাস পোষণ ও যে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, অতঃপর এক এক করিয়া তাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রথমে পাঁচ প্রকার বিশ্বাসের কথা বলিয়া দেওয়ার পর চারি প্রকার কর্ম্ম ও সাধনার কথা বলা হইতেছে। এই সব বিশ্বাস পোষণ ও কর্ম্ম পালন করে যাহারা, সত্যকার পুণ্যাগ্রহী ও সত্যকার পরহেজগার তাহারাই। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, প্রকৃত পুণ্যবান তাহারাই —আত্মীয় স্বজনগণকে, পিতৃহীনদিগকে, কাঙ্গালদিগকে, দুস্থ বিদেশীদিগকে, বিপন্নপ্রার্থী-দিগকে এবং মানুষকে দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত করার জন্য, যাহারা আল্লার প্রেমবশে নিজের ধনসম্পদ দান করিয়া থাকে। ইহা চারিটার মধ্যকার প্রথম সাধনা। এখানে "আল্লার প্রেমবশে"-পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এছলামে সব কর্ম্মের কেন্দ্র এবং সব সাধনার সাধ্য হইতেছেন—আল্লাহ। মানুষের প্রতি মুছলমানের যে প্রেম, তাহাও মূলতঃ সেই আল্লারই প্রেমের জন্য। আল্লার প্রেমবশতঃ দান করে, ইহার দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে, জাকাত ও ওশর প্রভৃতির ন্যায় যে অর্থ তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করার

ব্যবস্থা নাই, স্বেচ্ছাক্রমে কেবল আল্লার প্রেমলাভের আশায় তাহাও সানন্দচিত্তে দান করিয়া থাকে। আমরা فى الرقاب পদের অর্থ করিয়াছি 'দাসত্ব মোচন' বলিয়া। আভিধানিক হিসাবে উহার অর্থ মানুষের "গ্রীবাকে বন্ধনমুক্ত করা"—গর্দ্দান খালাসি করা। ক্রীতদাস এবং যুদ্ধের বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য যে অর্থব্যয় করা হয়, এখানে তাহারই কথা বলা হইতেছে। শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিতেছেন—দুস্থ ঋণগ্রস্ত লোকদিগকে মহাজনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াও এই আয়ত অনুসারে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। দ্বিতীয় দফায় পুণ্যকার্য্য বলিয়া নামাজ ও জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে। জাকাত হইতেছে বাধ্যতামূলক দান। নামাজ সম্বন্ধে ৬ টীকা দ্রষ্টব্য। ফরজ জাকাত সম্বন্ধে ছুরা তাওবায় বিস্তারিত আদেশ নাজেল হইয়াছে, সেখানে উহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে। তৃতীয় দফায় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করাকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চতুর্থ দফায় বিপদে অভাবে ও রণবিভীষিকায় ধৈর্য্যধারণ করার উল্লেখ করা হইতেছে। এই চারি দফার সাধনার সমষ্টি হইতেছে কোর্‌আনের নির্দ্দিষ্ট সত্যকার পুণ্যকর্ম্ম। বড় দুঃখের বিষয়, মুছলমানেরা ইহার অধিকাংশ সাধনাকে আজ বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে। এই আয়ত অনুসারে আমাদের দিন্‌দারীর দাম্ভিকতার মূল্য যে কতটুকু দাঁড়ায়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্ব রুকু'র শেষ আয়তগুলির সহিত একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে যানা যাইবে যে, আল্লাহ তাঁহার কেতাবে যে সব কার্য্যকে ধর্ম্মসাধনার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে প্রভেদ ঘটাইয়া, অর্থাৎ দুই একটাকে আবশ্যকীয় বলিয়া গ্রহণ এবং অবশিষ্টগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই, মানুষ নিজের ধর্ম্মজ্ঞানের অপচয় ঘটাইয়াছে।

১৬৬ **নরহত্যার দণ্ড** :—

উপরে পুণ্যবান লোকদিগের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদিগের সামাজিক জীবন সাম্যবাদের যে উচ্চ আদর্শ অনুসারে গঠিত হইবে, এই আয়তে তাহার পরিচয় দেওয়া হইতেছে। সাধারণ নীতি (principle) হিসাবে আয়তের প্রথমভাগে বলা হইতেছে যে, নরহত্যার জন্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করাই পুণ্যবান সমাজের কর্ত্তব্য হইবে। মূলে 'কেছাছ'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আভিধানিক হিসাবে উহার অর্থ—অনুকরণ করা, যে যেরূপ কাজ করে তাহার সহিত সেইরূপ কাজ করা (কবির, প্রভৃতি)। অতএব হত্যাকারীকে হত্যা করার নামও কেছাছ। প্রাণহত্যার পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড—এই সাধারণ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া দিবার পর সে সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইতেছে।—

(ক) আরবে সাধারণ নিয়ম ছিল—কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক কোন নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা নিহত হইলে, একজনের পরিবর্ত্তে তাহাদের সমাজের বহু লোককে হত্যা করা হইত। কোন দাস বা নারী, স্বাধীন লোককে হত্যা করিলে দাসের পরিবর্ত্তে কোন স্বাধীন

লোকের এবং নারীর পরিবর্ত্তে তাহার গোত্রস্থ কোন পুরুষের প্রাণদণ্ড করা হইত। আরব-দেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত দেশেও এই শ্রেণীর অবিচার সমানভাবে প্রচলিত ছিল। 'ন শরীরো ব্রাহ্মণস্থ দণ্ডঃ'-শ্রেণীর আইন তখন দুন্‌য়ার সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। কোর্‌আন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—যে হত্যা করিবে, প্রাণদণ্ড করিতে হইবে তাহার। সে ভদ্র, স্বাধীন বা ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার দণ্ড লাঘব করা বা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে নিহত করা সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে হত্যাকারী দাস বলিয়া বা স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাদের স্থলে কোন স্বাধীন লোককে বা পুরুষকে হত্যা করার দাবী চলিতে পারিবে না।

(খ) নরহত্যার বিভিন্ন কারণগুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে এবং নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ও বা প্রতিপাল্য স্বজনগণের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলে, সময় সময় প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড করা এবং তাহাদ্বারা নিহত ব্যক্তির প্রতিপাল্যদিগের আর্থিক ক্ষতির পূরণ করিয়া দেওয়াই অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। এরূপ অবস্থায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সম্মত হইলে, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে কেবল ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইয়াই আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

১৬৭ দণ্ডবিধির হেতুবাদ :—

নরহন্তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে এবং এই দণ্ডদানে কোন প্রকার পক্ষপাতের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না—ইহাই হইতেছে কোর্‌আনের ব্যবস্থা। হত্যাকারীকে যদি দণ্ডিত করা না হয়, তাহা হইতে নরহত্যার সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর মোকদ্দমার বিচারকালে যদি ন্যায় ও সাম্যের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে অন্তর্বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ফলে সামাজিক ও নাগরিক জীবন অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে। কাজেই এই ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনকে নিরাপদ রাখার জন্যই নরহন্তার প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আয়তে দণ্ডবিধির এই মূলতত্ত্বের কথা বলা হইতেছে, সেই জন্য এখানে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী লোকদিগকে বিশেষরূপে আহ্বান করা হইয়াছে। কারণ, দয়া ও ক্ষমা মানুষের অতি উত্তম গুণ হইলেও, অপাত্রে নিহিত হইলে তাহাই যে অধিকাংশ মানুষের প্রতি নির্ম্মমতা ও অত্যাচারে পরিণত হইয়া যায়, জ্ঞানী-লোকেরাই কেবল একথা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন।

১৬৮ অছিয়ৎ :—

যাহারা পরহেজগার ও পুণ্যবান হইতে চায়, তাহাদের আরএকটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের কথা এই আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকালে নিজেদের আত্মীয়দিগের, বিশেষ করিয়া পিতামাতার জন্য সেই ধনসম্পত্তির বণ্টন সম্বন্ধে অছিয়ৎ করিয়া যাওয়া, তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

এছলামের পূর্ব্বে আরবদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে মৃত্যুব্যক্তির পুত্রগণ অথবা তাহাদের অবিদ্যমানে যুদ্ধক্ষম আত্মীয়গণ ব্যতীত আর কেহই কোন অংশ পাইত না। ইহাতে মৃত্যুব্যক্তির পিতা মাতা এবং অক্ষম ও স্ত্রীলোক আত্মীয়দিগের কষ্টের অবধি থাকিত না। মৃতব্যক্তির স্ত্রীকন্যা পিতামাতা প্রভৃতি স্বজনগণ এই ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় পথের ফকির হইয়া পড়িত, আর পুত্র বলিয়া অথবা যুদ্ধক্ষম বলিয়া দুই একজন মাত্র আত্মীয় তাহার সমস্ত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া বসিত। সঙ্গতভাবে ধনের নিষ্কেন্দ্রীকরণই হইতেছে এছলামের অর্থ-নৈতিক ধারার মূলনীতি। এছলামের ফারাএজ বা উত্তরাধিকার আইনের সর্ব্বত্র এই নীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

ফারাএজ সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলিতে, কোন্ ওয়ারেছের কি প্রকার ও কিপরিমাণ স্বত্বাধিকার, কোর্‌আনে তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফারাএজ সংক্রান্ত আয়তগুলি প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে আলোচ্য আয়তটী নাজেল হয়। এই আয়তে বিশেষ তাকিদের সহিত অছিয়তের আদেশ দিয়া বলা হইতেছে—তোমাদের পরলোক গমনের পর তোমাদের যে সকল অবশ্য-প্রতিপাল্য আত্মীয় স্বজন, আরবের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে পথের ফকির হইয়া যাইবে—তাহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া প্রত্যেক পরহেজগার ও পুণ্যার্থী মুছলমানের একান্ত কর্ত্তব্য। সেই প্রতিপাল্য আত্মীয় স্বজন কে বা কাহারা, তাহার বিচার করার ভার মুছলমানের বিবেকের উপর অর্পণ করা হইয়াছে-বটে, কিন্তু পিতামাতা সম্বন্ধে চিন্তা ও বিচারের কোন অবকাশ বা আবশ্যক নাই, এজন্য তাহাদের কথা আল্লাহ তাআলাই বলিয়া দিতেছেন।

অধিকাংশ আলেম ও তফছিরকারের মতে এই আয়তটী মন্‌ছুখ বা রহিত। কিন্তু কোন্ প্রমাণের দ্বারা আয়তটী মন্‌ছুখ হইয়াছে, ইহা সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এজন্য তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দুইটী আয়ত ও কএকটী হাদিছকে নছ্‌খ বা রহিত হওয়ার প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়া থাকেন। আয়তটী সম্পূর্ণ কি আংশিকভাবে রহিত, সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পক্ষান্তরে একদল আলেম ইহাকে মন্‌ছুখ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অপর পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণগুলির অসঙ্গতি ও অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য ইঁহারাও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

আয়তটী যে মন্‌ছুখ হয় নাই এই কথা প্রমাণ করার জন্য প্রথমতঃ বলা হইতেছে যে, "ফারাএজের যে আয়তদ্বারা এই আয়তকে মন্‌ছুখ বলা হইতেছে, তাহাতেও من بعد وصية অর্থাৎ "অছিয়তের পরে" এই পদটী প্রত্যেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং 'ফারাএজের আয়তে ওয়ারেছদিগের অংশ নির্দ্ধারণ হইয়া গিয়াছে—অতএব তাহাদের প্রতি আর অছিয়ত চলিতে পারে না'-এরূপ কথা বলা সঙ্গত হইবে না। ছুরা মায়দা ইহার অনেক

পরে অবতীর্ণ, তাহাতে অছিয়তের সময় দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী করিয়া রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অছিয়তের হুকুম যে রহিত হয় নাই, তাহা কোর্‌আন হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। যে সব হাদিছকে নাছেখ বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা একে খবরে-আহাদ, তাহার উপর দুর্ব্বল বা জঈফ। এহেন হাদিছের দ্বারা কোর্‌আনের কোন আয়তকে রহিত করা যাইতে পারে না।"

আমার মতে উল্লিখিত আয়ত দুইটীকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ফারাএজের আয়তে অছিয়ত অর্থে انفاق في سبيل الله। কোন সৎকর্ম্মে দানকে বুঝাইতেছে। যে সকল নিকটাত্মীয় অবস্থা গতিকে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে কিছু সম্পত্তি দান করাও এই অছিয়তের অন্তর্ভুক্ত। ছাআদ-এবনে-অক্কাছের অছিয়তের ঘটনা সংক্রান্ত যে হাদিছকে (বোখারী, মোছলেম) আধুনিক তফছিরকারেরা প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিতেছেন, সেই হাদিছই আমাদের মন্তব্যের স্পষ্ট প্রমাণ ;

ছুরা মায়দায় বর্ণিত অছিয়ৎ, সম্পত্তি বণ্টনের অছিয়ৎ নহে। দেশে বা বিদেশে একজন লোকের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, অথচ তাহার ওয়ারেছগণ সেখানে উপস্থিত নাই ; এ অবস্থায় কাহারও নিকট সম্পত্তি আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখা আর ওয়ারেছদিগকে তাহা পৌঁছাইয়া দিবার অনুরোধ করাকে এখানে অছিয়ৎ বলা হইতেছে। আদি ও তামিমদারী সংক্রান্ত হাদিছই ইহার প্রমাণ (তিরমিজী, এবনে জরির)।

যে হাদিছগুলিকে আলোচ্য আয়তের নাছেখ বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে, সেগুলি যে খবরে আহাদ ও জঈফ উভয়ই, তাহা আমিও স্বীকার করি। একরামা, শরহাবিল-এবনে-মোছলেম, এছমাইল-এবনে-আইয়াশ প্রভৃতি রাবীদিগের বর্ণনা বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না (মীজান)। এহেন দুর্ব্বল রাবীদিগের কর্ত্তৃক বর্ণিত খবরে আহাদের দ্বারা কোর্‌আনের আয়তকে রহিত করা, গুরুতর অসম সাহসিকতা।

আমার মতে এখানে মনছুখ হওয়া না হওয়ার কোন তর্কই উঠিতে পারে না। কারণ বস্তুতঃ ফারাএজের আয়তগুলিদ্বারা আলোচ্য আয়তটীর تخصيص হইয়া যাইতেছে মাত্র। مخصص আর নাছেখে যে পার্থক্য, অভিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কোন একজন ধনবান ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের সম্পত্তির চারিআনা অংশ যদি কোন মাদ্রাছার সাহায্যের জন্য অছিয়ৎসূত্রে দান করিয়া যান, তাহা হইলে এ অছিয়ৎ কি অসিদ্ধ হইবে ? পিতৃহীন পৌত্রদিগের জন্য কেহ যদি কিছু সম্পত্তি অছিয়ৎ করিয়া যান, তাহা হইলে এ অছিয়ৎ কি অসিদ্ধ হইবে ? কখনই নহে, বরং সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, এরূপ মাহরূম বা নিষ্প্রাপ্য আত্মীয়গণের জন্য অছিয়ৎ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আয়তটীকে মনছুখ বা রহিত বলিয়া গ্রহণ করিলে, কোন আত্মীয়ের প্রতি কোন প্রকার অছিয়তই সিদ্ধ হইতে পারে না।

এছলামের পূর্ব্বে আরবদেশে যুদ্ধক্ষম পুরুষ ব্যতীত আর কেহ ফারাএজ পাইতে অধিকারী ছিল না। তাই বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্ত্রী ও কন্যা, অল্প বয়স্ক পুত্র প্রভৃতিকে অনেক সময় পথের ফকির হইয়া যাইতে হইত। আরব গোত্রগণ আবহমান কাল হইতে এই ব্যবস্থাকেই সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল। হেজরতের দ্বিতীয় সনের শেষভাগে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া কোর্‌আন বলিয়া দিল যে, পিতা মাতা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দিগের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া পরহেজগার মুছলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যুদ্ধক্ষম ব্যতীত অন্যান্য নিকটআত্মীয়দিগের অধিকারকে এখানে on principle বা অছূলের হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইল মাত্র, সম্পত্তি বিভাগের ভার অর্পণ করা হইল তাহার মালেকের উপর। কএক মাস মাত্র এইরূপে অতিবাহিত হওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, আরব মানসিকতা এই অছুলকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু নিকট আত্মীয়-গণের নির্ব্বাচনে অথবা তাহাদের অংশ নিদ্ধারণে সব সময় সম্পূর্ণ সুবিচার করিতেছে না, কিম্বা করিতে পারিতেছে না—তখন ফারাএজের আয়তের দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইল যে, নিকটাত্মীয় বলিতে অমুক অমুক স্বজনকে বুঝিতে হইবে। আলোচ্য আয়তে বলা হইতেছে —পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়গণের মধ্যকার কে কি পরিমাণ অংশ পাইবে, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। এই আয়তে সেই অংশ বিভাগের যথাযথ ব্যবস্থার তফছিল করিয়া দেওয়া হইতেছে—তাহাদের প্রাপ্য অংশ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে সম্পত্তির মালেকের উপর যে ভার দেওয়া হইয়াছিল, অংশ নির্দ্ধারণের পর তাহার আর কোন আবশ্যক বা সার্থকতা থাকিতেছে না। সেই জন্য যাহাদের অংশ নিদ্ধারিত নাই অর্থাৎ যাহারা অংশী বা জুবেল ফরুজ নহে, অথবা যাহারা অবস্থাগতিকে বঞ্চিত বা নিষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদের প্রতি অছিয়তের বিধান সমানভাবে বলবৎ হইয়া আছে।

ত্রয়োবিংশ রুকু'

—০০০—

(ছিয়াম-সাধনা)

———

১৮৩ হে মো'মেনগণ! তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের ন্যায় তোমাদের প্রতিও 'ছিয়াম'কে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত করা হইল-যেন তোমরা সংযমশীল হইতে পার,—

১৮৪ —গণিত দিবস নিচয়; তবে তোমাদিগের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি পীড়িত হয় বা প্রবাসে থাকে, তাহা হইলে অন্য সময় গণনা (করতঃ তাহা পরিশোধ) করিতে হইবে; আর রোজা রাখিতে (কষ্টের সহিত) সমর্থ হয় যাহারা, তাহাদিগকে 'ফিদ্‌য়া' দিতে হইবে- একজন কাঙ্গালের অন্ন; তবে কেহ যদি স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত সৎকর্ম্ম সম্পাদন করে, সে'ত তাহারই জন্য মঙ্গল; আর 'ছিয়াম'-পালন করা তোমাদিগের পক্ষে

١٨٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۙ

١٨٤ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا

মঙ্গলজনক, তোমরা যদি বিদিত থাক (তাহা হইলে ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে)।

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১৮৫ রমজান মাস-যাহা সম্বন্ধে কোর্‌আন নাজেল করা হইয়াছে, (যে কোর্‌আন) বিশ্বমানবের জন্য পথপ্রদর্শক এবং পথ-প্রদর্শনের ও সত্যমিথ্যার পার্থক্য -সাধনের প্রমাণ সমষ্টি; অতএব তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ঐ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে, সে যেন তাহাতে ছিয়াম পালন করে; আর যে ব্যক্তি পীড়িত হয় অথবা প্রবাসে থাকে তাহা হইলে অন্য সময় তাহার গণনা; আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদিগের প্রতি সহজ (ব্যবস্থা করিতে) আর তোমাদের প্রতি কঠোর (ব্যবস্থা করিতে) তিনি ইচ্ছা করেন না; অধিকন্তু (তাঁহার উদ্দেশ্য) যেন তোমরা (দিনের) সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে পার, এবং যেন তোমরা আল্লার নির্দ্দেশ মতে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে পার, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে থাক!

১৮৫ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ؗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১৮৬ আর আমার বান্দাগণ তোমাকে যখন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে (তখন তাহাদিগকে বলিয়া দিও) — আমি ত নিকটেই আছি ; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে- তখনই আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়া থাকি ; অতএব তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাতে বিশ্বাস করে - তাহা হইলেই তাহারা সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিবে।

١٨٦ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝

১৮৭ রোজার রাত্রে আপন স্ত্রীদিগের সহিত 'প্রেমালাপ' করা তোমা-দিগের জন্য বৈধ করা হইয়াছে ; তাহারা হইতেছে তোমাদিগের পোষাক আর তোমরা হইতেছ তাহাদিগের পোষাক ; আল্লাহ্ অবগত আছেন যে (এই ব্যবস্থা না হইলে) তোমরা নিজদিগকে অপরাধী করিয়া ফেলিতে, অতএব তিনি তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং তোমাদিগের (ভার) লাঘব করিয়া দিলেন, তএব এখন (রোজার রাত্রেও) তাহাদের সহিত সম্মিলিত হও এবং

١٨٧ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য যে নির্দ্ধারণ করিলেন-তাহার চেষ্টা কর, এবং যাবৎ কৃষ্ণতর সূত্র হইতে ঊষার শুভ্রতর সূত্র দেদীপ্যমান হইয়া না উঠে, তাবৎ আহার করিতে ও পান করিতে থাক,—অতঃপর রাত্রি পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ করিয়া লও, —আর যে অবস্থায় তোমরা মছজিদে এ'তেকাফ করিয়া থাক, সেই (এ'তেকাফ-) কালে স্ত্রীদিগের সহিত সম্মিলিত হইও না;—এগুলি হইতেছে আল্লার (নির্দ্ধারিত) সীমা - অতএব তাহার নিকটেও যাইও না; মানুষের মঙ্গলের জন্য এই প্রকারে আল্লাহ্ নিজ আয়ত-গুলিকে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দেন - যেন তাহারা সংযমশীল হইতে পারে।

১৮৮ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ

১৮৮ (এবং তোমরা যেন নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পত্তি অন্যায়রূপে গ্রাস করিও না, আর জনসাধারণের ধনসম্পত্তির এক অংশকে অপরাধভাবে গ্রাস করার জন্য সেই বিষয় সম্পত্তি (-সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা)

শাসনকর্ত্তাদের নিকট উপস্থাপিত করিও না, অথচ তোমরা জানিতেছ।) * | اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

টীকা ঃ—

১৬৯ ছিয়াম-সাধনা ঃ—

প্রকৃত পুণ্যকর্ম্ম যে কি, উপরে তাহার কএকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে এই পরম্পরায় মধ্যে ছিয়ামের উল্লেখ করা হইতেছে। এখানেও উদ্দেশ্য সত্যকার পরহেজগার ও সংযমশীল হওয়া। ১৮৪ আয়তের প্রথমে বলা হইতেছে, সেই ছিয়াম পালন করিতে হইবে-গণিত কএক দিবস মাত্র। অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া বা সম্বৎসর জুড়িয়া ছিয়াম পালন করিবার কঠোর আদেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। ১৮৫ আয়তের প্রথমে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উপরে বর্ণিত সেই গণিত কএক দিবস হইতেছে, রমজান মাস।

গণিত কএক দিন বা রমজান মাসে রোজা ফরজ হওয়ার সাধারণ আদেশ প্রচারের পর, ১৮৪ আয়তে কএকটা বর্জ্জিত বিধির উল্লেখ করা হইতেছে। বলা হইতেছে যে—রমজান মাসে সকলের উপর রোজা ফরজ, কিন্তু (ক) যদি কোন ব্যক্তি ঐ মাসে পীড়িত হইয়া পড়ে অথবা যদি কেহ প্রবাসে থাকে, তাহা হইলে সে রমজান মাসে রোজা নাও রাখিতে পারে। তবে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া অথবা সুস্থ হইয়া অন্য মাসে সেই ভাঙ্গা রোজাগুলি তাহাকে শোধ দিতে হইবে—অর্থাৎ যে কয়টা রোজা তাহার বাদ গিয়াছে, গণিয়া সেই কয়টা রোজা তখন তাহাকে রাখিতে হইবে। (খ) পীড়িত ও প্রবাসীদিগের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা দিবার পর বলা হইতেছে যে, যে সকল নরনারীকে কষ্টের সহিত রোজা রাখিতে হয়—যেমন বৃদ্ধ নরনারী, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, চিররোগী প্রভৃতি, তাহারা রোজা না রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কাঙ্গালদিগকে অন্নদান করিবে—একটী রোজার পরিবর্ত্তে একজন কাঙ্গালকে তাহার একদিনের খোরাক দিবে—ইহাই রোজার ফিদ্‌য়া। একজনের খোরাক দিতে সে ধর্ম্মের হিসাবে বাধ্য, অন্যথায় সে অপরাধী হইবে। তবে যদি কোন সহৃদয় মুছলমান, একজনের পরিবর্ত্তে দুই বা ততোধিক কাঙ্গালকে অন্নদান করে, তাহাতে কোন দোষ নাই, বরং ইহার পুরস্কার সে লাভ করিবে। আয়তের শেষভাগে এই সতর্কবাণী প্রচার করা হইতেছে যে, অবস্থাভেদে এই যে রোজা কাজা করার বা ফিদ্‌য়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইতেছে, ইহাকে রোজা ত্যাগের ছুতা বাহানা বানাইয়া লওয়া উচিত নহে। রোজার মহিমা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান যদি

তোমাদের থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, রোজা রাখাই হইতেছে আদর্শ ও মূল বিধান। তাহা ত্যাগ করা অগত্যা পক্ষের ব্যবস্থা, ইহাতে রোজার অশেষবিধ মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সুতরাং মিথ্যা ওজর বা বাহানা বাহির করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করা প্রকৃত পুণ্যার্থী পরহেজগার মুছলমানের পক্ষে কখনই উচিত হইবে না।

আমরা ১৮৪ আয়তের يطيقونه পদের অনুবাদ করিয়াছি—"(কষ্টের সহিত) সমর্থ হয় যাহারা"। আমাদের মতে ইহাই প্রকৃত অনুবাদ। "কোন ব্যক্তি সহজে কোন কাজ করিতে সমর্থ হইলে, সেখানে يطيق বলা হয় না, বরং لمن كان قادرا على الشئ مع الشدة والمشقة কঠোরতা ও ক্লেশ সহ্য করিয়া যে কাজ সমাধা করা হয়, তাহারই সম্বন্ধে এই শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে" (কবির ২—১৭৭)। ইহার পরে আর একস্থানে বলা হইতেছে—

انه لا يقال في العرف للقادر القوي انه يطيق هذا الفعل - لان هذا اللفظ لا يستعمل الا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة -

—"যে ব্যক্তি শক্তিমান ও সমর্থ, তাহার কোন কাজ করার জন্য প্রচলিত পরিভাষায় يطيق 'য়োতিকো'-শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেখানে কোন কাজ সম্পাদন করিতে কোন না কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, কেবল সেই সকল স্থানে এই শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে" (কবির ২—১৭৮)। এমাম রাগেবও তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে 'তাকৎ'-শব্দের এই তাৎপর্য্য দিয়া কোর্‌আনের অন্য আয়ত হইতে তাহার নজির উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন (দেখ—রাগেব, طوق)।

এই তাৎপর্য্যের প্রতি মনোযোগ না দেওয়াতে এই অংশের ব্যাখ্যায় অনেক অনর্থক তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল তফছিরকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—'যাহাদের রোজা রাখার শক্তি আছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে রোজা রাখিতে পারে অথবা রোজার বদলে ফিদ্‌য়া দিতে পারে—ইহাই হইতেছে এই অংশের মর্ম্ম। তবে, ১৮৪ আয়তের এই ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫ আয়ত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে!' মুহূর্ত্তেকের জন্য এই প্রকার একটা ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা রহিত করিয়া দেওয়ার সার্থকতা যে কি, তাহা তাঁহারা বলিয়া দেন নাই। কিন্তু অন্যদলের যে অভিমত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে অভিধান ও সাহিত্যকে অমান্য করিতে হয় না, কোর্‌আনের একটা আয়তকে মনছুখ বলিয়া বাদ দিবার দরকারও হয় না, এবং হজরতের ছাহাবাগণের ও তাবেয়ীদিগের চিরাচরিত ব্যবহার হইতেও তাহার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

(এই সকল হাদিছের জন্য মনছুর ১—১৭৫ হইতে ১৭৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং হাদিছের কেতাবে রোজার অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য)।

১৭০ **রমজান মাস**ঃ—

রমজান মাসে সর্ব্বপ্রথমে কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল,—এইরূপ একটা ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই আয়তের অনুবাদ করেন ঃ—"রমজান মাস-যাহাতে কোর্‌আন নাজেল হইয়াছে।" এইরূপ অনুবাদ করাতে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যকার একটা সমস্যার উত্তরে এই মতের সমর্থকগণ বলেন যে, কোর্‌আন বায়তুল-মা'মুর হইতে পহেলা আছমানে রমজান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই কল্পনার কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত করা কেহই আবশ্যক মনে করেন নাই। ছুরা দোখানের প্রথমে একটী আয়ত আছে, তাহাতে জানা যায়, "এক মহিমময়ী রজনীতে في ليلة مباركة কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছিল।" 'অধিকাংশ বিদ্বানের মতে' শবে বরাতের রাতই হইতেছে সেই মহিমময়ী রজনী। আয়তে বর্ণিত "ফি" বর্ণের অর্থ "তে" ও "মধ্যে" লইলে এই সকল সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু 'ফি'-বর্ণের অর্থ যেমন "তে" ও "মধ্যে" হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ "বিষয়" ও "সম্বন্ধ" বলিয়াও উহার অর্থ হয়। কোর্‌আনেও বহুস্থানে এই অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে এবং ঐ সকল স্থানে উহার এই অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ নাই। যেমন— فادارئتم فيها —এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তোমরা তাহার **সম্বন্ধে** বিসম্বাদ করিতেছিলে (বকরা)। الذي هم فيه مختلفون —যাহা **সম্বন্ধে** তাহারা মতভেদ করিতেছে (নাবা)। لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم —তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহা **সম্বন্ধে** তোমরা ভীষণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে (আন্‌ফাল)। لمسكم فيما افضتم فيه —তোমরা যে **সম্বন্ধে** চর্চ্চা করিয়াছিলে ··· (নূর)। فلا تمار فيهم —অতএব তাহাদের **সম্বন্ধে** কোন বিসম্বাদে লিপ্ত হইও না (কহফ)। لا تستفت فيهم منهم ابدا —তাহাদিগের **সম্বন্ধে** ইহাদের কাহারও অভিমত জিজ্ঞাসা করিও না (ঐ)। يستفتونك في النساء —নারীদিগের **সম্বন্ধে** তাহারা তোমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে (নেছা)। قل الله يفتيكم فيهن —বল, আল্লাহ তাহাদের **সম্বন্ধে** তোমাকে ব্যবস্থা দিতেছেন (ঐ)। منهم من يلمزك في الصدقات —তাহাদের মধ্যকার কেহ কেহ ছদকা-**সম্বন্ধে** তোমার সহিত বিতণ্ডা করে (তাওবা)। فلا ينازعنك في الامر —ধর্ম্ম **সম্বন্ধে** তাহারা যেন তোমার সহিত কলহ না করে (হজ)। فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون —যাহা **সম্বন্ধে** তোমরা মতভেদ করিতেছ, তিনি তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করাইয়া দিবেন (মায়দা-আনআম)। يجادلونك في الحق —সত্য **সম্বন্ধে** তাহারা তোমার সঙ্গে কলহ করিতেছে (আনফাল)। الذين يجادلون في آيات الله —যাহারা আল্লার নিদর্শনগুলি **সম্বন্ধে**

কলহ করিয়া থাকে (মো'মেন)। من الناس من يجادل في الله —একদল লোক এরূপ আছে, যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে হঠতর্ক করিয়া থাকে (হজ দুইস্থানে ও লোকমান)। يجادلنا في قوم لوط —লুতের কওমসম্বন্ধে আমাদের সহিত কলহ করিতে থাকে (হুদ)। الله يفتيكم في الكلالة —কালালা-সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদিগকে ব্যবস্থা দিতেছেন (নেছা)।

উপরে কোর্‌আন শরিফের ১৬টী আয়তের ২০টী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই সকল স্থানে "ফী"-বর্ণের অর্থ 'সম্বন্ধে' বা 'বিষয়ে' গ্রহণ করা অনিবার্য্য, এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। 'মধ্যে' বা 'তে' বলিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে উহার কোনই মানে মতলব হইতে পারে না। হাদিছেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত বলিতেছেন—

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها -

—"জনৈক স্ত্রীলোক একটা বিড়ালের **কারণে** নরকে প্রবেশ করিয়াছিল-সে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, অথচ খাইতে দেয় নাই" (বোখারী, মোছলেম)। একটী স্ত্রীলোক "বিড়ালের মধ্যে" নরকে প্রবেশ করিয়াছিল, এরূপ তাৎপর্য্য কেহই গ্রহণ করিবেন না। এই হাদিছের শেষভাগে আছে, ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন— و ان لنا في البهائم اجرا —পশুদিগের **সম্বন্ধেও** কি আমাদের পুণ্যলাভ হইতে পারে? হজরত উত্তর করিলেন— في كل كبد رطبة اجر —প্রত্যেক সজীব হৃৎপিণ্ড **সম্বন্ধে** পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। এইরূপে— هذه الاية نزلت في الخمر - رجم ما غر في الزنا - في كل اربعين شاة شاة - هذه الاية نزلت في ابي بكر ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারে হাদিছ তফছির পূর্ণ হইয়া আছে। সমস্ত অভিধানকার একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, 'ফী'-বর্ণ 'সম্বন্ধে, বিষয়ে ও কারণে'-অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (দেখ—মুনীর, কামুছ, মাওয়ারেদ, বেহার, কবির ২—১৮২, ৪৩৮ প্রভৃতি)। এই সকল প্রমাণের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে যে, শাব্দিক হিসাবে আয়তের অর্থ নিম্নলিখিত উভয় প্রকারই হইতে পারে। যথা:—

(১) রমজান মাস **যাহাতে** কোর্‌আন নাজেল হইয়াছে।

(২) রমজান মাস **যাহার সম্বন্ধে** কোর্‌আন নাজেল হইয়াছে।

প্রথম অর্থ সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কারণ রমজান মাসে কোর্‌আন নাজেল হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, বরং ইহা প্রমাণের বিপরীত যুক্তিহীন দাবী মাত্র। রমজান মাসে কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? হয় বলিতে হইবে যে, হজরতের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে রমজান মাসে কোর্‌আনের প্রথম অংশ নাজেল হইয়াছিল, অথবা বলিতে হইবে যে, সমস্ত কোর্‌আন এক রমজান মাসে একত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিম্বা স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য মাসের ন্যায় রমজান মাসেও তাহার কিছু কিছু অংশ নাজেল হইয়াছিল। শেষোক্ত তাৎপর্য্য অনুসারে বিশেষরূপে রমজান মাসে কোর্‌আন নাজেল

হওয়ার কোনই সার্থকতাই থাকে না। দ্বিতীয় তাৎপর্য্যটীও সর্ব্বতঃভাবে অগ্রাহ্য। কারণ, দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরিয়া কোর্‌আনের এক এক অংশ ক্রমে ক্রমে নাজেল হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও অকাট্য সত্য। সুতরাং কেবল প্রথম তাৎপর্য্যটী সম্বন্ধে বিচার চলিতে পারে। যদি হাদিছ ও ইতিহাস হইতে প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে, বাস্তবিক কোর্‌আনের প্রথমাংশ রমজান মাসেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা হইলে আয়তের ১নং অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা যদি সপ্রমাণ না হয়, বরং তাহার বিপরীত রমজান ব্যতীত কোন অন্য মাসে যদি কোর্‌আনের প্রথম আয়তগুলি নাজেল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাহইলে, আমাদের গৃহীত, দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থে, হজরতের বিভিন্ন ছাহাবী কর্ত্তৃক বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রছুলে করিম ৪০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া ৪১ বৎসরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতি প্রথমে কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল। যথা :—

(১) انزل عليه و هو ابن اربعين

(২) على رأس اربعين سنة

(৩) بعث رسول الله صلعم لاربعين سنة

এই সকল বিশ্বস্ত হাদিছের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে যে, হজরত রছুলে করিম ৪০ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ৪১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি কোর্‌আনের প্রথমাংশ নাজেল হইয়াছিল। বোখারীর স্বনামখ্যাত টীকাকার হাফেজ এবনে হজর, অন্যত্র প্রতিকুল অভিমতের আভাষ দেওয়া সত্ত্বেও, এখানে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন যে :—

و هذا انما يتم على القول بانه بعث فى الشهر الذي ولد فيه -

অনুবাদ :— "এই সকল হাদিছের মন্তব্য কেবল সেই অভিমত অনুসারে সার্থক হইতে পারে, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে মাসে হজরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই মাসেই তাঁহার প্রতি নবুঅত প্রদান করা হইয়াছিল (ফৎহুলবারী ৬—৩৬৬)। রবিউল আউঅল মাসে হজরতের জন্ম, সুতরাং এই সকল হাদিছ অনুসারে অকাট্যরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ঐ মাসেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রতি কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল। এই জন্য অধিকাংশ এমাম ও মোহাদ্দেছগণ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাকেই "বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণের সাধারণ অভিমত" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (জাদুল-মাআদ ১—১৮, হালবী ১—২২৪ প্রভৃতি)। এই শ্রেণীর যুক্তি প্রমাণগুলির খণ্ডন করা অসম্ভব হওয়ায়, অন্য পক্ষের একদল পণ্ডিত বলিয়া বসিয়াছেন যে, রমজান মাসেই হজরতের জন্ম হইয়াছিল!

পাঠকগণ দেখিলেন—রমজান মাসে সর্ব্বপ্রথমে কোর্‌আন নাজেল হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। বরং সমস্ত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন

হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথমে রবিউল আউঅল মাসেই কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল। সুতরাং 'ফী'-বর্ণের অর্থ এখানে "তে" বা "মধ্যে" গ্রহণ না করিয়া, "সম্বন্ধে" বা "বিষয়ে" গ্রহণ করা অনিবার্য্য।

১৭১ কোর্‌আনের তিনটী বিশেষণ :—

কোর্‌আনের তিনটী বিশেষণের কথা এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। যথা :— (১) কোর্‌আন হইতেছে বিশ্বমানবের জন্য মুক্তি ও মঙ্গলের পথপ্রদর্শক। (২) কোর্‌আন পথপ্রদর্শন করে স্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের সহায়তায় (৩) স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জের দ্বারা কোর্‌আন সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়া দেয়।

১৭২ আল্লার মহিমা ঘোষণা :—

শাউওয়ালের নূতন চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে হজরত রছুলে করিম ও তাঁহার ছাহাবাগণ উচ্চস্বরে তকবির বলিতে আরম্ভ করিতেন; এবং ঈদের খোৎবা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মদিনার আকাশ বাতাস অযুত কণ্ঠের "আল্লাহো-আকবর"-নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিত। ঈদগাহের পথে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিশেষ করিয়া এইরূপে আল্লার নামের জয়জয়কার করিতেন (মনছুর ১—১৯৪ প্রভৃতি)। কিন্তু আজকাল ঈদের দিনও মুছলমানের কণ্ঠে এ জয়ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না, এমনি মরিয়া গিয়াছে তাহার মন।

১৭৩ আল্লাহ নিকটেই আছেন :—

রমজান হইতেছে আল্লার সহিত সম্বন্ধ সূত্রকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বান্দার এক বিরাট যোগ সাধনা। এই সাধনার ধ্যান ধারণা ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া মানুষ নিজের দেহ মন ও মস্তিষ্কের সংস্কার সাধন করিয়া সেগুলিকে পাশব প্রবৃত্তির সংস্পর্শ হইতে যতই মুক্ত করিয়া লইতে থাকে, আল্লার এ নৈকট্যের অনুভূতি ততই তাহার প্রবল হইতে থাকে। "আল্লাহ বান্দার নিকটেই আছেন, এবং ডাকা মাত্রই বান্দার ডাকে সাড়া দেন"—এই সত্যকে বাস্তবরূপে প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ ঘটে রোজার সাধনা অবলম্বন করিয়া। এই সত্যকার ডাক আর তাহার সাড়ার অনুভূতি হইতেছে রমজানের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। তাই রমজানের বিধিব্যবস্থাগুলির বর্ণনার মধ্যে এই বিষয়টীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ মানুষের নিকটেই আছেন। অন্য আয়তে বলা হইয়াছে :—

نحن اقرب اليه من حبل الوريد -

—"তাহার প্রাণশীরা অপেক্ষাও আমি তাহার নিকটে" (ছুরা কাফ)। অতএব এত নিকটে যিনি, এমন দরদী আপনজন যিনি, তাঁহাকে ডাকার জন্য অথবা তাঁহার হুজুরে নিজের ফরয়াদ পৌঁছাইবার জন্য, কোন মধ্যবর্ত্তী উকিল বা Midiator এর দরকার হয় না।

বান্দা যেমন আল্লাহকে ডাকিয়া নিজ অন্তরের গোপন বেদনাগুলি তাঁহার হুজুরে নিবেদন করিয়া থাকে, আল্লাও সেইরূপ বান্দাকে ডাক দিয়া তার প্রাণের স্তরে স্তরে সেই ডাকের সাড়া জাগাইতে চান। কিন্তু ছিন্নসূত্র হইয়া পড়ায় অনেক সময় বান্দার প্রাণবীণায় তাহার সাড়ার সুর বাজিয়া উঠে না। তাই বান্দার প্রেমময় প্রভু বলিয়া দিতেছেন—ঈমানের এই সম্বন্ধসূত্রকে জুড়িয়া লও, রমজানের সাধনার দ্বারা মাজিয়া ঘষিয়া তাহাকে সব ময়লা ও জঙ্গার হইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেল। তাহা হইলে আমার ডাকও তোমার প্রাণে ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলিতে পারিবে।

১৭৬ **রোজার রাত্রে স্ত্রীসহবাস** :—

হাদিছের কেতাবে এই আয়ত সম্বন্ধে অনেক প্রকার রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। সেই সমস্ত রেওয়ায়ৎ একত্রে আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রোজার আদেশ নাজেল হওয়ার পর ছাহাবাগণের মধ্যে বিভিন্ন লোক রমজানের রাত্রি সম্বন্ধে নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে, অথবা খৃষ্টান ও এহুদীদিগকে দেখিয়া, এক একটা অভিমত নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। কেহ মনে করিতে লাগিলেন—রোজার রাত্রিতেও স্ত্রীসহবাস অবশ্য বর্জ্জনীয়। কেহ স্থির করিলেন—এফতারের পর নিদ্রা না যাওয়া পর্য্যন্ত পানাহার সিদ্ধ, কিন্তু একবার ঘুমাইয়া পড়িলে, পরদিন সূর্য্যাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত একভাবে রোজা রাখিয়া যাইতে হইবে (বোখারী, আবুদাউদ, তিরমিজী)। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, রমজানের রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা এবং "ছোবহে ছাদেক" আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত পানাহার করা তোমাদিগের পক্ষে সিদ্ধ। 'প্রেমালাপ'-বলিতে স্ত্রীসহবাসকে বুঝাইতেছে, সুরুচি ও শ্লীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোর্‌আন শরিফে এরূপ স্থলে এইরূপে ইঙ্গিতে আভাষে বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

লেবাছ বা পরিচ্ছদের দ্বারা লজ্জা নিবারণ হইয়া থাকে, শীত ও রৌদ্রের প্রকোপ হইতে শরীরকে রক্ষা করা হয়, এবং মানুষের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আয়তে স্বামীকে স্ত্রীর ও স্ত্রীকে স্বামীর লেবাছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরের লজ্জা নিবারণ করে, প্রবৃত্তির রুদ্র উন্মাদনা হইতে পরস্পরকে রক্ষা করে এবং আলস্য অবসাদের আড়ষ্টতা হইতে রক্ষা করিয়া সংসারের কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে, পরস্পরের জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য্যকে তাহারা বর্দ্ধিত করিয়া দিতে থাকে। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ যখন এমন কল্যাণমণ্ডিত, তখন তাহাদের যৌনসম্বন্ধকে অভিশপ্ত করা প্রাকৃতিক ধর্ম্মের লক্ষ্য কখনই হইতে পারে না। তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করার ও বশীভূত করিয়া রাখার শক্তি অর্জ্জনই ছিয়ামের উদ্দেশ্য। এই জন্য মাত্র দিনের বেলায় ও এ'তেকাফের অবস্থায় 'স্ত্রীচর্চ্চা' নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রমজানের নীরব নিভৃত সাধনার নাম—এ'তেকাফ। মছজিদের কোন নিভৃত স্থানে

বসিয়া একমনে আল্লার জেক্‌র-ফেক্‌র করা, তাঁহার ধ্যান ধারণায় তন্ময় হইয়া থাকা, নিজের পাপপুঞ্জ স্মরণ করিয়া অনুতপ্তচিত্তে আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করা—এ'তেকাফকারীর কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যক্তিগত কাজ ব্যতীত মছজিদের বাহিরে যাওয়া বা কাহার সঙ্গে কথা বলাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। হজরত রছুলে করিম শেষজীবন পর্য্যন্ত বরাবরই রমজানের শেষ দশদিন এ'তেকাফে বসিতেন (বোখারী, মোছলেম)। "কৃষ্ণতর সূত্র"-অর্থে রাত্রির অন্ধকার, "শুভ্রতর সূত্র"-অর্থে উষার প্রথম আলোকরেখা। হজরত এই অর্থ বলিয়া দিয়াছেন (বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি)। আমরা শাব্দিক অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছি। আরবী পরিভাষা অনুসারে উহার ভাবার্থ হইবে—রাত্রির অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রভাতের শুভ্র উষার প্রথম প্রকাশ (তাজুল-অরুছ)। মুছলমানেরা ইহাকে "ছোব্‌হে ছাদেক" বলিয়া থাকেন।

১৭৫ **পরের ধনসম্পত্তি গ্রাস করা**ঃ—

মানুষ প্রথমতঃ ষড়যন্ত্র ও জোর জুলুম করিয়া অন্যের ধনসম্পত্তি গ্রাস করিতে চায় এবং অনেকে এই প্রকারে তাহা গ্রাস করিয়াও থাকে। কিন্তু কোন গতিকে ইহাতে সফল মনোরথ না হইলে শাসনকর্ত্তাদের আদালতে গিয়া মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং আদালতের সাহায্যে তাহা হস্তগত করিয়া লয়। আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা যদি প্রকৃত পুণ্যার্থী হও, যদি সত্যকার দিন্‌দার পরহেজগার হওয়ার জন্য তোমাদের আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তোমাদিগকে এই মহাপাতক হইতে নিশ্চয় বারিত থাকিতে হইবে।

মানুষ পরহেজগারীর ভেক করিয়া কত প্রকারে অহমিকতা প্রকাশ করে, অথচ হারাম খাইতে, হারাম পরিতে বা হারাম ধনসম্পত্তি গ্রাস করিতে দ্বিধা করে না। সে মুখে যতই আল্লাহ আল্লাহ করুক না কেন, তাহার এবাদৎ আল্লাহ কখনই গ্রহণ করেন না। হারাম দিয়া যে শরীর গঠিত হইয়াছে, আগুন ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই। কাহারও এক বালেশ্‌ত (বিঘাত) জমি অপহরণ করিলেও কিয়ামতের দিন তাহা মানুষের গলায় লা'নতের তওক হইয়া ঝুলিতে থাকিবে। আল্লার বিরুদ্ধে মানুষের যে সব অপরাধ, দয়াময় তিনি, ইচ্ছা করিলে তাহা মআফ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার কোন বান্দার স্বত্বাধিকারে (হকুকুল-এবাদে) কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটায় যে, তাহাকে আল্লাহ কখনই মআফ করিবেন না—যাবৎ সেই উৎপীড়িত ব্যক্তি নিজে মআফ না করিয়া দিবে। এই মর্ম্মের উপদেশসমূহের দ্বারা বিখ্যাত হাদিছগ্রন্থগুলি পূর্ণ হইয়া আছে। (আয়তের অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে যে দুইটী শব্দ যোগ করিয়াছি, তাহার জন্য বায়জাভী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

চতুর্ব্বিংশ রুকু'

যুদ্ধের শর্ত্ত ও অনুমতি

১৮৯ তোমাকে তাহারা নূতন চাঁদগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে; বলিয়া দাও—এগুলি হইতেছে জনসমাজের উপকারের এবং হজ্জের জন্য সময় নিরূপক[১৭৬]; আর (ঐ হজ্জের চাঁদে) তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়া গৃহে সমাগত হও - ইহা পুণ্যকর্ম্ম নহে, বরং পুণ্যবান সেই ব্যক্তি -যে সংযমশীল হয়।[১৭৭] — এবং গৃহগুলিতে তাহার দ্বার দিয়া সমাগত হইবা, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে সাবধান থাকিবা, তাহা হইলেই তোমরা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবা।

١٨٩ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১৯০ এবং তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করে যাহারা, তাহাদিগের সহিত তোমরা যুদ্ধ কর — আল্লার পথে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিও না; কারণ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।[১৭৮]

١٩٠ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

১৯১ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ج فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

১৯১ আর তাহাদিগকে যেখানে পাইবে - নিহত করিবে, এবং যেস্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছে -তাহাদিগকে তোমরা সেস্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে, বস্তুতঃ ফেৎনা হইতেছে হত্যা অপেক্ষা কঠোরতর, — আর মছজিদুল - হারামের নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না- যাবৎ তাহারা সেখানে তোমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, তবে তাহারা যদি তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয় - তাহা হইলে তোমরাও তাহাদিগকে নিহত করিও,— কাফেরদিগের কর্ম্মফল এইরূপই (হইয়া থাকে)।[২১৯]

১৯২ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১৯২ কিন্তু তাহারা যদি (যুদ্ধ হইতে) বিরত হয়, তবে (তাহাদের অতীত অত্যাচারগুলিকে তোমরা ক্ষমা করিবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণানিধান।[২২০]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط فَإِنِ

এবং যে পর্য্যন্ত না ফেৎনা রহিত হইয়া যায় ও ধর্ম্ম আল্লার জন্য হইতে পারে - তাহাদের

اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ◎

সহিত যুদ্ধ করিবে সেই পর্য্যন্ত[১৮১]; কিন্তু তাহারা যদি বিরত হয়, তবে (তোমরাও ক্ষান্ত হইবে, কারণ) অত্যাচারীরা ব্যতীত আর কাহারও দণ্ডদান (সঙ্গত) নহে।

١٩٤ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ◎

১৯৪ নিষিদ্ধ মাসের বদলে নিষিদ্ধ মাস, এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান[১৮২]; অতএব কেহ যদি তোমাদের উপর অত্যাচার করে, - তবে, সে যে পরিমাণ অত্যাচার করিয়াছে - তাহার অনুরূপ দণ্ড তাহাকে প্রদান কর — আর আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে, এবং জানিয়া রাখিবে যে আল্লাহ্ সংযমশীল-দিগের সঙ্গে।

١٩٥ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ◎

১৯৫ আর তোমরা আল্লার পথে সদ্ব্যয় করিতে থাক এবং (তাহাতে কুণ্ঠিত হইয়া) নিজেদের শক্তি - প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিও না, আর হিতসাধন করিতে থাক, নিশ্চিত হিতকারী লোকদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

১৯৬ আর আল্লার উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাকে সম্পূর্ণ করিবে ; কিন্তু তোমরা যদি বারিত হও; তবে সহজলভ্য যে কোন কোর্‌বান (-জবেহ করিয়া ব্রতভঙ্গ করিবে), এবং কোর্‌বানগুলি স্বস্থানে না-পেঁাছা পর্য্যন্ত নিজেদের মাথা মুড়াইও না ; তবে তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা মস্তক সম্বন্ধে তাহার যদি কোন প্রকার ক্লেশ ঘটিয়া থাকে ; তবে (সময়ের পূর্ব্বে মাথা মুড়াইবার জন্য) তাহাকে ফিদ্‌য়া দিতে হইবে — তাহা রোজা হউক, ছদ্‌কা খয়রাত হউক, অথবা কোর্‌বানী হউক। অতঃপর তোমরা যখন নিরাপদ হইবে, সে অবস্থায় যে ব্যক্তি ওমরাকে হজের সহিত মিশাইয়া উপকৃত হইতে চায়, যে কোন কোর্‌বান সহজলভ্য হয় (তাহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট), তবে যে ব্যক্তি (কোর্‌বান) সংগ্রহ করিতে না পারে, সে অবস্থায় রোজা রাখিতে হইবে হজের সময় তিন দিন এবং (দেশে) ফিরিলে সাত দিন, — এই

١٩٦ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ
فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْىِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى
مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ
اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ
اَمِنْتُمْ قف فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْىِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا
رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ

হইল পূরা দশ দিন ;— এ ব্যবস্থা কেবল তাহারই জন্য, যাহার পরিজন মছজিদুল-হারামে উপস্থিত নাই ; এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে আর জানিয়া রাখিবে যে,— আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৮৮]

حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

টীকা :—

১৭৬ **আহেল্লা-নূতন চাঁদ :—**

আহেল্লা হেলাল-শব্দের বহুবচন, প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের চাঁদকে হেলাল বলা হয়। এই হেলাল বা নূতন চাঁদ সম্বন্ধে লোকে হজরতকে কি প্রশ্ন করিয়াছিল, উত্তরে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। রজব, জিল্‌কা'দা, জিল্‌হাজ্ ও মহরম এই চারি মাসকে আরবগণ নিষিদ্ধ বা সম্ভ্রান্ত মাস বলিয়া মনে করিত। এই সময় যুদ্ধবিগ্রহ এবং অন্যান্য সকল প্রকার লুটতরাজ ও অশান্তিউপদ্রব স্থগিত হইয়া যাইত, এবং লোকে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য কাফেলা লইয়া সর্ব্বত্র নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারিত। হজের জন্য কা'বার তীর্থযাত্রাও এই সময় সংঘটিত হইত। আরবগোত্র সমূহের সে সময়কার দুর্দ্ধর্ষ মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এছলাম তাহাদের এই সংস্কারে কোন আঘাত করে নাই।

ইহার পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে জেহাদ সংক্রান্ত যে সকল আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং হজের বিধিব্যবস্থাগুলির সহিত সেগুলিকে যেরূপ মিশ্রিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা এখানে প্রথম লক্ষ্য করার বিষয়। তাহার পর, এই হজ ও জেহাদ সংক্রান্ত আয়তগুলির সহিত যে সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, তাহাও স্মরণ করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে স্পষ্টভাবে জানা যাইবে যে, হজরতের হোদায়বিয়া-সন্ধি ও তাহার পর বৎসরের হজ সম্বন্ধেই এই আয়তগুলি নাজেল হইয়াছিল। ইহা হইতেছে ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরির ঘটনা। বদর, ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধ তাহার পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছিল।

হজরত কতিপয় মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীর জিকাদ মাসে তীর্থযাত্রা করেন। এই যাত্রায় কোরেশ ও তাহার বন্ধু-গোত্রগুলি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সকলেই করিতেছিলেন। এই আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে মুছলমানদিগকেও অস্ত্রধারণ করিতে

হইবে, কাজেই পবিত্র মাসের সম্ভ্রম হানি হইয়া যাইবে-এই প্রকার একটা সমস্যায় তখন অনেকের মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাই এই প্রশ্ন।

১৭৭ পশ্চাৎদিক দিয়া গৃহে প্রবেশ :—

হজের এহরাম বাঁধিয়া বাহির হওয়ার পর পুনরায় গৃহে প্রবেশ করার আবশ্যক হইলে, মদিনার আন্‌ছারগণ সদর দরজার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ দিক দিয়া, এমন কি, সুড়ঙ্গ কাটিয়া বাটীতে উপস্থিত হইতেন। আনছার ব্যতীত অন্যান্য গোত্রদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করার জন্য আলোচ্য আয়তটী নাজেল হইয়াছে বলিয়া কোন কোন ছাহাবা কর্ত্তৃকও রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে (বোখারী, তায়ালছী, হাকেম)। কিন্তু পণ্ডিত আবুওবায়দা বলেন—আয়তের শাব্দিক অনুবাদ করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, "গৃহে তাহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করা অথবা পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ না করা"—আরবী সাহিত্যের একটা 'ইডিয়ম' মাত্র। উহার অর্থ—প্রত্যেক কাজকে তাহার যথাযথ পন্থা দ্বারা সম্পাদন করা, অযথা উপায় অবলম্বন না করা। এখানে উহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয় কোন সংশয় উপস্থিত হইলে আলেম ও জ্ঞানী লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত, মূর্খ ও অজ্ঞান লোকদিগের বর্ণিত কুসংস্কারের অনুসরণ করা উচিত নহে (ফত্‌হুল-বয়ান)।

১৭৮ জেহাদ—আল্লার পথে :—

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরিতে সংঘটিত হোদায়বিয়ার ঘটনাগুলি এই রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৯৫ আয়তের ব্যাখ্যায় এই দাবীর সঙ্গতি স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। বদর, ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধগুলি ইহার পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ সংক্রান্ত আয়ত যে ইহার বহু পূর্ব্বে নাজেল হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। হাদিছ ও ইতিহাসের আলোচনা দ্বারা জানা যাইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে ছুরা হজ্জের ৩৯ ও ৪০ আয়তে মুছলমানদিগকে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে (ফৎহুল্‌বারী ৭—১৯৯, নাছাই আয়েশা হইতে এবং নাছাই, তেরমিজি ও হাকেম-এবনে-আব্বাছ হইতে)। এছলামের ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদের স্বরূপ কি, তাহা দেখিবার জন্য ছুরা হজ্জের ঐ আয়ত দুইটীর অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইল—কারণ তাহারা অত্যাচারিত, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিতে শক্তিমান। সেই সমস্ত লোক, যাহারা "আল্লাই আমাদের প্রভু"-কেবল এই কথা বলার অপরাধে, অন্যায়রূপে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। আল্লাহ যদি মানবসমাজের কতিপয় লোকের দ্বারা অন্যলোকদিগকে অপসৃত না করিতেন, তাহা হইলে মন্দির, গির্জ্জা, উপাসনালয় এবং

মছজিদ সমূহকে—যাহাতে বহুলভাবে আল্লার নাম করা হইয়া থাকে—বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইত।"

এই আয়তে জেহাদের কারণ ও লক্ষ্য উভয়ই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। যে অবস্থায় মুছলমান ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত হয়, স্বাধীনভাবে স্বধর্ম্মপালনে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বাধা দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়—সে অবস্থায় ধর্ম্মের সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, মুছলমানদিগকেও অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্মের স্বাধীনতা রক্ষা করাই হইতেছে এই জেহাদের উদ্দেশ্য, বলপূর্ব্বক অন্যকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা এছলামের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য নহে। এছলাম যেমন মুছলমানকে স্বাধীনভাবে স্বধর্ম্মপালনের অধিকার দিতেছে, সেইরূপ অন্যধর্ম্মাবলম্বী-দিগের সেই অধিকার স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিতেছে। তাই আয়তে মুছলমানের মছজিদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের মন্দির গির্জ্জা ও Synagogues বা উপাসনালয়গুলিরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছুরা হজের এই আয়ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, আলোচ্য ১৯০ আয়তে আবার মুছলমান-দিগকে নূতন করিয়া জেহাদের আদেশ বা অনুমতি দেওয়ার কারণ হইতেছে—নিষিদ্ধ মাস সংক্রান্ত আরববাসীর সংস্কার। হোদায়বিয়ার তীর্থযাত্রার সময় কোরেশ ও অন্যান্য গোত্রদ্বারা মুছলমানদিগের আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। অন্য সময় এই প্রকার আক্রমণের প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করা অসঙ্গত হইত না। কিন্তু নিষিদ্ধ মাসগুলিতে যুদ্ধ করা আরবের সংস্কার অনুসারে মহাপাপ। সুতরাং এ অবস্থায় আক্রান্ত হইলে, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে কি না—ইহাই ছিল হজরতের সহচরদিগের সংশয়ের বিষয়। এই নূতন সংশয় দূর করার জন্য নূতন করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই নিষিদ্ধ মাসের বাধাবিঘ্নকে অমান্য করিয়া কোরেশগণ যদি তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমরাও ঐ সময় অস্ত্রধারণ করিয়া অত্যাচারীদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইবে। আয়তে এই অস্ত্রধারণের তিনটী শর্ত্ত অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যথা:—(১) অন্যে যুদ্ধ না করা পর্য্যন্ত মুছলমান কাহাকেও আক্রমণ করিবে না, (২) তাহা হইবে আল্লার পথে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক যুদ্ধ, এবং (৩) শত্রুদিগের অত্যাচার ও আক্রমণ নিবারণের জন্য যতটা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত জুলুম জবরদস্তি করা মুছলমানের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। এইরূপ করিলে সীমালঙ্ঘন করা হইবে, সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে আল্লাহ প্রেম করেন না। সুতরাং তাঁহার প্রেমভিখারী মুছলমান ঐরূপ অনাচারে কখনই লিপ্ত হইতে পারে না। হজরত রছুলে করিম স্বয়ং বলিয়াছেন—নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যে যুদ্ধ, তাহা জেহাদ নহে। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া যে যুদ্ধ করা হয়, তাহা জেহাদ নহে। সমাজের নিকট যশ অর্জ্জনের করার ও লোক দেখাইবার জন্য যে যুদ্ধ, তাহাও জেহাদ নহে। কিন্তু—

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله -

অর্থাৎ—"আল্লার বাণী জয়যুক্ত হউক—একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যে, সেই কেবল আল্লার পথে" (ফৎহুল্ বায়ান)।

১৭৯ তাহাদিগকে ··· নিহত করিবে ঃ—

আয়তের প্রথমভাগে বলা হইতেছে—"তাহাদিগকে যেখানে পাইবে, নিহত করিবে"। এখানে 'তাহাদিগকে'-অর্থে, কাহাদিগকে ? একদল লেখক বলিতেছেন, এখানে তাহাদিগকে অর্থে—বিধর্ম্মীদিগকে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে, মুছলমানগণ যেখানে কোন অমুছলমানকে পাইবে, সেখানে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে—ইহাই হইতেছে এই আয়তের শিক্ষা। কিন্তু এছলামধর্ম্মের সমস্ত সামরিক অনুশাসন, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনের সমস্ত শিক্ষা এবং এছলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস একবাক্যে বলিয়া দিতেছে যে, উহা কোর্‌আনের কদর্থ ও অন্যায় ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ সমস্ত ছাড়িয়া কেবল আয়তের শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও, আমরা ঐ প্রকার অর্থের অসঙ্গতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিব।

১৯০ আয়তে বলা হইতেছে—'তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করে যাহারা, তাহাদিগের সহিত তোমরাও যুদ্ধ করিবা'। উহার অব্যবহিত পরে, এই আয়তে বলা হইতেছে—'তাহাদিগকে যেখানে পাইবে, নিহত করিবে'। সুতরাং এই 'তাহাদিগকে' অর্থে, মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করে যাহারা, কেবল সেই অমুছলমানদিগকে বুঝাইতেছে। ইহারা আক্রমণ করার পর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে, তখন সেই আক্রমণকারী শত্রুদিগকে যত্রতত্র হত্যা করা মুছলমানের পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। কা'বার চারিদিকে কএক মাইল ব্যাপিয়া একটী স্থান 'হরম' বা নিষিদ্ধ স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। উহার সীমানার মধ্যে বিশেষতঃ কা'বা গৃহের সন্নিধানে, কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ, নরহত্যা ও অশান্তি উপদ্রব ঘটাইবার অনুমতি নাই। হজরত এবরাহিমের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই বিধি সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। হোদায়বিয়ার হজযাত্রার সময়, নিষিদ্ধ মাসের সম্ভ্রমহানি করিয়া কোরেশগণ যেমন হজরতকে ও তাঁহার সহচরগণকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইরূপ কা'বার ও তাহার হরমের মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করিয়া ঐ নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে, বিশেষতঃ কা'বার নিকটে, তীর্থযাত্রী মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিতেও তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছিল। অথচ মুছলমানদিগের বংশগত সংস্কার এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে হরমের সীমানার মধ্যে নরহত্যা করা মহাপাপ। মুছলমানদিগের এই দুর্ভাবনা দূর করার জন্য বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, হরমের সীমায় সকল প্রকার শান্তিভঙ্গ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—তীর্থযাত্রীদিগকে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরুদ্বেগ করার জন্য, যেন তাহারা সম্পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তির সহিত সেখানে আল্লার এবাদত বন্দেগীতে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে। সেই তীর্থযাত্রীদিগকে

নিহত ও বিধ্বস্ত করার জন্য যাহারা অস্ত্রধারণ করিতেছে, হরমের সীমার মধ্যে তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সেখানে নিহত করা কোন মতেই অসঙ্গত হইবে না। ফলতঃ "যেখানে পাইবে ··· নিহত করিবে"-পদের তাৎপর্য্য এই যে, আক্রমণকারীরা হরমের সীমার ভিতরে কি বাহিরে আছে, সে বিচার তখন আর করা চলিবে না।

কোরেশগণ মুছলমানদিগকে তাঁহাদিগের গৃহ সম্পত্তি হইতে বাহির করিয়া দিয়া নিজেরা তাহার উপর অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। মুছলমানদিগকে বলা হইতেছে —অত্যাচারীদিগের কবল হইতে নিজেদের সেই সকল সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে সেই অন্যায় অধিকার হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া, তোমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য।

ফেৎনা-শব্দের আভিধানিক অর্থ—

ادخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته —

—"খাদ দূর হইয়া তাহার খাঁটি অংশ প্রকাশ পায়, এই উদ্দেশ্যে সোণাকে আগুনে দেওয়ার নাম ফতন্।" মোমেনদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করার জন্য অথবা তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের দণ্ডস্বরূপ বিধর্ম্মীরা তাহাদিগকে যে সব নির্য্যাতন করিয়া থাকে, কোর্‌আনের বহুস্থানে সেই নির্য্যাতন-গুলিকে ফেৎনা বলা হইয়াছে। রাগেব ইহার বহু উদাহরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন (৩৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

নরহন্তাকে নিহত করা সকলেই সঙ্গত মনে করিয়া থাকে। এক একটা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আরবগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া অসংখ্য নরহত্যা করিত, অথচ কেহ তাহাকে অসঙ্গত মনে করিত না। কিন্তু দৈহিক জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবন অধিকতর মূল্যবান। ধর্ম্মই সেই আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই ধর্ম্মে বাধা দিয়া, অত্যাচার ও নির্য্যাতন দ্বারা মানুষের স্বাধীন ধর্ম্মমতকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা পাইয়া, যে পাষণ্ডেরা তাহাদিগের অধ্যাত্মজীবনকে ধ্বংস করিতে চেষ্টিত, সাধারণ নরহন্তা অপেক্ষা তাহাদের পাপ অধিক গুরুতর। সুতরাং সেই অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই অসঙ্গত হইতে পারে না। "ফেৎনা হইতেছে হত্যা অপেক্ষা কঠোরতর"-পদের তাৎপর্য্য ইহাই।

১৮০ **তাহারা যদি বিরত হয়ঃ—**

ধর্ম্মের জন্য যে অত্যাচার ও নির্য্যাতন এতদিন তাহারা করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে যদি বিরত হয়—তীর্থযাত্রী মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া নিহত করার যে ষড়যন্ত্র তাহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে যদি ক্ষান্ত থাকে—তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্বের অপরাধগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়াই ক্ষমাশীল করুণানিধান আল্লার মোছলেম-বান্দাগণের কর্ত্তব্য।

১৮১ ফেৎনা-দিন ঃ—

"যে পর্য্যন্ত ফেৎনা রহিত হইয়া না যায় এবং ধর্ম্ম আল্লার জন্য হইতে না পারে"-সে পর্য্যন্ত বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করার আদেশ এই আয়তে দেওয়া হইয়াছে। একদল লোক বলিতেছেন, এখানে ফেৎনা শব্দের অর্থ কোফর ও শের্ক। অর্থাৎ যাবৎ কাফের ও মোশরেকগণ এছলাম গ্রহণ না করে, তাবৎ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করার আদেশ এই আয়তে দেওয়া হইতেছে। "যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগের সহিত তোমরাও যুদ্ধ কর"—"তাহারা যুদ্ধ হইতে বারিত হইলে, তোমরাও ক্ষান্ত হইবে, তাহাদের পূর্ব্ব অপরাধগুলি ক্ষমা করিবে"—ইত্যাদি যে সব উদার ব্যবস্থা এই রুকু'র পূর্ব্ববর্ণিত আয়তগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ শ্রেণীর লেখকদিগের মতে তাহা এই আয়তদ্বারা রহিত বা মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

আমাদের মতে এই অভিমতটী সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। কোর্‌আনের মর্ম্ম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝিতেন, এবং তাহার আদেশের বিপরীত কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব—এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এহুদী, পৌত্তলিক প্রভৃতি জাতির সহিত হজরত রছুলে করিম কিন্তু বরাবরই সন্ধি করিয়াছেন—সকলকে স্বাধীনভাবে স্বধর্ম্ম পালন করার অধিকার দিয়াছেন। যে হোদায়বিয়ার তীর্থযাত্রার কথা এই রুকু'তে বর্ণিত হইয়াছে, সে সময়ও তিনি মক্কার পৌত্তলিক কোরেশদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। রহমতুল-লিল-আলামীন যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণের উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে কোরেশদিগের এমন অন্যায় শর্ত্তগুলিও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—যাহাকে হজরত ওমর প্রমুখ ছাহাবাগণ মুছলমানের আত্মসম্মানের হানিকর বলিয়া ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হজরতের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা বরাবরই বলবৎ ছিল। হজরতের খলিফা চতুষ্টয়ের ইতিহাস এই উদার আদর্শে পরিপূর্ণ। বহু প্রদেশ ও লক্ষ লক্ষ অমুছলমান খেলাফতের মিত্র ও করদ 'জিম্মি' বলিয়া খলিফাগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। মুছলমান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—একথা তাঁহারা কেহই বলেন নাই।

ফেৎনা-শব্দের ধাতুগত ও ব্যবহারিক অর্থ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কোফর ও শের্ক সম্বন্ধে উহার প্রয়োগের কোন প্রমাণ অপর পক্ষ প্রদান করেন নাই। কোর্‌আনের সর্ব্বত্রই উহা কঠোর পরীক্ষা, বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত নির্য্যাতন এবং ইহারই সমভাবাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বোখারীর বর্ণিত হজরত এবনে-ওমরের একটী হাদিছে এই আয়তের ফেৎনা শব্দের তাৎপর্য্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এবনে-ওমর বলিতেছেন ঃ—

فعلنا على عهد رسول الله صلعم و كان الاسلام قليلاً و كان الرجل يفتن في دينه اما قتلوه و اما عذبوه - حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة -

—"যাবৎ ফেৎনা রহিত না হইয়া যায়, তাবৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর"—হজরতের সময় আমরা এই আয়ত অনুসারে কাজ করিয়াছি। সে সময় মুছলমান কম ছিল, ধর্ম্মের জন্য মুছলমানকে তখন ফেৎনায় আপতিত করা হইত—বিধর্ম্মীরা হয় তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত, না হয় নির্য্যাতিত করিত। তাহার পর মুছলমানের সংখ্যা অধিক হইয়া গেলে এই ফেৎনা রহিত হইয়া যায় (মনছুর ১—২০৬)। অতএব 'যাবৎ ফেৎনা রহিত না হয়' ইহার অর্থ—যাবৎ ধর্ম্মের জন্য বিধর্ম্মীদের অত্যাচার ও নির্য্যাতন স্থগিত না হয়।

মানুষ ধর্ম্ম পালন করিবে—স্বাধীনভাবে, একমাত্র আল্লার আদেশ বা নিষেধ বলিয়া। অত্যাচারী জালেমের দল তাহাতে বাধা দিয়া আল্লার আদেশ নিষেধকে রহিত করিয়া নিজেদের আদেশ নিষেধকে বলবৎ করিতে চায়। তাহাদের ফেৎনা বা অত্যাচার নিবারিত হইয়া গেলেই মানুষ স্বাধীনভাবে আল্লার ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইবে। লিল্লাহে-শব্দের লাম-বর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাব্দিক অনুবাদ করিলে يكون الدين لله -পদের অর্থ হইবে:—ধর্ম্মের কর্ত্তা হইবেন আল্লাহ। অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব চলিবে না। আল্লাহ যে কাজের আদেশ বা অনুমতি দিয়াছেন, কেহ জোর জবরদস্তি করিয়া তাহা করিতে না দিলে আল্লার কর্ত্তৃত্বকে অমান্য করা হয়। এইরূপে আল্লাহ যে কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, মানুষকে অত্যাচার পূর্ব্বক সেই কাজ করিতে বাধ্য করিলে, আল্লার কর্ত্তৃত্বের উপর মানুষের কর্ত্তৃত্বকেই বলবৎ করা হয়। ফেৎনা রহিত হইয়া আল্লার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত যাবৎ না হয়, মুছলমানকে তাবৎ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আদেশ এই আয়তে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বের আয়তগুলির সহিত এই আয়তের কোনই অসামঞ্জস্য নাই, কোর্‌আনে এই প্রকার অসামঞ্জস্য থাকা সম্ভবপরও নহে।

১৮২ নিষিদ্ধ মাস:—

রজব, জিল-কা'দা, জিল-হাজ্জা ও মহরম—এই চারি মাসকে নিষিদ্ধ মাস বলা হয় (১৭৫ টীকা দেখ)। নিষিদ্ধ মাসের বদলে নিষিদ্ধ মাস—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিষিদ্ধ মাসে অন্যকে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কেহ যদি নিষিদ্ধ মাসের সম্ভ্রম হানি করিয়া এই সময় মুছলমানদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ নহে। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হজরত রছুলে করিম ছাহাবাগণকে লইয়া মক্কার তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলে, নিষিদ্ধ মাসের অন্যায় সুযোগ লইয়া কোরেশগণ ঐ সময় কা'বার হরমের মধ্যে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল (মোস্তফা-চরিত ৬৩৫)। মুছলমানেরা তখন মহা সমস্যায় পড়িলেন—নিষিদ্ধ মাসে ও নিষিদ্ধ স্থানে যুদ্ধ করা অন্যায়। এ দিকে অস্ত্রধারণ না করিলে তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। ঐ সময় এই আয়ত নাজেল হয় এবং ইহাতে মুছলমানদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, আত্মরক্ষার জন্য নিষিদ্ধ মাসে ও নিষিদ্ধ স্থানে অস্ত্রধারণ করা অসঙ্গত নহে। আয়তের শেষভাগে বলিয়া দেওয়া হইতেছে

যে, অত্যাচার নিবারণ করার জন্য যে পরিমাণ দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত করিলে অসংযমের পরিচয় দেওয়া হইবে। আল্লাহ সংযমশীলদিগের সঙ্গী, সুতরাং তাঁহার সঙ্গপ্রার্থী-মুছলমান কখনই ঐরূপ অসংযম প্রকাশ করিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে "আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিবে"-বলিয়া এই ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে কোন প্রকার অতিরিক্ততা করিলে, মুছলমানকে তজ্জন্য আল্লার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

১৮৩ আল্লার পথে সদ্ব্যয় ... ইত্যাদি :—

"আল্লার পথে"-পদের অর্থ ১৭৮ টীকার শেষভাগে হাদিছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কোন প্রকার গোঁড়ামী অহমিকতা বা যশলিপ্সাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া, একমাত্র আল্লার কালামকে বলবৎ করার জন্য মুছলমানের যে অস্ত্রধারণ, কোর্‌আনের পরিভাষায় তাহাই আল্লার পথ। সত্যকে জয়যুক্ত করার জন্য এই যুদ্ধ মুছলমান মাত্রের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই এছলামের জেহাদ, কোর্‌আনের শত শত আয়তে মুছলমানকে এই জেহাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, হাদিছের গ্রন্থগুলি জেহাদের হুকুম ও ফজিলতের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এছলামের ও মুছলমানের রক্ষা কবচ ছিল-এই জেহাদ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ইংরাজী শিক্ষিত মুছলমানদিগের একদল যেমন জেহাদকে কাটিয়া কাটিয়া "নির্ম্মূল" করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, অন্যদিকে আরবী-শিক্ষিত আলেমদিগের অতি জঘণ্য কাপুরুষতার ফলে, এছলামের এই অন্যতম উপাদানটী আজ মুছলমানের জীবন সাধনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বরং পরীক্ষার সময় এই আয়তের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া অনেকেই মুছলমানকে বুঝাইয়া থাকেন :—"আপন জান্‌কে হালাকতির মধ্যে ডালিতে খোদা হাকিম মানা করিয়াছেন।" অতএব প্রত্যেক অন্যায় ও অসত্যের শয়তানের দরগাহে আত্মসমর্পণ করিয়া, নিরব নিস্তব্ধ হইয়া থাকাই দিনদার মুছলমানের পক্ষে জরুরী হইতেছে!

কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কোর্‌আনের স্পষ্ট তাহরিফ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আয়তের প্রথম অংশটাকে সুবিধাজনকভাবে বাদ দিয়া এবং শেষ অংশের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াই তাঁহারা এই অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। আয়তে বলা হইতেছে যে, জেহাদের আয়োজনের জন্য সর্ব্বদাই তোমরা অর্থব্যয় করিতে থাকিবে এবং এই ব্যয় কুণ্ঠিত হইয়া নিজদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিও না।

بايديكم -পদের তফছিরে অনেক কষ্টকল্পনা করা হইয়া থাকে। আমার মতে এখানে উহার অর্থ قوة বা শক্তি, এইরূপ অর্থগ্রহণ করা সাহিত্যের হিসাবে অসঙ্গত নহে (রাগেব)। এই হিসাবে আমরা আয়তের অর্থ করিয়াছি—এবং (ব্যয় কুণ্ঠিত হইয়া) নিজেদের শক্তি-প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিও না। যাহা হউক, কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে, যে,

জেহাদ পরিত্যাগ করিলেই মুছলমান ধ্বংস হইয়া যাইবে। কোর্‌আনকে অমান্য করার প্রতিফল আজ দুন্য়াজোড়া ধ্বংসলীলারূপে মুছলমানের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

এই আয়তটী যে জেহাদ সম্বন্ধেই নাজেল হইয়াছে, আবুআইউব আন্ছারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিছে তাহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে (আবুদাউদ, তিরমিজি, হাকেম প্রভৃতি)।

১৮৪ **হজ ও ওমরা ঃ—**

হজ্জের মাস ও দিন নির্দ্ধারিত আছে, হজ্জের জন্য মেনা ও আরাফাতে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ওমরার কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই, এবং সেজন্য মেনা ও আরাফাতে উপস্থিত হওয়ারও দরকার করে না। হজ্জের ও ওমরার সময় কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয় ঃ—এহরামের লেবাছ পরিতে হয়, ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়। এই সময় সকল প্রকার লড়াই ঝগড়া, অশ্লীলতা ও নারীচর্চ্চা হইতে বারিত থাকা হাজীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার ত্রুটী হইলে দণ্ডস্বরূপ কাফ্ফারা দিতে হয়। হজের সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর, যথাবিধি কোর্‌বানী দিয়া ব্রতভঙ্গ করিতে হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি ইহাতে বাধা দেয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ করিয়া কোর্‌বানী করা অসম্ভব, কাজেই এ অবস্থায় অগত্যা সহজলভ্য কোন একটা পশু কোর্‌বানী করিয়া ব্রতভঙ্গ করা চলিবে। হোদায়বিয়ার তীর্থযাত্রার সময় মক্কার মোশ্‌রেকগণ হজরতকে ও মুছলমানদিগকে এই ভাবে বাধা দিয়াছিল, এই রুকু'র আয়তগুলি সেই সব ঘটনা উপলক্ষে নাজেল হইয়াছে। কেহ যদি পীড়িত হইয়া পড়ে, অথবা উকুন প্রভৃতির জন্য যদি চুল রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, সে অবস্থায় সময়ের পূর্ব্বে মাথা মুড়াইবার অনুমতি তাহার আছে। তবে এজন্য তাহাকে ফিদ্য়া দিতে হইবে। তিন দিন রোজা রাখিলে কিম্বা ছয়জন কাঙ্গালকে অন্নদান করিলে, অথবা কোন একটা কোর্‌বানী দিলে এই ফিদ্য়া আদায় হইয়া যাইতে পারে।

হজ তিন প্রকার ঃ— এফরাদ, কেরান ও তামাত্তো'। শাউওয়াল, জিল্‌কাদ ও জিল্‌হাজকে হজের মওছম বা নির্দ্ধারিত সময় বলা হয়। মীকাত হইতে কেবল হজের নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিলে তাহাকে এফরাদ বলা হয়। এ অবস্থায় মক্কা শরিফে গিয়া সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্বে তাওয়াফ ও ছাফা মারওয়া দৌড়ান শেষ করিতে হয়। এফরাদের নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিলে হজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় এহরামের অবস্থায় থাকিতে ও এহরামের সমস্ত নিষেধ পালন করিতে হয়। কেরানের জন্য মীকাত হইতে একসঙ্গে হজ ও ওমরার নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিতে হয়। এ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছিয়া ওমরা শেষ করিয়া, হজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, এহরামের অবস্থায় থাকিতে ও সমস্ত নিষেধ পালন করিতে

হয়। মীকাত হইতে কেবল ওমরার নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিলে 'তামাত্তো' বলা হয়। এ অবস্থায় মক্কায় আসিয়া ওমরা পূরা করিয়া—অর্থাৎ তওয়াফ ও ছাফা মারওয়া শেষ করিয়া—হাজামত বানাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর ৮ই জিল্‌হাজ তারিখে আবার হজের নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিতে হয়। তামাত্তো'-শব্দের অর্থ উপকার গ্রহণ, এই প্রকারে মানুষ হজ ও ওমরা উভয়ই সম্পন্ন করিতে পারে, এবং মাঝের অবকাশ সময় এহরামের আদেশ নিষেধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। তামাত্তো'র নিয়ত করিলে সেজন্য একটা কোর্‌বানী দিতে হয়। কোর্‌বানী দিতে অসমর্থ হইলে, বিদেশী যাত্রীদিগকে, আয়তের বর্ণনা মতে, দশটী রোজা রাখিতে হয়।

পঞ্চবিংশ রুকু'

—∞—

হজ-সংক্রান্ত বিবরণ

১৯৭ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ

১৯৭ হজ্বের মাসগুলি (সকলের) বিদিত, অতএব ঐ মাসগুলির মধ্যে কেহ যদি হজের সঙ্কল্প করে - তবে 'হজ্‌কালে কোন প্রকার অশ্লীলতা, কোন প্রকার অনাচার এবং কোন প্রকার ঝগড়া - লড়াই সে করিতে পারিবে না।[১৮৫] এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম্ম (সম্পাদন) কর না কেন, আল্লাহ্ তাহা অবগত হন। আর তোমরা (নিজেদের) পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও —' বস্তুতঃ নিশ্চয় উৎকৃষ্টতম পাথেয় হইতেছে আত্মসংযম।[১৮৬] আর হে তত্ত্ব-দর্শীগণ ! -আমার প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাবধান হও !

১৯৮ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ

১৯৮ তোমরা নিজপ্রভুর প্রসাদ-লাভের চেষ্টা করিবে-তোমাদের প্রতি ইহাতে কোনই দোষ

বর্ত্তায় না[১৮৭]। অতঃপর আরাফাত হইতে ফিরিয়া আসার সময়, মাশআরুল - হারামের নিকট আল্লার স্মরণ (ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন) করিও, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিও সেইভাবে-যেভাবে (স্মরণ করিতে) তিনি তোমা-দিগকে হেদায়ৎ করিয়াছেন, যদিও তোমরা তৎপূর্ব্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছিলে[১৮৮]।

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

১৯৯ তাহার পর, সমস্ত লোক যেখান হইতে ফিরিয়া আসে-তোমরাও সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিও এবং আল্লার সমীপে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে থাকিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণানিধান।

١٩٩ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২০০ অনন্তর, তোমরা যখন (হজের) অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিয়া লও, তখন আল্লার মহিমাকীর্ত্তন করিও — যেমন (এছলামের পূর্ব্বে এই সময়) তোমরা নিজেদের পিতৃপুরুষগণের (কথা) আলোচনা করিতে-সেইরূপে, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে[১৮৯]। কিন্তু কোন কোন লোক এরূপ আছে-

٢٠٠ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا

فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ◎

যাহারা বলে ঃ—"হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে এই দুন্‌য়াতেই দিয়া দাও !" বস্তুতঃ পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই।

٢٠١ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ◎

২০১ আর তাহাদিগের মধ্যকার কেহ কেহ বলিয়া থাকে ঃ— "হে আমাদের প্রভু ! দুন্‌য়ায় আমাদিগকে মঙ্গলদান কর এবং পরকালেও মঙ্গল (দান করিও), আর আমাদিগকে নরকের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিও !"

٢٠٢ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ◎

২০২ এই যে লোকগুলি, ইহাদের (প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের) জন্য তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফল (নির্দ্ধারিত) আছে, আর আল্লাহ্ হিসাব-নিকাশ গ্রহণে অতি-ত্বরিত।

٢٠٢ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط وَمَنْ

২০৩ এবং (তশরিকের) গণিত দিনগুলিতে (মেনায় থাকিয়া) আল্লার স্মরণ ও তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তন করিতে থাকিও ! তবে কেহ যদি দুইদিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরিয়া যাইতে) তাড়াতাড়ি করে - তাহাতে তাহার উপর কোন পাপ বর্ত্তায় না, পক্ষান্তরে কেহ যদি দু'দিন বিলম্ব করে - তাহাতে তাহার

উপর কোন পাপ বর্ত্তায় না, যে সংযমসাধনা করে - তাহার জন্য (এই ব্যবস্থা)[২২২]। আর তোমরা আল্লার (প্রতি কর্ত্তব্য-পালন) সম্বন্ধে সাবধান থাকিও, এবং জানিয়া রাখিও যে, তোমাদের সকলকে তাঁহারই সন্নিধানে সমবেত করা হইবে।

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

২০৪ আর কোন কোন লোক এরূপ আছে - পার্থিব জীবন সংক্রান্ত যাহার কথা তোমাকে চমৎকৃত করিয়া তুলে, আর সে নিজের অন্তরস্থ (সততা) সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে সাক্ষীও করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হইতেছে কঠোর শত্রুতাপরায়ণ ব্যক্তি—

٢٠٤ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ لا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝

২০৫ অথচ যখনই সে 'সম্পন্ন' হইয়া উঠে - অমনই দুন্‌য়ায় ধাবিত হয়, কারণ সে চায় তথায় বিপর্য্যয় ঘটাইতে এবং ক্ষেত্র ও বংশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে-অথচ বিপ্লবকে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না—

٢٠٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

২০৬ আর তাহাকে যখন বলা হয়ঃ— "আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল !"

٢٠٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ

الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

প্রতিপত্তির অহমিকতা তাহাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করিয়া দেয় - অতএব নরকই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, আর তাহা হইতেছে অতি মন্দ আবাস।[১০৩]

٢٠٧ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

২০৭ পক্ষান্তরে কোন কোন লোক এরূপ আছে, আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে নিজের প্রাণকে (পর্য্যন্ত) বিক্রয় করিয়া ফেলে,[১০৪] আর আল্লাহ্ হইতেছেন সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহ-পরায়ণ।

٢٠ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ

২০৮ হে মো'মেনগণ! 'আত্মসমর্পণের ধর্ম্মে' প্রবেশ কর-সম্পূর্ণভাবে, আর শয়তানের পদরেখাগুলির অনুসরণ করিও না—নিশ্চয় সে হইতেছে তোমাদিগের স্পষ্ট শত্রু।

٢٠ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২০৯ পরন্তু স্পষ্ট দলিল প্রমাণগুলি তোমাদিগের নিকট সমাগত হওয়ার পরও যদি তোমরা পদস্খলিত হইয়া যাও, তবে জানিয়া রাখিও যে আল্লাহ্ হইতেছেন প্রবল, প্রজ্ঞাময়।[১০৫]

২১০ তাহারা কেবল এই অপেক্ষাই করিতেছে যে, শুভ্র মেঘমালার ছত্রতলে আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাগণ-কে সঙ্গে লইয়া সমাগত হইবেন আর সকল কার্য্য সমাধিত হইয়া যাইবে, এবং সমস্ত ব্যাপার প্রত্যাবর্ত্তিত হয় আল্লারই পানে।

২১০ هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّآ اَنْ يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ع

টীকা :—

১৮৫ **হজের নিষেধ :—**

শাউওয়ালের প্রথম তারিখ হইতে জিল্‌হজ্জের দশম তারিখ পর্য্যন্ত হজ্জের মওছুম, ইহা আরববাসী মাত্রেরই বিদিত। এই সময় হজ্জের নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধার পর কএকটা নিষেধ পালন করা হজযাত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। এই সময় সকল প্রকার অশ্লীলতার ভাব ও কাজ হইতে মনকে পাক রাখিতে হইবে, সকল প্রকার পাপ ও অনাচার হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে, লড়াই-ঝগড়ার সমস্ত কোন্দল কোলাহল হইতে আত্ম-সম্বরণ করিতে হইবে, ইহাই কোর্‌আনের আদেশ। এই সব আদেশ ভঙ্গ করিলে অনেক সময় তাহার জন্য কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হজযাত্রী একদিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপে কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করার চেষ্টা পাইবে, অন্যদিকে সকল সময় মহিমময় আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম ও তাঁহার মহিমা স্মরণ করিতে থাকিবে। এই আদেশ-নিষেধগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিপালন করার ফলে মানুষের মন যে পবিত্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, বাস্তবিকই তাহা অবর্ণনীয়। নামাজ, রোজা, হজ প্রভৃতি এছলামের সমস্ত অনুষ্ঠানে এই রিয়াজত বা যোগাভ্যাসের শিক্ষাই হইতেছে প্রধান উপাদান। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলাদেশের হজযাত্রীগণকে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া আপোষে ঝগড়া-বিবাদ করিতে দেখা যায়।

১৮৬ **পাথেয় সঞ্চয় :—**

"পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও"-পদের অর্থ সাধারণতঃ করা হয়—নিঃসম্বল অবস্থায় হজযাত্রা করিও না, মক্কা পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য পথের ব্যয় সংগ্রহ করিয়া লইয়া তবে যাত্রা করিবে, যেন বিদেশে গিয়া অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে না হয়। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ গ্রহণ

করিলে, আয়তের উপসংহার ভাগের সহিত এই অংশের সম্বন্ধ কিছুই থাকে না। "তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও-বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হইতেছে পর্‌হেজগারী বা সংযম"—ইহার অর্থ এই যে, হজযাত্রার সময়, এই যাত্রার আসল সাধনার প্রতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সে সাধনা হইতেছে—সংযমের অভ্যাস এবং ইহাই হইতেছে পরকালের মহাযাত্রার শ্রেষ্ঠতম সম্বল।

১৮৭ প্রভুর প্রসাদলাভ :—

ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যের দ্বারা মানুষ যে অর্থ উপার্জ্জন করে, কোর্‌আনের বিভিন্নস্থানে তাহাকে আল্লার 'ফজ্‌ল' বা প্রসাদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হজের লক্ষ্য ও সাধনার বিষয় অবগত হওয়ার পর, লোকে মনে করিতে লাগিল যে, ঐ সময় বাণিজ্য ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত হইলে পাপের ভাগী হইতে হইবে। আয়তে এই ধারণার প্রতিবাদ করা হইতেছে।

১৮৮ মাশআরুল্‌হারাম :—

মক্কা ও আরাফাতের পথে মেনা ও মুজ্‌দালেফা নামক দুইটী স্থান আছে। আরাফাত হইতে ফিরিবার সময় প্রথমে মুজ্‌দালেফা ও পরে মেনায় অবস্থান করিতে হয়। এই মুজ্‌দালেফার একটী পাহাড়ের নাম—মাশ্‌আরুল্‌হারাম। এখানে নামিয়া আল্লার জেক্‌র ও মোনাজাত প্রভৃতি করিতে হয়। মাশ্‌আরুল হারামের নিকটে-পদে, সমস্ত মুজ্‌দালেফাকে বুঝাইতেছে।

১৮৯ অসাম্যের প্রতিবাদ :—

কা'বার সেবক ও অধিকারী বলিয়া, হজরত এছমাইলের বংশধর বলিয়া, কোরেশগণ নিজেদের কৌলিন্যের অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছিল। কা'বা পুনর্নির্ম্মাণের পর তাহাদের এই অহঙ্কার চরমে উঠিয়া গেল। তখন পরামর্শ করিয়া সকলে ঘোষণা করিল—কোরেশ হইতেছে, কুলীন ও পুরোহিত জাতি। সুতরাং অন্যান্য লোকের মত তাহারা হজের জন্য আরাফাতে যাইবে না, মুজ্‌দালেফায় অবস্থান করিবে (বোখারী, এবনেহেশাম)। কোর্‌আন ইহার প্রতিবাদ করিয়া ঘোষণা করিতেছে—বংশ, বৃত্তি বা পৌরোহিত্যের জন্য মানুষের কর্ত্তব্যের বা অধিকারের ইতর বিশেষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ হজ হইতেছে, সাম্যবাদ ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রধান প্রকাশস্থল। সুতরাং অসাম্যের আপদ তাহার ত্রিসীমায়ও স্থানলাভ করিতে পারিবে না। অতএব জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব মোহাম্মদ মোস্তফা হইতে আরম্ভ করিয়া, আরবের দুর্ব্বলতর দাস পর্য্যন্ত সকলকেই হজের সময় আরাফাতে সমবেত হইতে এবং সেখান হইতেই একত্র যাত্রা করিতে হইবে। কুলীন ও পুরোহিতের জন্য এক

ব্যবস্থা, আর জনসাধারণের জন্য অন্য ব্যবস্থা—নিরপেক্ষ ও মঙ্গলময় আল্লার ধর্ম্মে এহেন জঘন্য বিধানের কোন স্থান নাই।

নবুঅত-লাভের পূর্ব্বেই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই জঘন্য মানসিকতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সময় একদা হজের মওছমে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ যখন নিজেদের কৌলিন্য ও পৌরোহিত্যের গৌরব রক্ষার জন্য মুজদালেফায় গিয়া সমবেত হইল এবং অকুলীন জনসাধারণ আরাফাতের দিকে যাত্রা করিতে লাগিল, তখন বজ্রকণ্ঠে এই অন্যায় মানসিকতার প্রতিবাদ করিয়া কোরেশের এই তরুণযুবক তথাকথিত অকুলীনদিগের সহিত মিশিয়া আরাফাতযাত্রা করেন এবং তাহাদের সঙ্গে আবার ফিরিয়া আসেন। নিজেদের কুলগৌরবকে এমনভাবে পদদলিত করাতে কোরেশের ক্রোধ ও অভিমান যে কিরূপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মজার কথা এই যে, যাহাদের মনুষত্বের অধিকারকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করার জন্য কোরেশগণ এই অন্যায় ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারাও তখন হজরতের এই কার্য্যকে অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় মোহাম্মদ মোস্তফা তাহাদের সমবেত সংস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া, এই অধর্ম্মের ধর্ম্মকে দলিত মথিত করিয়া ফেলিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। দুঃখের বিষয়, রছুলের এই শ্রেণীর ছুন্নতের উপর আমল করার লোক অতি বিরল।

১৯০ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিও!—

এছলামের পূর্ব্বে আরবগণ হজের পর একত্র সমবেত হইয়া, কবি ও কথকদিগের দ্বারা নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নামে নানা প্রকার অহঙ্কার ও আস্ফালন করিত। সঙ্গে সঙ্গে অন্য গোত্রগণের গ্লানি ও নিন্দাও আরম্ভ হইয়া যাইত। ফলে, যে হজ ছিল সাম্যের ও শান্তির সাধনক্ষেত্র, তাহাই আরবগোত্রগণের অসাম্য ও অশান্তির প্রধান কারণে পরিণত হইয়া যাইত। তাই আয়তে এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়া আদেশ দেওয়া হইতেছে যে, হজের পর নিজ নিজ গোত্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নামে অহঙ্কার না করিয়া, সকল বংশের সকল গোত্রের সমবেত মালেক যে আল্লাহ, সমবেত কণ্ঠে তাঁহারই নামে জয়জয়কার করিতে থাক। সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করিতে পারিলেই অসাম্যের সমস্ত সংঘর্ষ দূর হইয়া যাইবে। "মানুষ সকলেই সেই একমাত্র আল্লার আয়াল বা সন্তান"—এই শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই এছলামের ভ্রাতৃত্বজ্ঞানের সত্য অনুভূতি তোমাদিগের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

১৯১ ইহকাল ও পরকাল :—

ইহকাল ও পরকালের সমবায় মুছলমানের ধর্ম্মজীবন, এই উভয় জীবনের মঙ্গললাভের সাধনার নামই এছলাম। অতএব মুছলমানের কাম্য হইবে—ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের

মঙ্গল উভয়ই। কিন্তু একদল লোক কেবল এই জীবনের সুখসম্পদকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করে, নিজেদের পার্থিব কামনা বাসনাকে সফল করিয়া লইতে পারিলে তাহারা নিজেদের মানবজীবনকে সার্থক বলিয়া ধরিয়া লয়। আর একশ্রেণীর লোক কেবলই পরজীবনের চিন্তা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাহার পার্থিবজীবনটা যে কিরূপ বিভিন্নমুখী কর্ত্তব্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পরকালের মঙ্গললাভের জন্য সেই কর্ত্তব্যগুলি পালন করাও যে কতদূর আবশ্যক, তাহা তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না। প্রথমদল মনে করে—জড় ও নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত শেষ হইয়া গেল। বস্তুতঃ পাশবজীবন আর মানবজীবনের কোন পার্থক্য এই প্রবৃত্তির দাসগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। দ্বিতীয় দল মানুষকে ফেরেশ্‌তায় পরিণত করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু এই পশু ও ফেরেশ্‌তার সমাজ মানুষ কখনই নহে। সে উদ্দেশ্যেও আল্লাহ তাহাদিগকে পয়দা করেন নাই। এছলামের আদর্শ হইতেছে—একই সঙ্গে দুন্‌য়া ও আখেরাতের মঙ্গল সাধনা। হজরত রছুলে করিম দুন্‌য়াকেই পরকালের কৃষিক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এছলাম মানবধর্ম্ম, আয়তে সেই মানবধর্ম্মের সাধনার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু ছহি হাদিছে জানা যায়—হজরত অনেক সময় এই দোআটী পাঠ করিতেন।

১৯২ **গণিত দিনগুলি ঃ—**

জিল্‌হজ্জ মাসের ৯ তারিখে হজ সম্পন্ন করিয়া ১০ তারিখে মেনায় আসিয়া কোর্‌বানী করিতে হয়। তাহার পর ১১ই ১২ই ও ১৩ই পর্য্যন্ত মেনায় অবস্থান করিয়া জেক্‌র মোনাজাত প্রভৃতিতে তন্ময় হইয়া থাকা আবশ্যক। জিল্‌হজ্জ মাসের ১১ হইতে ১৩ তারিখ —এই তিন দিনকে 'আইয়ামে তশরিক' বলা হয়। আয়তে বর্ণিত "গণিত দিনগুলি"-দ্বারা তশরিকের এই তিন দিনকে বুঝাইতেছে। (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি প্রভৃতি—নজদীয়দিগের সংক্রান্ত হাদিছ দ্রষ্টব্য)। এই তিন দিন মেনায় অবস্থান করা উত্তম, তবে কেহ যদি দুই দিন পূর্ব্বে চলিয়া আসে, তাহাতে তাহার হজের কোন ক্ষতি হয় না।

১৯৩ **প্রতিপত্তির অহমিকা ঃ—**

২০৪ হইতে ২০৬ আয়ত পর্য্যন্ত নেতারূপী ভণ্ড মুছলমানদিগের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এখানে তাহাদের তিন প্রকার বিশেষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ—

(১) দুন্‌য়ার স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে, মুছলমান ও এছলামের নামকরণে ইহারা অনেক বড় বড় কথা বলিয়া সমাজকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। স্বজাতির স্বার্থ ও স্বধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য তাহারা যে আন্তরিকতার সহিত সাধনা করিয়া আসিতেছে, আল্লার নামে দিব্য করিয়া সর্ব্বদাই তাহারা সে কথা প্রচার করিয়া থাকে। কিন্তু কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে যে, তাহারা, বস্তুতঃ কঠোর কলহপরায়ণ ব্যক্তি। অর্থাৎ কেবল অন্যের সহিত কলহ করার

জন্যই তাহারা এই প্রকার সমাজ হিতৈষণার দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ কোন সৎ বা মহৎ উদ্দেশ্য তাহাদের সম্মুখে নাই।

(২) যতদিন তাহাদের মতলব হাসিল না হয়, ততদিন তাহারা জাতি ও ধর্ম্মের নাম করিয়া নিজেদের সমাজ হিতৈষণার আস্ফালন করিতে থাকে। কিন্তু নিজের স্বার্থ উদ্ধার হইয়া যাওয়ার পর এই লোকগুলি যখন আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে, তখন তাহারাই আবার দেশে অশান্তি উপদ্রব উপস্থিত করার চেষ্টা করে। এমন সব কাজ তাহারা তখন করিতে থাকে, যাহাতে জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষকসমাজ ধ্বংস হইয়া যায়।

(৩) তখন যদি কেহ তাহাদিগকে বলে—আল্লাহকে ভয় করিয়া এই অনাচার হইতে নিবৃত্ত হও! তবে প্রতিপত্তি ও সম্মানের শয়তান আসিয়া তাহাদের দাম্ভিকতাকে আরও প্রচণ্ড করিয়া তুলে, এবং নিবৃত্ত না হইয়া তাহারা অধিকতর অন্যায়াচরণে লিপ্ত হয়।

ক্ষেত্র অর্থে কৃষিক্ষেত্র, বংশ অর্থে এখানে কৃষিকার্য্যের ও অন্যান্য দরকারের জন্য আবশ্যক - পশুবংশ। অর্থাৎ কৃষকের স্বার্থ নষ্ট করিয়া তাহারা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

১৯৪ **আল্লার সন্তোষ** :—

পূর্ব্বের আয়তগুলিতে যে দলের কথা বর্ণিত হইয়াছে, কোন সৎ উদ্দেশ্য বা মহান আদর্শ তাহাদিগের সম্মুখে নাই, কোন গতিকে নিজেদের অভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া লওয়াই তাহাদের সমাজ হিতৈষণার সমস্ত দাম্ভিকতার একমাত্র কারণ। তাই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সামান্য আঘাত লাগিলে, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সকল লোকই এরূপ ভণ্ড ও স্বার্থপর নহে। এক শ্রেণীর লোক এরূপ আছে-যাহাদের সমস্ত সাধনার একমাত্র সাধ্য হইতেছে—আল্লার সন্তোষ। এজন্য পরীক্ষার সমস্ত বিভীষিকা পদদলিত করিয়া অগ্রসর হইতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি দরকার হইলে তাহারা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত।

কি প্রকার কার্য্যের দ্বারা আল্লার সন্তোষ লাভ করা যাইতে পারে, আয়তের শেষভাগে তাহার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আদর্শ নেতা ও সাধক সেই, আল্লার সন্তোষ লাভের একমাত্র উদ্দেশ্যে যে নিজকে বিক্রয় করিয়া ফেলে, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে—"আর আল্লাহ হইতেছেন সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহপরায়ণ।" অতএব আল্লার সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ পায় যে কাজে, সেই কাজের দ্বারাই তাঁহার সন্তোষ লাভ করা যায়।

১৯৫ ছেল্‌ম—কাফ্‌ফাতান :—

ছেল্‌ম-শব্দের মূল অর্থ—ছোলে করা, সন্ধি করা, বিবাদ বিসম্বাদ মিটমাট করিয়া ফেলা (জওহরি, মেছবাহ, রাগেব)। কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়তে এই অর্থেই ছেল্‌ম শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। যেমন ان جنحوا للسلم ইত্যাদি। এই ছ-ল-ম ধাতু হইতেই ছালাম ও এছলাম শব্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে, উহার অর্থ—শান্তি ও আত্মসমর্পণ। পূর্ব্ব আয়তে আদর্শ মুছলমানের স্বরূপ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে :—আল্লার সন্তোষ মাত্রই তাহার সমস্ত কর্ম্ম-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য এবং এজন্য নিজের প্রাণকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহাই হইতেছে পূর্ণ এছলাম। এই আয়তে মুছলমান জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে এই পূর্ণএছলাম গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে।

ছুরা নুরে বর্ণিত হইয়াছে :—"যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্কগুলির অনুসরণ করে (তাহার আর কল্যাণ নাই), কারণ শয়তান মানুষকে অশ্লীল ও অসাধু কাজেরই আদেশ করিয়া থাকে (২১ আয়ত)। সুতরাং যে বৃত্তি মানুষকে অশ্লীল ও অসাধু কাজের দিকে প্ররোচিত করে, তাহাই হইতেছে শয়তানের পদরেখা।

১৯৬ আল্লাহ প্রবল, প্রজ্ঞাময় :—

নবী ও কেতাব পাঠাইয়া আল্লাহ নিজের হেদায়তকে পূর্ণ পরিণত করিয়া দিয়াছেন। সত্য মিথ্যা এবং ন্যায় অন্যায় স্পষ্টভাবে দেদীপ্যমান হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কেহ যদি পদস্খলিত হইয়া যায়, সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যাকে অবলম্বন করে—মুখে মুছলমান হওয়ার দাবী করে, আর ধন প্রাণের সামান্য ক্ষতির আশঙ্কা হইলে এছলামের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়া বসে, তাহা হইলে, তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও প্রবল উভয়ই। অর্থাৎ তাঁহার প্রজ্ঞা কর্ম্মফলের যে স্বাভাবিক নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার প্রবল শক্তি যে নিয়মকে দুন্‌য়াময় চিরকাল বলবৎ করিয়া রাখিয়াছে, সেই নিয়মের অধীনে আসিয়া তোমাদিগকে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে হইবে।

১৯৭ আল্লার আগমন :—

এছলামের আদর্শ হইতে স্খলিত হওয়ার পর মানুষ যখন সকল দিক দিয়া পতিত হইয়া পড়ে, নিজকে ধ্বংসের সমস্ত উপকরণদ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া তাহার আত্মা যখন চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কেবলই চীৎকার করিতে থাকে—আল্লাহ, মুছলমানকে রক্ষা কর! কর্ম্মবিমুখ কাপুরুষের এ সমস্ত আর্ত্তনাদই ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু তবুও অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াও নানা প্রকার আকাশ কুসুম কল্পনা দ্বারা সে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে থাকে। আয়তে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ধিক্কার দিয়া বলা

হইতেছে ঃ— তোমাদের এ সকল কল্পনার কোনই সার্থকতা নাই। তোমরা ভাবিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা কর্ম্মবিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিব, আর আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদিগকে লইয়া শুভ্র মেঘমালার ছত্রতলে সমাগত হইবেন, আর তোমাদিগের বাসনাগুলি পূর্ণ করিয়া দিবেন। কিন্তু এ তোমাদের মিথ্যা আশা, উত্থানের জন্য তিনি তাঁহার কেতাবে ও তাঁহার মহানবীর মারফতে কতকগুলি সাধনাকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বের ও পরের আয়তে যাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ আল্লার রাজ্যে সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ একেবারে অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ের মুছলমানদিগের প্রতি আয়তটী যে কতদূর প্রযুজ্য, পাঠকগণকে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ষড়বিংশ রুকু

—ooo—

পরীক্ষা ও জেহাদ

২১১ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ বনি-এছরাইলকে-কত স্পষ্ট প্রমাণই না আমরা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম ! এবং নিজের নিকট সমাগত হওয়ার পর কেহ যদি আল্লার নে'মৎকে বদলাইয়া ফেলে, তবে (জানিয়া রাখিও) নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠিন দণ্ডদাতা[১৯৮] ।

٢١١ سَلْ بَنِيٓ اِسْرَاءِيلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

২১২ কাফেরদিগের পক্ষে পার্থিব-জীবনকে শোভনীয় করা হইয়াছে, তাহারা আবার মো'মেনদিগের সহিত বিদ্রূপ করিয়া থাকে ; আর মো'মেনগণ কিয়ামতের দিনে তাহাদিগের উচ্চে (অবস্থিত হইবে), অধিকন্তু আল্লাই যাহাকে ইচ্ছা অপর্য্যাপ্ত উপজীবিকা দান করিয়া থাকেন[১৯৯] ।

٢١٢ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا م وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

২১৩ সমস্ত লোকই একমণ্ডলীভুক্ত ছিল[২০০], অতঃপর আল্লাহ্ সু-

٢١٣ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف

فبعث الله النبين مبشرين و منذرين ص وانزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ط وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينت بغيا بينهم ط فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ط والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

সংবাদবাহক ও সতর্ককারী নবিগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত সত্য-সহকারে কেতাব নাজেল করিলেন—যেন (ঐ কেতাব) তাহাদের মতভেদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়। অথচ কেতাব-প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহারা, স্পষ্ট নিদর্শন সকল তাহাদিগের নিকট সমাগত হওয়ার পর, পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ-বশতঃ তাহারা সেই কেতাবকে লইয়া মতভেদ ঘটাইয়া বসিল[২]। অতঃপর আল্লাহ্ নিজঅভিপ্রায়-ক্রমে মো'মেনদিগকে সেই সত্যপথ দেখাইয়াছিলেন — যাহা লইয়া তাহারা বিসম্বাদ করিতেছিল, আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন[৩০২]।

٢١٤ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا

২১৪ তোমরা কি মনে করিয়া লইয়াছ যে (অমনি বিনা পরীক্ষায়) বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে ! অথচ তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী (উম্মত) গণের ন্যায়

مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

কোন (বিপদ) এখনও তোমাদিগের নিকট সমাগত হয় নাই; তাহারা ধনে প্রাণে ঘোরবিপদে বিপন্ন হইয়াছিল এবং এমনভাবে আলোড়িত হইয়াছিল যে, (সেই যুগের) রছুল ও তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল যাহারা-তাহারা সকলে (আর্ত্তস্বরে) বলিয়া উঠিল — আল্লার সাহায্য (আর) কবে আসিবে ? সাবধান ! (পরীক্ষায় বিচলিত হইও না), নিশ্চয় আল্লার সাহায্য নিকটবর্ত্তী।

٢١٥ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

২১৫ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে — " কিরূপ ব্যয় করিবে তাহারা ? " বল—যাহা কিছু অর্থ তোমরা ব্যয় কর না কেন-তাহা পিতামাতার, ও আত্মীয়গণের, ও পিতৃহীনদিগের, ও কাঙ্গালগণের, ও (দুস্থ) পথিকগণের প্রাপ্য। আর যে কোন সৎকর্ম্ম তোমরা সম্পাদন কর না কেন, আল্লাহ্ তাহা সম্যকরূপে অবগত।

٢١٦ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

২১৬ জেহাদকে তোমাদিগের জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত করা হইয়াছে - এবং

وهو كره لكم ج وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ج وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ط والله يعلم وانتم لا تعلمون ع

তোমাদিগের নিকট তাহা অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করিতেছ - যাহা তোমাদিগের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করিতেছ - যাহা তোমাদিগের পক্ষে বাস্তবিকই অহিতজনক; এবং আল্লাই (তোমাদিগের ইষ্ট ও অনিষ্ট) অবগত আছেন - আর তোমরা তাহা অবগত নহ।[২০৬]

টীকা :—

১৯৮ **স্পষ্ট প্রমাণ :—**

কেহ কেহ বলেন :—শেষনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন সম্বন্ধে যে সকল সুসংবাদ তাওরাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে এখানে স্পষ্ট প্রমাণ বলা হইয়াছে। হজরতের ও তাঁহার জন্মস্থানেয় নাম পর্য্যন্ত তাওরাতে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু আল্লার এই পরম নে'মতরূপী শেষনবী যখন তাহাদিগের নিকট সমাগত হইলেন, তখন সেই নে'মতকে গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া, অস্বীকার করিয়া বসিল'। এইরূপে আল্লার নে'মতের অবমাননা যাহারা করে, আল্লার কঠোর দণ্ডের ভাগী তাহাদিগকে নিশ্চয়ই হইতে হইবে—তাহারা বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু আমার মতে এই নে'মতের কথা কোর্‌আনেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছুরা মায়দার ২০ আয়তে নবুঅত ও রাজত্বের অধিকারকেই এই নে'মৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বনি-এছরাইল এই উভয় নে'মতেরই অবমাননা করিয়াছিল আল্লার নবীগণকে অস্বীকার করিয়া এবং জেহাদকে পরিত্যাগ করিয়া। এই ছুরার ২৪৬ আয়তে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন :— فلما كتب عليهم القتال تولوا ... الاية

অর্থাৎ—"তাহাদিগের উপর জেহাদকে যখন ফরজ করিয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল ...।" বনি-এছরাইল এইরূপে নবীগণকে অমান্য করিয়া এবং জেহাদকে পরিত্যাগ করিয়া আল্লার নে'মতের অবমাননা করিয়াছিল। তাই আল্লার দণ্ড আসিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজত্বের নে'মত হইতে বঞ্চিত হইয়া তখন তাহারা পরজাতির অধীনতার লা'নতে অভিশপ্ত হইয়াছিল। আয়তে বলা হইতেছে যে, যে কোন জাতি এইরূপে জেহাদ পরিত্যাগ করিয়া বসিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকেও এহুদীদিগের ন্যায় বিধর্ম্মী বিজাতির গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে, এবং এই গোলামীই হইতেছে মানবজীবনের প্রধান লা'নৎ। রুকূ'র উপক্রম ও উপসংহারের সহিত এই অর্থই সমঞ্জস হইতে পারে।

১৯৯ **পার্থিব জীবনের মায়া ঃ—**

কাফের পার্থিব জীবনের সুখ ও স্বস্তির মোহে মানবজীবনের প্রকৃত মর্য্যাদা ও লক্ষ্যকে বিস্মৃত হইয়া বসে। তাই দৈহিক ভোগবিলাসে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় যে কাজে, অথবা ধন প্রাণের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে যে পরীক্ষায়, পার্থিব-জীবনমোহে প্রবঞ্চিত কাফের, তাহার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করিতে পারে না। অথচ এই কাপুরুষেরা আবার মো'মেন-দিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কারণ, আল্লার পথে জেহাদে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা অদূরদর্শী মূর্খের মত মরণকে বরণ করিয়া লয়, আল্লার নামকে জয়যুক্ত করার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ-গুলি লুটাইয়া দিয়া তাহারা দারিদ্র্যকে ডাকিয়া লয়। এই বুদ্ধিমান দলের অস্তিত্ব চিরকালই বিদ্যমান আছে। ইহাদের অভিধানে এই শ্রেণীর ত্যাগ ও মহত্ত্ব বোকামীর প্রতিশব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আল্লাহ বলিয়া দিতেছেন—কিয়ামতের দিন ঐ বিশ্বাসীরা সম্মানে ও মর্য্যাদায় ইহাদিগের অপেক্ষা বহু উচ্চ আসন লাভ করিবে। কিয়ামত হইতেছে 'য়্যাওমুদ্দিন' বা কর্ম্মফল পাওয়ার দিন। মো'মেনগণের এই কর্ম্মের ফল এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ হইবে এবং কিয়ামতে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিয়ামতে তাহারা উচ্চ মর্য্যাদা পাইতে সমর্থ হইবে—দুন্য়ার ত্যাগ, সাধনা ও মহৎচরিত্রের পুরস্কাররূপে। এইরূপ ত্যাগ, সাধনা ও মহত্ত্বের অধিকারী যাহারা, দুন্য়াতেও তাহাকে কেহ অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে না। জেহাদের কাজে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইয়া সঞ্চয়ী বুদ্ধিমান, মো'মেনদিগকে অদূরদর্শী ও মূর্খ বলিয়া বিদ্রূপ করে। কিন্তু এই অজ্ঞ কাফেরদিগের জানা নাই যে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ ত্যাগের এই সাধনা যে জাতি অবলম্বন করে, তাহাদের দৈন্য দারিদ্র্য অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না, আল্লার ফজলে অচিরে তাহারা অগাধ ধনসম্পদেরও মালেক হইয়া যায়।) এই আয়তের দ্বারা হজরতের সমসাময়িক মো'মেনদিগের আশু সাফল্যের সুসংবাদও দেওয়া হইতেছে।

২০০ **সমস্ত লোক** :—

"সমস্ত লোক"-বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইতেছে—ইহা লইয়া অকারণে অনেক মতভেদ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানকার বর্ণনাধারার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে সহজে জানা যাইবে যে, এখানে এহুদীজাতির সমস্ত লোককে লক্ষ্য করা হইয়াছে—রুকু'র প্রথম আয়তে যাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। হজরত মূছার সময় বনি-এছরাইল নিজেদের সমস্ত বিরোধ বিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া আল্লার নামে সংহত হইয়াছিল। এখানে সেই অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইতেছে। আমাদের মতে ইহাই সহজ সরল ও কোর্‌আনের বর্ণনা ধারার সহিত সমঞ্জস তাৎপর্য্য (দেখ—কবির ২—৩০৫)। অবশ্য পরোক্ষভাবে দুন্‌য়ার সমস্ত গ্রন্থধারী জাতি সম্বন্ধে ইহার ব্যাপক তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২০১ **পুনরায় মতভেদ** :—

হজরত মূছা ও তাঁহার পরবর্ত্তী নবীগণ আল্লার কেতাব লইয়া আসিলেন, আল্লার কেতাব তাহাদের মতভেদের কারণগুলি মীমাংসা করিয়া দিল। কিন্তু ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষবশতঃ জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া বনি-এছরাইল আবার গৃহবিচ্ছেদে লিপ্ত হইয়া পড়িল, আল্লার কেতাবকে লইয়াই তাহারা দলাদলি পাকাইয়া বসিল, ধর্ম্মকেই তাহারা ঘোর অনর্থের কারণে পরিণত করিয়া তুলিল।

২০২ **নূতন সাধক দল** :—

উপরোক্ত বিরোধ ও বিচ্ছেদের অবস্থায়, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গে আল্লার মঙ্গল অভিপ্রায়ে এক নূতন সাধকদলের আবির্ভাব হইল। বনি-এছরাইল জাতি বিশেষ করিয়া এবং দুন্‌য়ার অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ সাধারণভাবে, ধর্ম্মের যে সকল বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছিল, তাহার সত্য ও সঙ্গত সমাধান তিনি মো'মেনদিগকে কোর্‌আনের মারফতে বুঝাইয়া দিলেন। ফলতঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য মুছলমানের আবির্ভাব হয় নাই, বরং ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিশ্ব সমস্যার চরম সমাধান করার জন্যই তাহার আগমন।

পাঠক দেখিতেছেন, এখানে 'তাহার পর মোহাম্মদকে নবীরূপে প্রেরণ করিলাম'-এইরূপ না বলিয়া, বলা হইতেছে — 'তাহার পর আল্লাহ মো'মেনদিগের আবির্ভাব করিলেন।' কারণ দেহের হিসাবে নবী ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তিনি অমর হইয়া থাকেন, নিজের শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রদত্ত সেই শিক্ষা এবং তাঁহার প্রদর্শিত সেই সাধনা সজীব হইয়া সফল হইয়া প্রকাশ পায়—তাঁহার অনুসারী উম্মতিগণের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়া। তাই এখানে নবীর উল্লেখ না করিয়া তাঁহার আদর্শের

অনুসরণকারী মো'মেনদিগের কথাই বলা হইয়াছে। উম্মতে মোহাম্মদের মো'মেনগণের দায়িত্ব যে কতদূর গুরুতর, এই বর্ণনা ধারাদ্বারা তাহাদিগকে সে কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত বিরোধ ও মতভেদের সমাধান করিয়া দিবার জন্য যে উম্মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারাই আজ কোর্‌আনের ধর্ম্মকে শতধা বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই আজি নিজদিগকে একটা অসমাধ্য সমস্যায় পরিণত করিয়া লইয়াছে। এই শোচনীয় দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে এই দলাদলির গণ্ডীগুলিকে পদদলিত করিয়া, নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। আমরা মোছলেম, ইহা ছাড়া কোন নাম, কোন বিশেষণ আমরা জানি না—আমাদের ধর্ম্ম এছলাম, ইহা ব্যতীত কোন গণ্ডী, কোন দল, কোন মজহাব আমরা মানি না—দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করাই এখন মো'মেন মাত্রেরই কর্ত্তব্য। দলাদলির অভিশাপ মুক্ত হইয়া কোর্‌-আনের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে পারিলেই আমরা আবার দেখিতে পাইব যে, এছলাম সমস্যা নহে, বরং বিশ্বসমস্যার একমাত্র সমাধান।

২০৩ **পরীক্ষা ও পুরস্কার :—**

হাদিছে আছে, হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন—আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন, অথচ তিনি তোমাদিগের সম্বন্ধে অজ্ঞও নহেন। আসল কথা এই যে, তোমরা যেমন সোণাকে আগুনে নিক্ষেপ করিয়া যাঁচাই করিয়া থাক, সেই আল্লাহ তোমাদিগকে অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া খাঁটি করিয়া লন, খাদগুলিকে বাছাই করিয়া ফেলেন (হাকেম)। মুখে ধার্ম্মিকতার অহঙ্কার সকলেই করিয়া থাকে। কিন্তু কে ভক্ত আর কে ভণ্ড, তাহার যাঁচাই হইয়া যায় পরীক্ষাদ্বারা।

আজকাল আমরা অনেকেই মুছলমানকে বেহেশ্‌তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াজ শুনাইয়া থাকি। আয়তে বলা হইতেছে—বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নহে। যে পথে বিপদ নাই, পরীক্ষার বিভীষিকা নাই, তাহা বেহেশ্‌তের পথ কখনই নহে। পুরস্কারলাভের জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, স্বর্গের পথ জেহাদের ত্যাগ ও ধৈর্য্যসাধনাদ্বারা নির্ম্মিত করিয়া লইতে হয়। ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জাতিই এই জেহাদের অগ্নিপরীক্ষাকে এড়াইয়া মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে নাই। বরং তাহারা নানা আপদে বিপদে আপতিত হইয়াছিল, তাহাদের জাতীয় অস্তিত্বের ভিত্তি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল এমনকি পরীক্ষার চরম সময় চঞ্চল হইয়া, আল্লার সাহায্য লাভের জন্য তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। কোর্‌আন বলিতেছে—পরীক্ষার ভীষণতা দেখিয়া বিচলিত হইও না, নিরাশ হইও না। আল্লার সাহায্য তোমাদের নিকটেই আছে, সময় হইলেই অনন্ত-মঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া সে সাহায্য তোমাদিগের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবে। এক আয়তে

পরে জেহাদের স্পষ্ট আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, এই আয়তগুলি তাহার উপক্রমস্বরূপে নাজেল হইয়াছে।

২০৪ কিরূপ ব্যয় করিবে ?—

একদল তফছিরকার মনে করেন যে, এখানে প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা আয়তের "মা" শব্দের অনুবাদ করিতেছেন "কি" বলিয়া। এই হিসাবে আয়তের অনুবাদ এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—"তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি ব্যয় করিবে তাহারা ?" কিন্তু উত্তরে কি ব্যয় করিবে, তাহা না বলিয়া কোথায় ব্যয় করিবে, তাহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে। সুতরাং প্রশ্নের সহিত উত্তরের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। এই অসামঞ্জস্যের কারণ দেখাইবার জন্য তাঁহারা অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। শেখুল-এছলাম মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবদুহু বলিতেছেন, গ্রীকদর্শনের পরিভাষাগুলির অন্ধ-অনুকরণের ফলেই তাঁহারা এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অন্যথায় আরবীসাহিত্যের দিক দিয়া এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। কারণ, স্বরূপ ও প্রকারের প্রশ্নেও 'মা'-শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আরবী সাহিত্যে আছে। হজরত মুছার সহিত গো-কোর্‌বানী সংক্রান্ত আলোচনায় বনি-এছরাইল জিজ্ঞাসা করিতেছে ما هي ? এখানে 'মা'-শব্দের অর্থ "তাহা কি ?" না হইয়া "তাহা কি প্রকার ?" হইবে। সকলে ইহা স্বীকার করিতেছেন, কারণ কোর্‌বান যে গরু, অন্য পশু নয়, একথা বনি-এছরাইলের খুবই জানা ছিল। তাহারা প্রশ্ন করিয়াছিল গরুর প্রকার সম্বন্ধে। এখানেও সেইরূপ ছাহাবাগণ কি বস্তু দান করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, বরং দানের প্রকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন। স্বজনগণের প্রতিপালনের জন্য খরচ করা, দুস্থ কাঙ্গাল দুঃখীদিগকে দান করা, জেহাদের জন্য ব্যয় করা, ব্যয়ের এইরূপ অনেক প্রকার আছে। ইহার মধ্যকার কোন্ প্রকার ব্যয় তাঁহাদের আশু কর্তব্য, ইহাই ছিল তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য। সুতরাং প্রশ্নের ও তাহার উত্তরের মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য নাই (তফছির ২—৩১৪)।

মুছলমান যে কোন অর্থ ব্যয় করিবে-তাহার প্রথম হকদার অভাবগ্রস্ত পিতামাতা, দ্বিতীয় হকদার নিস্বআত্মীয় স্বজনগণ, তৃতীয় হকদার পিতৃহীন এতীম, চতুর্থ হকদার সাধারণ কাঙ্গাল দুঃখীগণ, পঞ্চম হকদার বিপদগ্রস্ত বিদেশীগণ। যথাক্রমে এই হিসাবে অর্থব্যয় করা উচিত। পাঠক দেখিতেছেন, ইহার পূর্ব্বে ও পরে জেহাদের আদেশ ও তাহার কঠোর পরীক্ষার বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইতেছে। সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, উপক্রম উপসংহারের সহিত এই আয়তের কোন সংশ্রব নাই। আমার মতে কোর্‌আনের আয়তগুলির তরতিব সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ইহা অসংলগ্ন আয়ত কখনই নহে। বরং একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ইহার পূর্ব্বে ও পরে বর্ণিত বিষয়-গুলির মধ্যকার অতি গভীর, অতি নিগূঢ় তত্বটী এই আয়তে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জেহাদের আয়োজন করার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক হয় অর্থের। কিন্তু যখনই জেহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করার দরকার উপস্থিত হয়, তখনই আমরা ভাবিতে বা বলিতে আরম্ভ করি—'আমার পিতামাতা আছেন, দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন আছে, তাঁহাদের অভাব পূরণ করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য।' আমাদের মধ্যকার কেহ কেহ আবার গম্ভীরভাবে বলিতে থাকেন—দেশের কাঙ্গাল গরীবরা খাইতে পাইতেছে না, এতিমদিগের শিক্ষার বা প্রতি-পালনের কোন ব্যবস্থা অর্থাভাবে হইতে পারিতেছে না, এগুলির প্রতিকার করাই এখন মুছলমানের আশুকর্ত্তব্য। এ সবগুলির প্রতিকার হইয়া গেলে পর, তখন যাহা হয় দেখা যাইবে। কিন্তু আয়ত বলিয়া দিতেছে যে, শয়তানের কুহকে এই অজ্ঞতার পর্দ্দা তোমাদিগের চোখের উপর পড়িয়া গিয়াছে, তাই প্রকৃত অবস্থা অবগত না হইয়া তোমরা নিজেদের কপট মানসিকতাকে এমনভাবে প্রশ্রয় দিতেছ। নিজেদের স্বজনগণের অথবা স্বদেশস্থ দীন-দুঃখীদিগের অভাবের প্রতিকারের জন্য তোমরা এইভাবে যে অর্থব্যয় করিতে চাহিতেছ, তাহাদ্বারা অভাবের স্থায়ী প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু সেই অর্থ যদি জেহাদের আয়োজনে ব্যয় কর, তাহা হইলেই তাহার ব্যাপক ও চিরস্থায়ী প্রতিকার হইয়া যাইবে—তোমাদেরই স্বজনগণ আর তোমাদিগের দেশবাশী দীনদুঃখী সকলে তাহাদ্বারা সকল প্রকার অভাব ও দুর্দ্দশা মুক্ত হইয়া যাইতে পারিবে।

অভাব ও দুঃখদৈন্যের প্রধান কারণ জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব। যখনই কোন অত্যাচারী আসিয়া তোমার মনুষ্যত্বের কোন স্বত্ব ও অধিকার হরণ করিতে চায়, তখনই উলঙ্গ তরবারীদ্বারা তাহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করার নাম জেহাদ। সুতরাং এই জেহাদই জাতি বা দেশকে অর্থনৈতিক অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু দেশের বা জাতির এই প্রকার ব্যাপক ও সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, মানুষ তাহাকে নিঃস্বার্থ দান বলিয়া মনে করে। অথচ এ দানের মুনাফা শত সহস্র গুণ অধিক, এ স্বার্থ বিরাট ব্যাপক ও স্থায়ী। তাই কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে, প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বজনগণের এবং দুস্থ দেশবাসীদিগের স্থায়ী মঙ্গলসাধন যদি করিতে চাও, তাহা হইলে নিজেদের স্বার্থকে একটু বড় করিয়া মহান করিয়া ভাবিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলেই জানিতে পারিবে যে, জেহাদের জন্য তোমরা যাহা দান করিবে, তোমাদিগের স্বজনগণ ও দেশবাসীরাই তাহাদ্বারা উপকৃত হইবে। অতএব অন্য সমস্ত ছুতা বাহানা পরিত্যাগ করিয়া জেহাদের জন্য অর্থব্যয় করিতে থাক, তাহা হইলেই তোমাদের সব দৈন্যের সকল দুঃখের স্থায়ী প্রতিকার হইয়া যাইবে।

২০৫ জেহাদকে ফরজ করা হইল :—

মূলে كتب কোতেবা শব্দ আছে, উহার আভিধানিক অর্থ—'**লিখিয়া দেওয়া হইল**'। কোন আদেশ বা দলিলকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিতে হইলে তাহাকে লিখিয়া দেওয়া হয়। এই

হিসাবে যাহা নিশ্চিত, যাহা অপরিহার্য্য, যাহা অলঙ্ঘনীয়, তাহার সম্বন্ধে বলা হয়—লেখা হইল, লিখিয়া দেওয়া হইল (রাগেব)। কোর্‌আনের বহুস্থানে এইরূপ ব্যবহার আছে। এই ছুরার ১৮৩ আয়তে বলা হইয়াছে—

يايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام -

—"হে মো'মেনগণ ! রোজাকে তোমাদিগের প্রতি লিখিয়া দেওয়া হইল"—অর্থাৎ তোমার জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত করা হইল। এখানেও ঠিক ঐরূপে মুছলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, আল্লাহ জেহাদকে তোমাদিগের জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে —ফরজরূপে-নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। নমাজ ও রোজার ন্যায় জেহাদও এছলামের অপরিহার্য্য ফরজ।

২০৬ জেহাদ-অপ্রীতিকর :—

এই আয়তের প্রথম লক্ষ্য ছিলেন—হজরতের ছাহাবিগণ। আল্লার এই হুকুম তাঁহাদিগের পক্ষে "অপ্রীতিকর" হইয়াছিল কোন হিসাবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জেহাদে অর্থের ক্ষতি, প্রাণহানির আশঙ্কা এবং নানাবিধ দৈহিক ক্লেশের সম্মুখীন হইতে হয়, এই সব আপদ বিপদের জন্য জেহাদ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য হজরতের ছাহাবাগণ জেহাদকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ছাহাবাদিগের মহানচরিত্র সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, এরূপ কথা তাঁহারা কখনই বলিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ পার্থিব ক্ষতির ভয়ে তাঁহারা বিচলিত হন নাই, নিজেদের যথাসর্ব্বস্বকে আল্লার নামে উৎসর্গ করিয়াই তাঁহারা মুছলমান হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধবিগ্রহ তখনকার আরবের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল, যুদ্ধের বিভীষিকা তাহাদের মনকে কখনই বিচলিত করিতে পারে নাই। সুতরাং এই প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অসমীচীন।

বস্তুতঃ নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভাবনায় ছাহাবাগণ কখনই অস্থির হন নাই। তাঁহারা বিচলিত হইয়াছিলেন এছলামের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। মুছলমান তখন উভয় জনবলে ও ধনবলে অতিশয় দুর্ব্বল। তাই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—এ অবস্থায় সমরে লিপ্ত হইলে এই মুষ্টিমেয় মুছলমানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, মুছলমানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লার সত্যধর্ম্ম এছলামও লোপ পাইবে। তালুতের উপখ্যানে ইহারই নজির দিতে গিয়া অল্পপরেই বলা হইয়াছে :—"কত সংখ্যালঘু সঙ্ঘ আল্লার হুকুমে কত সংখ্যাগুরুদলকে পরাজিত করিয়াছে, বস্তুতঃ ধৈর্য্যশীলদিগের সহায় আল্লাহ (২৪৯ আয়ত)। আল্লাহ নিজের পতাকা যাহাকে দান করেন, তাহা বহন করার শক্তিও তিনি তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। সমাজের

অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সততার সহিত এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া জাতি ও ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্যই মুছলমানকে জেহাদ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে, ইহা তাঁহাদের ভুল। কিসে তোমাদের মঙ্গল কিসে অমঙ্গল, তোমাদের মঙ্গলময় আল্লাহ তাহা সম্যকরূপে অবগত আছেন। তিনিই যখন তোমাদিগকে জেহাদের আদেশ দিতেছেন, তখন তাহা যে তোমাদের মঙ্গলেরই কারণ হইবে, এ বিশ্বাস তোমাদের থাকা চাই। আল্লার সেই গূঢ় উদ্দেশ্য তোমরা বুঝিয়া উঠিতে পার না, সেজন্য কোরআন নাজেল করিয়া তিনি তোমাদিগকে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

সপ্তবিংশ রুকু'

নিষিদ্ধ-মাসে যুদ্ধযাত্রা

২১৭ নিষিদ্ধমাস সম্বন্ধে-তাহাতে যুদ্ধ করার বিষয় তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। বল ঃ— তাহাতে যুদ্ধ করা গুরু (-অপরাধ) ;— আবার (মানুষকে) আল্লার পথ হইতে বারিত রাখা আর তাঁহাকে অমান্য করা ও মছজিদুল্‌হারাম হইতে (তীর্থযাত্রীদিগকে) বারিত রাখা এবং তাহার প্রতিবেশীদিগকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া — আল্লার সমীপে অপেক্ষাকৃত গুরুতর(-অপরাধ), অধিকন্তু ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা অধিক গুরুতর। বস্তুতঃ তোমাদিগকে স্বধর্ম্ম হইতে বিমুখ করার জন্য, সাধ্যে কুলাইলে, তাহারা চিরকালই তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকিবে। আর তোমাদিগের মধ্যকার কেহ

٢١٧ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ج وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ط وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

যদি স্বধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যায় এবং সেই কাফের অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তাহার ইহকাল সংক্রান্ত ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, নরকের পারিষদ তাহারা, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।[২০৯]

২১৮ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২১৮ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিল এবং দেশত্যাগী হইল ও জেহাদ করিল আল্লার পথে, তাহারাই (সঙ্গতভাবে) আল্লার কৃপালাভের আশা করিয়া থাকে, আর আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাশীল করুণানিধান।[২১০]

২১৯ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۭ

২১৯ মাদকদ্রব্য ও জুয়া[২১১] সম্বন্ধে তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। বল ঃ—ঐ দুইটীর মধ্যে মহাপাপ আর কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, তবে ঐ দুইটীর উপকারের তুলনায় তাহার পাপ অত্যধিক গুরুতর।[২১২] তাহারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞাসা করিতেছে —কি (পরিমাণ) ব্যয় করিবে তাহারা? বল ঃ— "যাহা

সহজসাধ্য"।[২১৩] আল্লাহ্ এইরূপে তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য নিজের আয়তগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন - যেন পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ ![২১৪]

قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ

২২০ এবং পিতৃহীনদিগের সম্বন্ধে তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। বল ঃ—তাহাদের মঙ্গল সাধন করাই হইতেছে উত্তম কাজ, আর তাহাদিগকে তোমরা যদি শরিক করিয়া লইতে চাও (স্বচ্ছন্দে করিতে পার), কারণ উহারা হইতেছে (ধর্ম্মের সম্পর্কে) তোমাদিগের ভাই,— আর কে অনিষ্টকারী-কে হিতকামী - আল্লাহ্ তাহা জানিতেছেন — আর ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে কঠোর ব্যবস্থার অধীন করিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন প্রবল, প্রাজ্ঞ।

٢٢٠ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২২১ আর মোশ্‌রেক-নারীদিগকে - তাহারা ঈমান না আনা পর্য্যন্ত -বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ মো'মেন দাসী মোশ্‌রেক মহিলা

٢٢١ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

অপেক্ষা উত্তম - যদিও সে তোমাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলে ;—আর ঈমান না আনা পর্য্যন্ত - মোশ্‌রেক পুরুষদিগের সহিত (মুছলমান-নারীদিগের) বিবাহ দিও না, বস্তুতঃ মো'মেন-দাস মোশ্‌রেক (আজাদ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও সে তোমাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলে। ইহারা আহ্বান করে নরকের পানে—আর আল্লাহ্ নিজ অভিপ্রায়ক্রমে স্বর্গের দিকে ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন, এবং লোকের মঙ্গলের জন্য নিজের আয়তগুলি বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়া দেন - যেন তাহারা (সেগুলির) অনুশীলন করিতে থাকে।

টীকা :—

২০৭ নিষিদ্ধ মাসের সম্মান :—

কোরেশ প্রভৃতি পৌত্তলিক জাতিরা বলিত—মোহাম্মদ নিষিদ্ধ মাসের সম্মান হানি করিয়া তাহাতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে ইহা লইয়া তখন খুব আলোচনা হয়। কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে—নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে মূলনীতির উপর এই নিষেধের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ঐ নিষেধের সম্ভ্রম লইয়া আলোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। পূর্ব্বে যে কএকটা মাসকে ও কা'বার হরমকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কা'বার সাধক

ও তাহার হজযাত্রীদিগকে রক্ষা করা, সকলকে স্বাধীনভাবে ও শান্তির সহিত আল্লার ধ্যান ধারণায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া, দেশবাসীকে নির্ভয় ও নিরাপদ করা। কিন্তু কোরেশগণ সেই কা'বার হরম হইতে মুছলমানদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিল, মুছলমান-তীর্থযাত্রীদিগকে মক্কার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিল, ঐ নিষিদ্ধ মাসে মুছলমান-দিগকে আক্রমণ করিয়া সদলবলে নিহত করার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল, এই সমস্ত ব্যাপারে আল্লার স্পষ্ট আদেশকে শোচনীয়ভাবে অমান্য করিয়াছিল। সুতরাং স্থান বিশেষের বা সময় বিশেষের সম্মান করার যে মূলনীতি, তাহাকে জঘন্যভাবে পদদলিত করিতে একটুও দ্বিধা বোধ তাহারা কখনই করে নাই। এ অবস্থায় নিষিদ্ধ মাসের সম্ভ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা তাহাদের পক্ষে আদৌ শোভা পায় না। হেজরতের পূর্ব্বে ও পরে, মক্কাবাসীরা ভক্ত-নরনারীর উপর, শুধু তাহারা এক আল্লার পূজারী হওয়ার অপরাধে, যে সকল নির্ম্মম ও লোমহর্ষক অত্যাচার করিয়াছিল, "ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা অধিক গুরুতর"-পদে এই প্রসঙ্গে তাহার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ফেৎনার অর্থ সম্বন্ধে ১৭৮ টীকা দ্রষ্টব্য। ১৮১ টীকাতেও নিষিদ্ধ মাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

২০৮ **জেহাদের গভীর তত্ত্ব :—**

কোফরের সহিত এছলামের এবং শের্কের সহিত তাওহিদের কখনই সন্ধি হইতে পারে না। সেই জন্য শের্ক ও কোফরের বাহক যাহারা, তাহারা মুছলমানের সহিত চিরকাল যুদ্ধ চালাইতে থাকিবে এবং তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মচ্যুত না করা পর্য্যন্ত বিধর্ম্মীরা কখনই ক্ষান্ত হইবে না। এ অবস্থায় হয় তাহাকে বিধর্ম্মীর এই অভিসন্ধির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, না হয় উলঙ্গ তরবারী হস্তে আপন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে। বিধর্ম্মীরা সাধ্যপক্ষে এই চেষ্টার ক্রটী কোন দিনই করিবে না—সুতরাং মুছলমানকেও আত্মরক্ষার জেহাদ চিরকালই চালাইয়া যাইতে হইবে। এই জন্যই হজরত রছুলে করিম বলিয়াছেন :—

الجهاد ماض الى يوم القيامة -

অর্থাৎ—জেহাদ কেয়ামত পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। "উম্মতের সমবেত অভিমত এই যে, সকল সময় জেহাদ ফরজে-কেফায়া, অর্থাৎ একদল লোক জেহাদে লিপ্ত থাকিলে অন্য সকলের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়। কিন্তু কেহই যদি জেহাদ না করে, তাহা হইলে ফরজ ত্যাগ করার জন্য সকলেই গোনাহগার হয়। তবে কাফেরগণ যদি মুছলমানের রাজত্ব আক্রমণ করে, তখন উহা ফরজে-আএন হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ তখন জেহাদে লিপ্ত হওয়া প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে ব্যক্তিগত ফরজ হইয়া দাঁড়ায়" (তফছিরুল কোর্‌আন ২—৩১৯)। মুছলমানেরা যাবৎ বিধর্ম্মীদিগের ঐ অত্যাচারের শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে না পারে حتى اذا اثخنتموهم (৫—৪৭) তাবৎ তাহাদিগকে জেহাদ চালাইয়া যাইতে হইবে, ইহা কোর্‌আনেরই আদেশ। কারণ মুছলমানের জাতীয় জীবনকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়

হইতেছে আল্লার নির্দ্ধারিত এই জেহাদ। তাই এই জেহাদ সম্বন্ধে ছূরা আন্‌ফালে বলা হইতেছে :—

يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم -

—"হে মো'মেনগণ! আল্লাহ ও রছুল যখন সেই সাধনার পানে আহ্বান করেন যাহা তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়া রাখিবে-তখন তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিও!" কিন্তু মুছলমান আমরা আল্লাহ ও রছুলের সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া আজ অন্যত্র জীবনের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি।

২০৯ **সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে :—**

মুছলমানকে এছলাম হইতে বিমুখ করার জন্য কাফেরগণ চিরকালই তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে থাকিবে এবং মুছলমান স্বধর্মচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের এ সংগ্রামের নিবৃত্তি হইবে না, পূর্ব্ব আয়তে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে কাফেরদিগের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে, মুছলমানকে যেখানে তাহারা স্বধর্ম হইতে বিমুখ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইবে, মুছলমানের পরকালের সহিত তাহার ইহকালের সমস্ত সাধনাও সেখানে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পরাজিত পরাধীন দেশের মুছলমান ধর্মবিমুখ হইয়া পড়িবে এবং তাহার জাতীয় জীবনের সব সাধনাই বিফল হইয়া যাইবে, আয়তে এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে।

২১০ **হেজরত ও জেহাদ :—**

কাফেরদিগের সংগ্রামের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার উপায়—হেজরত ও জেহাদ। জেহাদের আয়োজনের জন্যই অনেক সময় হেজরতের আবশ্যক হইয়া থাকে। মুছলমানের রক্ষামন্ত্র হইতেছে ঈমান, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে হেজরত ও জেহাদ। বিশ্বাস ও কর্ম্মের এই মহীয়সী সাধনাকে অবলম্বন করে যাহারা, আল্লার কৃপালাভের আশা করার অধিকার একমাত্র তাহাদের আছে। অর্থাৎ যাহারা মুখে মুছলমান বলিয়া অহমিকতা প্রকাশ করে, কিন্তু আল্লার পথে জেহাদ করার সাহস ও শক্তি সামর্থ্য যাহাদের নাই, আল্লার কৃপালাভের অধিকার হইতে তাহারা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

২১১ **মাদক ও জুয়া :—**

আমরা 'খমর' শব্দের অনুবাদ করিয়াছি মাদক দ্রব্য, কেহ কেহ উহার অনুবাদ করেন 'মদ' বলিয়া। হজরত রছুলে করিম স্বয়ং বলিয়া দিতেছেন :—

كل مسكر خمر -

—"প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খমর" (বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, তিরমিজি, নাছাই)।

জওহরী, আবুনছর কোশায়রী, দয়মুরী, মজদুদ্দিন প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের পণ্ডিতগণও একবাক্যে এই অর্থের সমর্থন করিতেছেন। এই জন্য খমর শব্দের অর্থ "মাদকদ্রব্য" বলিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্যপক্ষের মতে, খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত আর কোন বস্তুর দ্বারা প্রস্তুত মাদকদ্রব্য খমর পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। একটা হাদিছে আছে—হজরত বলিয়াছেন—'খেজুর ও আঙ্গুর হইতে খমর উৎপন্ন হয়'। ইঁহারা এই হাদিছকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মোহাদ্দেছগণ বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, প্রথম মদ হারাম হওয়ার সময় মদিনায় ঐ দুই বস্তু হইতে মদ প্রস্তুত হইত, হজরত এই হাদিছে কেবল ঐ বৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। উহা ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে 'খমর' প্রস্তুত হইতে পারে না, এরূপ ভাব ঐ হাদিছ হইতে কোন প্রকারেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। "মধু হইতে খমর উৎপন্ন হয়, যব হইতে খমর উৎপন্ন হয়, গম হইতে খমর উৎপন্ন হয়"—এই প্রকার হাদিছও যখন হজরত রছুলে করিম হইতে বর্ণিত হইয়াছে (আবুদাউদ—নোমান হইতে) তখন এ সম্বন্ধে তর্কের পথ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। হজরত বলিয়াছেন—যাহা অধিক পরিমাণে খাইলে নেশা হয়, তাহার সামান্য পরিমাণও হারাম (নাছাই)।

হজরত আবুহোরায়রার এক বর্ণনায় জানা যায়, মাদকদ্রব্যের নিষেধ সম্বন্ধে এই আয়তটী সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার পর ছুরা নেছার ৪৩ আয়তদ্বারা নেশার অবস্থায় নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হয়। শেষে ছুরা মায়দার ৯০ আয়তে মদ, জুয়া প্রভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করার চরম আদেশ অবতীর্ণ হয়।

২১২ **হারাম হওয়ার হেতু** :—

কোন্ কাজ সঙ্গত আর কোন্ কাজ অসঙ্গত, তাহা নির্ণীত হয় যে মূলনীতির দ্বারা, এই আয়তে সেই নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। এমন কোন বিষয় বা বস্তু দুনয়ায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাদ্বারা কেবল নিরবচ্ছিন্ন অপকারই সাধিত হয়—কোন অবস্থায় কাহারও কোন প্রকার উপকার হয় না। পক্ষান্তরে যে কোন সৎকর্ম্মই হউক না কেন, কোন সময় কোন লোকের কোন প্রকার অনিষ্ট তাহাদ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। চোর পরস্ব অবহরণ করিয়া নিজের পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করে, আবার বিচারক তাহাকে কারাগারে পাঠাইয়া তাহাদের অনিষ্ট করেন। অতএব এমন একটা তুলাদণ্ড বাহির করিতে হইবে-যাহাতে ওজন করিয়া আমরা সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়কে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারি। সেই তুলাদণ্ড বা Principle এর কথাই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়তে বলা হইতেছে যে, মাদকদ্রব্য ও জুয়া ধর্ম্মের হিসাবে মহাপাপ, কারণ তাহাতে কোন কোন্ লোকের কিছু কিছু উপকার থাকিলেও, অধিকাংশ লোকের অধিকতর ক্ষতি

তাহাদ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিলাম—যে কার্য্যে বা যে বস্তুতে অধিকাংশ সময় অধিকতর লোকের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, সময় সময় অল্পসংখ্যক লোকের সামান্য পরিমাণ উপকার তাহাদ্বারা সাধিত হইলেও, মানবসমাজের জন্য সেই প্রকার কার্য্য বা বস্তুকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত হইবে। এই কারণেই এছলাম মাদকদ্রব্য ও জুয়াকে হারাম করিয়া দিয়াছে, এবং শরিয়তের প্রত্যেক নিষিদ্ধ বিষয়ের মূলে এই নীতিই কাজ করিয়া আসিতেছে।

অর্থ, স্বাস্থ্য ও জ্ঞান মানবজীবনের প্রধান কাম্যবস্তু, মাদক ও জুয়ার সংশ্রবে এসমস্তেরই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। কলিকাতা শহরে আজ মুছলমানের বিষয় সম্পত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রাচীন পরিবারগুলির নামনিশান পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু চিরকাল এরূপ ছিল না। মুছলমানের সে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি প্রধানতঃ মদে ও ঘোড়দৌড়ের জুয়াতেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

এই আয়ত নাজেল হওয়ার সময় পর্য্যন্ত আরবের সমস্ত গোত্রগুলি মদ ও জুয়ার নেশায় একেবারে মশগুল হইয়াছিল এবং তাহাদের আত্মবিচ্ছেদ ও গৃহ যুদ্ধের প্রধান কারণও ছিল ইহাই (৫-৯০ আয়ত দ্রষ্টব্য)। মুছলমানকে এখন জেহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। সেজন্য তাহার দরকার অর্থবলের, জ্ঞানবলের, মানসিক শক্তির এবং সংহতি শক্তির। কিন্তু মদ ও জুয়ার প্রচলন থাকিতে ইহার আশা করা যায় না। তাই এখানের জেহাদের আদেশের সহিত মদ ও জুয়ার নিষেধকেও প্রসঙ্গক্রমে একসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। মদ ও জুয়া সংক্রান্ত অন্যান্য কথা ছুরা মায়দার তফছিরে আলোচনা করাই অধিকতর সঙ্গত হইবে।

২১৩ পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে চিন্তা :—

১৯৫ আয়তে আল্লার পথে বা জেহাদের জন্য অর্থব্যয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। জেহাদ সংক্রান্ত আদেশ উপদেশগুলি পর পর প্রকাশিত হওয়ার পর তাহার আয়োজনও আরম্ভ হইয়া গেল। তখন অর্থের আবশ্যক হইল এবং আল্লার পথে ব্যয় করার জন্য জাতীয় ধনভাণ্ডার সঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই সময় ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন— আমাদের ধনসম্পদের কি পরিমাণ জেহাদের জন্য দান করিতে হইবে? এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তরে কোর্‌আনে বলিয়া দেওয়া হইতেছে—যে পরিমাণ ব্যয় করা তোমাদিগের পক্ষে সহজসাধ্য, প্রত্যেকে নিজের অবস্থা অনুসারে সেই প্রকার দান করিবে।

ইহকাল ও পরকাল উভয়ই মুছলমানের লক্ষ্যের বিষয়, ২১৭ আয়তে জেহাদ উপলক্ষে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। এখানেও বলা হইতেছে যে, মুছলমানের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সিদ্ধির সহিত যে সকল সাধনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আদেশ ও নিষেধরূপে আল্লাহ কোর্‌আনের আয়তের মধ্য দিয়া সেগুলিকে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন। মুছলমান

নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখুক, চিন্তার ফলে এছলামের বিধিব্যবস্থার প্রতি সত্যকার আস্থাবান হইয়া উঠুক, ইহাই আল্লার উদ্দেশ্য।

২১৪ **পিতৃহীনের প্রতিপালন :—**

যুদ্ধবিগ্রহে বহু উপার্জ্জনক্ষম পুরুষকে শহীদ হইতে হইবে, সমাজে পিতৃহীন বালক-বালিকার সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক কথা। তাই জীবন-সংগ্রাম-লিপ্ত ছাহাবাগণের মধ্যে এতিমদিগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা গুরুতর সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোর্‌আন এই সমস্যার সমাধান করিয়া বলিয়া দিতেছে—এতিমদিগের মঙ্গলচিন্তা জাতিকে করিতে হইবে, যে কোন উপায়ে তাহাদের হিতসাধিত হয়, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। আল্লাহ চান তোমাদের মনে তাহাদের সত্যকার হিতকামনা জাগাইয়া দিতে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার পর তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা তোমরা করিতে চাহিবে, তাহাই সুফলপ্রদ হইবে। তখন তোমরা যদি তাহাদিগকে নিজেদের পরিবারভুক্ত করিয়া লও, তাহাও অসঙ্গত হইবে না।

জেহাদ-প্রসঙ্গে এতিমদিগের ভরণ পোষণাদির ব্যবস্থা করা যে কতদূর আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যে সমস্ত বীর, জাতির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন না, অনেক সময় নিঃসহায় পুত্রকন্যাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহাদের বীরহৃদয়ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তাই জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার পূর্ব্বে এমন ব্যবস্থা হওয়ার দরকার, যাহাতে মোজাহেদের পক্ষে ঐ প্রকার আশঙ্কা করার কোন কারণ না থাকে।

২১৫ **মোশরেকের সহিত বিবাহ :—**

মুছলমান তাওহীদের বাহক। শের্ক ও অংশীবাদের অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া দুন্‌য়ায় আল্লার অনাবিল তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার প্রধান সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে তাহার সর্ব্বপ্রথম দরকার, নিজে সেই খাঁটি তাওহীদকে গ্রহণ করার, শের্কের পারিপার্শ্বিকতা হইতে দূরে অবস্থান করার। কিন্তু মোশ্‌রেকসমাজের সহিত তাহারা যদি বৈবাহিক আদান প্রদানে লিপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে শের্কের বিষাক্ত 'আবহাওয়ার' প্রভাবে তাওহীদের সেই বাঞ্ছনীয় পারিপার্শ্বিকতা কলুষিত হইয়া যাইবে, মোশ্‌রেকদিগের মানসিকতা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সমাজজীবনে সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। কাজেই তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান সঙ্গত হইবে না। জাতীয় জীবনের এই সমস্ত অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রূপজমোহে আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়া মুছলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ।

জাতীয় জীবনসাধনায় জয়যুক্ত হইতে হইলে মুছলমানকে প্রতিকুল শক্তির সহিত সর্ব্বদাই সংঘর্ষ সংঘাতে লিপ্ত হইতে হইবে। সফলতার সহিত সে সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হইলে জাতীয় চরিত্রকে সকল দোষত্রুটি হইতে মুক্ত করিয়া, সকল মহিমায় পূর্ণ করিয়া ও সকল শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তিগণের পারিবারিক জীবনই এই শ্রেণীর চরিত্র-গঠনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। তাই তাহাদের পারিবারিক জীবনের কএকটা প্রধান দোষত্রুটীর সংস্কার করিয়া দিবার জন্য, এই আয়ত হইতে ২৪২ আয়ত পর্য্যন্ত, বিবাহ তালাক প্রভৃতি সম্বন্ধে কতিপয় আয়ত নাজেল করা হইয়াছে।

২১৬ **অনুশীলন করা** :—

মূলে يتذكرون শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উহার অর্থ—আলোচনা করা, অনুশীলন করা, উপদেশ গ্রহণ করা। আল্লাহ কোর্‌আনের আয়তগুলিকে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। মুছলমানের উচিত সেগুলির অনুশীলন করা, গভীর চিন্তা সহকারে তাহার তত্বগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা। তাহা হইলেই সে কোর্‌আনের আদেশ নিষেধগুলির গুরুত্ব ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। এই আলোচনা-অনুশীলনের আদেশ মুছলমানকে পুনঃ পুন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা আজ এই আদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করিতেছি না। আমাদের সমস্ত অবিশ্বাসের বা অন্ধবিশ্বাসের ইহাই হইতেছে প্রধান কারণ।

———

অষ্টাবিংশ রুকু

বিবাহ তালাক ইত্যাদি

২২২ তোমাকে তাহারা (স্ত্রীলোকের ঋতুসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে বল ঃ—উহা হইতেছে অশৌচ অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলো হইতে পৃথক থাকিবে, ত উত্তমরূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের নিকট যাইও না! পরে উহারা শুদ্ধ হইয়া গেলে, আল্লার নির্দ্দেশ মতে তাহাদিগতে সমাগত হইতে পার; নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন অনুতাপ-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গকে, আর ভালবাসেন শুচিপ্রয়াসী লোকদিগকে[২১৭]।

২২৩ তোমাদিগের স্ত্রীগণ তোমাদিগের পক্ষে শস্যক্ষেত্র(-স্বরূপ); অতএব নিজেদের ক্ষেত্রগুলিতে যদৃচ্ছা সমাগত হইতে পার, এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্য‍্যতের আয়োজন করিয়া রাখ[২১৮]; আর আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিও

২২২ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

২২৩ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

এবং জানিয়া রাখিও যে, তোমাদিগের সকলকে সাক্ষাৎলাভ করিতেই হইবে; এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দান কর।

২২৪ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৪ আর তোমরা পুণ্যকর্ম করিবে, বা সংযমশীল হইবে, এবং মানবসাধারণের মধ্যে মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে — নিজেদের দিব্যগুলির বলে, আল্লাহ্‌কে যেন তাহার অন্তরায়রূপে গ্রহণ করিও না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।

২২৫ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৫ তোমাদিগের অনর্থক দিব্যগুলির জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দণ্ড প্রদান করিবেন না - কিন্তু তিনি তোমাদিগকে দণ্ডিত করিবেন সেই সকল দিব্যসম্বন্ধে, যেগুলি তোমাদের মনের সঙ্কল্প অনুসারে সাধিত হইয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল।

২২৬ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ

২২৬ স্ত্রীর নিকটে যাইবে না - বলিয়া যাহারা দিব্য করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য চারি মাস অপেক্ষা (-করার ব্যবস্থা),

فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ফলে তাহারা যদি মতপরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে (স্বচ্ছন্দে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে), নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণানিধান—

২২৭ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২২৭ — পক্ষান্তরে তাহারা যদি তালাক দিতেই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে (স্ত্রীকে 'লটকাইয়া' না রাখিয়া তালাক দিয়া ফেলুক), নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।

২২৮ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ

২২৮ এবং তালাকী-স্ত্রীগণ তিন ঋতু পর্য্যন্ত আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিবে; অধিকন্তু আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে বৈধ হইবে না- যদি তাহারা আল্লাতে ও পরকালে বিশ্বাস করে; আর তাহাদিগের স্বামীরা এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পুনঃ গ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকারী - যদি 'মিলন ও শান্তির' প্রয়াসী তাহারা হইয়া থাকে; এবং বিহিতরূপে, তাহাদিগের প্রতি (স্বামীর) কর্ত্তব্য ঠিক সেইরূপ

-যেরূপ (স্বামীর) প্রতি তাহা-দিগের কর্ত্তব্য,[২২৫] এবং তাহাদিগের উপর পুরুষদিগের প্রাধান্য আছে,[২২৬] আর আল্লাহ হইতেছেন প্রবল, প্রাজ্ঞ।

টীকা :—
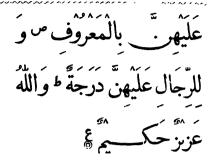
২১৭ ঋতুকালীন অশৌচ :—

ঋতুর মছলার সহিত তালাকের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই রুকু'র ২২৮ আয়তে পাঠকগণ তাহা দেখিতে পাইবেন। এই জন্য প্রসঙ্গক্রমে ঋতুকালীন অশৌচের কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আয়তে ঋতুকে اذى বলা হইয়াছে। যাহা কিছু ঘৃণাজনক বা পীড়াদায়ক, তাহাকে اذى বলা হয় (কবির ও রাগেব)। ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস করা ঘৃণাজনক এবং স্বামীস্ত্রী উভয়ের পক্ষে ক্ষতির কারণ, এই হেতুতে তাহা হইতে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হইতেছে।

পৌত্তলিক আরবগণ স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন অশৌচের কোন পর্‌ওয়া না করিয়া তাহাদিগের সহিত সহবাস করিত। পক্ষান্তরে এহুদীরা ঋতুমতী স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিত, সকল বিষয়ে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিত—আমাদের দেশে প্রসূতীদিগের প্রতি যেরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করা হয়, তাহারা ঋতুমতী স্ত্রীদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিত। ফলে উভয় সমাজের ব্যবহারে আরবনারীকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত। কোর্‌আন আসিয়া এই জঘণ্য অত্যাচারের প্রতিবিধান করিয়া দিল। এই আয়ত নাজেল হইলে এহুদীরা খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং মুছলমানদিগের সহিত তাহাদিগের অনেক তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। তখন হজরত তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—যে ব্যাপারটা ঘৃণার বা পীড়ার কারণ, শুধু সেইটাকেই বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। এই উপলক্ষে অতিরিক্ততা করিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করা কখনই সঙ্গত হইবে না। কোর্‌আনের এই আদেশে আরবের সমস্ত নারী এই সময়কার উভয়বিধ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই মর্ম্মের ছহি হাদিছ আহমদ, মোছলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি কর্তৃক আনছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এবনে আব্বাছের এক বর্ণনায় দেখা যায়, প্রথম প্রথম মুছলমানেরাও এ বিষয়ে এহুদীদিগের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (নাছাই)।

ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস করা এছলামের চক্ষে মহাপাতক। সেই জন্য এই অপরাধের কারণে তাওবা করার সঙ্গে সঙ্গে, কাঙ্গালদুঃখীদিগকে কাফ্‌ফারা স্বরূপ (অবস্থাভেদে) এক বা অর্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা দান করার হুকুমও হজরত প্রদান করিয়াছেন (আহমদ, আবুদাউদ, এবনেমাজা, হাকেম প্রভৃতি)। হজরত বলিয়াছেন—ঋতুমতী স্ত্রীতে সমাগত হয় যে ব্যক্তি, অথবা কোন নারীর সহিত অস্বাভাবিক সঙ্গমে লিপ্ত হয় যে ব্যক্তি, কিম্বা কোন গণকের নিকট গমন করে যে ব্যক্তি, মোহাম্মদের আনীত ধর্ম্মকে নিশ্চয় সে অমান্য করে (আহমদ, নাছাই, তিরমিজি, এবনে মাজা)।

পরবর্ত্তী আয়তে স্ত্রীকে ফসলের ভূমিস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ফসলের জন্য কেবল বীজবপনই যথেষ্ট নহে। সেজন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপযুক্ত সময় নির্ব্বাচন করারও দরকার। এই আয়তে উপযুক্ত সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হইতেছে—তাহারা যখন সম্পূর্ণরূপে শুচি হইয়া যায়, সেই সময় তাহাদিগের সহিত সহবাস করিবে। জগতের সমস্ত শরীরবিজ্ঞান এই কথার সমর্থন করিতেছে। "আল্লার নির্দ্দেশ মতে ... সমাগত হও", অর্থাৎ কোন অস্বাভাবিক কার্য্যে লিপ্ত হইও না। পরবর্ত্তী আয়তে এই অস্বাভাবিক পাপাচারের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। স্বামীস্ত্রীর বিশেষ সম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে, সুরুচি ও শ্লীলতার মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখার জন্য কোর্‌আন কিরূপ সতর্ক ও সংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে, এই সব ক্ষেত্রে তাহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করার বিষয়।

২১৮ **স্ত্রী শস্যক্ষেত্র স্বরূপ :—**

প্রবৃত্তি বিশেষকে চরিতার্থ করার লালসার মধ্যে করুণানিধান আল্লার যে মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্যকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে—ইহাই হইতেছে এছলামের প্রধান নীতি। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া আল্লার সেই মঙ্গল উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হইয়া গেলে, এছলামের এই মূলনীতির অবমাননা করা হয়। স্বামীস্ত্রীর যৌনসংশ্রবের সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—মানববংশকে রক্ষা করা, বর্দ্ধিত করা। এই উদ্দেশ্যের অনুকূল বলিয়া ঋতুস্নানের পরে সহবাসকে সঙ্গত বলা হইয়াছে, ঋতুকালে উহাকে হারাম করা হইয়াছে। এ আয়তেও "শস্যক্ষেত্র" বলিয়া অস্বাভাবিক সঙ্গমকে আল্লার মঙ্গল উদ্দেশ্যের বিপরীত বলিয়া হারাম করিয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ সে ক্ষেত্রে শস্য বা সন্তানলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, বরং ঐ শ্রেণীর জঘন্য পাপাচার দ্বারা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়।

"নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের আয়োজন করিয়া রাখ"-এই পদে আয়তের অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। স্বামীস্ত্রীর যৌন সম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদের যে ভবিষ্যতের আয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সন্তান ব্যতীত আর কিছুই নহে। শয়তানী লালসায় বশবর্ত্তী হইয়া নর ও নারী পিতা হওয়ার ও মাতা হওয়ার স্বাভাবিক শক্তিকে এমন শোচনীয়ভাবে বিকৃত করিয়া ফেলে যে, নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বলরূপ

সন্তান সন্ততির মুখ দেখার সৌভাগ্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া থাকে। আয়তের এই অংশে ঐ শ্রেণীর ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া মাত্রকে বর্জ্জন করিতে এবং স্বাভাবিক ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে অথবা পালন করিবে, আয়তের শেষভাগে তাহাদিকে যথাক্রমে আল্লার দণ্ডের ভয় প্রদর্শন এবং তাঁহার পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। এক শ্রেণীর খৃষ্টান ও আর্য্যসমাজী লেখক এই আয়তের ব্যাখ্যা লইয়া যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ন্যায় ও যুক্তির সংশ্রব হইতে তাঁহারা যে কত দূরে অবস্থিত, বিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইহার যথাযথ উত্তর দিবার মত তাহাদিগের পুথিপুস্তকের বহু উপকরণ আমাদিগের নিকট সংগৃহীত আছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ করিলেও তফছিরের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য সেই জঘন্য হঠোক্তিগুলির আলোচনা করিতে পারিলাম না।

২১৯ **আল্লাহকে অন্তরায়রূপে গ্রহণ :—**

"ঈলা'-তালাক নামে এক প্রকার অত্যাচার আরবদেশে প্রচলিত ছিল। ইহাতে স্বামী আল্লার নামে দিব্য করিয়া বলিত—আমি স্ত্রীর নিকটে যাইব না। তাহার পর তাহাকে গ্রহণও করিত না, বর্জ্জনও করিত না। ২২৬ আয়তে এই ঈলার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ২২৪ ও ২২৫ আয়তে ইহার ভূমিকা স্বরূপ দিব্য করা সম্বন্ধে কএকটা মৌলিক নীতির বর্ণনা করা হইতেছে।

মানুষ পুণ্যকর্ম্ম করিবে, সংযমশীল হইবে, সমাজের ও দেশের মঙ্গলকর কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে, ইহাই আল্লার উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর কোন সৎ ও মহৎ কাজ করিবে না বলিয়া একদল লোক আল্লার নামে দিব্য করে এবং তাহার পর বলিতে থাকে—কি করিব, আল্লার নামে কছম খাইয়াছি, এখন তাহা করিতে গেলে আল্লার নামের মর্য্যাদাহানি করা হইবে! আরবে তখন এই শ্রেণীর অন্যায় দিব্য বহুলভাবে প্রচলিত ছিল, 'ঈলা'ও তাহার প্রকার বিশেষ। কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে—আল্লাহকে সৎকর্ম্মের অন্তরায়রূপে গ্রহণ করিও না। অর্থাৎ আল্লার নামের মর্য্যাদারক্ষার মিথ্যাভাণ করিয়া ঐ সকল সৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকা তোমাদের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইবে না। কোন সৎ ও সঙ্গত কাজ করিবে না, অথবা কোন অন্যায় কাজ করিবে বলিয়া কেহ যদি আল্লার নামে দিব্য করে, তাহা হইলে সেই দিব্য ভঙ্গ করিয়া ফেলাই মুছলমান স্বরূপে তাহার কর্ত্তব্য হইবে। অবশ্য ঐ প্রকার অন্যায় দিব্য করার জন্য তাহাকে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে—এই মর্ম্মে হজরত রছুলে করিমের বহু স্পষ্ট আদেশ হাদিছগ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত আছে। (মনছুর ২—২৬৮, ৬৯ পৃষ্ঠা)।

২২০ **অনর্থক দিব্য :—**

এক শ্রেণীর লোক অভ্যাসবশতঃ কথায় কথায় "অল্লাহ" "বিল্লাহ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার

করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে লক্ষৌ-অঞ্চলের মুছলমানদিগের মধ্যে এই দোষটা এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। অনর্থক দিব্য বলিতে এই শ্রেণীর দিব্যগুলিকে বুঝাইতেছে। ক্রোধের সময় হঠাৎ উত্তেজনা বশতঃও মানুষ না বুঝিয়া সুঝিয়া ঐ প্রকার দিব্য করিয়া বসে, ইহাও একটা বেহুদা কাজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর দিব্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু মানুষ যখন ইচ্ছা করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া কোন দিব্য করে, আল্লার নিকট তাহাই ধর্ত্তব্য। প্রথম শ্রেণীর অনর্থকদিব্যগুলি দণ্ডার্হ না হইলেও আল্লার অভিপ্রেত নহে, এই কথা বুঝাইবার জন্য আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে—আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল।

২২১ **ঈলা-তালাক**ঃ—

কোন করণীয় কার্য্য না করার জন্য দিব্য করাকে ঈলা বলা হয় (রাগেব)। স্ত্রীকে জব্দ করার জন্য আরবগণ প্রতিজ্ঞা করিত-তাহার সংশ্রবে যাইবে না। এই প্রতিজ্ঞার ফলে স্ত্রী সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব অবস্থায় ভাসিয়া বেড়াইত, অথচ বিবাহবন্ধনচ্ছেদ না হওয়ায় অন্যবিবাহ করার অধিকারও তাহার থাকিত না। আমাদের দেশের যে সকল সমাজে তালাকের ব্যবস্থা প্রচলিত নাই, সেখানেও এই শ্রেণীর পরিত্যক্তা নারীর অশেষ দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। কোর্‌আন এই অত্যাচারের পথকে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিতেছে যে, কেহ ঈলা করিয়া স্ত্রীর সংশ্রব ত্যাগ করিলে, তাহাকে চারি মাস মাত্র সময় দেওয়া হইবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামী যদি মতপরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে এবং স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়, বড় ভাল কথা। ক্ষমাশীল করুণানিধান আল্লাহ তাহার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

২২২ **চারি মাস মিআদ**ঃ—

কিন্তু স্বামী যদি ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে সে তালাক দিতে বাধ্য। এবনে-আব্বাছ বলিতেছেন—স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক না দিলে, রাজা তাহাদের বিবাহবিচ্ছেদের আদেশ দিবেন (বায়হাকী প্রভৃতি)। এমাম শাফেয়ীরও এই মত। কিন্তু এমাম আবুহানিফা বলেন—চারি মাস অতিবাহিত হইয়া গেলে স্বামী তালাক না দিলেও আপনাআপনি Automatically তালাক হইয়া যাইবে (কবির ২—৪৬২)। আয়তের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মতামত দিতে হইলে, এমাম আবুহানিফা ছাহেবের অভিমতকে অধিক সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

২২৩ **তালাকের ইদ্দৎ**ঃ—

কোরু'—কোরওন শব্দের বহুবচন, উহার অর্থ ঋতুকাল বা অশৌচকাল উভয়ই হইতে পারে। আয়তে বলা হইতেছে যে, যে সকল স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হইয়াছে,

তাহারা তালাকের পর তিন মাস অপেক্ষা করিবে—অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে স্বামীর বিবাহবন্ধন হইতে সে মুক্ত হইতে পারিবে না, সুতরাং অন্যবিবাহও করিতে পারিবে না। এই তিন মাসের মধ্যে যদি তাহারা গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য। গর্ভবতী স্ত্রীকে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত ইদ্দৎ পালন করিতে হয়, এই সময় স্বামী তাহার ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। নিজের ভাবীবংশধরের গর্ভধারিণীর প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক, তাহার শিশু-সন্তানকে প্রতিপালন করার ভাবনাও আছে। এই সব কারণে স্বামীর মনপরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক। এছলামে তালাকের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে অগত্যা-পক্ষে। সুতরাং যাহাতে তালাকের সংখ্যা কম হইয়া যায়, প্রত্যেক বিধানেই তাহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তাই স্ত্রীদিগকে গর্ভের কথা গোপন করিতে এতটা তাকিদের সহিত নিষেধ করা হইতেছে।

২২৪ স্বামীর অধিকার :—

তালাক দেওয়ার পর এবং উপরোক্ত ইদ্দতের মধ্যে, স্বামীর যদি মন পরিবর্ত্তন হয় এবং স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিয়া সে যদি শান্তির জীবনযাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সময় পূর্ণ হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে তালাকী স্ত্রীকে গ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। স্বামীকে এই অধিকার দিয়া তালাকের অনাচার যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলারই চেষ্টা করা হইয়াছে। আয়তে বলা হইতেছে—যদি স্বামী 'এছলাহে'র ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থায় তালাকী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। এছলাহ শব্দের অর্থ—যাহা বিগড়াইয়া গিয়াছে তাহা সংশোধন করা—কোন বিপর্য্যয়ের ক্ষতিপূরণ করা। ব্যবহারে শান্তি ও মিলনের প্রচেষ্টাকে 'এছলাহ' বলা হয়। স্বামী যদি গতজীবনের ভুলভ্রান্তির সংশোধন করিয়া লইতে এবং ভবিষ্যতে স্ত্রীর সহিত শান্তির জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল সেই অবস্থাতেই সে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার অধিকারী। আয়তে এই শিক্ষা খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন স্বামী যদি এই শিক্ষার বিপরীতভাবে তালাকী স্ত্রীকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে আল্লার নিকট সে নিশ্চয়ই অপরাধী।

২২৫ স্ত্রীর সমান অধিকার :—

উপরে স্বামীর একটা অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, স্বামীর উপর স্ত্রীরও সেইরূপ কতকগুলি অধিকার আছে। তালাকী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণের প্রসঙ্গেই এই অধিকারের কথা উঠিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলে স্বামী যেমন স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ

করিতে অধিকারী, কোন অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলে, তালাক আদায় করিয়া লওয়ার অধিকারও সেইরূপ স্ত্রীর আছে। কোর্‌আনে ও হাদিছে খুব স্পষ্টভাষায় স্ত্রীদিগের এই অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই ছুরায় এবং ছুরা নেছা ও ছুরা তালাকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

২২৬ **পুরুষের প্রাধান্য** ঃ—

ছুরা নেছার ৩৪ আয়তে পুরুষকে নারীর قوام প্রধানরক্ষক ও অবলম্বন বলা হইয়াছে। নারীকে সে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, নিজে উপার্জ্জন করিয়া তাহার ভরণ-পোষণ করিবে, এইরূপ উপকরণ দিয়াই আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের এই প্রকৃতিদত্ত রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপই তাহার প্রাধান্যের কারণ। এ অবস্থায় এই প্রাধান্যের জন্য নারীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য বহুপরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। আয়তে এই কথা বুঝান হইতেছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য আছে - ইহা ঠিক। কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যতটা কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। কারণ আল্লাহ তাআলা তাহাকে নারীর রক্ষক ও অভিভাবকের উপাদান দিয়া সৃজন করিয়াছেন। স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের যে প্রাধান্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই। দুঃখের বিষয় এই তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনেকে এই আয়তের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করেন—স্ত্রীকে স্বামীর যথেচ্ছাচারের উপকরণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

উনত্রিংশ রুকু'

—০০০—

তালাক, খোলা' প্রভৃতি

২২৯ তালাক দুইবার,[২২৯] অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখিয়া লইতে হইবে অথবা সদ্ব্যবহারের সহিত বিদায় দিতে হইবে ; আর তোমরা যাহা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহার কিছু ফিরাইয়া লওয়া তোমাদিগের পক্ষে বৈধ হইবে না - তবে দম্পতিযুগল যদি এই আশঙ্কা করে যে, তাহারা আল্লার বিধানকে পালন করিয়া চলিতে পারিবে না (তখনকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র) ; তখন (হে বিচারপতিগণ !) তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, (বাস্তবিকই) স্বামী স্ত্রী আল্লার বিধান পালন করিয়া চলিবে না, সে অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তিলাভের কিছু বিনিময় দিলে তাহাদের প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না ;[২২৮] এগুলি হইতেছে আল্লার বিধান,

২২৯ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَ

অতএব তাহার লঙ্ঘন করিও না, বস্তুতঃ আল্লার বিধান-গুলিকে লঙ্ঘন করে যাহারা-তাহারাই'ত অত্যাচারী।

مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৩০ তৎপরে স্বামী যদি স্ত্রীকে (কথিতরূপে চরম-) তালাক দিয়া ফেলে, তবে অতঃপর ঐ স্ত্রী তাহার পক্ষে আর বৈধ হইবে না - যাবৎ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে; তখন এই (শেষোক্ত) স্বামী যদি তালাক দেয় - সে অবস্থায় স্ত্রী পূর্ব্বস্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলে তাহাদিগের প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না, আল্লার বিধান-গুলি পালন করিয়া চলিবে - এ বিশ্বাস যদি তাহাদের থাকে; আর এই সমস্ত হইতেছে আল্লার বিধান - বিদ্বৎসমাজের জন্য সেগুলি তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন।

٢٣٠ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

২৩১ এবং তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দাও আর তাহারা তাহাদের নির্দ্ধারিত মিয়াদে পৌঁছিয়া যায় - সে অবস্থায় তোমরা তাহাদিগকে হয় বিহিত

٢٣١ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ ص وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ج وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط
وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز
وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ
الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

ভাবে রাখিয়া লইবে অথবা বিহিত ভাবে বিদায় করিয়া দিবে, আর ক্ষতিজনক ভাবে অত্যাচার করার জন্য তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না,[২৩২] এবং এইরূপ করে যে ব্যক্তি - সে'ত বস্তুতঃ নিজের প্রতিই অত্যাচার করিয়া থাকে ; আর (সাবধান!) আল্লার আয়তগুলিকে হাসিঠাট্টার উপকরণ বানাইয়া লইও না, এবং তোমাদিগের প্রতি আল্লার যে নে'মত-আর যেরূপে তোমাদিগের প্রতি কেতাব ও প্রজ্ঞা নাজেল করিয়া তিনি তোমাদিগকে সদুপদেশ দিতেছেন - তাহা স্মরণ করিতে থাকিও ; আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে সাবধান থাকিও এবং জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সম্যক্‌রূপে অবগত।[২৩৩]

টীকা :—

২২৭ তালাক দুইবার :—

ঋতুস্নানের পর হইতে পুনরায় ঋতু আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে 'তোহর' বা শুচিকাল বলা হইয়া থাকে। এই তোহরে তালাক দিতে হইবে, ইহাই কোর্‌আনের স্পষ্ট আদেশ। ঋতুকালে তালাক দেওয়া অন্যায়। যে তোহরে স্ত্রীর সহিত একবারও

সহবাস হইয়াছে, তাহাতে তালাক দেওয়া অন্যায়। স্ত্রী স্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত না হইলে ইদ্দতের সময় তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া অন্যায়। ছুরা তালাকের প্রথম আয়তে আল্লার এই আদেশগুলি মুছলমানকে স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২২৮ আয়তে তালাকী স্ত্রীদিগকে তিন ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে বলা হইতেছে—তালাক দুইবার। অর্থাৎ দুই তোহরে স্বামীকে দুইবার তালাক দিতে হইবে। তৃতীয় তোহর হইতেছে শেষ সময়। এই সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ শর্ত্তে স্বামী তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ঐ সময় অর্থাৎ তিন তোহর অতীত হইয়া গেলে স্বামী সে অধিকার হইতে চিরকালের তরে বঞ্চিত হইয়া পড়ে।

তালাক দুইবার - অর্থাৎ বিভিন্ন সময় স্বতন্ত্রভাবে দুই তালাক দিতে হইবে। তাহার পর সদ্ব্যবহারের সহিত বিদায় অর্থাৎ তৃতীয় তালাক। এই তিন তালাক তিন তোহরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে দিতে হইবে, ইহাই কোর্‌আন ও হাদিছের শিক্ষা। এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেওয়াও কোর্‌আনের স্পষ্ট আদেশ অনুসারে নিষিদ্ধ। যে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে যাইতেছে, তাহাকে এই দীর্ঘ তিন মাস ধরিয়া একই ঘরে স্ত্রীর সহিত বসবাস করিতে হইবে, তাহার ভরণ পোষণ ও অন্যান্য তত্বাবধানও স্বামীকে করিতে হইবে। অথচ এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, এমন কি কামভাবে তাহাকে স্পর্শ করিলেও, তালাক পণ্ড হইয়া যাইবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, নিতান্ত গুরুতর দরকার ব্যতীত, অন্য কোন অবস্থায় তালাকের দুর্ঘটনা একেবারেই না ঘটিতে পারে, ইহাই ছিল কোর্‌আন ও হাদিছের সমস্ত ভাব ও ভাষার একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্যই হজরত রছুলে করিম তালাককে ابغض الحلال الى الله "আল্লার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত হালাল কাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আবু দাউদ, এবনে মাজা, হাকেম প্রভৃতি)। মআজ-এবনে-জবল ছাহাবি বলিতেছেন, হজরত রছুলে করিম বলিয়াছেন—দুনয়ার পৃষ্ঠে দাসকে মুক্ত করা অপেক্ষা প্রিয়কার্য্য আল্লার নিকট আর কিছুই নাই, এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিক ঘৃণিত কার্য্যও তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই (মনছুর ২—২৭৮)।

উপরি বর্ণিত বক্তব্যগুলি সমস্ত মজহাবের আলেমগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা স্বীকার করিয়াও একদল এমাম ও আলেম বলিয়া থাকেন যে, কোন ব্যক্তি কোর্‌আন হাদিছের এই আদেশগুলিকে উপেক্ষা করিয়া, যদি একই মজলিছে তিন তালাক দিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে। তাঁহারা ইহাকে 'তালাকে বেদয়ী' বা বেদ্‌আতী তালাক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্যের সার এই যে, এই প্রকার তালাক অন্যায় হইলেও বলবৎ হইয়া যাইবে। অন্যেরা বলেন—ইহা এছলামের সমস্ত শিক্ষার এবং কোর্‌আন হাদিছের ভাষা ভাব ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহ্য। কেহ এক মজলিছে তিন হাজার বার তালাক দিলেও তাহা এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে। হজরত রছুলে করিমের স্পষ্ট আদেশ অনুসারে

বেদ্‌আৎ মাত্রই গোম্‌রাহী এবং তাহা মর্‌দুদ (ভ্রষ্টতা এবং অগ্রাহ্য ও বাতিল)। সেই বেদ্‌আৎকে দিয়া শরিয়তের উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় ঘটান ঘোর অন্যায়।

হাদিছে বর্ণিত ইতিহাসে জানা যায়—হজরত রছুলে করিমের সময়, প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের খেলাফতকালে এবং হজরত ওমরের খেলাফতের দুই বৎসর পর্য্যন্ত, কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা একই তালাক বলিয়া পরিগণিত হইত। অতঃপর হজরত ওমর আদেশ প্রদান করেন যে, এখন হইতে কেহ এক মজলিছে তিন তালাক দিলে তাহা তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে (মোছলেম, আবুদাউদ, নাছাই প্রভৃতি)। লোক নির্দ্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাড়াতাড়ি একই মজলিছে তিন তালাক দিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায়, হজরত ওমর যে দণ্ডস্বরূপ এই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই হাদিছ হইতে তাহাও স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। ছাহাবি মাহমুদ-এবনে-লবিদ বলিতেছেন :—"এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়াছিল, এই সংবাদ হজরত রছুলে করিমের নিকট পৌঁছিলে তিনি ক্রোধভরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

ايلعب بكتاب الله عزوجل وانا بين اظهركم -

—"কী! আমি এখনও তোমাদের মধ্যে বাঁচিয়া আছি, আর আল্লার কেতাবকে লইয়া খেলা আরম্ভ হইয়া গেল ?" এই ব্যাপারে ছাহাবাদিগের মধ্যে ঘোর উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া যায়। এমন কি, একজন তাহাকে কতল করার জন্য হজরতের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন (নাছাই)। একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে এমাম আবুহানিফাও হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (লাম্‌আৎ, এই হাদিছের টীকা)।

যাহা কোর্‌আনের ভাব ও ভাষা উভয়ের বিপরীত, যাহাদ্বারা আল্লার কেতাবের সঙ্গে খেলা করা হয়, যাহাকে হারাম ও বেদ্‌আৎ বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তাহাই এখন আমাদের সমাজে ও আইন আদালতে শরিয়তের হুকুম বলিয়া প্রচলিত। এক মজলিছে তিন তালাক দিবার কুপ্রথা রহিত হইয়া যায়, হজরত ওমর যে একমাত্র এই উদ্দেশ্যে, দণ্ডস্বরূপ তাহাকে তিন তালাক বলিয়া গণ্য করার আদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة উক্তি হইতেই স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, দুর্ভাগ্যক্রমে হজরত ওমরের এই এজ্‌তেহাদের সদুদ্দেশ্য বর্ত্তমানে একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, ঐ কুপ্রথা এখন একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধানের স্থান করিয়া লইয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই আজ তালাকী স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনকে অভিশাপে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—যে সদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হজরত ওমরের এজ্‌তেহাদক্রমে, কোর্‌আন-হাদিছের স্পষ্ট আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করাও সঙ্গত বলিয়া মনে করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে কোর্‌আন হাদিছের শিক্ষাকেই পুনরায় সমাজে বলবৎ করিয়া লওয়া কি অন্যায় বলিয়া

বিবেচিত হইতে পারে ? এ দেশে প্রচলিত "মোহাম্মদীয় আইন" (বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া) কোর্‌আন হাদিছের শিক্ষার অতি শোচনীয়ভাবে অপচয় করিয়া দিয়াছে। আমার মনে হয়, আমাদের সামাজিক জীবনের একটা বড় গলদের মূল কারণ এইখানে লুকাইয়া আছে। সংক্ষেপে ইহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। এ দেশে প্রচলিত Mohamadan Law বা এছলামী আইনের কল্যাণে সাধারণতঃ সকলই বিশ্বাস করেন যে, মুছলমানের বিবাহ একটা Civil Contract ব্যতীত Sacrament কিছুই নহে, অর্থাৎ উহার সহিত ধর্ম্মগত সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই। অথচ হজরত রছুলে করিম বিবাহকে, নিজের ও অন্যান্য নবীগণের ছুন্নৎ বা আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য হাদিছে বিবাহকে "ঈমানের অর্দ্ধেক" বলিয়া উল্লেখ করার পর হজরত বলিতেছেন :—

من تزوج فقد استكمل نصف الايمان -

—"যে বিবাহ করিল, সে নিজের অর্দ্ধেক ঈমানকে পূর্ণ করিয়া লইল।" যে হানাফী ফেকাকে অবলম্বন করিয়া এ দেশের "মোহাম্মদীয় আইন" রচিত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট বিধান অনুসারে বিবাহ 'এবাদৎ' বলিয়া গণ্য (ফৎহুল্‌বারী)। দোর্রে মোখতার হানাফী ফেকার বিশ্বস্ততম গ্রন্থ, তাহাতে বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم الى الان ثم تستمر فى الجنة الا النكاح و الايمان

বিবাহ ও ঈমান ব্যতীত শরিয়তে এমন অন্য কোন এবাদত নাই, যাহা আরম্ভ হইয়াছে আদমের সময় হইতে এবং পরজীবনে বেহেশ্‌ত পর্য্যন্ত যাহা আমাদের সহিত শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

و يكون سنة مؤكدة فى الاصح ' فيأثم بتركه و يثاب ان نكح ولدا و تحصينا -

অধিক সঙ্গত মত এই যে, বিবাহ করা ছুন্নতে-মোআক্কাদা, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিলে গোনাহগার হইতে হইবে, এবং সন্তানলাভের ও সচ্চরিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিলে মানুষ ছওয়াব বা পুণ্যের ভাগী হইবে।

و رجح فى النهر وجوبه ' للمواظبة عليه و الانكار على من رغب عنه -

'নহরে-ফাএক'-গ্রন্থকারের মতে বিবাহকে ওয়াজেব বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত, কারণ হজরতের উহা চিরাচরিত আদর্শ। পক্ষান্তরে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয় যে, হজরত তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠক দেখিতেছেন—এছলামের পয়গম্বর যাহাকে ঈমানের অর্দ্ধেক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পার্থিবজীবন শেষ হওয়ার পরও শরিয়তের যে বন্ধন বেহেশ্‌তের অনন্তজীবনেও শাশ্বত হইয়া থাকিবে, হানাফী-ফেকার এমামগণ যাহাকে ওয়াজেব—অন্ততঃ ছুন্নাতে-মোআক্কাদা-বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই তথাকথিত "মোহাম্মদীয় আইনের

রচয়িতারা তাহাকে একদম ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য একটা Civil Contract মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই হানাফী আইনেরই দোহাই দিয়া !

২২৮ খোলা'-সংক্রান্ত বিবরণ ঃ—

স্বামী স্ত্রীকে 'যাহা' দিয়াছে, তাহার কোন অংশ তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া স্বামীর পক্ষে বৈধ হইবে না। 'যাহা' হইতে এখানে প্রধানতঃ মোহরকে বুঝাইতেছে। মোহর ব্যতীত অন্য কোন ধনসম্পত্তিও যদি স্বামী স্ত্রীকে চরমভাবে দান করিয়া থাকে, তাহা ফিরাইয়া লওয়াও বৈধ হইবে না। আজকাল মোহরকে যেমন একটা হিলা-শরয়ীতে পরিণত করা হইয়াছে, তাহা কোর্‌আনের ও হাদিছের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। মোহরের ঋণ যে পরিশোধ করিতে হয় এবং বিবাহের সিদ্ধতা যে মোহরের উপরে বহু পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা আজকাল আর কেহ মনে করেন না।

যে অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ হইতে তালাকের প্রস্তাব হয় নাই, বরং স্বামী নিজের ইচ্ছাক্রমে তালাক দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সে অবস্থায় স্বামী তাহার দেওয়া মোহর প্রভৃতি কিছুই ফেরৎ লইতে পারিবে না। ছুরা নেছার প্রথমভাগে ও অন্যান্য স্থানেও এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দাএন মোহর শোধ না হইয়া থাকিলে তালাকের সময় তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া দেওয়াও স্বামীর কর্ত্তব্য।

কিন্তু স্বামী তালাক দিতে অনিচ্ছুক, এরূপ অবস্থায় স্ত্রী যদি বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া লইতে চায়, এবং সে জন্য নিজের স্ত্রীধনের কিছু স্বামীকে দিয়া রফা নিষ্পত্তি করাইয়া লইতে সে যদি প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে স্বামীর পক্ষে তাহা গ্রহণ করা অবৈধ হইবে না। এই প্রকার বিবাহবিচ্ছেদকে শরিয়তের পরিভাষায় খোলা' বলা হয়।

আয়তে বিবাহবিচ্ছেদের পদ্ধতি সম্বন্ধে পর পর যে দুইটী স্তরের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। স্বামী ও স্ত্রী যদি মনে করে যে, আল্লার বিধান পালন করিয়া চলা আর তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্ত্তব্য অথবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য আল্লাহ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, সে কর্ত্তব্য পালন করিতে তাহারা আর সমর্থ হইবে না—তাহা হইলে দিনের এমাম বা তাহার কাজী-দিগের নিকট, অথবা সমাজপতি বা বিচারপতিদিগের নিকট নিজেদের এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করিয়া তাহারা বিচ্ছেদের প্রার্থনা করিবে—নিজেদের মনে একটা আশঙ্কা হইল, আর বিবাহ বন্ধন ছেদ করিয়া ফেলিল, এরূপ স্বেচ্ছাচারের অনুমতি কোর্‌আন মুছলমানদিগকে কখনই প্রদান করে নাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে —তোমরাও যদি দেখ যে, বাস্তবিকই তাহাদের আশঙ্কা অমূলক নহে, ভবিষ্যতে আল্লার বিধানকে পালন করিয়া চলিতে তাহারা সমর্থ হইবে না, কেবল সেই অবস্থাতেই তাহাদের স্থায়ীবিচ্ছেদের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

এখানে কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, কেবল খোলা'-তালাক সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্ত্রী যদি তালাকের প্রার্থী হয়, তবে সমাজপতি বা বিচারপতিগণের এই মধ্যস্থতার ব্যবস্থা চলিতে পারে। কারণ, খোলা' প্রসঙ্গেই এই ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তালাক দিতে চায়, তাহা হইলে সে তালাকের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করার অধিকার অন্য কাহারও নাই। আমার মতে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। পাঠক দেখিতেছেন, এই প্রসঙ্গে এবং এই আয়তের সহিত সংলগ্নভাবে ইহার পরবর্ত্তী আয়তে, তালাকের অন্য সাধারণ ব্যবস্থারও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, চরম তালাক হইয়া যাওয়ার পর ঐ তালাকী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার অধিকার স্বামীর থাকে না। খোলা'র "প্রসঙ্গের সহিত বর্ণিত হইয়াছে"-বলিয়া যদি প্রথম আদেশকে কেবল খোলা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম অনুসারে বলিতে হইবে যে, খোলা' ব্যতীত অন্য অবস্থায়, চরম তালাক হইয়া যাওয়ার পরও, স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার অধিকারী থাকে; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে কেহই প্রস্তুত হইবে না।

তালাক সম্বন্ধে বর্ণিত কোর্‌আনের আয়তগুলির যথাযথ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে, স্বামীদিগকে এছলাম স্বেচ্ছাচারের অধিকার কখনই প্রদান করে নাই। পাঠকগণ যথাস্থানে ইহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন। তাহার মধ্যকার দুইটী আয়তের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"... এবং যে সকল স্ত্রীর অবাধ্যতাচরণের ভয় তোমাদের হয়, তাহাদিগকে তোমরা (যথাক্রমে) উপদেশ দান কর, শয্যা হইতে তাহাদিগকে অপসারিত কর এবং (ইহাতেও ফল না হইলে) তাহাদিগকে প্রহার কর; অতঃপর তাহারা যদি তোমাদিগের বাধ্য হইয়া চলে, তবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আর কোন পন্থার অন্বেষণ করিও না।"

"আর যদি তোমরা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহা হইলে স্বামীর পরিজনদিগের মধ্য হইতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিজনবর্গের মধ্য হইতে একজন বিচারক নিযুক্ত করিবে, তাহারা উভয়ে যদি শান্তি ও মিলনের প্রয়াসী হইয়া থাকে-আল্লাহ তাহাদিগকে শক্তি দান করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞাত, সকল তত্ত্ব অবগত।" (ছুরা নেছা ৩৪, ৩৫ আয়ত)।

এখানে খোলা'র কোনই প্রসঙ্গ নাই। এই দুই আয়তে স্বামীদিগকে প্রথমে উপদেশ দিয়া ও শাসন করিয়া স্ত্রীর সুমতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে। তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে স্বামী এই অবস্থার কথা এমাম, কাজী, বিচারপতি বা সমাজপতিদিগের নিকট প্রকাশ করিবে। তাঁহারা তখন দুই পরিবারের দুইজন ব্যক্তিকে তদন্ত ও মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা মিটমাট করিয়া দতে

না পারিলে তখন স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিবার অধিকার পাইবে। সে তালাকও দিতে হইবে, তিন স্বতন্ত্র তোহরে, স্ত্রীকে স্বগৃহে রাখিয়া। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের মুছলমানদিগের পরাধীন জীবন এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বিকৃত "মোহাম্মদীয় আইন" কোর্‌আনের এই শিক্ষাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। উপরি উদ্ধৃত আয়তে এই সকল শর্ত্তে স্ত্রীত্যাগের অধিকার দিয়াছে—কেবল স্ত্রীদিগের চরম অবাধ্যতার অবস্থায়, পাঠকগণ ইহাও লক্ষ্য করিবেন।

খোলা' ও তালাক সম্বন্ধে কোর্‌আনের এই শিক্ষার উপর হজরত রছুলে করিমের ও তাঁহার খলিফাগণের সময় কিরূপ তাকিদের সহিত আমল করা হইত, তাহার দুইটী নজির নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) ছাবেত-বেন-কাএছ একজন ছাহাবী, কুরূপ কুৎসিত বলিয়া তাঁহার স্ত্রী হাবিবা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই সময় এক রাত্রে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করেন। ভোর বেলা হাবিবা আসিয়া হজরতের নিকট বিবাহবিচ্ছেদের প্রার্থনা জানাইলেন। হজরত স্বামীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং স্ত্রীকে অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হবিবা উত্তর করিলেন—"ধর্ম্মের দিক দিয়া বা চরিত্রের দিক দিয়া আমি উহাকে কোন দোষ দেই না, কিন্তু আমার মন উহার প্রতি বিদ্রোহী, মোছলেমজীবনে এই বিদ্রোহের ভার বহন করিয়া চলা আমার পক্ষে অসম্ভব।" ছাবেত স্ত্রীকে দুইটী বাগান মোহর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি হজরতকে বলিলেন। হজরতের প্রশ্নে হাবিবা বাগান ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইল। তখন হজরত ছাবেতকে বাগান ফিরাইয়া লইয়া স্ত্রীর দাবী দাওয়া ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তখন হইতে তাঁহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল (মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, নাছাই, এবনে মাজা প্রভৃতি)।

(২) হজরত আলীর খেলাফতকালে একটী পরিবারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অবনিবনাও হওয়ায় উভয়ই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, উভয়ের সঙ্গে তাহাদের আত্মীয়স্বজনগণের ভিড়। হজরত আলী তখন তাহাদিগকে কোর্‌আনের আদেশমতে উভয় পরিবার হইতে দুইজন বিচারক নির্ব্বাচিত করিতে আদেশ দিলেন এবং নির্ব্বাচনের পর ঐ বিচারকদ্বয়কে বুঝাইয়া দিলেন :—"তোমরা দেখিবে, উহাদের মিলন সম্ভব ও সঙ্গত কি না। যদি হয়, তবে উহাদিগকে পুনরায় সম্মিলিত হওয়ার আদেশ করিবে, অন্যথায় তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, ইহাই তোমাদিগের উপর ধর্ম্মের আদেশ।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রী বলিল—আমি সম্মত, আল্লার কেতাব আমার অনুকূল বা প্রতিকূল যাহাই আদেশ করুক না কেন, আমি তাহা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু স্বামী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল—বিবাহ বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাইতে আমি প্রস্তুত নহি। তখন হজরত আলী তাহাকে

তাহার স্ত্রীর ন্যায় কোর্‌আনের বিধানে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন (কবির ৩—৩২০)। হজরত আলীর সময় তালাকের এই প্রথা যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং স্বামী ও স্ত্রীর পুনর্মিলন বা স্থায়ীবিচ্ছেদ যে ঐরূপে নির্ব্বাচিত বিচারকদিগের সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত, ইহার আরও অনেক প্রমাণ হাদিছের কেতাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ এবনে আব্বাছ বলিতেছেন—হজরত ওছমানের খেলাফৎকালে আমাকে ও মাআবিয়াকে একটী বিবাহবিচ্ছেদের মোকদ্দমায় বিচারক মনোনীত করা হইল। আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল—তোমরা যদি উহাদিগের পুনর্মিলন সঙ্গত বলিয়া মনে কর, তাহাই করিয়া দিবে। আর যদি উহাদিগের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই তোমাদিগের সঙ্গত মনে হয়, তবে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। এই সমস্ত বিবরণের জন্য তফছির দুরে মনছুর, ২য় খণ্ড, ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২২৯ **আল্লার বিধান** ঃ—

মূলে 'হদুদ' আছে, উহা 'হদ' শব্দের বহুবচন। হদের আভিধানিক অর্থ সীমারেখা। আমাদের চৌহদ্দি শব্দ ইহা হইতেই সম্পন্ন। কোন্ কাজ করনীয় আর কোন্ কাজ বর্জ্জনীয়, আল্লাহ শরিয়তের বিধিব্যবস্থাদ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ বিধিবিধানগুলিই আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা, এবং তাহা অমান্য করিলেই আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হয়। তালাক, খোলা', মোহর, ইদ্দত, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে সকল আদেশ নিষেধের কথা এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে —আল্লার এই নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করিও না। কারণ জালেমগণ ব্যতীত অন্য কেহই, এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এক সঙ্গে একাধিক তালাক দেওয়াকে আল্লাহ জুলুম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আর জালেম জাতি যে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে لنهلكن الظالمين ইহাও কোর্‌আনের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত (এবরাহিম)। মছলমান তাহার জীবনের প্রতিপদক্ষেপে, আল্লার বিধিবিধানগুলি অমান্য করিয়া ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে। অথচ আমরা নিজেদের পতনের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে গিয়া আজ যেন একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। ইহা আমাদের কোরআন পরিত্যাগ করার শোচনীয় পরিণাম ব্যতীত আর কিছু নহে।

২৩০ **তৃতীয় তালাকের পরের ব্যবস্থা** ঃ—

২২৯ আয়তে দুই বারের তালাকের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে—তৎপরে, অর্থাৎ ঐ দুই তালাক দিবার পরে, স্বামী যদি পুনরায় তালাক দেয়, অর্থাৎ তিন তালাক যদি পূর্ণ হইয়া যায়—তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর সহিত পুনরায় বিবাহ করাও তাহার পক্ষে

বৈধ হইবে না। তবে ঐ স্ত্রী যদি অন্য স্বামীর সহিত বিবাহিত হয় আর সহবাসের পর এই দ্বিতীয় স্বামী যদি তাহাকে স্বেচ্ছাক্রমে তালাক প্রদান করে, এবং তখন যদি স্ত্রী তাহার প্রথম স্বামীর সহিত বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে কেবল এই অবস্থায় তাহাদের পুনর্মিলন বৈধ হইতে পারে। দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পূর্ব্বে তালাক দেয়, তাহা হইলে প্রথম স্বামীর পক্ষে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করা সিদ্ধ হইবে না, তাহা এই আয়ত হইতে এবং ইহার সমর্থক হাদিছ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায়। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতিতে বিবি আএশা কর্ত্তৃক বর্ণিত رفاعة القرظی সংক্রান্ত হাদিছে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, তালাকী স্ত্রী অন্য স্বামীর সহিত যথানিয়মে বিবাহিত হওয়ার পর, ঘটনাক্রমে তাহাদিগের দাম্পত্যজীবনও যদি অসুখকর হইয়া দাঁড়ায় এবং "আল্লার বিধান" অনুসারে এই স্বামীও যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই স্ত্রীর সহিত প্রথম স্বামীর পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। নিতান্ত নির্লজ্জ ও বেগায়রৎ না হইলে কোন মানুষই আর এই প্রকার বিবাহে সম্মত হইতে পারে না। ফলতঃ তালাকের পথে বাধা দেওয়াই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। যদি কোন ব্যক্তি, প্রথম স্ত্রীর সহিত পুনরায় বিবাহ করার অভিসন্ধি আঁটিয়া, অন্য কোন পুরুষকে তালাক দিবার শর্ত্তে রাজী করতঃ তাহার সহিত ঐ তালাকী স্ত্রীর বিবাহ ঘটাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিবাহ এছলামের পরিভাষায় কখনই বিবাহ নামে অভিহিত হইতে পারে না। যাহারা এইরূপ বিবাহ দেয় বা করে, আল্লাহ ও তাহার রছুলের মুখে তাহাদিগের উপর শতসহস্র অভিসম্পাৎ বর্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অভিশপ্ত মলউন বলিয়া কঠোর ভাষায় ভৎ´সনা করা হইয়াছে (আহমদ, তিরমিজি, আবু-দাউদ, এবনে-মাজা, বায়হাকী প্রভৃতি)। এই তথাকথিত বিবাহ "হজরতের সময় স্পষ্ট ব্যভিচার বলিয়াই গণ্য হইত" (হাকেম, বায়হাকী). এই প্রকার অনাচারকে বিবাহ নামে খ্যাত করা আর কোর্‌আনের সহিত বিদ্রূপ করা একই কথা (এবনে-আব্বাছ, মনছুর)। এই প্রকার বিবাহ যে কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না, হাফেজ এবনে কাইয়ম তাহা অতি বিশদ ও সম্পূর্ণ অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন (এ'লাম ৩—৫৫)। এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমদ বেন হাম্বল, এমাম আওজায়ী প্রভৃতি আলেম ও এমামগণ ইহাকে অন্যায় ও অসিদ্ধবিবাহ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (তফছির-আহমদী ১৩২ পৃষ্ঠা ও ১নং টীকা দেখ)।

পাঠক দেখিয়াছেন, একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে একদল পণ্ডিত বেদ্‌আৎ ও হারাম বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও ঐ শ্রেণী তালাককে সিদ্ধ Valid বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন। কোর্‌আন ও হাদিছের স্পষ্ট শিক্ষার এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, হঠাৎ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়া বসে, আর তাঁহাদের ফৎওয়া অনুসারে তাহা চরম তালাক বলিয়া গণ্য হইয়া যায়। অথচ স্বামী পরমুহূর্ত্তে অনুতপ্ত হইয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে

থাকে। কিন্তু উপায় নাই, উহা তাঁহাদের ফৎওয়ায় তিন তালাক বলিয়া গণ্য। কাজেই বেচারী স্বামী হয় নিরুপায় হইয়া অন্য 'মজ্হাব' গ্রহণ করে, না হয় ঘৃণিতভাবে হীলাশরয়ী করিয়া অন্য স্বামীদ্বারা তাহাকে হালাল করিয়া লওয়ার চেষ্টা পাইয়া থাকে। যেহেতু প্রথমে তাঁহারা বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, একসঙ্গে তিন তালাক দিলে, সেই বেদ্আৎ ও হারাম তালাক বলবৎ হইয়া যাইবে—সেই জন্য এই শ্রেণীর জঘন্য ব্যভিচারকেও তাঁহারা "মক্রূহ হইলেও জাএজ" বলিয়া ফৎওয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপে বিবাহের নামকরণে এই জঘন্য ব্যভিচারের ঘৃণিত প্রথা মোছলেম জগতের প্রতি কেন্দ্রে অতি শোচনীয়ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে।

২৩১ **আলেম সমাজ** :—

আলেম সমাজের জন্য বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আল্লার বিধিব্যবস্থাগুলি কোর্আনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আলেম বা বিদ্বান সমাজ তাহার ভাব ও ভাষা এবং তাহার লক্ষ্য ও আদর্শগুলিকে প্রথমে নিজেরা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন, এবং তাহার পর জনসাধারণকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন—ঐ সকল নিয়মের কোন অপচয় যাহাতে তাহারা করিতে না পারে, সে চেষ্টা তাঁহারা বিহিতভাবে করিতে থাকিবেন। কিন্তু আজ এই সকল বিষয় উপলক্ষে মুছলমান সমাজে সাধারণতঃ কোর্আনের শিক্ষার যে মারাত্মক ব্যভিচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য করা বা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাওয়া কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন না।

২৩২ **স্ত্রীকে আটকাইয়া রাখা** :—

নির্দ্ধারিত মিয়াদ অর্থে ইদ্দত। 'ইদ্দতে উপনীত হইয়া যায়'-অর্থে ইদ্দতকাল সমাপ্ত ার উপক্রম করে, ইদ্দত শেষ হয় হয় অবস্থায় উপনীত হয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে, ২২৯ আয়তে তাহা বলা হইয়াছে। ইদ্দতের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে, শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইলে অসতর্ক বা অনাচারী স্বামীদিগের হাতে একটা স্বেচ্ছাচারের অধিকার তুলিয়া দেওয়া হয়। তাই এই আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া -অসদুদ্দেশ্যে, স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য আটকাইয়া রাখার অধিকার তাহার নাই। যেমন একজন স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিল এবং ইদ্দত পুরা হওয়ার দুই তিন দিন পূর্ব্বে বলিয়া দিল—আমি স্ত্রীকে গ্রহণ করিলাম। কিছুদিন পরে, আবার তালাক দিল এবং ঐ প্রকারে আবার গ্রহণ করিল। এইরূপে স্বামী স্ত্রীকে আজীবন আটকাইয়া রাখিয়া চিরকাল তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে। তাহার অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের জন্য কোন ব্যবস্থা করার সুযোগ লাভ তাহা হইলে স্ত্রীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে

পারিবে না। এছলামের পূর্ব্বে আরবে ঐ প্রকার তালাক যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচলিত ছিল।

ঐ প্রকার অসদুদ্দেশ্যে স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখা যে হারাম, এই আয়তে বিভিন্নভাবে তাহা প্রকাশ করা হইতেছে। এই প্রকার আচরণে লিপ্ত হয় যাহারা, প্রথমে তাহাদিগকে জালেম বা অত্যাচারী বলা হইয়াছে। সে নিরপরাধ স্ত্রীর উপর যে অত্যাচার করিতেছে, তাহা ত সকলেরই বিদিত। কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে যে, তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচার করিতেছে — নিজের জীবনের, মনুষ্যত্বের এবং মোছলেম-স্বরূপের উপর। হজরতের সময়, আশআরী-সমজের লোক এইরূপে তালাক দিবার পর স্ত্রীদিগকে পুনরায় গ্রহণ করে। এই সংবাদ হজরত রছুলে করিমের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তখন আশআরী-সমাজের নেতা আবু-মুছা আসিয়া হজরতকে এই অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আশআরীদিগের তালাকের উল্লেখ করিয়া বলেন :— তোমরা তালাক দিতেছ আবার ফিরাইয়া লইতেছ, আবার তালাক দিতেছ পুনরায় ফিরাইয়া লইতেছ, এ সব কি ব্যাপার ?

ليس هذا طلاق المسلمين - طلقوا المرأة في قبل عدتها -

—মুছলমানের তালাক ইহা নহে (এবনে-মাজা, বায়হাকী, এবনে-কছির)। আলোচ্য আয়তের শেষভাগেও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উহা এছলাম নহে, বরং এছলামের সহিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং আল্লার আদেশ নিষেধকে অমান্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজের ও নিজস্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করার জন্য প্রস্তুত হয়, যে ব্যক্তি এছলামের নামে এছলামের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে থাকে, তাহার অত্যাচার নিবারণ করা কাজী ও বিচারপতির কর্ত্তব্য। আদালতে স্বামীর এই প্রকার অসদভিপ্রায় বা অত্যাচার প্রতিপন্ন হইয়া গেলে, বিচারক তাহাকে পুনঃগ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিবেন, ইহাই কোর্‌আনের উদ্দেশ্য।

২৩৩ **আল্লার নে'মত :—**

এখানে স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্যাদির কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং "তোমাদিগের প্রতি আল্লার যে নে'মত"-এই পদে "তোমাদিগের"-অর্থে স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি আল্লার যে বিশেষ নে'মত, তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। সেই জন্য "কেতাব ও হেকমতের" কথা ইহার পর স্বতন্ত্রভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছুরা রূমের ২১ আয়তে আল্লার এই নে'মতের কথা স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হইয়াছে :— "এবং তাঁহার নিদর্শনগুলির মধ্যে (একটী নিদর্শন) এই যে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে "যুগল"-সৃষ্টি করিয়া দিলেন, যেন তোমরা তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পার এবং তোমাদিগের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে তিনি প্রেম ও করুণার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন।"

দাম্পত্যজীবনের এই শান্তি, প্রেম ও করুণাই হইতেছে, আয়তে বর্ণিত আল্লার নে'মত। এখানে এই নে'মতকে স্মরণ রাখিতে অর্থাৎ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে মুছলমানকে আদেশ দেওয়া হইতেছে।

অত্যাচারী স্বামী তদ্‌বিরের জোরে হয় ত আদালতের বা সমাজের চোখ এড়াইতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে তাহার মনে করা উচিত নহে যে, দণ্ডের হাত হইতে সে বাঁচিয়া গেল। কারণ চরম বিচারের মালেক যিনি, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তোমাদের সকলের জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ সব বিষয়ই সম্যক্‌রূপে অবগত হয়েন, অতএব সদাসর্ব্বদা তাঁহার ন্যায়দণ্ডকে ভয় করিয়া চলিবে।

ত্রিংশ রুকু'

বিধবা ও তালাকী-স্ত্রীদিগের অধিকার

---

২৩২ এবং (হে মোছলেম সমাজ !) তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দাও এবং তাহারা নিজেদের নির্দ্ধারিত - মিয়াদে পৌঁছিয়া যায় — তখন তাহারা উভয়ই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিত ভাবে সম্মত হইয়া থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে গেলে, তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না[২৩৭]; তোমাদিগের মধ্যকার যে ব্যক্তি আল্লাহে ও পরকালে ঈমান রাখে - ইহাদ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; তোমাদিগের জন্য ইহা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম (ব্যবস্থা)[২৩৮]; বস্তুতঃ (তোমাদিগের মঙ্গলামঙ্গল) আল্লাই অবগত আছেন পরন্তু তোমরা তাহা অবগত হইতে পারিতেছ না।

২৩২ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ◎

২৩৩ এবং প্রসূতিগণ আপন সন্তান-দিগকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে — স্তন্যদানের জন্য নির্দ্ধারিত সময় সম্পূর্ণ করিয়া লইতে চায় যাহারা, তাহাদের জন্য (এই ব্যবস্থা); আর সন্তানের জনকগণ বিহিত-ভাবে প্রসূতীদিগের খোরাক ও তাহাদের পোষাক দিতে বাধ্য ; এবং কোন ব্যক্তির উপর যেন তাহার সাধ্যের অতীত ভারার্পণ করা না হয় — নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলিবে না, জনককেও তাহার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা (সঙ্গত) নহে, (জনকের) ওয়ারেসগণের উপরও ইহার অনুরূপ (কর্ত্তব্য), তবে (জনক জননী) উভয় যদি পরস্পরের সম্মতি মতে ও পরামর্শক্রমে (দুই বৎসরের পূর্ব্বে) দুধ ছাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করে, তাহাতে তাহাদিগের প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না ; আর তোমরা যদি আপন সন্তানদিগকে (জননী ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা) স্তন্যপান

২২২ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ
لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
اِلَّا وُسْعَهَا ج لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج
فَاِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

করাইতে চাও, তবে—তোমরা যাহা দিতে চাহিয়াছ - বিহিত-ভাবে তাহা সমর্পণ করার পর—তাহাতে তোমাদিগের কোন পাপ বর্ত্তাইবে না[২৩৮]; আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে সাবধান থাকিও এবং জানিয়া রাখিও যে আল্লাহ্ তোমাদিগের সমস্ত কার্য্য-কলাপের সম্যক দ্রষ্টা।

٢٣٤ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

২৩৪ এবং তোমাদিগের মধ্যকার যাহারা স্ত্রীদিগকে রাখিয়া মরিয়া যায়, (সেই বিধবাগণ) চারি মাস ও দশ দিন আপনা-দিগকে সম্বরিত করিয়া রাখিবে, অতঃপর এই বিধবারা যখন নিজেদের নির্দ্ধারিত সময়ে উপনীত হয়, তখন তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে যাহা (ব্যবস্থা) করে, তাহাতে তোমাদিগের প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না[২৩৯]; বস্তুতঃ তোমাদিগের সমস্ত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক খবরদার।

٢٣٥ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ

২৩৫ এবং (এই সমস্ত) স্ত্রীলোকের পয়গাম সম্বন্ধে তোমরা পরোক্ষ ভাবে যাহা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যাহা

أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

পোষণ করিয়া থাক - তাহাতে তোমাদিগের প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না; আল্লাহ্ জানিতেছেন যে তাহাদিগের উল্লেখ তোমরা করিবে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত গোপনে (বিবাহের) ওয়াদা করিও না, তবে যদি তোমরা কোন বিহিত কথা বল (তাহাতে দোষ নাই)। আর (ইদ্দতের) নির্দ্ধারিত সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ-বন্ধনের সঙ্কল্প করিও না; আর জানিয়া রাখিও যে, তোমাদের অন্তরের (গুপ্ত) বিষয়গুলি আল্লাহ্ বিদিত আছেন-অতএব তাঁহাকে সমিহ করিয়া চলিও! আর (সঙ্গে সঙ্গে ইহাও) জানিয়া রাখিও যে, তিনি ক্ষমাশীল-ধৈর্য্যশীল।

টীকা :—

২৩৪ তালাকী-স্ত্রীদিগের বিবাহে-বাধাদান :—

যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দাও, তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না-ইত্যাদি পদে "তোমরা"-শব্দে সমাজ হিসাবে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ফেলে এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, সে অবস্থায় স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করাও তাহার পক্ষে বৈধ হইবে না—স্ত্রী বিবাহ করিতে সম্মত থাকিলেও তাহা আর বৈধ হইবে না, ২৩০ আয়তে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্বামী যদি

এক বা দুই তালাক দেয়, আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব্বে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ না করে, আলোচ্য আয়তে এই শ্রেণীর ঘটনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। এখানে বলা হইতেছে যে, স্বামী যদি এক বা দুই তালাক দেয় এবং সেই অবস্থাতেই যদি ইদ্দতকাল শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে নিজের ইচ্ছাক্রমে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার অধিকার তাহার আর থাকিবে না। এ অবস্থায় নূতন বিবাহদ্বারা তাহারা পুনরায় মিলিত হইতে পারে এবং বিবাহ করিতে হইলে যথারীতি স্ত্রীর সম্মতি ইত্যাদিও দরকার। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে সে বিবাহে সম্মত হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে অসম্মতও হইতে পারে।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ অসদ্ভাব না ঘটিলে তালাক পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ গড়ায় না। স্বামী তালাক দিলে, স্ত্রীর অভিভাবকগণ স্বামীর উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা স্বাভাবিক কথা। এই প্রকারে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, তাহাকে তালাক দিয়া দূর করিয়া দিল যে স্বামী, তাহার প্রতি স্ত্রীর অভিভাবকের ঘৃণা ও বিদ্বেষেরও অবধি থাকে না। কাজেই সে স্বামীর সহিত পুনরায় নিজের কন্যা বা ভগ্নীর বিবাহ দিতে তাঁহাদের অভিমানে আঘাত লাগারই কথা। কিন্তু অভিভাবকগণ এক্ষেত্রে নিজের অভিমান বা ক্রোধের প্রতি নজর করিতে পারিবেন না—তাঁহাদিগকে দম্পতিযুগলের-বিশেষতঃ স্ত্রীর—জীবনের সুখ শান্তি আর তাহাদের মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, এই বিচ্ছেদের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সত্য সত্যই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছে, পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য তাহাদের অন্তরে সত্যকার আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে, সে অবস্থায় স্ত্রীকে এই বিবাহে বাধা দেওয়া তাহার অভিভাবকের পক্ষে কখনই বৈধ হইবে না। হজরত রছুলে করিমের সময় ঠিক এইরূপ একটা ঘটনা ঘটে। মা'কল-এবনে-য়্যাছার নামক ছাহাবীর ভগ্নিপতি তাঁহার ভগ্নীকে এইরূপ তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষ হইয়া যায়, তাহার মধ্যে স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাহাকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য ঘটক পাঠাইলেন—পরস্পরকে পাওয়ার জন্য তখন তাহারা উভয়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। মা'কল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ ভৎর্সনার সহিত এই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন। এই ঘটনার বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে, তিনি মা'কলকে ডাকিয়া তাঁহার নিকট এই আয়ত পাঠ করিলেন। মা'কল তখন নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে ঐ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, এবনে মাজা, এবনে জরির প্রভৃতি)।

২৩৫ **শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা :—**

যাহারা আল্লার প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী—অর্থাৎ যাহারা সত্যকারভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পরকালে সদাসৎ কাজের পুরস্কার বা দণ্ড মানুষকে নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন, এই সকল বিবরণদ্বারা তাহাদিগকে সদুপদেশ দেওয়া হইতেছে। সত্যকার

মো'মেন যে, সে নিশ্চয়ই এই উপদেশগুলি গ্রহণ করিবে, পক্ষান্তরে এই উপদেশগুলিকে উপেক্ষা বা অমান্য করিবে যে, তাহার ঈমানের দাবী একটা মিথ্যা ভণ্ডামি মাত্র।

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্বন্ধকে কোর্‌আন অতি গুরুতর ও পবিত্রতম ব্যাপার বলিয়া সর্ব্বদাই নির্দ্ধারণ করিয়া আসিয়াছে। হাদিছ অনুসারে বিবাহ আল্লার আমানৎ, বিবাহ নবীগণের ছুন্নৎ, বিবাহ স্বর্গীয় বন্ধন, বিবাহ অর্দ্ধেক ঈমান। কোর্‌আন ইহাকে শান্তি, প্রেম ও করুণার স্বর্গীয় বিধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সুতরাং নরনারীর এই বন্ধন যাহাতে শাশ্বত হইয়া থাকে, যাহাতে স্বর্গীয় বিধানের অবমাননা করা না হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কোর্‌আন তাহার সমস্ত বিধিব্যবস্থার মধ্য দিয়া বলিয়া দিতেছে যে, আল্লার নামে নরনারী একবার মিলিত হওয়ার পর, তাহাদের সে স্বর্গীয় সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইয়া থাকুক! নিতান্ত বাধ্য না হইলে, তাহাদের সে সম্বন্ধ জীবনে মরণে কখনই বিচ্ছিন্ন হইবে না, ইহাই এছলামের আদর্শ। আলোচ্য আয়তে ইহাকেই শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ পুরুষ একস্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে অথবা স্ত্রী একস্বামীর নিকট হইতে বিদায় পাইয়া অন্যস্বামীর মনোরঞ্জন করিতে যাইবে—ইহাতে ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত হইয়া পড়ে, সামাজিক জীবনের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, আজ গরু কেনা-বেচা করিতে মুছলমানের যেটুকু চিন্তা বা বিলম্ব হয়, জরু কেনা-বেচা করিতে ততটুকু চিন্তা বা বিলম্বও তাহার হয় না।

২৩৬ **শিশুসন্তানের ব্যবস্থা :—**

এখানে "প্রসূতিগণ"-শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন—শব্দের সাধারণ অর্থ অনুসারে, উহা তালাকী ও সধবা সকল শ্রেণীর প্রসূতীকে বুঝাইতেছে। অন্যেরা বলেন—এখানে প্রসূতী-শব্দদ্বারা কেবল তালাকী-প্রসূতীদিগকে বুঝাইতেছে, সধবা-প্রসূতীদিগের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রযুজ্য হইতে পারে না। ওয়াহেদীর মত ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে আয়তে প্রসূতী শব্দদ্বারা কেবল সধবা-প্রসূতীদিগকে বুঝাইতেছে, তালাকী-প্রসূতীদিগের সম্বন্ধে এ আদেশের প্রয়োগ হইতে পারে না।

শেষ মতটী যুক্তির হিসাবে একেবারে অচল (তফছিরুল কোর্‌আন)। আয়তে বর্ণিত "প্রসূতী" অর্থে যে তালাকী-প্রসূতীদিগকেই বুঝাইতেছে, তাহার একটা প্রধান প্রমাণ এই যে, আয়তে স্ত্রীকে দুধ খাওয়াইতে বলা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সন্তানকে দুধ খাওয়াইবার সময় সন্তানের পিতা প্রসূতীর খোরাক পোষাক যোগাইতে বাধ্য থাকিবে। অথচ স্ত্রীর খোরাক পোষাক যোগান স্বামীর উপর সর্ব্বদাই ওয়াজেব, প্রসূতী অ-প্রসূতী বলিয়া কোন পার্থক্য সেখানে নাই। সুতরাং "সন্তানের দুধ খাওয়াইবার কালে" স্বামী প্রসূতীকে খোরাক পোষাক দিতে বাধ্য—এরূপ বলাতে এমন এক প্রসূতীর

কথা বুঝা যাইতেছে, সন্তানকে দুগ্ধদানের অবস্থা ব্যতীত খোরাক পোষাক পাওয়ার অধিকার যাহার নাই।

ফলতঃ আয়তে ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে যে, তালাকী স্ত্রীর কোলে যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকে, তাহা হইলে ঐ সন্তানের দুই বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মাতাই তাহাকে দুধ খাওয়াইবে, আর তাহার জনক সেই সময় পর্য্যন্ত প্রসূতীর ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া যাইবে। সন্তানের বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে এই বাধ্য-বাধকতা শেষ হইয়া যাইবে।

২৩৭ **পিতার ওয়ারেসগণের কর্ত্তব্য :—**

তালাক দেওয়ার পরে এবং সন্তানের বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, সন্তানের পিতা যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ওয়ারেসগণও দুগ্ধদানের সময় পর্য্যন্ত ঐ তালাকী-প্রসূতীর খোরাক পোষাক যোগাইতে বাধ্য হইবে। বলা বাহুল্য যে, এই সকল ব্যবস্থাদ্বারা একদিকে যেমন পুরুষের নারীনির্য্যাতনের পথবন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, সেইরূপ পক্ষান্তরে তালাককে কার্য্যতঃ অসম্ভব করিয়া তোলা হইতেছে। মনে করুন—একজন লোক, তাহার স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় তালাক দিল। প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ইদ্দত, অতএব এই সময় পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার খোরাক পোষাক স্বামীকে যোগাইতে হইবে। তাহার পর প্রসবের পরেও দীর্ঘ দুই বৎসর পর্য্যন্ত নিজসন্তানের দুগ্ধদাত্রী ধাত্রীস্বরূপে সেই তালাকী স্ত্রীর ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করিয়া চলিতে হইবে। দুই বৎসরের কম বয়স্ক সন্তানের জননীকে তালাক দেওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। ইদ্দত সময় বাদেও, সন্তানের বয়স দুই বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত ঐভাবে খোরাক পোষাক পাওয়ার সে অধিকারিণী। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক হয় গর্ভবতী, না হয় দুই বৎসরের কম বয়স্ক সন্তানের জননী অবস্থাতেই অবস্থান করে। সুতরাং কোর্‌আনের ব্যবস্থা মোতাবেক তালাক দেওয়া যে, স্বামীর পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

২৩৮ **সময়ের পূর্ব্বে দুধ ছাড়াইবার ব্যবস্থা :—**

সাধারণ অবস্থাতেও অনেক সময় প্রসূতীর ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য দুই বৎসরের পূর্ব্বে দুধ ছাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তালাকীস্ত্রীলোকদিগের আরও অনেক অসুবিধা ঘটার সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় জনকজননী উভয়ই যদি দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে সন্তানের দুধ ছাড়াইয়া দিতে সম্মত হয়, এবং বিশেষজ্ঞরাও যদি মনে করেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় দুধ ছাড়াইয়া দেওয়াই সন্তানের পক্ষে মঙ্গলজনক অথবা প্রসূতীর পক্ষে আবশ্যক—তাহা হইলে দুই বৎসরের পূর্ব্বেও দুধ ছাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাঠকগণ দেখিবেন —আয়তে জনকজননীর স্বার্থের সহিত শিশুসন্তানের স্বার্থের প্রতি কতদূর দৃষ্টি রাখা

হইয়াছে। বিচ্ছেদের পর সন্তানের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা তাহার প্রসূতীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তালাকী স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষতি ও অপমান হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পিতাও দুধ ছাড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে পারে। ফলে সময়ের পূর্ব্বে দুধ ছাড়াইয়া দিবার জন্য তাহাদের উভয়ের একমত হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহারা একমত হইলেও, সন্তানের পক্ষে সে ব্যবস্থা ক্ষতিজনক হওয়াও অসম্ভব নহে। কাজেই কোর্‌আন ব্যবস্থা দিতেছে—শুধু تراض منهما তাহাদের দুইজনের সম্মত হওয়াই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ লোকদিগের تشاور মতামত গ্রহণ করারও দরকার হইবে। তাঁহারা যদি মনে করেন যে, দুধ ছাড়াইলে সন্তানের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে পিতা মাতা সম্মত হওয়া সত্বেও দুধ ছাড়ান সঙ্গত হইবে না—ইহাই দয়াময় আল্লার ন্যায় বিধান।

শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে। মনে করুন—জনকজননীর সম্মতিক্রমে এবং বিশেষজ্ঞদের দের পরামর্শ অনুসারে, দুইবৎসরের পূর্ব্বে প্রসূতীর নিকট সন্তানের দুধ খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, অথচ স্তন্যদান ব্যতীত তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব—এ অবস্থায় সন্তানকে স্তন্য দেওয়ার জন্য অর্থ দিয়া অন্য কোন ধাত্রী নিয়োজিত করা পিতার পক্ষে অবৈধ হইবে না। আয়তের শেষ অংশে এই ব্যবস্থা দিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে, খয়রাতীভাবে ও যাহাকে তাহাকে দিয়া অযত্নের সহিত দুধ খাওয়ান চলিতে পারিবে না। বরং এজন্য ধাত্রীনিয়োগ করিতে হইবে—বিহিতভাবে, এবং তাহাকে পারিশ্রমিক দিতেও হইবে—বিহিতভাবে। অতএব যে ধাত্রীর দুধ খাওয়াইলে সন্তানের স্বাস্থ্যহানী হইতে পারে, সেরূপ ধাত্রী নিয়োগ করা চলিবে না। পক্ষান্তরে বিনা পয়সায় কাহারও উপর দুধ খাওয়াইবার ভার দিলে সন্তানের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। সুতরাং দস্তরমত বিনিময় দিয়া ধাত্রী নিয়োগ করিতে হইবে। সন্তানের জননীকে তালাক দেওয়া যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, এই সকল ব্যবস্থা হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাইতেছে। আল্লার প্রাকৃতিক বিধানে দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর জীবন ধারণের ও স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ হইতেছে মাতৃস্তন্য। বিশেষ অবস্থা ব্যতীত শিশুকে এই মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারিবে না, ইহাও হইতেছে এই সকল ব্যবস্থার একটা প্রধান লক্ষ্য।

এই আয়তে জানা যাইতেছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দুই বৎসর। ছুরা লোকমানের ১৪ আয়তে বলা হইয়াছে—وفصاله في عامين অর্থাৎ "সন্তানের দুধ ছাড়ান দুই বৎসরের মধ্যে।" ছুরা আহকাফেও ইহার উল্লেখ আছে। এই সকল আয়তের তফছির সম্বন্ধে এমাম ও আলেমগণের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। এই মতভেদের কারণ এই যে, হজরত রছুলে করিমের আদেশ অনুসারে—

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - متفق عليه -

রক্তের সম্বন্ধে যে সব নরনারীর মধ্যে বিবাহ হারাম হইয়া থাকে, দুধের সম্পর্কেও তাহারা পরস্পরের প্রতি হারাম হইয়া যায়। সেইজন্য দুধভগ্নী প্রভৃতির সহিত বিবাহ করা নিজ সহোদরার সহিত বিবাহ করার ন্যায় হারাম। এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, শিশু কি বয়স পর্য্যন্ত দুধ খাইলে তাহার দুধ-মা ও দুধ সম্পর্কীয় অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত তাহার ঐরূপ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে.? এমাম শাফেয়ী প্রভৃতি অধিকাংশ আলেম ও এমাম আয়তগুলির সাধারণ অর্থ লইয়া বলেন—দুই বৎসরকে যখন আয়তে দুধ খাওয়াইবার শেষ সময় বলা হইতেছে, তখন শিশু উহার পর দুধ খাইলে দুধের সম্পর্ক ঘটিতে পারিবে না। এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণ আয়তগুলির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইহার জন্য আড়াই বৎসরকে শেষ সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (নববী) আমাদের দেশে এই উপলক্ষে আর একটা অনর্থক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল লোক মনে করেন, দুই বৎসরের অধিক সন্তানকে দুধ খাওয়ান হারাম, আর একদল আড়াই বৎসর বলিয়া থাকেন। ছুরা লোকমানের তফছিরে এ সমস্ত মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখিতেছি যে, সন্তানের আবশ্যক হইলেও, দুই বৎসর বা আড়াই বয়সর বয়সের পর তাহার পক্ষে মাতৃস্তন্য যে হারাম হইয়া যায়, ইহার কোন প্রমাণ আজও আমার হস্তগত হয় নাই। আহলে হাদিছ জমাতের একজন প্রধান আলেম লিখিতেছেন :—

جمہور رضاعت سے بعد دو برس کے مطلق منع نہیں کرتے ہیں کہ بالکل دو برس کے بعد بچے کو دودھ پینا جایز ہي نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بعد دو برس کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگي - (الکلام المبین ' ص ۲۹۲)

২৩৯ বিধবার ইদ্দত :—

বিধবার ইদ্দত চারিমাস দশদিন। এই ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার পর বিধবারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ যদি পুনরায় বিবাহ করাই তাহারা সঙ্গত মনে করে, তাহা হইলে তাহাতে অর্থাৎ সে বিধবাদিগকে পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি দেওয়াতে, অথবা তাহাদিগকে বিবাহ করার প্রস্তাব করাতে, দোষের কথা কিছুই নাই। এখানেও "তোমরা" শব্দে সমাজ হিসাবে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করা হইতেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ইদ্দতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সাজ সজ্জা করা, সুরমা লাগান, সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ (বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি)।

হিন্দুস্থানের পারিপার্শ্বিক প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া এক শ্রেণীর মুছলমান নিজেদের বালবিধবা কন্যাদিগের বিবাহ দিতেও লজ্জা বা ঘৃণাবোধ করেন। এই আয়ত এবং কোরআন হাদিছের অন্যান্য শিক্ষাকে এই কুসংস্কারের নিকট বলি দিয়া তাঁহারা নিজেদের কুলগৌরব অক্ষত রাখিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা জঘণ্য ধর্ম্মহীনতা ও

নির্ম্মম অত্যাচার আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর লোকের অবিরাম প্রচারের ফলে সাধারণতঃ মনে করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বিধবামাত্রকেই পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতেই হইবে—ইহাই আদর্শ। পরলোকগত স্বামীর প্রেমস্মৃতি এবং শিশু সন্তান-দিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যদি কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর প্রচারকেরা আদাজল খাইয়া তাহাদের পশ্চাতে লাগিয়া যান এবং ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া সেই বিয়োগ বিধুরা হতভাগিনীদিগের শোকসন্তপ্ত ও দুর্ভাবনা-ক্লিষ্ট মন ও মস্তিষ্ককে আরও জ্বালাতন করিয়া তোলেন। কিন্তু অতি-ধার্ম্মিকতার আগ্রহাতিশয্য বশতই হউক, নিজেদের কোন গোপন লালসার প্ররোচনায় হউক, অথবা শুধু অজ্ঞতার জন্যই হউক—তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ৪০ কোটি রূহানী সন্তানের প্রেমময় পিতা হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা, ঐ শ্রেণীর বিধবাদিগের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিয়া যাইতেও বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন :—

انا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ... امرأة آمت من زوجهـــا ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا او ماتوا - ابوداؤد -

মর্ম্মানুবাদ :—যে নারীর রূপ আছে, সম্ভ্রম আছে—অথচ স্বামী বিয়োগে যাহার গণ্ডদ্বয়ের উপর কালিমা ছাইয়া পড়িয়াছে, নিজের এতিম পুত্র কন্যাগণের মুখ চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া থাকে এরূপ যে বিধবা, সে কেয়ামতের দিনে আমার এমনই নিকটে হইবে—তর্জ্জনী ও মধ্যমা যেরূপ পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে (আবুদাউদ)।

২৩৯ **ইদ্দতকালে পয়গাম :—**

কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করা অথবা এই ইচ্ছা আ[illegible] প্রকারান্তরে তাহাকে জানাইয়া দেওয়াতে দোষ নাই। এখানে "স্ত্রী লোক" অর্থে পূর্ব্বর্ণিত বিধবাদিগকে বুঝাইতেছে।

২৪০ **গোপনে বিবাহের ওয়াদা :—**

বিবাহের যে বিহিত নিয়ম সমাজে প্রচলিত আছে, সে অনুসারে সঙ্গত ভাবে কোন নারীকে বিবাহ করায় প্রস্তাব করাতে দোষ নাই। কিন্তু তাহার বিপরীত, গুপ্ত ভাবে স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করা অন্যায়। ভাবপ্রবণ নারী হৃদয়কে রূপজ "বা কামজ মোহে আবিষ্ট করিয়া এক শ্রেণীর লালসাসর্ব্বস্ব পুরুষ তাহাদিগকে চিরকালই প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। অধিকন্তু এই শ্রেণীর গুপ্ত প্রেমের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যভিচারের দ্বার মুক্ত হইয়া যায় এবং অবশেষে পুরুষের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে নারীর ভাবী জীবন বিষময় হইয়া উঠে। আল্লার এই বিধানকে উপেক্ষা করার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজিক জীবন যে কিরূপ সাংঘাতিক ভাবে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে,

ঐ সকল দেশের শাসন বিবরণ ও আদালতের রিপোর্ট দেখিলে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল অনাচারের গতিরোধ করার জন্য এখানে বলা হইতেছে —বিহিতভাবে বিবাহের পয়গাম দেওয়াতে কোন দোষ নাই, কিন্তু গোপনে কোন নারীর সহিত বিবাহের ওয়াদা করা অবৈধ।

১৪১ ইদ্দতকালে বিবাহ নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ :—

বিধবা বা তালাকী স্ত্রীর ইদ্দতের কথা পূর্ব্বের আয়তগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ইদ্দতকাল সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে কোন নারীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। এই প্রকার বিবাহ যে হারাম, সে সম্বন্ধে সমস্ত এমাম ও আলেমগণ একমত (ফৎহুল বায়ান)। এই প্রকার বিবাহ যে অসিদ্ধ ও বাতিল, সে সম্বন্ধেও কাহারও মতভেদ নাই। হজরত ওমরের সময় এই প্রকারে ইদ্দতের মধ্যে একটা বিবাহ হইয়াছিল। তাহাতে হজরত ওমর তাহাদিগের বিবাহ বাতিল করিয়া দেন। হজরত আলীও ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। এমাম আবুহানিফা, এমাম শাফেয়ী, এমাম মালেক প্রভৃতি এমামগণ সকলেই এ সম্বন্ধে একমত। হজরত ওমর, এমাম মালেক, এমাম আওজায়ী প্রভৃতির মতে শুধু এই বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট হইবে না; বরং এই অনাচারী ভবিষ্যতে আর কখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না, ইহাও তাঁহাদের অভিমত। উপরোক্ত বিবাহের ঘটনায়, হজরত ওমর খলিফা স্বরূপে ঐরূপে আদেশ দিয়াছিলেন (আহকাম-রাজী ১—৪২৫)।

কিন্তু মুছলমান সমাজে আজ এই আদেশ-নিষেধের প্রতি যেরূপ শোচনীয়ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহা স্মরণ করিতেও ক্ষোভে ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতে হয়। বিধবার বা তালাকী স্ত্রীর যে ইদ্দত বলিয়া কিছু একটা বিষয় আছে, সাধারণতঃ লোকে যেন তাহা আদৌ বিদিত নহে। তাই ইদ্দতের পূর্ব্বে বিধবার বিবাহ এবং তালাকের দুই চারি দিনের মধ্যে তালাকী স্ত্রীর বিবাহ, আজকাল মুছলমানসমাজে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে; এমন কি, যে মজলিছে তালাক দেওয়া হইল, সেই মজলিছেই তালাকী স্ত্রীর বিবাহও হইয়া গেল—এরূপ ঘটনা আমি ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছি। প্রচলিত "মোহাম্মদীয় আইন" সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব অনাচারের সম্পূর্ণ ও স্থায়ী প্রতিবিধান সম্ভবপর নহে; তবে আমাদের আলেম ও প্রচারকগণ চেষ্টা করিলে, ইহার কতকটা প্রতিকার অসম্ভবও নহে। এই সকল হারাম বিবাহ ও হারাম তালাকের শেষ পরিণত কোথায় গিয়া দাঁড়াইতেছে চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে, শ্রমসার্থক মনে করিব।

একত্রিংশ রুকু'

বিধবা ও তালাকী-স্ত্রীদিগের ব্যবস্থা

২৩৬ যে স্ত্রীদিগকে তোমরা স্পর্শ কর নাই অথবা যাহাদিগের জন্য কোন মোহর সাব্যস্ত করিয়া দাও নাই - তাহাদিগকে তালাক দেওয়াতে তোমাদিগের প্রতি কোন দায়িত্বভার বর্ত্তায় না; এবং তোমরা তাহাদিগকে কিছু সংস্থান করিয়া দিবে ঃ— সচ্ছল অবস্থার লোক নিজের অবস্থানুসারে আর অসচ্ছল অবস্থার লোক নিজের অবস্থা-নুসারে-বিহিত সংস্থান (করিয়া দিবে), সৎকর্ম্মশীল লোকদিগের উপর এই কর্ত্তব্য।

২৩৭ আর তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্ব্বেই তালাক [illegible]গর মোহর তোমরা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছ —তাহা হইলে তোমাদিগের নির্দ্ধারিত মোহরের অর্দ্ধেক (সেই স্ত্রীর প্রাপ্য হইবে),

২৩৬ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

২৩৭ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا

فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অবশ্য তাহারা যদি মাফ করিয়া দেয় কিম্বা বিবাহের বন্ধন যাহাদের হাতে - তাহারা যদি মাফ করিয়া দেয়[২৪৫] (তাহা হইলে আর কিছুই দিতে হইবে না); আর তোমাদের মাফ করিয়া দেওয়াই পর্‌হেজগারীর হিসাবে অধিক সঙ্গত; এবং পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলিয়া যাইও না[২৪৬]; নিশ্চয় তোমাদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক্‌দ্রষ্টা।

২৩৮ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

২৩৮ সমস্ত নামাজের এবং বিশেষতঃ মধ্য-নামাজের হেফাজত করিতে থাকিবা, আর আল্লার হুজুরে দণ্ডায়মান হইবা আত্মসংযমী হইয়া[২৪৭]।

২৩৯ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৩৯ তবে তোমরা যদি (কোন বিপদের) আশঙ্কা কর, সে অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনাদির উপর (নামাজ সমাপন করিয়া লইবা),—অতঃপর যখন নিরাপদ হইয়া যাও - তখন, তোমাদের অবিদিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে যে মত শিক্ষা দিয়াছেন, সেই-রূপে আল্লার ধ্যান করিতে থাকিবা[২৪৮]।

٢٤٠ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২৪০ আর তোমাদিগের মধ্যকার যাহারা স্ত্রীদিগকে রাখিয়া মরিয়া যায় (এবং এই মর্ম্মে) অছিয়ত করিয়া যায় যে—"তাহাদিগের স্ত্রীরা এক বৎসরের ভরণপোষণ পাইবে (এবং এই সময়ের মধ্যে) তাহাদিগকে (বাটী হইতে) বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না"-এ অবস্থায় তাহারা যদি (স্বেচ্ছায়) বাহির হইয়া যায়, তবে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তাহারা যে ব্যবস্থা করে-তাহাতে তোমাদিগের প্রতি কোন পাপ বর্ত্তায় না, আর আল্লাহ্ হইতেছেন প্রবল, প্রজ্ঞাময়।[২৪৯]

٢٤١ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

২৪১ আর তালাকী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিহিতরূপে (ভরণপোষণের) সংস্থান করিতে হইবে; পর্‌হেজগার লোকদিগের উপর (ইহা) অবশ্য কর্ত্তব্য।[২৫০]

٢٤٢ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ع

২৪২ এইরূপে, তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ্ নিজআয়তগুলিকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া দেন, যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার।

টীকা :—

২৪৩ তালাকীস্ত্রীর অবস্থা চতুষ্টয় :—

তালাকী স্ত্রীর চারি প্রকার অবস্থা হইতে পারে। **প্রথম**—যাহার মোহর নির্দ্ধারিত হইয়া আছে এবং যাহার সহিত সহবাসও হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরের অধিকারিনী, স্বামী তাহার কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। তিন ঋতু পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। এই ছুরার ২২৯ আয়তে এই শ্রেণীর তালাকী স্ত্রীদিগের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়**—যাহার মোহর নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং তাহার সহিত সহবাসও ঘটে নাই। এই শ্রেণীর তালাকী স্ত্রীদিগের কথা এই আয়তে বর্ণিত হইতেছে—তাহাদিগকে তালাক দিলে স্বামীর উপর মোহরের কোন বাঁধাবাঁধি দায়িত্ব বর্ত্তায় না। তবে এ অবস্থাতেও আপন অবস্থা অনুসারে একটা কিছু সংস্থান স্ত্রীর জন্য করিয়া দেওয়া স্বামীর পক্ষে উচিত হইবে। ছুরা আহজাবে জানা যায় যে, এই শ্রেণীর তালাকী স্ত্রীদিগকে ইদ্দত পালন করিতেও হয় না। (৪৯ আয়ত) **তৃতীয়**—মোহর নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু সহবাস হয় নাই। পরবর্ত্তী (২৩৭) আয়তে ইহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইতেছে যে, এই শ্রেণীর তালাকী স্ত্রী অর্দ্ধেক মোহরানা পাইবার অধিকারিনী হইবে। **চতুর্থ**—মোহর নির্দ্ধারিত হয় নাই, অথচ সহবাস হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কুলপ্রথা অনুসারে একটা মোহর নির্দ্ধারণ করিয়া সেই সম্পূর্ণ মোহর তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। ছুরা নেছার ২৪ আয়তে এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

আয়তের প্রথম ভাগে جناح শব্দ আছে, উহার মৌলিক অর্থ ভার, বোঝা প্রভৃতি। ভাবার্থে কর্ত্তব্য ভার ও পাপের বোঝা সম্বন্ধেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ দায়ীত্ব বা কর্ত্তব্য ভার। অর্থাৎ ঐরূপ অবস্থা বিশেষে তালাক দিতে বাধ্য হইলে স্বামী মোহরানার দায়ীত্ব ভার বহন করিতে বাধ্য হয় না (করিব ২—৪০৫)।

২৪৪ মোহরের অর্দ্ধেক :—

পূর্ব্ব টীকায় বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর তালাকী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে এই আয়তে ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে যে, যে সকল স্ত্রীর মোহর নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং তাহাদিগের সহিত সহবাসও ঘটে নাই, তালাকের পর তাহারা মোহরানার দাবী করিতে পারিবে না। তবে অবস্থা অনুসারে তাহার ভরণপোষণের কিছু একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া স্বামীর পক্ষে উচিত।

২৪৫ যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন :—

উপরোক্ত অবস্থায় তালাক দিলে স্বামী অর্দ্ধেক মোহর পরিশোধ করিয়া দিতে বাধ্য। তবে স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, অথবা স্ত্রী নাবালেগা হইলে তাহার অলি যদি মাফ করিয়া দেয়, তাহা হইলে কেবল সেই অবস্থায় স্বামী মোহরের দায়ীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে। এখানে "যাহার হাতে বিবাহের বন্ধন"-পদে 'যাহার' শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল বলেন—এখানে 'যাহার' শব্দে স্বামীকে বুঝাইতেছে, অন্যেরা বলিতেছেন—উহা দ্বারা নাবালেগা স্ত্রীর অলি বা অভিভাবককে বুঝাইতেছে। যুক্তি প্রমাণের হিসাবে শেষোক্ত মতটাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'এমাম রাজী প্রথমোক্ত মতের সমর্থক'—ইহা অপ্রকৃত কথা, বরং ব্যাপার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমাম ছাহেব অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, এখানে 'যাহার' অর্থে নাবালেগা স্ত্রীর অলির। প্রথম মতকে তিনি বাতেল এবং দ্বিতীয় মতকে ওয়াজেব বা অবশ্য গ্রহনীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনার জন্য তফছির কবির, ২য় খণ্ড, ৪০৯ হইতে ৪১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণের বিবাহ দিবার অধিকার যে অভিভাবকগণের আছে এবং সে বিবাহ যে অসিদ্ধ নহে, এই আয়ত হইতে তাহাও সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে। কারণ যাহার বিবাহই মূলতঃ অসিদ্ধ, তাহার সম্বন্ধে তালাক ও মোহরের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

২৪৬ মাফ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত :—

স্বামীর সহিত যে স্ত্রীর "সাক্ষাৎ"ও হয় নাই, তালাকের পর তাহার অর্থ গ্রহণ ও উপভোগ করিলে নারীর আত্মসম্ভ্রমের ও তাহার মানসিক শুদ্ধতার অপচয় ঘটিতে পারে। তাই বলা হইতেছে—এ অবস্থায় কিছু গ্রহণ না করাই অধিক সঙ্গত। মানুষ কর্ত্তব্যের হিসাবে যতটা বাধ্য, তাহার অতিরিক্ত কোন উপকার করাকে এরূপক্ষেত্রে 'ফজ্‌ল' বলা হয়। আয়তে এই শ্রেণীর উপকার ও সদ্ব্যবহারের কথা বিস্মৃত না হওয়ার তাকিদ করা হইতেছে। অর্থাৎ তালাক হইতেছে চরম অপ্রীতিকর ব্যাপার। ইহাদ্বারা বিভিন্ন পরিবারের ও গোত্রের মধ্যে একটা স্থায়ী অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং দেনা-পাওনার ব্যাপারে নিজেদের প্রাপ্য কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া লওয়ার জন্য বা আইন মোতাবেক দেনার অতিরিক্ত কিছু না দেওয়ার জন্য কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া, যাহাতেএই অশুভ ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত কম অপ্রীতির সৃষ্টি করে, সকল পক্ষকে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

২৪৭ নামাজের হেফাজত :—

জেহাদ প্রসঙ্গেই এতিম ও বিধবাদিগের, তাহাদের বিবাহ, ইদ্দত ও ভরণপোষণাদির

এবং সেই সংশ্রবে তালাক প্রভৃতির বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছিল। এদিককার আলোচনা শেষ করার পর জেহাদ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা এই আয়ত হইতে আরম্ভ হইতেছে।

নামাজ এছলামের প্রধানতম সাধনা, ঈমানের সঙ্গে নামাজের স্থান। এই ছুরায় প্রথমে এবং অন্যান্য বহুস্থানে তাই ঈমান ও নামাজকে এক সঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লার আদেশ পালন ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জেহাদ এবং সে জেহাদে শক্তি ও তেজঃ সঞ্চয় করিতে হয় একমাত্র আল্লাহ হইতে। তাই জেহাদের যোগসাধনারও প্রধান উপকরণ হইতেছে নামাজ। শান্তি বা সংগ্রামের কোন অবস্থাতেই মুছলমান নামাজ ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আল্লার সহিত তাহার আত্মার সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।

নামাজের হেফাজত সম্বন্ধে এখানে যে দুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ অর্থ—বাধ্য বাধকতার সহিত দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে কোন কাজ সমাধা করিতে থাকা। সুতরাং حافظوا على الصلوات পদের সম্পূর্ণ অর্থ—বাধ্যবাধকতার সহিত নিয়মিত ভাবে চিরকাল সমস্ত নামাজ সমাধা করিতে থাকিবা। কখনও পড়িলাম, কখনও পড়িলাম না; এরূপ করিলে এই আদেশকে অমান্য করা হইবে। নামাজে বান্দা দণ্ডায়মান হয় আল্লার হুজুরে, সুতরাং সেই দরবারের অনুরূপ আদব-লেহাজের সহিত নিজকে ভিতর বাহিরের সকল দিক দিয়া শুদ্ধ ও সংযত করিয়া রাখাই তাহার কর্ত্তব্য।

আয়তে "মধ্য নামাজের" হেফাজত করার জন্য বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছে। এই 'মধ্যনামাজের' অর্থ লইয়া তফছিরের রাবীগণ যে প্রকার অন্যায় মতভেদের প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই দুঃখজনক। এই শব্দের তফছিরে ১৮ প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায় (নয়লুল-আওতার)। "আধুনিক" লেখকেরা আবার 'বোঝার উপর শাকের আটি' যোগ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, যাঁহার প্রতি কোরআন নাজেল হইয়াছিল, তাহার অর্থ তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছেন। এই মধ্যনামাজ অর্থে যে আছরের নামাজকেই বুঝাইতেছে, স্বয়ং হজরত রছুলে করিম তাহা পুনঃ পুনঃ যথেষ্ট পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন, সমস্ত বিশ্বস্ত হাদিছের কেতাবে ঐ সকল বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। একত্রে এই সকল হাদিছের জন্য 'এবনে-কছির, দোরে মনছুর, নয়লুল-আওতার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আছরের নামাজ ব্যতীত উহার অন্য কোন অর্থগ্রহণ করা যে যুক্তির হিসাবেও অসঙ্গত, এমাম রাজী এই আয়তের তফছিরে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। দিনের দুই অক্ত ফজর ও জোহর এবং রাতের দুই অক্ত মগরব ও এশা, ইহার মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় আছরকে মধ্যবর্ত্তী নামাজ বলা হইয়াছে। সময় সাধারণতঃ মানুষের বিষয় কর্ম্মের ভিড় অত্যন্ত অধিক হয় এবং সেজন্য আছরের

অঙ্কের প্রতি অনেক সময়ই লক্ষ্য রাখা হয় না। এই কারণে আছরের নামাজের প্রতি বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছে।

২৪৮ **বিপদ কালে নামাজের ব্যবস্থা :—**

সম্পদে বিপদে, শান্তিতে সংগ্রামে, আল্লার সহিত বান্দার যোগসূত্র কোন ক্রমেই ছিন্ন হওয়া উচিত নহে। শান্তির সময় ও সাধারণ অবস্থায় কিরূপে নামাজ সমাধা করিতে হইবে, উপরের আয়তে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। রণপ্রাঙ্গণে মৃত্যুবিভীষিকার মধ্যে দাঁড়াইয়াও মুছলমান নামাজকে ভুলিতে পারিবে না, এই আয়তে মুখ্যতঃ তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। পদাতিক চলিতে চলিতে এবং ছওয়ার ছওয়ারীর পিঠের উপর বসিয়া নামাজ পড়িবে, কিন্তু নামাজের অঙ্ক টলিতে পারিবে না। হজরত রছুলে করিম ও তাঁহার ছাহাবাগণ যুদ্ধের চরম ভীষণতার মধ্যেও কিরূপ ধীরভাবে নামাজ সমাপন করিতেন, সমস্ত হাদিছের কেতাবেই তাহার উল্লেখ আছে। সে সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, কোন অসাধারণ শক্তি বলে নিস্ব মরুবাসী বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এতত্ত্বের সন্ধান সেখানে পাওয়া যায়। মোছলেম বাহিনী তিনগুণ চতুর্গুণ শত্রু সৈন্য কর্তৃক বেষ্টিত, আততায়ীরা নানা রণসম্ভারে সুসম্পন্ন। তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, রণবিভীষিকা তাহার সমস্ত চণ্ডতা লইয়া সমরপ্রাঙ্গণে তাণ্ডব করিয়া চলিয়াছে, মুছলমান জীবনমরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। এ অবস্থায় সেই প্রাঙ্গণের সমস্ত ভীমভৈরব রণনিনাদকে পরাজিত করতঃ আজানের ধ্বনি উঠিল আল্লার নামে জয়জয়কার করিয়া। তরবারী কোষবদ্ধ করিয়া এমাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, মোছলেম বাহিনী নামাজের জন্য দলে দলে বিভক্ত হইয়া গেল। একদল আসিল, আল্লাহোআকবর বলিয়া সব ভুলিয়া সেই শোণিতসিক্ত ময়দানের মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল—শত্রুর অস্ত্র অবিরাম চলিয়াছে, তাহার মারণশস্ত্রগুলি মরণের পয়গাম বহিয়া চারিপার্শ্বে বন বন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু নামাজরত মোজাহেদ উদ্যত খড়্গ আর আসন্ন মৃত্যুকে উপেক্ষা করিলে চরম স্বস্তির সহিত নামাজ পড়িয়া যাইতেছে। সেনাপতির আহ্বান ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিয়া এক রেকআতের পর ইহারা গিয়া সম্মুখের কাতারে দাঁড়াইতেছে, অন্যেরা আসিয়া তাহাদের স্থানে নামাজ আরম্ভ করিয়া দিতেছে। দুনয়ায় এ দৃশ্যের তুলনা নাই, এ শিক্ষার তুলনা নাই, এ সাধনার তুলনা নাই। ফলতঃ নামাজ যে মোছলেম জীবনের কিরূপ গুরুতর ও অপরিহার্য্য সাধনা, এই আয়ত হইতে তাহাও খুব পরিষ্কার রূপে জানা যাইতেছে।

২৪৯ **স্ত্রীর জন্য অছিয়ৎ :—**

নারীদিগের সম্বন্ধে আরব সমাজে যে সকল অনাচার প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে ইহাও একটী। তখন মানুষ মরিবার পূর্ব্বে অছিয়ৎ করিয়া যাইত যে, তাহার স্ত্রী একবৎসর

পর্য্যন্ত খোরোপোষ পাইতে থাকিবে এবং তাহার ওয়ারেছগণ এই সময় পর্য্যন্ত তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিবে না। এই অছিয়ত অনুসারে সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও বিধবাগণ এক বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী গৃহে অবস্থান করিতে বাধ্য হইত, বিবাহ বা নিজের সম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা করার স্বাধীনতা ঐ শ্রেণীর বিধবাদের থাকিত না। কোরআন এই প্রচলিত প্রথার সংস্কার করিয়া দিয়া বলিতেছে—ঐ শ্রেণীর বিধবারা ইচ্ছা করিলে তাহার পরলোকগত স্বামীর অছিয়ত হইতে উপকার লইতে পারে, পক্ষান্তরে সে সঙ্গত মনে করিলে নিজের সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থাও করিতে পারে। যাহার উপকারের জন্য অছিয়ৎ, সেই যখন নিজের মঙ্গলের জন্য তাহা প্রত্যাখান করা সঙ্গত মনে করিতেছে, তখন স্বামীর উত্তরাধিকারীদের আর কোন দায়ীত্ব ত থাকিতেছে না। ইচ্ছা করিলে, ইদ্দতের পর, সে নিজের সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে যে কোন সঙ্গত ব্যবস্থাকরিতে পারে।

অধিকাংশ তফছিরকারের মতে এই আয়তটী মনছুখ বা রহিত। কিন্তু কোন আয়তের দ্বারা ইহা মনছুখ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে ঘোর মতভেদ দেখা যায়। একদল লোক এই আয়তটীকে বিভিন্নখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, বিভিন্ন আয়ত ও হাদিছ দ্বারা ইহার বিভিন্ন অংশকে রহিত প্রমাণ করায় চেষ্টা পাইয়াছেন! মোজাহেদ, আবু মোছলেম এমামরাজী প্রভৃতির মতে আয়তটী মনছুখ বলা অন্যায়। বস্তুতঃ এই আয়তটীকে মনছুখ বলার কোন প্রমাণ নাই, তাহার কোনও দরকারও নাই। প্রধানতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, এই আয়তে বিধবাকে এক বৎসর ইদ্দত পালন করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং স্বামীর সম্পত্তি হইতে এক বৎসরের ভরণ পোষণ তাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, এই ছুরায় ২৩৪ আয়ত দ্বারা বিধবার ইদ্দত চারিমাস দশদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ আয়ত দ্বারা আলোচ্য আয়তের "একবৎসর ইদ্দতের ব্যবস্থা" রহিত হইয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে অমাদের নিবেদন এই যে, এই আয়তে মাত্র স্বামীর বাটীতে অবস্থান করার কথা বলা হইয়াছে, ইদ্দতের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তাহারপর একটা মোটা কথা এই যে, যে আয়তটী রহিত হইবে তাহার উল্লেখ আগে হওয়া চাই, আর যাহা দ্বারা সেটা রহিত হইবে, সে আয়তটী পরে আসা চাই। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, ২৩৪ আয়ত দ্বারা ২৪০ আয়ত রহিত হইয়া যাইতেছে!

তাহার পর তাঁহারা মনে করিয়াছেন—এই আয়ত অনুসারে স্ত্রী উত্তরাধিকার হিসাবে মাত্র এক বৎসরের খোরোপোষের অধিকারিণী। তাই ছুরা নেছার ফারাএজ সংক্রান্ত আয়তকে ইহার বিপরীত মনে করিয়া, এই আয়তটীকে মনছুখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তরাধিকারের সহিতও এই আয়তের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহার পরবর্ত্তী আয়তে তালাকী স্ত্রীদিগের জন্য বিহিতরূপে কিছু সংস্থান করিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানেও সেইরূপ বিধবা সম্বন্ধে ঐ প্রকার সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৫০ **তালাকী স্ত্রীর সংস্থান :—**

এখানে কোন শ্রেণীবিশেষের তালাকী স্ত্রীকে নির্দ্দিষ্ট না করিয়া, সকল শ্রেণীর সকল তালাকী স্ত্রী সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া দেওয়া পরহেজ্‌গার লোকদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। হজরত এবনে আব্বাছ, এবনে ওমর, আতা, জাবের এবনে জ'এদ, ছইদ এবনে জোবের, আবুল আলিয়া, হাছন বাছরী, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমদ প্রভৃতি বলেন যে, এই আয়ত অনুসারে তালাকী স্ত্রীদিগের ভরণ পোষণের কিছু সংস্থান করিয়া দেওয়া স্বামীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য (তফছিরুল-কোরআন ২—৪৪৮)।

দ্বাত্রিংশ রুকু'

—০০০—

জেহাদ ত্যাগের কুফল-ইতিহাসের নজির

২৪৩ তাহাদের (অবস্থার) প্রতি তুমি কি মনোযোগ প্রদান করিতেছ না ?— মৃত্যুবিভীষিকাকে এড়াইবার জন্য যাহারা আপনাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল - অথচ তাহারা ছিল বহু সহস্র;[২৮১] তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন—'মর !' অতঃপর তাহাদিগকে তিনি জীবনদান করিলেন;[২৮২] নিশ্চয় সকল মানবের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

٢٤٣ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ◎

২৪৪ এবং আল্লার পথে যুদ্ধ করিতে থাক আর জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।[২৮৩]

٢٤٤ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ◎

২৪৫ কে আছে এমন ব্যক্তি - যে আল্লাকে উত্তম করজ দান

٢٤٥ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ

قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

করিবে, সে মতে তাহার জন্য আল্লাহ্ উহাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন ? বস্তুতঃ (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ বা স্বচ্ছল করিয়া থাকেন - আল্লাহ্, আর তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে তাঁহারই পানে।[২৫৫]

২৪৬ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

২৪৬ দেখিতেছ না, এছরাইলীয়-প্রধানগণের অবস্থা, মূছার পর (কি হইল) ? নিজেদের এক-নবীকে তাহারা যখন বলিয়াছিল — "আমাদের জন্য একজন রাজা নিরুপণ করিয়া দাও (যেন) আমরা আল্লার পথে যুদ্ধ করিতে পারি ! নবী বলিল —তোমাদিগের প্রতি জেহাদকে ফরজ করিয়া দেওয়া হইলে তখন আর যুদ্ধ করিতে চাহিবে না - তোমাদের পক্ষে ইহাই কি অধিক সম্ভব নহে ? তাহারা বলিল—আমরা যুদ্ধ করিব না, কিরূপে (সম্ভব) হইতে পারে"- অথচ নিজেদের আবাস হইতে ও স্বজনগণের নিকট হইতে আমরা বহিষ্কৃত হইয়াছি ! কিন্তু তাহাদিগের উপর যখন যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইল,

ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ۝

তখন-স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা সকলেই পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল ; আর জালেম-দিগকে আল্লাহ্ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন।[২৫৫]

২৪৭ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ

২৪৭ এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল — নিশ্চয় আল্লাহ্ তাল্‌ৎকে তোমাদের জন্য রাজা-রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন ;[২৫৬] তাহারা বলিতে লাগিল — আমাদের উপর তাল্‌তের রাজত্ব কিরূপে (সঙ্গত) হইতে পারে ? - বস্তুতঃ রাজত্বের স্বত্ব তাহা অপেক্ষা আমাদেরই অধিক - পক্ষান্তরে যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতাও তাহার নাই ;[২৫৭] নবী বলিল — নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের মোকাবেলায় তাল্‌ৎকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছেন এবং জ্ঞান ও দৈহিক-শক্তিতে তিনি তাহাকে প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন, আর আল্লাহ্ তাঁহার রাজত্ব যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আর আল্লাহ্ হইতেছেন অপর্য্যাপ্ত-দানশীল, সর্ব্বজ্ঞাতা।

২৪৮ এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল— তাহার রাজত্বের প্রমাণ এই যে, তোমাদিগের নিকট তাবুত সমাগত হইবে, যাহাতে থাকিবে তোমাদিগের প্রভুর নিকট হইতে শান্তি এবং মূছার ও হারুণের অনুচরদিগের (পরিত্যক্ত) মঙ্গলাবশেষ, - ফেরেশ্‌তাগণ যাহাকে বহন করেন ; নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক।	٢٤٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع

টীকা :—

২৫১ **জাতির জীবন মরণ :—**

জ্ঞানে চরিত্রে, ভাবে ভক্তিতে, দৈহিক ও আত্মিক শুদ্ধতায় এবং অধ্যাত্মযোগের সকল মহিমায় মণ্ডিত হইয়া, মুছলমান যাহাতে আদর্শজাতিরূপে বিশ্বের দিকে দিকে এছলামের জয়পতাকাকে তুলিয়া ধরিতে পারে—কলহমান বিশ্ববানবকে আল্লার নামে মনুষ্যত্বের এক সাধন কেন্দ্রে সম্মিলিত করিয়া দিতে পারে, কোরআনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই শিক্ষাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্মবিমুখ ধর্ম্মসাধনা অথবা ধর্ম্মবিহিন কর্ম্মসংগ্রামের কোনই সার্থকতা কোরআন স্বীকার করে না। তাই ভোগসর্ব্বস্ব জড়বাদীর বা ভক্তিসর্ব্বস্ব সন্ন্যাসীর স্থান এছলামে নাই। এছলাম বস্তুতই আল্লার খেলাফত এবং মুছলমান হইতেছে সেই 'খেলাফতে কোবরার' বাহক ও সাধক। সেইজন্য মুছলমান স্বরূপে, মছজিদ ও ময়দান উভয় ক্ষেত্রেই তাহার দরকার। ছুরা বকরার প্রথম হইতে এই সব দরকারের কথাই মুছলমানকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাই ঈমানের এবং নামাজ, রোজা ও হজ্জের উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে তাহাকে জেহাদের কথাও ভুয় ভুয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় চরিত্র গঠনের এবং আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সাধনাগুলির পরিচয় দেওয়া হইতেছে। জাতীয় চরিত্র গঠনের এবং আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সাধনাগুলির পরিচয় দেওয়ার পর, ইতিহাসের নজির উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে—সেই সাধনাকে গ্রহণ বা বর্জ্জনের ফলে জাতিগণ কি পুরস্কার বা অভিশাপের ভাগী হইয়াছে। জেহাদের সাধনা-সংক্রান্ত আদেশ উপদেশ গুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার পর, এখানেও কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জেহাদের স্বরূপ ও সার্থকতাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দেখান হইতেছে।

প্রথমে, ২৪৩ আয়তে, আরবদিগের পরিচিত এক জাতির ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে—তাহারা কোন অত্যাচারীর হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে, নিজেদের প্রাণ লইয়া স্বদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল। এই অংশের তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে মৃত্যুবিভীষিকা আসিয়া জাতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, ব্যক্তিগণের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া সেখানে জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হয়। ব্যক্তিগণ আপন আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলে, জাতির হিসাবে আত্মবিনাশের সহায়তাই করা হয়। তাহার পর, কোর-আন তীব্র ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে—অথচ তাহারা সংখ্যা শক্তিতে খুবই সম্পন্ন ছিল! অর্থাৎ—ব্যক্তি যখন তাহার জাতিগত কর্ত্তব্যকে ছোট করিয়া ও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়, সংখ্যাগত গুরুত্বের কোন সার্থকতাই আর তখন থাকে না।

২৫২ ব্যক্তির মরণে জাতির জীবন :—

এইরূপে কাপুরুষের মানসিকতা লইয়া তাহারা যখন আত্মরক্ষার নামে আত্মবিনাশের আয়োজন করিতেছিল, সেই সন্ধিক্ষণে আল্লাহ তাহাদিগকে জাতীয় জীবনের গূঢ় রহস্যটী স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—হে বিপর্য্যস্ত জাতির আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিগণ! তোমরা মরণকে বরণ করিয়া লইতে শিক্ষা কর, ব্যক্তিগণের এই মরণ-পণই জাতিকে স্থায়ী-জীবনের সকল অবদানে মহীয়ান করিয়া তোলে। অতঃপর তাহারা যখন আল্লার এই উপদেশ অনুসারে সাধনায় প্রবৃত্ত হইল, তখন আবার আল্লাহ তাহাদিগকে জীবন্তজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে—"সমস্ত মানবের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহশীল।" অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও মঙ্গলময় আল্লাহ, সকল মানুষকেই এমন শক্তি ও উপকরণ দিয়া পয়দা করিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলেই তাহারা নিজেদের জাতিকে দাসত্বের সকল অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া লইতে পারে। "কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার (শোকর) করে না।" আল্লাহ মানুষকে যে সকল শক্তি ও উপকরণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলির সদ্ব্যবহারের নামই শোক্‌র, আর সে গুলির অব্যবহার বা অপব্যবহারে 'কোফরানে নে'মত' বা আল্লার নেমতগুলি সম্বন্ধে কৃতঘ্নতা করা হয়। এ শিক্ষার প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল মুখে দিনরাত "শোক্‌র আল-হাম্‌দুল্লাহ" বলার নাম শোক্‌র গোজারী

নহে, ইহা ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। দুঃখের বিষয়, নিজেদের সংস্কারের প্রভাবে তাওক্কল, তকদির, ছবর, শোক্‌র প্রভৃতি শব্দগুলির অত্যন্ত ভ্রান্ত ও মারাত্মক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, অনেক সময়ই জাতির মন ও মস্তিষ্ককে একেবারে আড়ষ্ট ও অবসন্ন করিয়া ফেলা হইয়া থাকে।

এই আয়তে যে-জাতির জীবন মরণের কার্য্যকারণ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে, তাহারা যে কে, আয়তে তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এজন্য একদল রাবী এখানে কএকটা ভিত্তিহীন গল্প গুজব রচনা করিয়া লইয়াছেন, এবং চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের তফাছিরকারগণ সেগুলিকে এই আয়তের তফছিরে বিনা বাক্যে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন! ইহার মধ্যকার সব চাইতে অধিক প্রচলিত কাহিনীটী নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

মোহাম্মদ-বেন-মরওয়ান কুফী নামক এক ব্যক্তি বলিতেছেন—একবার কোন এক জনপদে তাউন (সংক্রামক পীড়া) আরম্ভ হইলে অধিকাংশ লোক অন্যত্র পলাইয়া বাঁচিয়া গেল, যাহারা পলায় নাই, তাহাদের অধিকাংশ লোকই তাউনে হালাক হইয়া যায়। তাহার পর পলাতক লোকগুলি নিরাপদে ফিরিয়া আসার পর পল্লীর অবশিষ্ট লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এবার তাউন উপস্থিত হইলে আমরাও দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইব। আল্লার কি মর্জ্জি, কিছুদিন যাইতে না যাইতে আবার তাউন উপস্থিত। তখন পূর্ব্বের পরামর্শ অনুসারে সকলেই পলাইয়া এক প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তখন প্রান্তরের দুইদিকে দাঁড়াইয়া দুই ফেরেশতা ঘোষণা করিলেন—"মরিয়া যাও!" বলা বাহুল্য যে, তাহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল আর তাহাদের শরীরও ক্রমে পচিয়া সড়িয়া গেল। তাহার পর 'হজকিল' নামে এক নবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোকগুলির অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ তাহাকে বলিলেন—আমি উহাদিগকে কি প্রকারে জীবন্ত করিব, তাহা দেখিতে চাও? নবী বলিলেন—হাঁ! তখন আল্লাহ তাহাকে বলিয়া দিলেন, ঘোষণা কর—হে অস্থিপুঞ্জ, আল্লার হুকুমে মিলিত হইয়া যাও! তখন হাড়গুলি হাওয়ায় উড়িয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। এইরূপে নবীর দ্বিতীয় আহ্বানে হাড়ের গায়ে মাস ও মাসের মধ্যে রক্ত সৃষ্টি, এবং তৃতীয় ঘোষণায় তাহাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইয়া গেল।

এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। এই গল্পের রাবী মোহাম্মদ এবনে মরওয়ান সাধারণতঃ السدي الصغير ছোট ছুদ্দী নামে পরিচিত। অনেক মোহাদ্দেছ ইঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মিথ্যাবাদী না হইলেও, তাঁহার বর্ণনার কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ হজকিল নবীর সময় সেই প্রান্তরে তিনি নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন না, তাহা অবগত হওয়ার অন্য কোন বিশ্বস্ত সূত্রও তাঁহার বিবরণে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই গল্পটী, বাইবেলের "যিহিষ্কেল Ezikel বা حزقیال

ভাববাদীর পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেখানে ভাববাদের পরিভাষায় জাতির হিসাবে এছরাইলের জীবন-মরণের কথাই বলা হইয়াছে (দেখ ৩৭ অধ্যায় ১—১১ পদ)। ইহা যে প্রকৃত ঘটনা নহে; বরং বানি-এছরাইলের জাতীয় জীবন ও জাতীয় মরণের কথাই যে, এখানে রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, রাবীদিগের বর্ণিত যিহিস্কেল নবীর ভাবোক্তিতেও তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

২৫৩ **জেহাদে জীবন ঃ—**

ব্যক্তিগণের মরণ বরণের উপর জাতির জীবন কিরূপে নির্ভর করিয়া থাকে, উপরে বানি এছরাইলের নজির উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখান হইতেছে। তাই এই আয়তে মুছলমানকে সাবধান করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে—সাধবান ! জেহাদ হইতে কখনই বিরত হইও না। অন্যথায় জাতির হিসাবে তোমাদের মরণ নিশ্চিত।

২৫৪ **আল্লাহকে 'করজ' দেওয়া ঃ—**

ধাতুগত হিসাবে 'করজ' শব্দের অর্থ কর্ত্তন করা। কর্ত্তন করার যন্ত্র বলিয়া কাঁচিকে মেক্‌রাজ বলা হয়। কোন বস্তুকে কর্ত্তন করিলে তাহা অংশে অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, এই হিসাবে এক একটা অংশকেও করজ বলা হয়। মানুষ নিজের সম্পদের এক অংশ অন্যকে ঋণদান করে বলিয়া, ভাবার্থে ঋণকেও কর্জ্জ বলা হয়। কিন্তু ঋণ উহার মৌলিক অর্থ নহে, একমাত্র ভাবার্থও নহে। যেমন নিজসম্প্রদের এক অংশ কাটিয়া লইয়া অন্যকে ঋণদান করিলে তাহাকে করজ বলা হয়, সেইরূপ তাহার কোন অংশ কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে তাহাকেও করজ বলা হয়। আবার যে কাজের ফল উত্তম, তাহাকে 'উত্তম করজ' এবং যে কাজের ফল মন্দ, তাহাকে 'মন্দ করজ' বলা হইয়া থাকে (জওহরী, তাজ, রাগের, কবির)। ফলতঃ মানুষ নিজের আর্থিক সম্পদের বা শারীরিক ও মানসিক শক্তির যে কোন অংশ কোন কার্য্যে ব্যয় করে, আররী তাহাকে 'করজ' বলা হয়। সুতরাং আল্লাহকে করজ দেওয়ার অর্থ—আল্লার নির্দ্ধারিত কার্য্যে নিজের শক্তি ও সম্পদের এক অংশ ব্যয় করা। যে কর্ম্মের দ্বারা উত্তম ফল লাভ করা যায়, তাহাই উত্তম কাজ।

উপরের আয়তে জেহাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই শ্রেণীর 'করজ' ব্যতীত তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ জেহাদকে সফল করিতে হইলে বিপুল অর্থ ব্যয়ের দরকার। জেহাদের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে মুছলমানকে উৎসাহিত করা হইতেছে। ব্যক্তিগণ জেহাদের জন্য যে অর্থব্যয় করে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় না। বরং আল্লাহ তাহাকে বহুগুণে বৰ্দ্ধিত করিয়া আবার তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দেন। শেষভাগে বলা হইতেছে—অবস্থা অসচ্ছল বলিয়া, বা দরিদ্র হইয়া যাইব

* ইজকেল নবীর এই সকল বিবরণের বিস্তৃত আলোচনা ৩৫ রুকুর তফছিরে দ্রষ্টব্য।

ভাবিয়া, জেহাদে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইও না। তোমাদের অবস্থাকে সচ্ছল বা অসচ্ছল করিয়া দেওয়ার কর্ত্তা যিনি, সে ভাবনা তিনি ভাবিবেন।

২৫৫ এহুদী প্রধানগণের নজীর :—

হজরত মূছার পরলোক গমনের পর এহুদীজাতির মানসিকতার চরম পতন আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা আমালেকা জাতির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল, এহুদার দেশে প্রবেশ করিয়া আমালেকাগণ বানিএছরাইলদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতেছিল। এই সব শোচনীয় অবস্থার সূচনা হইতেছিল যখন, তখন এহুদী প্রধানগণ তাহাদের নবী সমুয়েলকে বলিয়াছিল—"আমাদের উপরে একজন রাজা চাই; তাহাতে আমরাও আর সকল জাতির সমান হইব এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন" (১ সমুয়েল, ৮, ১৯—২১)।

বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ নবী রাজা নির্ব্বাচনের প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হইলেন, সদাপ্রভুকে রাজা রূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বলিলেন, রাজতন্ত্রের ভাবী অত্যাচারের কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু "সদাপ্রভুকে রাজা করিয়া" অগ্রসর হওয়ার মত ঈমানের বল এহুদী জাতি তখন হারাইয়া বসিয়াছে, নিজেদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে বিস্মৃত হইয়া পরজাতির অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই নবীর উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া তাহারা জেদ ধরিয়া বসিল—"অন্য সকল জাতির ন্যায়" আমাদের উপরও একজন রাজা নিযুক্ত করিয়া দিন, সেই রাজার পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়া আমরা পরজাতিদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিব!" বৃদ্ধ সমুয়েল নবী এহুদীজাতির মানসিকতা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। সাময়িক উত্তেজনার হুজুগে আর জেহাদের উপযোগী ঈমানের বলে কত যে পার্থক্য, তাহা তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতেন। তাই এহুদি প্রধানদিগের প্রার্থনার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—এখন তোমরা এই প্রকার উৎসাহ দেখাইতেছ, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, জেহাদের ব্যবস্থা হইলে তোমরাই প্রথমে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িবে। কারণ সাধারণতঃ বড় লোকেরা 'জাতি' 'জাতি' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, জাতির নাম করণে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। সুতরাং জাতির মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া যেখানে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগার আশঙ্কা, সেখানে সাধনক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পরাধীন জাতির 'মধ্যে' প্রধান হইয়া নেতা ও নায়ক সাজিয়া অবস্থান করে যাহারা, অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতির অগ্রগতির পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া রাখে তাহারাই। এইজন্য আয়তে 'এহুদীদিগের' না বলিয়া "এহুদী প্রধানদিগের" বলা হইয়াছে।

২৫৬ তালূৎ :—

তালূৎ শব্দের ধাতুগত অর্থ দীর্ঘকায় ব্যক্তি। প্রচলিত বাইবেল অনুসারেও জানা যায়

যে, সে সময় যাঁহাকে এহুদীদিগের রাজারপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তিনি সকলের অপেক্ষা দীর্ঘকায় ছিলেন (১ সমুয়েল, ১০—২৩)। বাইবেলে ইহাঁর নাম Saul বা সৌল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সৌল নাম ত্যাগ করিয়া কোরআন তাঁহার এই বিশেষণমূলক নামকে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এক শ্রেণীর খৃষ্টান লেখক কোরআনের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, প্রচলিত বাইবেলের সৌল নাম পরিত্যাগ করাতে কোরআনের একটা অসাধারণ মোজেজাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই দীর্ঘকায় রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি, এই গণ্ডগোলের ফলে বাইবেল রচয়িতারাও কোন কোন ক্ষেত্রে সমুয়েল ও সৌলকে অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বাইবেলিকা-বিশ্বকোষের লেখক এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে—The true name of the first King, however, passed into oblivion, like so much besides connected with this dim far-off figure. (Saul, 4303 Col.).

বাইবেল এই রাজার যে নাম দিয়াছে, তাহা যে ভিত্তিহীন, খৃষ্টান পণ্ডিতেরা এতকাল পরে এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কোরআন ১৪শত বৎসর পূর্ব্বে, সৌল নাম বর্জ্জন করিয়া তাহার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছে। সেই রাজার প্রকৃত নাম এহুদীরা ভুলিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য কোরআন এমন একটী বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাঁহার পরিচয় দিতেছে, যাহা সর্ব্ববিদিত ও সর্ব্ববাদী সম্মত।

২৫৭ **নায়ককে অস্বীকার :—**

তালূৎকে আল্লাহ রাজা রূপে মনোনীত করিয়া দিলে, এহুদী প্রধানগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। বংশগৌরবের, ধন সম্পদের ও জন সংখ্যার হিসাবে তালূতের ও তাঁহার গোত্রের কোনই বিশেষত্ব ছিল না। ঐ প্রধানরাই সেদিক দিয়া বড় হইয়া ছিল। কাজেই তাহারা আশা করিতেছিল, রাজা আমরা হইব, আর এছরাইল বংশের সমস্ত শাখা প্রশাখা আমাদেরই পদানত হইয়া থাকিবে। তালূৎকে নির্ব্বাচিত হইতে দেখিয়া তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, ধনসম্পদ ও গোত্রগৌরবের উল্লেখ করিয়া তালূৎকে হেয় করায় চেষ্টা পাইতে থাকিল।

২৫৮ **সরদারের যোগ্যতা :—**

এহুদীদিগের ঐ সকল অন্যায় মন্তব্যের উত্তরে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, জাতির নায়ক ও পরিচালকের পদে নিযুক্ত করা হইবে যাহাকে, ধন সম্পদ বা গোত্রের লোকসংখ্যা তাহার যোগ্যতার প্রধান উপকরণ রূপে বিবেচিত হইতে পারে না। একটা বিরাট জাতিকে মরণের সাধনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া দিবে যে-নায়ক,

তাহার দুইটী গুণের অধিকারী হওয়া চাই। প্রথম গুণ হইতেছে জ্ঞানবল।—জাতির নায়ককে জ্ঞান বলে বলীয়ান হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সে নায়ক নিজেও দৈহিক শক্তিতে শক্তিমান হইবে। জাতিকে রক্ষা করার জন্য যখন বাহুবল প্রয়োগের দরকার, তখনও যেন সে নায়করূপে সকলের অগ্রগামী হইয়া চলিতে পারে। জ্ঞানের প্রভাবমুক্ত শারীরিক শক্তি অথবা দৈহিক শক্তিশূন্য দার্শনিক মস্তিষ্ক, মানুষকে কখনই কোন বড় কর্ত্তব্যপালনের উপযোগী করিতে পারে না। সেজন্য চাই—ঐ দুইয়ের সমাবেশ। এই দুই গুণ তালুতে পূর্ণভাবে অবস্থিত ছিল, সেইজন্যই তাহাকে উৎপীড়িত পরপদদলিত এহুদীজাতির নায়করূপে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। এহুদী প্রধানগণ যে তালুতের বা সৌলের নির্ব্বাচনে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, ১ সমুয়েল, ২—২৭ পদেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

২৫৯ **তাবুত, ছকিনা** :—

আরবী তাবুত ও এবরাণী Tebah একই বস্তু। বাইবেলের অনুবাদকগণ, Ark ও ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক বলিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। তাবুত অর্থে পাত্র ও আধার, 'এইজন্য হৃদয়কেও ভাবার্থে তাবুত বলা হয়।' এই তাবুতে হজরত মূছার ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত ছিল। প্রথম প্রথম বিপদের সময় এছরাইলিয়গণ এই সিন্দুক খুলিয়া শাস্ত্রবাক্য ও মূছার উপদেশ বাণী বাহির করিত, তাহা পাঠ করিয়া সেই নির্দ্দেশ মতে কাজ করিত, ফলে জয়যুক্ত হইত। কালক্রমে লোকে সিন্দুকটাকেই দৈবশক্তির আকর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই "ঈশ্বরীয় সিন্দুক" সঙ্গে না থাকিলে এহুদীরা বিমর্ষ ও অবসন্ন হইয়া পড়িত। যুদ্ধবিগ্রহাদির ফলে এই সিন্দুকটা সময় সময় শত্রুদিগের হস্তগত হইয়া পড়িলে এহুদীদের দুশ্চিন্তার আর অবধি থাকিত না।

বাইবেলে এই সিন্দুকের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন :—

There are many gaps in its history ...... For many years the ark remained untouched—apparently forgotten. Shiloh disappears from history ; neither Saul nor even Samuel, whose youth had been spent with it, takes any further thought of it. After a remarkable period of obscurity, the ark enters suddenly into the history of David.

ইহার সার মর্ম্ম এই যে, 'তাবুতের ঐতিহাসিক পরম্পরায় মধ্যে মধ্যে ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। সৌল কিম্বা স্যামুয়েলের বিবরণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। দীর্ঘকাল অপরিজ্ঞাত থাকার পর দাউদের ইতিবৃত্তে হঠাৎ আবার তাবুতের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।' ফলতঃ সৌল বা তালুতের সময়সাময়িক ইতিহাসে বাইবেল রচয়িতা এই সিন্দুকের উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, আধুনিক সমালোচকগণ যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কোরআন এই gapটা

পূর্ণ করিয়া দিতেছে। সৌল বা তালুত সেই সিন্দুকটা উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহা আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

আয়তে বলা হইতেছে যে সেই সিন্দুকে ছকিনা ছিল, এবং হজরত মূছা ও হজরত হারূণের পরিত্যক্ত মঙ্গলাবশেষ بقية তাহাতে অবস্থিত ছিল। ছকিনাঃ শব্দের এক মাত্র অর্থ স্বস্তি ও শান্তি। কোরআনে এই অর্থেই উহার প্রয়োগ হইয়াছে। যথা :—

فانزل الله سكينته على رسوله - هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين -

কিন্তু তত্রাচ আমাদের তফছিরের রাবিগণের কৃপায় উহা এক কিম্ভূত কিমাকার জানওয়ারে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

সিন্দুকে "তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে শান্তি থাকিবে"—ইহার এরূপ অর্থ নহে যে, শান্তিরূপী কোন দৃশ্য পদার্থ সিন্দুকে পূরিয়া রাখা হইবে। এমাম রাজী এ ক্ষেত্রে বলিতেছেন :— ان كلمة في كما تكون للظرفية فقد تكون للسببية

অর্থাৎ—"ফি-বর্ণ যেরূপ অধিকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ 'কারণ'-অর্থেও উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।" ফলতঃ আয়তের অর্থ হইতেছে—ঐ সিন্দুক তোমাদের শান্তির কারণ হইবে। হজরত মূছা ও হজরত হারূণ আল্লার যে সব কালাম ও শাস্ত্র এহুদীদিগকে পৌঁছাইয়াছিলেন, নানাপ্রকার বিপদ আপদ ও অবহেলা উপেক্ষার ফলে এহুদীগণ তাহার একাংশ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহা ঐ তাবুতে রক্ষিত হইয়াছিল। ফেরেশতাগণের মারফতে এই সব কালাম তাঁহাদের নিকট সমাগত হইয়াছিল।

এহুদীগণ তখন পরজাতিদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। তাই এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা একজন রাজা নির্ব্বাচনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল। এই রাজার পতাকাতলে সমবেত হইয়া অত্যাচারীদের সহিত জেহাদে প্রবৃত্ত হইবে, জাতিকে অধীনতার সকল অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবে, ইহাই ছিল তাহাদের সঙ্কল্প। সিন্দুকে যে সকল বাণী সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে এই জেহাদ সংক্রান্ত কর্ত্তব্য, তাহার কঠোর পরীক্ষা ও সুন্দর পরিণামের কথা লিখিত ছিল। এই সিন্দুক অনেক দিন হইতেই এহুদিদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

তালূত রাজারূপে মনোনীত হইলে এহুদী প্রধানগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, দরিদ্র বলিয়া তালূতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিল। তখন তাহাদের নবী বুঝাইয়া বলিলেন—তোমাদের জাতির প্রধানতম সম্বল ও সম্পদ যে তাবুত, তাহা এখনও শত্রুদের হস্তগত। ধনী ও প্রধান তোমরা, আজ পর্য্যন্ত সেটাকেই উদ্ধার করিতে পারিলে না! কিন্তু এই দরিদ্র তালূত, নিজের দৈহিক শক্তি ও জ্ঞানবলের দ্বারা তাহা উদ্ধার করিয়া আনিবে। তখন তোমরা বুঝিতে পারিবে, নেতা ও পরিচালকের উপযুক্ত শক্তি দিয়া আল্লাহ তালূতকে তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ রুকু'

—ooo—

জেহাদের পরীক্ষা - এহুদী ইতিহাসের নজির

২৪৯ অতঃপর তালূৎ যখন সৈন্য-বাহিনী লইয়া (স্বদেশ হইতে) বহির্গত হইল, সে (নিজের লোকজনকে) বলিল ঃ—"নিশ্চয় আল্লাহ্ এক নদী উপলক্ষে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, তখন যে ব্যক্তি তাহা হইতে (জল) পান করিবে - সে কিন্তু আমার কেহ নহে, আর তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিবে না যে ব্যক্তি, সেই-ই আমার (অনুগত) লোক, তবে কেহ যদি নিজের হাতে এক অঞ্জলী গ্রহণ করে (তাহাতে বিশেষ কোন বাধা নাই)।" কিন্তু তাহাদিগের মধ্যকার অল্প লোক ব্যতীত - আর সকলে সেই নদীর জল পান করিল। তাহার পর যখন তালূৎ নিজের সঙ্গী-মো'মেন-দিগকে লইয়া নদী অতিক্রম করিয়া গেল (তখন তাহাদের

٢٤٩ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۙ
قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي ٓ
اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ
فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ
فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا
مَعَهُ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

بِجَالُوتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ◎

একদল) বলিতে লাগিল — "জ্বালূতের ও তাহার সৈন্য-বাহিনীর সহিত মোকাবেলা করার শক্তি আজ আমাদিগের নাই।" (পক্ষান্তরে) যাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদিগকে আল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাহারা বলিতে লাগিল —আল্লার হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করিয়াছে, বস্তুতঃ ধৈর্য্যশীল-দিগের সঙ্গী হইতেছেন — আল্লাহ্ ![৬১]

২৫০ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۭ

২৫০ এবং ইহারা যখন জ্বালূতের ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল, বলিতে লাগিল :—"হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদান কর আর আমাদিগের চরণগুলি অটল করিয়া দাও, এবং কাফের-জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত কর ![৬২]

২৫১ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۣ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ

২৫১ তখন তাহারা আল্লার হুকুমে জ্বালূতের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দিল, এবং দাউদ জ্বালূৎকে নিহত করিয়া ফেলিল এবং আল্লাহ্ দাউদকে রাজ্য ও

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لا لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

প্রজ্ঞা দান করিলেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাকে শিক্ষা দিলেন।[২৬৩] বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি মানব-সমাজের একদলের দ্বারা অন্য দলকে অপসারিত না করিতেন-তাহা হইলে বিশ্বসংসার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু (এরূপ হইতে পারে না) কারণ আল্লাহ হইতেছেন সকল বিশ্বের প্রতি প্রসাদশীল।

٢٥٢ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২৫২ এসমস্ত আল্লার আয়ত, তোমার নিকট সত্য সহকারে তাহার আবৃত্তি করিতেছি, বস্তুতঃ তুমিও নিশ্চয় প্রেরিতগণের মধ্যকার একজন।

তৃতীয় পারা

٢٥٣ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ م مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَ

২৫৩ এই সমস্ত রছুল-ইহাদিগের এক একজনকে আমরা (এক এক বিষয়ে) অন্যের উপর বিশেষত্ব দান করিয়াছি। যেমন তাহা-দিগের মধ্যকার কাহারও সহিত আল্লাহ্ কথা কহিয়াছেন-আবার

تِلۡكَ … اٰتَيۡنَا عِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ الۡبَيِّنٰتِ وَاَيَّدۡنٰهُ بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقۡتَتَلَ الَّذِيۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنٰتُ وَلٰـكِنِ اخۡتَلَفُوۡا فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اٰمَنَ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ كَفَرَ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقۡتَتَلُوۡا وَلٰـكِنَّ اللّٰهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيۡدُ ۞

(অন্যান্য প্রকারে) কাহারও মর্য্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর মর্‌য়ম্‌-তনয় ঈছাকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ প্রদান করিয়াছিলাম এবং রূহুল-কোদোছ্ দ্বারা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম।[২৬৫] আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নবীগণের পরবর্ত্তী লোকেরা—তাহাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ সমাগত হওয়ার পর—পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইত না, কিন্তু অবস্থা এই যে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, ফলে তাহাদের কতক হইল মো'মেন, আর কতক হইল কাফের। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন-তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।[২৬৬]

টীকা :—

২৬০ পরীক্ষা, নদীর জলপান :—

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, তালূৎ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া, অত্যাচারী পরজাতীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দীর্ঘ মরু প্রান্তর অতিক্রম করার সময় সৈন্যগণ যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় তালূৎ তাহাদিগকে

ডাকিয়া বলিলেন—সম্মুখে একনদী উপস্থিত হইতেছে। আমি তোমাদের নেতা ও অধিনায়ক স্বরূপে আদেশ করিতেছি, কেহ ঐ নদীর জল পান করিতে পারিবে না। যে করিবে, আমার মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকার অধিকার তাহার থাকিবে না। তবে কেহ যদি হাতে করিয়া এক গণ্ডুষ মাত্র পান করে, তাহাতে বিশেষ বাধা নাই। কিন্তু ঐ পানির আস্বাদও গ্রহণ করিবে না যাহারা, জেহাদের এই অনল পরীক্ষায় আমার প্রকৃত সঙ্গী তাহারাই।

জাতির মঙ্গল ও মুক্তির জন্য যখনই কোন মহৎ ও বৃহৎ সাধনার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হয়, তখন জাতির সকল স্তর হইতে সে সাধনার জয়ধ্বনি আরম্ভ হইয়া যায়। সেই প্রাথমিক অবস্থায় হুজুগের কোলাহল এতদূর বেশি হইয়া পড়ে যে, তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া মোমেন ও মোনাফেকদিগকে বাছিয়া লওয়া নায়কের পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মুক্তি, প্রগতি ও জয়যাত্রা প্রভৃতি বলিয়া বাচনিক আস্ফালন করা যতটা সহজ, প্রকৃত মুক্তিকামী মোজাহেদের জয়যাত্রার পথ বস্তুতঃ ততটা সহজ নহে। সে পথ নানাবিধ পরীক্ষার অসংখ্য কণ্টকে সমাকীর্ণ। এই পরীক্ষার ফলে কপটের দল, ভীরু কাপুরুষের দল, স্বার্থসর্ব্বস্ব সমাজপতিগণ যাত্রামার্গ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। মুক্তির একনিষ্ঠ সাধকগণ এই সকল জঞ্জালমুক্ত হইয়া তখনই সমবেত সঙ্ঘশক্তি লইয়া প্রকৃত জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়া দেন।

তালূতের ও তাঁহার সমসাময়িক এহুদীজাতির এই উপাখ্যান দ্বারা মুছলমানকে মুক্তিসংগ্রামের সেই অবশ্য জ্ঞাতব্য স্তরগুলির কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। পাঠক দেখিতেছেন, প্রথমস্তরে বানি-এছরাইলের প্রধান ব্যক্তিগণ পরজাতির অধীনতা হইতে মুক্তি চাহিতেছে। কিন্তু সে সময়কার তাহাদের মানসিকতার তাৎপর্য্য এই যে, জাতি বিদেশীর অধীনতা হইতে মুক্ত হউক, আর মুক্ত হইয়া তাহাদের অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হউক। জাতির মুক্তির আকাঙ্খা তাহাদের মুখের কথা। কিন্তু তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলের গূঢ় কথা এই ছিল যে, পরজাতিকে তাড়াইয়া, তাহারা কয়জন সেই আসনে বসিয়া স্বজাতিকে শাসন ও শোষণ করিতে চায়। কসাই যেমন নেকড়ের মুখ হইতে ছাগল-ছানা উদ্ধার করিতে চায়, তাহাদের এই জাতির মুক্তিসাধনাও ঠিক সেইরূপ। সকল দেশের সকল জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথমে, প্রধানদিগের এই মানসিকতার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪৬ আয়তে পাঠকগণ ইহার পরিচয় পাইয়াছেন।

এই স্তরকে অতিক্রম করিয়া শক্তিমান জননায়ক তালূৎ যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন এবং উদ্যোগ আয়োজন শেষ করিয়া শত্রু জাতির বিরুদ্ধে জয়যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন, লক্ষ লক্ষ এহুদী আসিয়া তখন তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। কিন্তু প্রকৃত জননায়ক মাত্রই অবগত আছেন যে, কোন বৃহৎ কার্য্য সমাধা করার জন্য সংহতি শক্তির দরকার, কতিপয় বিক্ষিপ্তমনা হুজুগ প্রিয় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা যে সাধনার

কোন সহায়তা হয় না। বরং এই 'দুষ্টবলদ'দিগের সহচর্য্য ফলেই সমস্ত সাধনাটা অনেক সময় পণ্ড হইয়া যায়। তাই পরীক্ষার তাত দিয়া খাঁটি ও ভেজালগুলিকে বাছিয়া ফেলিতে হয়।

জননায়ক তাল্‌ৎও তাহাই করিলেন। তৃষাতুর মরুযাত্রীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—আমার অনুগত যাহারা হইবে, এই নদীর পানি তাহারা মুখে দিবে না। কেহ এই জলপান করিলে জানা যাইবে যে, আমার দলের লোক সে কখনই নহে। তবে হাতে করিয়া একগণ্ডুষ যদি কেহ পান করে, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই।

এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার কাজ সুন্দর ভাবে সমাধা হইয়া গেল। হুজুগে-দল নায়কের কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া হরদম জলপান করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মছলা-বাদীরা বলিলেন, পিপাসা ও এক গণ্ডুষ পানের অনুমতি উভয়ই যখন আছে, তখন উভয় দিক রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে তাঁহারা এক এক গণ্ডুষ করিয়া জল পান করিয়া লইলেন। থাকিয়া গেল অল্প সংখ্যক অবুদ্ধিমানের দল, এক বুক পিপাসা লইয়া এক নদী জল তাহারা নীরবে অতিক্রম করিয়া গেল। সুতরাং আমরা তিনটী দলের স্বরূপ উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিতেছি। প্রথমদল অনর্থক বরং অনিষ্টকর, শক্তিমানের বজ্রমুষ্টি অথবা নিজেদের আশু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত, অন্য কোন মহৎ ভাবের ধার তাহারা ধারে না। কর্ম্মসংগ্রামের প্রথম অবস্থাতেই ইহাদিগকে বাদ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার পর দুর্ব্বল ঈমানের লোকদিগের দ্বিতীয় স্তর। সব কাজে ইহারা সঙ্গে থাকিতে চায়, জাতির জয়যাত্রা সফল হউক, এ আকাঙ্খাও তাহাদের আছে। কিন্তু ঈমানের দুর্ব্বলতার জন্য কোন বড় পরীক্ষায় সম্মুখীন হওয়ার শক্তি ইহাদের থাকে না। জননায়ক ইহাদিগকে সঙ্গে লইবেন বটে, কিন্তু কোন গুরুতর কার্য্যের জন্য ইহাদিগের উপর কখনই নির্ভর করিবেন না। মুক্তির পতাকাধারী জননায়কের প্রকৃত সহায় হইতেছে তৃতীয় শ্রেণীর সত্যকার আত্মসমর্পনকারী মোছলেম ও মোজাহেদগণ—সমরক্ষেত্রের অনল পরীক্ষায় সেনা-পতির ইঙ্গিতমাত্রেই বিনাবাক্যব্যয়ে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত আছে যাহারা। তাহাদেরই হৃৎপিণ্ডের তপ্তশোণিত দিয়া জাতির গৌরব ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা লিখিত হয়, তাহাদেরই দলিত মথিত বক্ষের চূর্ণবিচূর্ণ পঞ্জর-পুঞ্জ দ্বারাই জাতীয় গৌরবের বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

২৬১ **শক্তিগুরু ও সংখ্যাগুরু**:—

তাল্‌ৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোমেনদিগকে সঙ্গে লইয়া নদী পার হইয়া গেলেন। হুজুগে দল পশ্চাতে থাকিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের লোক সংখ্যা কমিয়া গেল। দুর্ব্বল ঈমানের লোকেরা নিজেদের এই সংখ্যাহ্রাসের অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল, আর বলিতে

লাগিল—জালুতের ও তাহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করার শক্তি 'আজ' আমাদের নাই। "আজ…নাই" অর্থে, আজ ফিরিয়া যাই, আবার শক্তিসঞ্চয় করিয়া উহাদিগের মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হইব। কিন্তু খাঁটি মোমেন যাহারা, যাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, মৃত্যুই মানবজীবনের শেষ পরিণতি নহে, এবং এই মৃত্যুর যবনিকাকে অতিক্রম করিয়াই বান্দা তাহার দয়াময় আল্লার সহিত মিলিত হইতে পারে—তাহারা তখন তারস্বরে বলিয়া উঠিল, মুছলমানের শক্তি তাহার সংখ্যায় নহে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জামেও নহে। তাহার প্রকৃত তেজ ও বাস্তব শক্তির একমাত্র কেন্দ্র হইতেছেন—আল্লাহ। সেই আল্লাহকে বুকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার পতাকাকে উচু করিয়া ধরিতে চাহিয়াছে যাহারা, সংখ্যা শক্তিতে ক্ষুদ্র হইয়াও তাহারা বহুবার বহু সংখ্যাগুরু অনাচারীদিগের বিরাট সৈন্য-বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে মোছলেম জীবনের এই সফলতার বহু নজির বিদ্যমান আছে। আবশ্যক ছবর বা ধৈর্য্যধারণ করার। আল্লাহ তাঁহার ছাবের বান্দাদিগের সঙ্গে আছেন, সুতরাং শক্তির জন্য সংখ্যাগণনা করিতে বসার কোন দরকার মুছলমানের কখনও হইতে পারে না।

২৬২ **বিজয় লাভের গূঢ় রহস্য :—**

"ধৈর্য্য ও প্রার্থনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতে থাক"—এই আয়তের তাৎপর্য্য আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। তালুতের সহযাত্রী মোমেন-মোজাহেদগণ প্রথমে ধৈর্য্যধারণের সাধনায় অগ্রসর হইতেছেন, পূর্ব্ব আয়তে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে তাহাদের প্রার্থনার বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে।

জালুৎ এক "৬॥ হাত দীর্ঘ বিরাট বপু দৈত্য।" অসংখ্য সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত। তাহাদের অযুত কণ্ঠের জয়নিনাদে সমর প্রাঙ্গন মুহুর্মুহু প্রকম্পিত। অন্যদিকে একদল সংখ্যালঘু মোছলেম ধীরস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, আকাশের পানে দুইহাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে—হে আল্লাহ! হে সকল শক্তির একমাত্র কেন্দ্র আল্লাহ! ধৈর্য্যের যে অনল পরীক্ষার পর তোমার মঙ্গল-আশীষ সমাগত হইয়া থাকে, সেই ধৈর্য্য ধারণের পূর্ণশক্তি আমাদিগকে প্রদান কর, আমাদিগের চরণগুলি অটল করিয়া রাখ, এবং কাফের জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া দাও! মুছলমানের মুক্তি-সাধনার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য এই দৃশ্যের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার জীবন ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায়, শক্তি ও ভক্তি সাধনায় এই পুণ্য আদর্শ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

২৬৩ **দাউদের বীরত্ব :—**

দাউদ সমাজের এক তরুণ যুবক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন,

কিন্তু বালক বলিয়া পিতা তাঁহাকে মেষপালের তত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। সহোদরদিগের সংবাদ লইতে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—আল্‌ূত স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বানি এছরাইল জাতিকে এবং তাহাদের ধর্ম ও ঈশ্বরকে টিটকারী দিতেছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে। তরুণ যুবকের বীর হৃদয়, জাতির ও ধর্মের এই অবমাননা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি কএকখণ্ড প্রস্তর ও একখানি লাঠি লইয়া অগ্রসর হইলেন, প্রস্তরাঘাতে আল্‌ূৎকে আহত করিলেন, তাহারই খড়্গদ্বারা তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন, বাইবেলেও এ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। যাত্রার সময় এই বালকবীরকে যথানিয়মে বর্ম্মাচ্ছাদিত করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার গুরুভার বহন করিয়া অগ্রসর হওয়া বালকের সাধ্যাতীত। কাজেই তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং যাত্রার সময় বলিতে লাগিলেন—যাঁহার নামে আমাদের এই সংগ্রাম, ইচ্ছা করিলে তিনিই বর্ম্ম হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন।

২৬৪ **জেহাদের লক্ষ্য :—**

মুছলমানের এই যে জেহাদ সাধনা, ইহার মধ্যে আল্লার কি মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত, এই আয়তে এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য আয়তগুলিতে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া দেওয়া হইয়াছে। ছুরা হজ্জের ৪০ আয়তে জেহাদের আদেশের পর বলা হইয়াছে—"এবং আল্লাহ যদি মানব সমাজের একদলের দ্বারা অন্যদলকে নিবারিত না করিতেন তাহা হইলে গির্জ্জা, এহুদীদিগের ধর্ম্মস্থান Synagogues, এবং মন্দির ও মছজিদগুলি তাহাতে প্রভূতভাবে আল্লার নামের স্তবও ধ্যানধারণা করা হয়, সে সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বিশ্বসংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে চায় যাহারা, কোন জাতির ধর্ম্মসাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চায় যাহারা, বিশ্বমানবকে, জাতি ও ধর্ম নির্ব্বিশেষে, সেই অত্যাচারীদিগের কবল হইতে রক্ষা করাই মুছলমানের জেহাদ সাধনার প্রধানতম লক্ষ্য। এছলামের জেহাদ যে কিরূপ উদার মহান ও অনুপম, এই আয়তগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এছলামের গাজী যেমন যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া নিজের মছজিদকে রক্ষা করিবে, ঠিক সেইরূপে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গির্জ্জাও মন্দিরগুলিকে রক্ষা করার জন্য আত্মবলিদান করাও তাহাদের মোছলেম জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য। দুনয়ার অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মানুষকে এই মহিমার বাণী শুনাইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদের সময় ইহার সুযোগও ঘটিয়া উঠে নাই। তাই সর্ব্ব-সমন্বয়ী উদার বিশ্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার প্রতি ভবিষ্যতের ভারার্পণ তাঁহারা সকলে একবাক্যে করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, পারার শেষ আয়তে এই তত্ত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইতেছে।

২৬৫ **রূহুল কোদছ :—**

"রূহুল কোদছ" এর তাৎপর্য্য ৮৭ আয়তের টীকায় দ্রষ্টব্য। রছুল হিসাবে রছুলগণ সকলেই সমান, অর্থাৎ সকলেই আল্লার নিকট হইতে সত্যকার প্রেরণাপ্রাপ্ত, সকলের নিকটই আল্লার কালাম সমাগত হইয়াছে। কিন্তু এক এক যুগের আবশ্যক অনুসারে সেই যুগের পয়গম্বরকে এক একটা বৈশিষ্ট্য দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক রছুলেরই এইরূপ এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই সেই বৈশিষ্ট্যের হিসাবে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকলেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকাতে মোটের উপর তাঁহারা সকলেই আবার সমান পর্য্যায়ভুক্ত। তাই এই ছুরায় ২৮৫ আয়তে মুছলমানের মুখ দিয়া বলান হইতেছে— لا نفرق بين احد من رسله —"আল্লার রছুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য আমরা করি না।" হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে যেহেতু তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সকল যুগের জন্য শেষ ও একমাত্র নবীরূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, সেইজন্য সকল যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করিয়াই তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং রছুল হিসাবে অন্য সকলের সমান হইলেও, এই সকল বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া অন্য সকল রছুল অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ।

২৬৬ **কলহের কারণ :—**

রছুলগণ সকলে সমান, তবুও মানব সমাজ সেই রছুলদিগের নাম করিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, রছুলগণের পরলোক গমনের পর, একদল লোক তাঁহাদের নাম করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে সেই রছুলগণের শিক্ষাকে তাহারা অমান্য করিয়া বসে। তাই কোফরের সহিত ঈমানের এবং শয়তানের সহিত সত্যের সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এই সংগ্রাম স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত। (১)

---

(১) এই রুকুর তফছিরে, কোন কোন খৃষ্টান লেখক Gideon ও Saul এর ইতিবৃত্তের দোহাই দিয়া যে, 'Confusion'-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর অকিঞ্চিৎকর এবং বাইবেলের এই সমস্ত ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিক হিসাবেও যে কতদূর অবিশ্বাস্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সমালোচনা পাঠ করিলেও পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

চতুস্ত্রিংশ রুকু'

তাওহিদের স্বরূপ, ধর্ম্মে জোর-জবরদস্তি নাই

২৫৪ হে মো'মেনগণ! তোমাদিগকে আমরা যাহা দান করিয়াছি, সেই (কঠিন) কাল সমাগত হওয়ার পূর্ব্বে তাহা হইতে সদ্ব্যয় করিতে থাক - যাহাতে বিকিকিনি এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশ (-এর কোন সার্থকতা বা সুযোগ) নাই ; আর অবিশ্বাসী যাহারা - তাহারাই ত হইতেছে অত্যাচারী।

٢٥٤ يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৫৫ আল্লাহ্! - তিনি ব্যতীত অন্য কোনও ঈশ্বর নাই, চিরঞ্জীব তিনি - স্বয়ং স্বত্ব ও বিশ্বস্বত্বার কারণ তিনি। তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিদ্রাও (তাঁহাকে অভিভূত করিতে) পারে না। স্বর্গে ও মর্ত্তে যাহা আছে - সে সমস্তের অধিপতি তিনি। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার সন্নিধানে সুপারিশ করিতে সমর্থ - কে

٢٥٥ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ط وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ط وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

আছে এমন ব্যক্তি? তাহাদের সাক্ষাৎ ও পশ্চাতের সমস্তই তিনি অবগত হয়েন, এবং তাঁহার ইচ্ছা যতটুকু - তাহা ব্যতীত, তাঁহার জ্ঞানের সামান্যঅংশেরও অভিব্যাপ্তি তাহারা করিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে— অথচ সে সকলের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, বস্তুতঃ তিনিই হইতেছেন মহাসম্ভ্রান্ত, মহামহিম।[২৫৮]

২৫৬ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৫৬ ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন জোরজবরদস্তি (করিতে) নাই, (কারণ) অসত্য হইতে সত্য নিশ্চয়ই পৃথক হইয়া গিয়াছে,[২৫৯] অতএব 'তাগূৎ'-কে অমান্য করিয়া আল্লাতে বিশ্বাস স্থাপন করে যে ব্যক্তি, সে'ত আঁকড়াইয়া ধরিল (সেই) দৃঢ়তর রজ্জুকে-যাহা কখনও ছিন্ন হওয়ার নহে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।[২৬০]

২৫৭ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ

২৫৭ আল্লাই হইতেছেন বিশ্বাসীগণের অভিভাবক - তাহাদিগকে

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

তিনি অন্ধকার হইতে আলোকের পানে বাহির করিয়া আনেন; আর কাফের হইয়াছে যাহারা, তাহাদিগের অভিভাবক হইতেছে 'তাগূৎ'—ইহা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেয় আলোক হইতে অন্ধকারের দিকে; নরকের অধিবাসী তাহারাই, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

টীকা :—

২৬৭ যাহা দান করিয়াছি :—

মূলে رزقنا শব্দ আছে, সাধারণতঃ উহার অনুবাদ করা হয়-'আমি তোমাদিগকে যে রুজী দান করিয়াছি'। আমাদের অনুবাদের যুক্তি প্রমাণ সম্বন্ধে ৭ ও ৩১ টীকায় দ্রষ্টব্য। আয়তে জেহাদের জন্য ব্যয় করিতে তাকিদ করা হইতেছে। কঠিন সময় অর্থে কিয়ামত, যেখানে টাকা খরচ করিয়া, বন্ধুত্বের খাতিরে দেখাইয়া অথবা অনুরোধ উপরোধ ও সুপারিশ করাইয়া কর্মফলের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

২৬৮ আয়তুল্-কুর্সি :—

এই আয়তটী 'আয়তুল-কুর্সি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এছলামের সব সাধনার মূল লক্ষ্য হইতেছে-আল্লার তাওহিদ। এই আয়তে সেই তাওহিদের স্বরূপকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। "আল্লার কুর্সি স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিয়াছে"-এই আয়তে, কুর্সি শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া মতভেদ করা হইয়া থাকে। কুর্সি শব্দের দুই অর্থ—আসন ও জ্ঞান (রাগেব, কামূছ)। এবনে আব্বাছ এখানে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন (বোখারী),

এমাম এবনে জরির এই মতকেই অধিক সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (তাবরী)। ফলতঃ এই হিসাবে আয়তের তাৎপর্য্য হইতেছে :—আল্লার কুর্সি অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। আমাদের মতে ইহাই আয়তের সঙ্গত অর্থ। যাঁহারা আসন বলিয়া কুর্সি শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহাকে একটা রূপক উপমা মাত্র تمثيل مجرد বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, لا كرسي في الحقيقة ولا قاعد প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে কোন আসনও নাই, তাহার উপর উপবেশনকারীও কেহ নাই (বয়জাভী)। আসন-অর্থ গ্রহণ করিলেও, সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ যে কুর্সির কল্পনা আমরা করিয়া থাকি, তাহার সমর্থন আয়ত হইতে পাওয়া যায় না, বরং ইহাদ্বারা তাহার প্রতিবাদই হইয়া যাইতেছে। যে কুর্সি বা আসন সমস্ত আছমান ও সমস্ত জমিনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে, সাতওয়া আছমানের একটা মঞ্চের উপর তাহার স্থান হইবে কি করিয়া ?

'কাইয়ুম'-শব্দের তাৎপর্য্য القايم بنفسه المقيم لغيره যিনি স্বতঃভাবে কাএম এবং বিশ্বসংসারের সমস্ত বস্তু যাঁহাদ্বারা কাএম (বয়জাভী)। আয়তুল-কুর্সির বহু মহিমা হজরত রছুলে করিম কর্তৃক অনেক ছহি হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। চিন্তাশীল পাঠকগণ আয়তটীর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, আল্লার জাত ও ছেফাত বা সত্তা ও স্বরূপের একটা সম্পূর্ণ, সুন্দর ও নিখুৎ বর্ণনা এই আয়তে প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লার এই পরিচয়কে মুছলমানের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—তাহার মস্তক এই প্রভুর হুজুরে অবনত হইবে, এবং দুনয়ার অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তির নিকট সে মস্তক কখনও অবনত হইতে পারিবে না। মোজাহেদ মুছলমান তেজ গ্রহণ করিবে কোর্‌আনের এই অনুপম তাওহিদ শিক্ষা হইতে। মোছলেম জাতীয় জীবনের সমস্ত শক্তির মূল উৎস হইতেছে এইখানে। তাই জেহাদ প্রসঙ্গের উপসংহারে তাহাকে আবার সেই আসল কথাটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

২৬৯ **ধর্ম্ম সম্বন্ধে জবরদস্তি :—**

ধর্ম্ম সম্বন্ধে জোর-জবরদস্তি নাই, অর্থাৎ করিতে নাই, করা অন্যায়। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে 'হজের সময় অশ্লীলতা নাই, অনাচার নাই, সংগ্রাম সংঘর্ষ নাই'-অর্থাৎ করিতে নাই। কারণ এছলাম আসিয়া সত্যধর্ম্ম ও মিথ্যাধর্ম্মকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায়, যে ব্যক্তি আত্মার প্রেরণায় সত্যকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, জোর করিয়া তাহার দেহকে ধর্ম্ম-অনুশাসন পালনে বাধ্য করার কোনই সার্থকতা নাই। পূর্ব্বে আল্লার নামে জেহাদ করার অনেক উপদেশ ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কোন কোন বাহ্যদর্শী লোকের মনে হয় ত ধারণা হইতে পারিত যে, তরবারীর বলে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এছলামে

স্বীকার করিতে বাধ্য করাই বুঝি কোর্‌আনের উদ্দেশ্য। তাই জেহাদ প্রসঙ্গের উপসংহারে স্পষ্ট করিয়া এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হইতেছে।

কোর্‌আনের এই স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও কতিপয় অমুছলমান লেখক "তরবারী বলে এছলাম প্রচারের" কাহিনী তারস্বরে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর তফছিরকারই এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—'পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু জেহাদের আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়তটী মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে।' কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, জেহাদের প্রথম আয়ত নাজেল হইয়াছিল—হেজরতের অল্পকাল পরে এবং বদর সমরের পূর্ব্বে, আর আলোচ্য আয়তটী অবতীর্ণ হয়—তাহার দীর্ঘকাল পরে, ৪র্থ হিজরীর প্রথম ভাগে, বানি-নজিরের ঘটনা উপলক্ষে। সুখের বিষয়, আবুদাউদ ও নাছাই প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে যে বিবরণটী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা সমস্ত সংশয়ের অপনোদন হইয়া যাইতেছে। ঐ সকল হাদিছের খোলাসা এই যে:—"এছলামের পূর্ব্বে মদিনায় মৃত্যুবৎসা স্ত্রীলোকেরা মানসা করিত যে, তাহার সন্তান বাঁচিলে সে তাহাকে এহুদীধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে। বানু-নজিরবংশের এহুদীরা যখন মদিনা হইতে দেশান্তরিত হয়, তখনও আনছারদিগের পুত্রগণ এইরূপে এহুদীসমাজভুক্ত হইয়া ছিল। তখন একদিকে আনছারগণ বলিতে লাগিলেন—আমরা আমাদের পুত্রগণকে বিধর্ম্মী এহুদীদিগের সমাজভুক্ত হইয়া যাইতে দিব না। অন্যদিকে এহুদীরা বলিতে লাগিল—ইহারা আমাদের সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব আমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। সেই বাদ প্রতিবাদের সময় নাজেল হয়—'ধর্ম্ম সম্বন্ধে জোর-জবরদস্তি করিতে নাই।' তখন হজরত এই আয়ত অনুসারে ঘোষণা করিয়া দিলেন—এই যুবকগুলি নিজেদের স্বাধীন মত অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লউক। তাহারা ইচ্ছা করিলে মুছলমানরূপে আনছারদিগের সঙ্গে থাকিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে তাহারা যদি এহুদী ধর্ম্মকে পছন্দ করিয়া থাকে, তাহা হইলে জোর করিয়া তাহাদিগকে মুছলমানসমাজভুক্ত করিয়া রাখার অধিকার আনছারদিগের নাই। ফলতঃ এই আয়তটী কখনই মনছুখ বা রহিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এবনে-কছির প্রমুখ অভিজ্ঞ ও সতর্ক তফছির-লেখকগণের সিদ্ধান্তও ইহাই।

২৭০ 'তাগূত'কে অমান্য করা:—

'তাগূত' طغي ধাতু হইতে সম্পন্ন, একবচন ও বহুবচন উভয়েই ব্যবহার হয়। প্রত্যেক সত্যদ্রোহী শয়তানকে, প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী অনাচারীকে, প্রত্যেক অসত্য দেবদেবীকে, তাগূৎ বলা হয় (রাগেব, জওহারী, বায়জাভী)। যে কোন বস্তু বা বিষয় মানুষকে ন্যায় ও সত্য হইতে বারিত বা অন্যায় ও অসত্যের প্রতি প্ররোচিত করে, সে সমস্তই তাগূৎ পদবাচ্য। এই আয়তে মো'মেনকে যুগপৎভাবে দুইটী আদেশ দেওয়া হইতেছে। তাহার প্রথম কর্ত্তব্য

এই শ্রেণীর সব তাগূৎকে অমান্য করা। আল্লাহকে গ্রহণ করার পূর্ব্বে গয়রুল্লাহকে নিজের মন ও মস্তিষ্কের সকল কোণ হইতে সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর তাহার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য আল্লাহকে গ্রহণ করা, কোর্‌আনের শিক্ষা অনুসারে তাঁহার জাত ও ছেফাতে সম্পূর্ণভাবে মো'মেন হওয়া। যে ব্যক্তি এইরূপে মালেকের সহিত আত্মার যোগসূত্র স্থাপন করিয়া লইতে পারে, তাহার আর কোন ভাবনা নাই। কারণ এই রজ্জু বা যোগসূত্র এত দৃঢ় যে, তাহা ছিন্ন বা ভগ্ন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু মানুষকে ন্যায় ও সত্য হইতে বারিত করিয়া রাখে, আল্লার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ করিয়া দেয়, তাহাই তাগূৎ। যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু মানুষকে আল্লার আদেশ নিষেধের বিপরীত, কোন অন্যায় বা অসত্যকে গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিয়া তোলে, তাহাই তাহার তাগূৎ। এই তাগূৎ যে কতরূপে, কত আকারে, কত ছলনায় আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশেষ সতর্ক হইয়া না চলিলে, তাহা ধরিতে পারা কঠিন। কখন তাগূৎ আসে স্বর্ণরৌপ্যের স্তূপরূপে, কখন সে উপস্থিত হয় কারাশৃঙ্খল আর ফাঁসিকাষ্ঠের আকারে। জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইবে যে মোছলেম, তাহাকে এই শ্রেণীর সমস্ত প্রলোভন ও বিভীষিকার সকল তাগূৎকে দলিয়া মথিয়া, নিজের মোছলেমস্বরূপের কঠোর কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। মদিনা আক্রমণ করিয়া এছলামধর্ম্ম বা মোছলেমজাতীয়তাকে দুনয়ার পৃষ্ঠা হইতে নিশ্চিহ্নরূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলার জন্য, আরবের সমস্ত পৌত্তলিক, সমস্ত খৃষ্টান, সমস্ত এহুদী যখন সমবেতকণ্ঠে হুঙ্কার দিতেছিল—মদিনার মুষ্টিমেয় ভক্তকে সেই সময় এই সব উপদেশ দ্বারা অক্ষয় অব্যয় ও অজেয় শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তোলা হইতেছিল।

২৭১ **আল্লাই মো'মেনগণের অভিভাবক :—**

উপরের উপদেশ মতে, আল্লাহকে গ্রহণ ও তাগূৎকে বর্জ্জন করিতে পারিলেই মো'মেন তাহার সমস্ত সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া যাইবে। তখন সিদ্ধির জন্য কোন ভাবনা আর তাহাকে করিতে হইবে না। কারণ সর্ব্বশক্তিমান ও সকল মঙ্গল নিদান আল্লাহ তখন যাত্রার সাথী হইয়া, পথের আলো হইয়া, নিকটবন্ধু অভিভাবক হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। এই সাহিত্য ও সাহায্য কিরূপে লাভ করা যায়, ছুরা ফাতেহার তফছিরে তাহার আভাষ দেওয়ার চেষ্টা পাইয়াছি। তাগূতের বান্দাগণ হইতেছে অন্ধকারের উপাসক, অসত্য ও অন্যায়কে অবলম্বন করার ফলে ক্রমশই তাহারা নিবিড়তম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে থাকে। তাহার পর আলোকের সহিত অন্ধকারের মোকাবেলা যখন হইবে, তখন অন্ধকারকে নিজেনিজেই বিনষ্ট হইয়া যাইতে হইবে। কারণ আলোকের অর্থই হইতেছে —অন্ধকারের বিনাশ।

পঞ্চত্রিংশ রুকু'

মৃতজাতির পুনর্জীবন

২৫৮ তুমি কি দেখ নাই তাহার প্রতি, যে বিতণ্ডা করিয়াছিল এবরাহিমের সঙ্গে - তাহার 'প্রভু সম্বন্ধে, কারণ (সে বলে যে) আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব দান করিয়াছেন?[২৭২] এবরাহিম যখন বলিয়াছিল — "আমার প্রভু- তিনিই ত (মৃতকে) জীবন্ত করেন এবং (জীবন্তকে) মৃত করেন," সে বলিয়াছিল — "জীবনদান ও মৃত্যুসংঘটন করিয়া থাকি - আমি ;" এবরাহিম বলিয়াছিল — "এইরূপে, আল্লাহ্ পূর্ব্বদিক হইতে সূর্য্যকে আনয়ন করেন, তুমি তবে উহাকে পশ্চিম দিক হইতে আনয়ন কর![২৭৩]" সেই অমান্যকারী এইরূপে 'বিহ্বলিত' হইয়া গেল; বস্তুতঃ অত্যাচারী জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়ত করেন না।[২৭৪]

٢٥٨ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

২৫৯ অথবা যেমন সেই ব্যক্তি - যে নগর বিশেষে উপনীত হইল - আর তাহা ছিল শূন্য - নিজ ভিত্তির উপর পতিত, সে বলিল — এই নগরের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আবার ইহাকে জীবন-দান করিবেন - কিরূপে ? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে শত বৎসর (ধরিয়া) মারিলেন, তৎপর আবার উহার উত্থান করাইলেন[২১৫]; বলিলেন—(এই অবস্থায়) অবস্থিতি করিয়াছ কত কাল ? সে বলিল— এক দিন বা একদিনের কম অবস্থিতি করিয়াছি ; বলিলেন—না, বরং তুমি অবস্থান করিয়াছ এক শতাব্দী, অতঃপর (বিবেচনা করিয়া) দেখ আপন খাদ্যের ও আপন পানীয়ের বিষয়-তাহা বিকৃত হয় নাই, আর নিজের গর্দ্দভের বিষয় (বিবেচনা করিয়া) দেখ—এবং যেহেতু তোমাকে আমরা মানবের জন্য নিদর্শন করিতে চাই — আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের পানে, সেগুলিকে আমরা কিরূপে (উন্নত করিয়া) তুলিতেছি,

٢٥ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ج قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا

আর কি হইতে পারে? এই ঘোষণার ফলে সে সময়ের রাজা যে হজরত এবরাহিমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে, আদালতে হাজির করিয়া তাহার নিকট কৈফিয়ত তলব করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে? রাজা হজরত এবরাহিমের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছিল এই সময়, এবং হজরত এবরাহিম এই সময়ই তাহাকে বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বজাতীয়দিগের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন আর অধিকদিন সম্ভবপর হইবে না— কেনআনের রাজত্ব আবার তাহাদের হইবে, এ সুসংবাদ তিনি আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাজা তখন হজরত এবরাহিমের কথার কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল না, বিক্ষিপ্ত অর্দ্ধ মৃত এবং পরজাতির শাসনযন্ত্রে নিষ্পেষিত তাহারা আবার দেশের রাজা হইবে!

২৭৩ **জাতির জীবন-মরণ নিদান:—**

শক্তিমদমত্ত অদূরদর্শী রাজার এই শ্রেণীর তাচ্ছীল্যের উত্তরে হজরত এবরাহিম বলিলেন—আমার প্রভু যে আল্লাহ, তিনিইত হইতেছেন—জীবন মরণের একমাত্র মালেক, মৃতজাতির জীবন এবং জীবন্তজাতির মৃত্যু তাঁহারাই নির্দ্দেশক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর ইচ্ছায় আমার জাতি নবজীবনের অনন্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। অবোধ রাজা হজরত এবরাহিমের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, হঠকারিতার সহিত বলিয়া উঠিল—আমি হইতেছি দেশের রাজা-নরপতি, অধীনজাতি সমূহের জীবন মরণ আমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অতএব যদি স্বজাতির মঙ্গল চাও, তাহাদিগকে আমার অনুগত আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে বল। এই উপায়েই তাহারা মুক্তির পথে চলিতে চলিতে যথা সময় নিজেদের ইষ্টলাভ করিতে পারিবে। আর আমার অধীনস্থ কোন জাতি যদি আমাকে অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাহা হইলে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি আমি, তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

রাজার এই হঠোক্তির উত্তরে হজরত এবরাহিম নিজের প্রথম যুক্তির উপসংহার হিসাবে বলিলেন—রব্বুল আলামীনের বিশ্বরাজ্য তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন। সেই নিয়মের অনুশাসনে এরাজ্যের সকল বস্তুরই একটা জীবন মরণ ধারা আছে, উদয় অস্তের পর্য্যায় আছে। এবং সে জীবন মরণ বা উদয় অস্তের কতকগুলি কারণ ও উপাদান আছে, প্রত্যেকের একটা নিয়মও সময় নির্দ্ধারিত আছে। সে কারণও উপাদানগুলি সঞ্চিত হইলে এবং সেই নিয়ম সম্পন্ন ও সেই সময় সমাগত হইলে পর, কোন জাতির জীবন বা মরণকে চাপিয়া রাখার কাহারও সাধ্য নাই। ইহাই আল্লার নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান এবং ইহা অমোঘ, অলঙ্ঘ্য। রাজন! এই বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিলে অমন হঠোক্তি প্রকাশ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সূর্য্যের উপাসক তুমি, সুতরাং তাহার

উদয় অস্তের সহিত তোমার নিবিড় পরিচয় থাকার কথা। তাই তোমাকে সেই সূর্য্যেরই উদাহরণ দিতেছি। দেখ, আল্লার আদেশে সূর্য্যের উদয় হয় প্রভাতে, পূর্ব্বদিক হইতে। তাহার সেই উদয়কে তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত রাখিতে পার কি?—পূর্ব্বের পরিবর্ত্তে পশ্চিমদিক হইতে তাহাকে উদিত করাইবার শক্তি তোমার আছে কি? ইহা যেমন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেইরূপ যে জাতির উত্থানের সময় আসিয়াছে এবং আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়ম পালন পূর্ব্বক যে জাতি মুক্তির সাধনায় অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সেই নবজীবনের প্রেরণাকে চাপিয়া মারার শক্তি দুনয়ার কোনও রাজা বাদসারই নাই। অতএব আমার স্বজাতিকে চিরদিন নিজের পদানত করিয়া রাখার যে ধারণা তুমি পোষণ করিতেছ, তাহা নিতান্ত ভুল।

২৭৪ **আল্লার হেদায়ত :—**

হেদায়ত শব্দের সাধারণ অর্থ পথ-প্রদশন। কিন্তু আল্লার সহিত ইহার সম্বন্ধ হইলে তাহার তাৎপর্য্য হয়—পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। জ্ঞান দিয়া এবং নবী ও কেতাব পাঠাইয়া আল্লাহ ভাল মন্দ পথকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অত্যাচারী যাহারা, নিজেদের অত্যাচার ফলে, আল্লার দেওয়া চলার শক্তিক তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে, তাই মনজিলে উপনীত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

২৭৫ **মৃতনগরের নবজীবন :—**

তফছিরকারগণ সাধারণভাবে স্বীকার করিতেছেন যে, বখ্‌তনছর বাদশাহ কর্ত্তৃক বায়তুল-মোকদ্দছ বা যেরুশেলম সহর ও মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার এবং বানি এছরাইলগণ বন্দী হইয়া বাবিলে নীত হওয়ার পর কোন একজন নবী সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বখ্‌তনছর কর্ত্তৃক নিহত এহুদীদিগের বিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল — এমনভাবে মরিয়া মিটিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে যাহারা, কিয়ামতের সময় আল্লাহ আবার তাহাদিগকে জীবিত করিবেন কি করিয়া? নবীর এই সন্দেহ অপনোদিত করার জন্য আল্লাহ তাঁহাকে একশত বৎসর মারিয়া রাখিলেন। কেহ বলেন যেরূশেলমনগর পুনরায় আবাদ হইবে কি করিয়া—তাহাই ছিল নবীর ক্ষোভ, বিস্ময় ও নিরাশার কারণ। যাহা হউক, তাই নবীকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আল্লাহ তাঁহাকে একশত বৎসর মারিয়া রাখিয়া আবার জীবন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মৃত্যুর ৭০ বৎসর পরে যেরূশেলম নগর পুনরায় আবাদ হইতে আরম্ভ হইল, অবশিষ্ট ত্রিশ বৎসরে নানাদেশে বিক্ষিপ্ত বানি-এছরাইল সেখানে আসিয়া সমবেত হইল, নূতন বাগবাগিচাও এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া গেল। এইরূপে একশত বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর নবীকে আল্লাহ জীবন্ত করিয়া নিজের কুদরতের তামাসা দেখাইলেন। প্রথমে প্রস্তুত হইল তাঁহার চোখ, তাহাতে

তাঁহার হাড়গুলির উপর কিরূপে মাংস সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন। সেই নবীর নাম কেহ বলিয়াছেন ওজের (Ezra ইস্ত্র), কেহ বলিয়াছেন আরমিয়া (যিরমিয় ভাববাদী), দুই একজন বলিয়াছেন হেজ'কীল (যিহিস্কেল Ezikel)।

বাইবেলের পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, বখ্‌তনছর কর্তৃক যেরূশেলম আক্রমণের সময় হইতে সেখানে এহুদীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদের মুক্তির জন্য যে সব মহাপুরুষ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তফছিরকারগণের বর্ণিত তিনজন নবীই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাঁদেরই পুরুষানুক্রমিক সাধনার ফলে বানি এছরাইল জাতি দাসত্বশৃঙ্খল মুক্ত হইয়া দীর্ঘ এক শতাব্দী পরে যেরূশেলমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু এহুদীজাতির ইতিহাস ও বাইবেল পুরাতন নিয়ম মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, আলোচ্য আয়তে যে নবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—তিনি নিঃসন্দেহরূপে হজরত হজকিল।

এই হজকীল বা যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তকে দেখা যায়, এহুদীজাতি সদাপ্রভুর কোপগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘকাল ছিন্নভিন্ন থাকার ও নির্য্যাতিত হওয়ার পর, তিনি তাহাদের অনুতাপ গ্রহণ করিতেছেন এবং এই ভাববাদীকে জানাইতেছেনঃ—"আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, দেশ সমূহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তোমাদেরই দেশে তোমাদিগকে উপস্থিত করিব (২৪) আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব (২৬) আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা বাস করিবে (২৭) সেইদিন নগর সকলকে বসতিবিশিষ্ট করিব এবং উৎসন্ন স্থান সকল নির্ম্মিত হইবে (৩৩)-ইত্যাদি। ৩৬ অধ্যায়ে এই শ্রেণীর বর্ণনায় পর, ৩৭ অধ্যায়ের প্রথমভাগে বলা হইতেছেঃ—"সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে **বিস্তর অস্থি ছিল**; এবং দেখ, সে সকল অতিশয় শুষ্ক। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে? আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, **হে শুষ্ক অস্থি সকল,** সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে। **আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব... মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম্মের দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব,** ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে...আমিই সদাপ্রভু। তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম তদনুসারে ভাববাণী করিলাম আর আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ

হইল, আর দেখ ভূমিকম্প হইল, এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, তাহাদের উপরে শিরা হইল, ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং চর্ম্ম তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা ছিল না।...... আমি ভাববাণী করিলাম তাহাতে আত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারা জীবিত হইল, ও আপন আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল, সে অতিশয় মহতী বাহিনী (১—১০ পদ)।"

হজরত হজকীলের যে মকাশফার কথা উপরে উদ্ধৃত হইল, আমার মতে, আলোচ্য আয়তে তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা যে বাস্তব ঘটনা নহে, বাইবেলেই তাহার প্রমাণ আছে। ঐ পুস্তকে উদ্ধৃত বিবরণটী উল্লেখ করার পরেই বলা হইতেছে—"পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য সন্তান, **এই সকল অস্থি সমস্ত ইস্রায়েল-কুল,** দেখ, তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইলাম।" সদাপ্রভু যে ইহাদিগের কবর মুক্ত করিবেন এবং আবার ইস্রাইলের দেশে যাইয়া ইহারা বসতি স্থাপন করিবে, সে আশ্বাসও হজকীল নবীর মারফত তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। কোর্‌আনেও আলোচ্য আয়তের প্রথমে كالذي শব্দে যে ك বর্ণ আছে, উহা মেছাল, উদাহরণ বা রূপক উপমা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরের বিবরণটী যে হজকীল নবীর স্বপ্ন বা কশফের ব্যাপার—বাস্তব ঘটনা নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে ك ব্যবহার করা হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। † সে যাহা হউক, পাঠকগণ বাইবেলের বিবরণের সহিত কোর্‌আনের আয়তটী মিলাইয়া পড়িলে নিঃসন্দেহভাবে দেখিতে পাইবেন যে, কোর্‌আনে হজকীল নবীর এই মকাশফার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং জাতির হিসাবে মৃত বানিএস্রাইলদিগের নবজীবন লাভের প্রসঙ্গই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

কারয়া-নগর ঃ—

মূলে 'কার্‌য়া' শব্দ আছে, আমরা অগত্যা তাহার অনুবাদ করিয়াছি নগর বলিয়া। কিন্তু যেমন নগর অর্থে উহার ব্যবহার ব্যবহার হয়, সেইরূপ নগরের অধিবাসী এবং কওম বা জাতি অর্থেও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। রাগেব বলিতেছেন ঃ—

القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس و للناس جميعا و يستعمل في كل واحد منهما - قال تعالى و اسئل القرية قال كثير من المفسرين معناه اهل القرية و قال بعضهم القرية ههنا القوم انفسهم الخ ●

† মুফ্‌তী আবদুহু বলিতেছেন— و يحتمل ان تكون القصة من قبيل التمثيل
অর্থাৎ—"গল্পটী রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ বলাও সঙ্গত হইতে পারে।"
দেখ—তফছিরুল-কোর্‌আন ৩—৫২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ—"মানুষ যে স্থানে সমবেত হয় তাহাকে ও সেই মানুষকে একত্রে কারয়া বলা হয়, আর জনপদ ও তাহার অধিবাসী জনগণ ইহার প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবেও 'কার্য়া' বলা হয়। আল্লাহ বলিয়াছেন—"নগরকে জিজ্ঞাসা কর।" অধিকাংশ তফছিরফারের মতে এখানে নগর অর্থে নগরের অধিবাসী, আবার কেহ কেহ বলেন, এখানে কার্য়া অর্থে স্বয়ং জাতি।" ইহার পর রাগের এই প্রকার ব্যবহারের কএকটা নজীর কোর্আন হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমার মতে আলোচ্য আয়তে করয়া একত্রে প্রথমোক্ত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া কারয়া শব্দের অর্থগ্রহণ করিলে আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আর কোন সমস্তাই থাকে না।

২৭৬ **এক শতাব্দীর মরণ ঃ—**

পূর্ব্বে দেখানে হইয়াছে, ব্যাপারটা হইতেছে হজকীল নবীর কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের বিবরণ। কিন্তু কেহ যদি ইহাকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কোর্আনের ব্যবহৃত শব্দগুলি লইয়া ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, আয়তের প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। মূলে আছে اماته আমাতাহু, আল্লাহ তাহাকে মারিলেন। সাধারণ তফছিরকারগণ বলিতেছেন—তাহাকে মারিলেন অর্থে সেই নবীকে মারিলেন। একশত বৎসর পর্য্যন্ত মৃতাবস্থায় রাখিয়া আল্লাহ আবার তাঁহাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন, এই তাঁহাদের মত। কিন্তু নবীর মৃত্যু ত এক মুহূর্ত্তেই সমাধা হইয়া গিয়াছিল, অতএব 'আল্লাহ তাহাকে শত বৎসর মারিলেন'—এ কথার সার্থকতা কিছুই থাকে না। اماته আল্লাহ তাহাকে মারিলেন, আর ابقاه ميتا তাহাকে মৃতাবস্থায় রাখিলেন—এই দুই পদের একই তাৎপর্য্য কখনই হইতে পারে না! তাহার পর, আয়তে اماته তাহাকে মারিলেন-ক্রিয়ার মোকাবেলায় ثم احياه আবার তাহাকে জীবিত করিলেন—এরূপ না বলিয়া, বলা হইতেছে ثم بعثه আল্লাহ আবার তাহার উত্থান করাইলেন। এই সব স্পষ্ট লক্ষণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এখানে নবীর ব্যক্তিগত জীবন মরণের অথবা অন্য কাহারও দৈহিকজীবন মরণের কথা আদৌ বলা হয় নাই। আল্লাহ বলিতেছেন—যেরূশেলম নগরের অধিবাসী বানিএছরাইল জাতির মৃত্যুরও পুনর্জীবন লাভের কথা। এহুদী জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে, বখ্‌তনছর বাদশার আক্রমণের সূত্রপাত হইতে তাহাদের স্বদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত, ঠিক এক শতাব্দীই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। বখতনছর (Nabuchadnezzar) খৃষ্টপূর্ব্ব ৬১৩ সনে প্রথমে এহুদী জাতিকে আক্রমণ করিয়া যেরূশেলম অধিকার করিয়া লন। তাহার পর আবার আক্রমণ করিয়া ৫৯৯ সনে বাইতল মোকদ্দছ অধিকার করেন এবং সদাপ্রভুর মন্দির ধ্বংস করেন, এহুদী জাতিকে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত ও ঘৃণিত দাসজীবন বহন করিতে বাধ্য করেন। ৫৩৭ সনে রাজা কোরসের দয়া হয় এবং তিনি যেরূশেলম-মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করার

অনুমতি দিলেন। ৫১৫ সনে এই মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে বানি এছরাইল জাতির অধীনতার অভিশাপ শেষ হইতে ঠিক এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর তাহাদের মধ্যে নবজীবনের সূচনা আরম্ভ হয় এবং ক্রমে আবার তাহারা জাতির হিসাবে উত্থান করে। আল্লাহ তাহাকে :একশত বৎসর মারিলেন, তাহার পর আবার তাহার উত্থান করাইলেন—পদের স্পষ্ট তাৎপর্য্য ইহাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, اماته ক্রিয়াপদে ه সর্ব্বনামের বিশেষ্য নবী নহে—কারয়া। কারয়া অর্থে অধিবাসীকে বুঝাইবার জন্য এখানে বিশেষ করিয়া পুংলিঙ্গবাচক সর্ব্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে।

আয়তের প্রশ্নোত্তর ঃ—

অতঃপর আয়তে একটী প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ আছে, যথা ঃ—

প্রশ্ন ঃ— তুমি কতকাল অবস্থান করিয়াছ ?

উত্তর ঃ— একদিন বা তাহারও কম।

প্রশ্নকারী ঃ— না, বরং তুমি অবস্থান করিয়াছ শত বৎসর।

এই প্রশ্নকারী কে, আর কেই বা তাঁহার উত্তর দিতেছেন, এখানে আমাদিগকে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। তফছিরকারগণ একবাক্যে বলিতেছেন যে, এখানে প্রশ্নকারী হইতেছেন আল্লাহ এবং তাঁহার উত্তর দিতেছেন সেই নবজীবনপ্রাপ্ত নবী। প্রশ্নকারী যে আল্লাহ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উত্তরদাতা যে সেই নবী, আমার মনে হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। বিষয়টীর সূক্ষ্মবিচারের জন্য বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির আলোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি ঃ—

(১) এই প্রশ্নের হেতু ও তাহা প্রকাশের সার্থকতা কি ?

(২) নবী কতকাল মরিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া তাঁহার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় তাঁহাকে সে বিষয় প্রশ্ন করা এবং তাঁহার পক্ষে তাহার উত্তর দিতে যাওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁহার একজন নবী এমন অসঙ্গত কার্য্যে লিপ্ত হইতে যাইবেন কেন ?

(৩) আল্লাহ মৃতকে জীবনদান করিতে পারেন, কোন নবীর মনে এ সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র থাকা কখনই সম্ভব নহে। কারণ আল্লার সর্ব্বশক্তিমানত্বকে অস্বীকার করা আর আল্লাহকে অস্বীকার করা, একই কথা। কোন নবীর মনে এই প্রকার সন্দেহের উদয় হওয়া সম্ভব কি ?

(৪) মৃতকে জীবিত করা সম্বন্ধে 'নবীর মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল'—তাহা দূর করাই যদি উদ্দেশ্য হইবে, তাহা হইলে তাঁহাকে দুই চারি দিন বা মাস, না হয়

দুই চারি বৎসর মারিয়া রাখিয়া জীবন্ত করিলেই ত চলিত। সে জন্য একশত বৎসর মারিয়া রাখার হেতু কি হইয়াছিল ?

(৫) সাধারণ মত অনুসারে, আল্লার প্রশ্নের উত্তরে নবীই বলিতেছেন—আমি একদিন বা তাহারও কম সময় অবস্থান করিয়াছি। আল্লাহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—না, একদিন নয়, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থিতি করিয়াছ। আল্লাহ এই উক্তির সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপে বলিতেছেন—দেখ তোমার খাদ্য বা পানীয় বিকৃত হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই প্রমাণের দ্বারা নবীর কথারই সমর্থন হইয়া যাইতেছি। নবী বলিতেছেন—'তিনি খুব অল্প সময় অবস্থান করিয়াছেন।' খাদ্য ও পানীয় টাটকা ও অবিকৃত থাকাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতই তিনি অল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলেন। একশত বৎসর অবস্থান করিয়া থাকিলে তাঁহার খাদ্য ও পানীয় গলিয়া পচিয়া শুকাইয়া একদম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। এখানে নবীকে উত্তরদাতা বলিয়া গ্রহণ করিলে, প্রমাণ ও প্রমেয় বিষয়ের মধ্যে ঘোর অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয় কি না ? *

এই সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য আলোচনা করার পর আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এখানে প্রশ্নকারী আল্লাহ, এবং উত্তরদাতা ঐ জনপদের অধিবাসী এছরাইল জাতি। এক শতাব্দীর জাতীয় মৃত্যুর পর আল্লার অনুগ্রহে তাহারাই আবার নবজীবনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধঃপতিত জাতির মুমুক্ষার ইতিহাসে এক শতাব্দী যে একটা দীর্ঘ সময় নহে, ভাববাণীর বিশেষ পরিভাষায় রূপকভাবে এখানে সেই কথাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। জাতিকে ব্যক্তি হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে, তাই খাদ্য ও পানীয়ের অর্থও রূপকভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। খাদ্য ও পানীয় যেমন ব্যক্তিগণের দৈহিক জীবন

---

* এমাম ফখরুদ্দিন রাজী এই সব প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় দার্শনিক মহাপণ্ডিতের আদৌ উপযুক্ত হয় নাই। রাবীদিগের বর্ণিত গল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহাদিগকে এতটা কষ্টকল্পনার কর্ম্মভোগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ এমাম ছাহেবের একটা যুক্তির সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। শেষোক্ত প্রশ্নটার উত্তরে তিনি বলিতেছেন :—"সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য নবীর সন্দেহকে অন্য যুক্তিদ্বারা আরও দৃঢ় করিয়া লওয়া হইয়াছে। ব্যাপারটা হইতেছে এইরূপ—আল্লাহ নবীকে বলিলেন :—না, বরং তুমি এক শত বৎসর মরিয়াছিলে। তবে তোমার খাদ্য ও পানীয় যে বিকৃত হয় নাই, ইহাতে অবশ্য তোমারই ধারণার সমর্থন হইতেছে। কিন্তু নিজের গর্দ্দভটার দিকে তাকাইয়া দেখ, তাহা হইলে তোমার সব সন্দেহের অপনোদন হইয়া যাইবে। তখন নবী গর্দ্দভটার পানে তাকাইয়া দেখেন—পচিয়া সড়িয়া গিয়াছে, শুষ্ক অস্থিগুলি পড়িয়া আছে। তখন আল্লার অনন্ত কুদরতের অনুভূতি করিয়া নবী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ, খাদ্য ও পানীয় শীঘ্র নষ্ট হওয়ার কথা, তাহা অবিকৃত রহিয়া গেল—আর গর্দ্দভটার দীর্ঘকাল থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।" (২—৪৮৪)। এ সম্বন্ধে অন্য সমস্ত কথা বাদ দিয়া এখানে নিবেদন করিতে চাই যে, "তখন নবী গর্দ্দভটার পানে তাকাইয়া দেখিলেন—" ইত্যাদি কথাগুলি এমাম রাজীর স্বকপোল কল্পনা, কোর্‌আনে ঘুণাক্ষরেও উহার উল্লেখ নাই। এই প্রশ্নের আলোচনায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া একদল তফছিরকার বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সেই সন্দেহকারী ব্যক্তি ছিল একজন কাফের, নবী কখনই নহে।

ধারণের প্রধানতম উপকরণ, তাহার অভাবে দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মিক শক্তিও ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে থাকে, এবং কালে একেবারে বিলীন হইয়া যায়—ঠিক সেইরূপ জাতির জীবন ধারণেরও কতকগুলি আবশ্যকীয় উপাদান আছে। সেই উপাদানগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, অতি শোচনীয় পতনের পরও জাতির পুনর্জীবনের আশা থাকে। কিন্তু সেগুলি একবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া গেলে পর তাহার যে পতন হয়, সে পতনের আর উত্থান নাই। বানিএছরাইল-জাতি নিজেদের মুক্তির আশা হারাইয়া বসিয়াছিল। তাই ভাববাদীর মধ্যবর্ত্তিতায় তাহাকে নবজীবনের সন্দেশ দান করা হইতেছে। বলা হইতেছে—তোমার জাতীয় জীবনের উপাদানগুলি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই, সুতরাং তোমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। বাইবেলে ভাববাদীগণের প্রমুখাৎ বানি-এছরাইলের এই পতনের যতগুলি বিবরণ আছে, সমস্তই একবাক্যে বলিতেছে যে, সদাপ্রভুর বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার আদেশ নিষেধকে অমান্য করিয়া, এহুদীজাতি নানা অনাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। কোর্‌আন বলিয়াছে—

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا -

—"যাহাদিগকে তাওরাত বহনের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল পরে তাহারা তাহা বহন করে নাই, তাহাদিগের উপমা সেই গর্দ্দভের ন্যায় যে কেবল কতকগুলি কেতাবের ভার বহিয়া যাইতেছে (জুম্‌আ ৫)।" এখানে বানি-এছরাইলকে এই গর্দ্দভের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই ভারবাহী গর্দ্দভের দল তাওরাতের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইত, তাহার দোহাই দিয়া সমাজে সর্ব্বদাই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিত। কিন্তু অধীনতার অভিশাপ হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করার কোন সাধনাতেই তাহারা যোগদান করিত না—তাওরাতে বর্ণিত জেহাদের আদেশ উপদেশগুলিকে হয় বেমালুম হজম করিয়া যাইত, না হয় তাহার কদর্থ করিয়া জাতির সর্ব্বনাশ করিত। পাঠকগণ আরও দেখিতেছেন—আয়তে انظر ও তাহার সঙ্গে الى বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, نظر শব্দের অর্থ চোখে দেখা এবং চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করা উভয়ই হইতে পারে, বরং "শেষোক্ত অর্থই বিজ্ঞসমাজে অধিক প্রচলিত।" দৈহিক চক্ষুর দ্বারা দর্শন করার অর্থ নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে হইলে এখানে نظر এর সঙ্গে الى না আনিয়া فى ব্যবহার করা হইত—অর্থাৎ وانظر الى طعامك والى شرابك ইত্যাদি না বলিয়া, বলা হইত وانظر فى طعامك و فى شرابك ইত্যাদি (বিস্তৃত আলোচনার জন্য مفردات ৫১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অস্থিপুঞ্জ অর্থে মৃতপ্রায় বানি-এছরাইল জাতিকে বুঝাইতেছে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। 'নশজুন'-অর্থে এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ঊর্দ্ধে স্থাপন করা। অস্থিগুলিকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করিতেছি, অর্থাৎ বানি-এছরাইলকে উন্নত করিতেছি, তাহাদিগকে নূতন শক্তিতে সম্পন্ন করিতেছি।

ছুরা বকরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, দুন্য়াতে আল্লার খেলাফত প্রতিষ্ঠার এবং তৎসংক্রান্ত সাধনা ও সতর্কতাগুলির কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লার প্রতিনিধি হইয়া কোন জাতি বিশ্বমানবের শাসন পালনের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে—এ আলোচনা প্রসঙ্গে হজরত এবরাহিমের এবং তাহার বংশের দুই শাখার উল্লেখ এই ছুরায় পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে, দুই কেবলার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যও ইহাই। বর্ত্তমান যুগে সেই খেলাফতের পতাকা বহন করার জন্য মোছলেমজাতিকেই নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে—নিজেদের সাধনা-গুণে এক জাগ্রত জীবন্ত জাতিরূপে, তাহারাই বিশ্বমানবের সেবক শিক্ষক ও পরিচালকের আসন অধিকার করিবে—এ আশ্বাসও তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় মুছলমানের সে সময়কার বাহ্যিক অবস্থা দর্শন করিলে এ আশ্বাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানব মন নিরাশ হইয়া পড়িত। আরবের জাতীয় আত্মা তখন সকল দিক দিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল—বানি-এছমাইল এবরাহিমের পুত্র-বলিদানের ও এছমাইলের আত্ম-বলিদানের মূল শিক্ষাকে ভুলিয়া বসিয়া সেটাকে নিজেদের বংশগত কৌলিন্যাভিমানের উপকরণ মাত্রে পরিণত করিয়া লইয়াছিল। আরবজাতিকে তাওহীদের যে অগ্নি অভিষেকে পুণ্যপুত করিয়া তোলার জন্য আবু-কোবাএছের সমস্থলীতে কা'বার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে আগুনের তেজ ও আলোক উভয়ই নিবিয়া গিয়াছিল। এ আরব আবার উঠিবে, দুন্য়ার উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবে, বাহির হইতে এরূপ আশা করার কোন হেতুই দেখা যাইতেছিল না। বর্ত্তমানের এই অবস্থা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মুছলমানের মনকে নিরাশায় অবসন্ন করিয়া দিতে না পারে, সেই জন্য ছুরার শেষভাগে ঐতিহাসিক নজির দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে। এই রুকুতে তিনটী আয়ত আছে, এবং তিনটীতেই জাতির নবজীবন সম্বন্ধে মুছলমানকে একটা আশার বাণী শুনান হইয়াছে। প্রথম আয়তটী ইহার ভূমিকা, দ্বিতীয় আয়তে এবরাহিম বংশের বানি-এছহাক শাখার পতন ও উত্থানের নজির দেওয়া হইয়াছে, এবং এই নজির দেওয়ার পর, তৃতীয় আয়তে বানিএছমাইল শাখার ভাবী উত্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। পাঠকগণ এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে, কোর্‌আনে পরাধীনতাকেই জাতির মরণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার প্রচেষ্টাই হইতেছে তাহার পরিভাষায় জীবন-জেহাদ।

২৭৭ ارني আরেনী :—

"আরেনী"-ক্রিয়া رأي রা'য়ুন ধাতু হইতে সম্পন্ন, উহার অর্থ চারি প্রকার :—চক্ষু বা অন্য কোন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন, বিভ্রম বশতঃ কোন অপ্রকৃতকে প্রকৃত বলিয়া ধারণা, চিন্তার দ্বারা অনুভূতি, জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি। উপক্রম উপসংহার অনুসারে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। আরবী সাহিত্যে এবং কোর্‌আনে ইহার ভুরি ভুরি নজির বিদ্যমান আছে। এই ছুরার ২৪৩, ২৪৬ আয়তে এবং এই রুকু'র প্রথম

আয়তে الم تر শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার সর্ব্ববাদী সম্মত অর্থ—বুঝিয়া দেখা, হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি। (কোর্‌আনের অন্যান্য নজিরের জন্য রাগেব ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে সাহিত্যের হিসাবে رب ارني পদের অর্থ—প্রভুহে! 'আমাকে দেখাইয়া দাও' ও 'বুঝাইয়া দাও' - উভয়ই হইতে পারে। উপক্রম-উপসংহার হিসাবে এবং অন্যান্য যুক্তির দিক দিয়া এখানে শেষোক্ত অর্থ ই সঙ্গত—ইহাতে বিনা প্রমাণে একটা অস্বাভাবিক বিষয়ের কল্পনা করিতে হয় না। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, অস্বাভাবিক কল্পনা আছে বলিয়াই ত আয়তের আসল গুরুত্ব এবং সেই জন্যই এখানে রা'য়ুন-অর্থে চাক্ষুষদর্শন। তাঁহারা আরও বলিবেন—স্বীকার করিলাম, উহার দুই প্রকার অর্থ ই হইতে পারে। কিন্তু এখানে যে, 'দেখাইয়া দাও' হইবে না আর 'বুঝাইয়া দাও' নিশ্চয়ই হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহাদের অবগতির জন্য আরবী অভিধানের একটা অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। অভিধানকারেরা বলিতেছেন— و رأي اذا عدي الى مفعولين اقتضى معنى العلم অর্থাৎ রা'য়ুন-ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়ার কর্ম্ম যখন দুইটী হয়, তখন তাহার তাৎপর্য্য হইবে,- এল্‌ম বা জ্ঞান। এখানেও দুইটী কর্ম্ম আছে, সুতরাং এখানে 'বুঝাইয়া দাও'-অর্থ গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই আলোচনার দ্বারা আমাদের গৃহীত অনুবাদের সমীচীনতা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে। ভ্রান্ত ধারণার ইহাই ছিল ভিতের পাথর। এটা অপসারিত হওয়ার পর, বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কিরূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করিবেন, হজরত এবরাহিম তাহা বুঝিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, চোখে দেখিতে চান নাই। এই অর্থের প্রতি উপেক্ষা করাতে, বিনা প্রমাণে কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছে যে, এবরাহিম এই অনুসারে চারিটা পাখী ধরিয়া, সেগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া বিভিন্ন পর্ব্বতের উপর তাহার কতকটা রাখিয়া দেন, উপদেশ মতে তাহাদিগকে ডাক দেন, এবং বস্তুতই সেগুলি জীবন্ত হইয়া তাঁহার নিকট উড়িয়া আসে। তাঁহাদের মতে আয়তের শেষভাগে এই সব কথা উহ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কারণ আল্লাহ যে মৃতকে কিরূপে জীবিত করেন, হজরত এবরাহিম তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন। আল্লার আদেশের পর, এই সব ঘটনা না ঘটিলে, এবরাহিমের প্রার্থনা ও অপূর্ণ থাকিয়া গেল, তাঁহার অস্বস্তির কোনই প্রতিকার হইল না!

২৭৮ فصرهن অনুরক্ত করিয়া লও!—

মূলে আছে فصرهن اليك —সাধারণতঃ ইহার অর্থ করা হয়:—ঐ পাখীগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেল। তফছিরের প্রাতঃস্মরণীয় এমাম, আবু-মোছলেমের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত তফছিরকারই এই গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছেন। আবুমোছলেমই সর্ব্বপ্রথম ধরাইয়া দেন যে, صر শব্দের অর্থ—আসক্ত করা, অনুরক্ত করা, পোষ মানাইয়া লওয়া। এখানে উহার কর্ত্তন-অর্থ গ্রহণ করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে

পারে না। এই প্রসঙ্গে অন্যপক্ষ হইতে যে সব সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছিল, সে সমস্তেরও তিনি অকাট্য উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার পরে, এমাম রাজীই সর্ব্বপ্রথমে আবুমোছলেমের এই মতবাদ লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম কথা এই যে, আরবী সাহিত্যে উহার প্রচলিত ও সর্ব্ববিদিত অর্থ—পোষ মানান, অনুরক্ত করিয়া লওয়া, ইত্যাদি। এখানে 'কাটিয়া ফেলা' উদ্দেশ্য হইলে ঐ ক্রিয়াপদের পর الیک 'নিজের প্রতি' ছেলা কখনই ব্যবহার করা হইত না। পাখীগুলিকে 'নিজের প্রতি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট'-এ কথার কোনই মানে মতলব হইতে পারে না। অপরপক্ষ আবুমোছলেমের এই অকাট্য যুক্তির কোনই উত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন —আবুমোছলেমের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত তফছিরকার যখন একমতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন ইহা তাঁহাদের এজমা। আবুমোছলেমের মত গ্রহণ করিলে সেই এজমা অমান্য করা হয়, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের একটা বড় যুক্তি এই যে, আয়তে বলা হইয়াছে—'প্রত্যেক পর্ব্বতে সেগুলির এক এক অংশ রাখিয়া দাও।' এখানে সেগুলির অর্থে —'কর্ত্তিত মাংসখণ্ডগুলির' লইতেই হইবে, কারণ শেষে বলা হইয়াছে, একএকটা "অংশ"কে পর্ব্বতের উপর রাখিয়া দাও, না কাটিলে অংশ হইবে কি করিয়া? আবুমোছলেম বলিতে-ছেন—'সেগুলিকে' অর্থে, অন্যত্রের ন্যায় এখানেও সেই পাখীগুলিকেই বুঝাইতেছে। এক চারের অংশ, সুতরাং একএকটা পাখী, পক্ষীচতুষ্টয়ের সমষ্টির একএকটা অংশ; ইহাতে কাটাকাটির কোন দরকার নাই। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য কবির ২—৪৯৪ এবং রাজীর উপস্থাপিত দুর্ব্বল সংশয়গুলির অকাট্য উত্তরের জন্য শেখ মোহাম্মদ আবদুহু কৃত তফছিরুল কোরআন ৩—৫৭ দ্রষ্টব্য।

হজরত এবরাহিমকে পাখী গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ বনের পাখীকে পোষ মানাইয়া বশীভূত করিয়া লওয়া খুব কঠিন। আল্লাহ হজরত এবরাহিমকে বুঝাইয়া দিতেছন —এহেন বনের পাখীকে পোষ মানাইয়া লইলে, তাহারা তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তোমার ডাক কাণে পৌঁছা-মাত্র ব্যস্তে ত্রস্তে তোমার কাছে ছুটিয়া আসে। ঠিক এইরূপ, আরব-জাতির বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সকলেই তোমারই সন্তান—তুমিই তাহাদের দৈহিক বা আত্মিক পিতা, কা'বার মুক্তপ্রান্তর হইতে মুক্তির যে স্বর্গীয় আহ্বান তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ যাইবে না। তোমার প্রতিষ্ঠিত কা'বার সেই পুণ্যমিলনপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া নূতন জয়যাত্রার আয়োজন ইহারা আবার করিবে। এই জয়যাত্রার সূত্রপাত হইতেছিল যে সময়, তখন হজরত এবরাহিমের এই বংশধরগণ এহুদী, পৌত্তলিক, খৃষ্টান ও মুছলমান এই চারি ধর্ম্মশাখায় বিভক্ত ছিল। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই সময়, "মিল্লতে এবরাহিমের" নামে যে আহ্বান করিলেন, তাহাতে তাহারা সকলেই আবার এক অখণ্ড জাতিরূপে সেই "মকামে এবরাহিমে" সমবেত হইল, দুইদিনে অপরাজেয় বিশ্ববিজয়ী মহাজাতিতে পরিণত হইল। সে আহ্বান শাশ্বত, সে ঝঙ্কার সদাজাগ্রত—ছুরা বকরার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

ভবিষ্যতে সেই আশার বাণী মুখরিত। মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কের সহিত তাহার যোগসূত্র স্থাপন করিয়া দিতে পারিলেই তাহার জাতীয় জীবনের সব জড়তা সমস্ত অবসাদ আপনা আপনিই কাটিয়া যাইবে, মুছলমান পূর্ব্বে যাহা ছিল, আবার তাহা হইতে পারিবে।

ষট্‌ত্রিংশ রুকু'

আল্লার পথে অর্থব্যয়

২৬১ নিজেদের ধনসম্পদ আল্লার পথে ব্যয় করে যাহারা, তাহাদের উপমা - যেমন একটী শস্য-বীজ, তাহা হইতে উৎপন্ন হইল সাতটী শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হইল) শত শস্য, এবং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বর্দ্ধিত করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন বিপুল দাতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।[২৭৭]

٢٦١ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞

২৬২ যাহারা আল্লার পথে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, অপিচ ব্যয় করার পর কৃপা প্রকাশও করে না, ক্লেশদানও করে না,[২০০] তাহাদের পুরস্কার (নির্দ্ধারিত)

٢٦٢ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ

আছে তাহাদিগের প্রভুর নিকট বস্তুতঃ কোন ভয় নাই তাহাদের আর তাহারা দুর্ভাবনাগ্রস্তও হইবে না।	أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
২৬৩ যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশদান, সাধুবাক্য বলা ও ক্ষমা করা তাহা অপেক্ষা উত্তম, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন বেনায়াজ (নিরভাব) ধৈর্য্যশীল[২৮১]।	٢٦٣ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝
২৬৪ হে মো'মেনগণ! কৃপাপ্রকাশ ও ক্লেশদান করিয়া নিজেদের ছদকাগুলি ব্যর্থ করিয়া ফেলিও না[২৮২]-সেই ব্যক্তির মত যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখাইবার জন্য, অথচ আল্লাতে ও পরকালে সে বিশ্বাস করে না; ফলতঃ তাহার উপমা—যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তরখণ্ড, যাহার উপর কতকটা মাটি (জমিয়া) আছে, এ অবস্থায় তাহাতে উপস্থিত হইল প্রবল বর্ষা, ফলতঃ তাহাকে বন্ধুর-অনুর্ব্বর অবস্থাতেই রাখিয়া আসিল;—নিজেদের কৃতকর্ম্মের	٢٦٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ

عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۞

কিছু (সুফল লাভ করিতে) তাহারা সমর্থ হয় না ; বস্তুতঃ অত্যাচারী জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়ত করেন না।[১৮৩]

٢٦٥ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

২৬৫ পক্ষান্তরে, যাহারা নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে—আল্লার সন্তোষলাভের চেষ্টায় এবং নিজদিগকে মজবুত করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে, তাহাদের উপমা—যেমন উর্ব্বর ভূভাগে অবস্থিত একটী কানন, তাহাতে প্রবল বর্ষা উপস্থিত হইল, ফলে সে কানন খাদ্যদান করিল দ্বিগুণ —প্রবল বর্ষা না হইলেও হালকা বারিপাতে (কাজ হইয়া যায়) ; আর আল্লাহ্ তোমাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক্‌দ্রষ্টা।

٢٦٦ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ

২৬৬ তোমাদিগের মধ্যকার কাহারও যদি এমন একটী কানন থাকে যাহার তলদেশ দিয়া নদী নালা প্রবাহিত-সেখানে সকল প্রকার মেওয়ার সংস্থান তাহার আছে, আর সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইল, অথচ তাহার কতকগুলি দুর্ব্বল (-অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তান সন্ততি আছে—এ অবস্থায় সে

وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايت لعلكم تتفكرون

কাননে উপস্থিত হইল অগ্নিসহ এক বাত্যাবর্ত্ত, আর তাহা পুড়িয়া (ভস্মিভুত হইয়া) গেল —(তোমরা কেহ) ইহা পছন্দ করিবে কি ? এইরূপে আল্লাহ্ আয়তগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়া দেন, যেন তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ ! [২৭৯]

টীকা :—

২৭৯ সদ্ব্যয়ের উপমা :—

কোন মৃতপ্রায় জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইতে হইলে যত প্রকার সাধনার আবশ্যক হয় এবং সেই সব সাধনার যত প্রকার উপাদান আছে, তাহার আয়োজনের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রধানতঃ দরকার হইবে অর্থের। অথচ সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে মানুষ সাধারণতঃ কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এরূপ কার্য্যের ফল অনিশ্চিত বা সুদূর পরাহত, সুতরাং তাহাতে অর্থব্যয় করা তাহার নিকট বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহা ব্যতীত মানুষ সাধারণতঃ বুঝিতে পারে না যে, জাতির মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যক্তিগণ বাহ্যতঃ যে সব ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা বস্তুতঃ আদৌ ত্যাগ নহে। বরং সে ত্যাগ বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থসিদ্ধির পথকে প্রশস্ত করিয়া, তাহাকে স্থায়ী ও ব্যাপক করিয়া দেয়। ৩৬ ও ৩৭ রুকু'তে মুছলমানকে বিভিন্নভাবে এই কথাগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এমাম রাজী বলিয়াছেন, কোর্‌আনের পরিভাষায়, 'আল্লার পথে'-অর্থ জেহাদে। পূর্ব্বে জেহাদ সংক্রান্ত আদেশ উপদেশগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন ছুরার উপসংহার-ভাগে তাহাতে অর্থব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। ১৯৫ ও ২৪৫ আয়তেও পাঠকগণ ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। এখানে একটী উপমা দিয়া এই সদ্ব্যয়ের সুফলের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে :—কৃষক যে বীজটী ভূমিতে নিক্ষেপ করে, বাহ্যতঃ তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহার আশু সুফল কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু মাটির স্তবকে গুপ্ত এই ক্ষুদ্র বীজটী, বাহিরের উত্তাপ ও ভিতরের রস সঞ্চয় করিয়া অদূর ভবিষ্যতে উপ্ত হইয়া, বহু শীর্ষে পুষ্ট হইয়া উঠে. একটী বীজের পরিবর্ত্তে তাহাতে শত শত শস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে জাতির

জীবন-জেহাদে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহা ব্যর্থ যাইবার নহে। বরং অদূর ভবিষ্যতে তাহা বহু শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজের নিকট ফিরিয়া আসে। সাত শতের কথা উপমা ভাবে বলা হইয়াছে। অনন্ত বিশ্বভাণ্ডারের মালেক আল্লাহ, সাধনার ক্রমানুসারে তাহার ফলকে অসংখ্যগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন - এই কথা বুঝাইবার জন্য আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, সে মালেক হইতেছেন বিপুলদাতা।

২৮০ **কৃপাপ্রকাশ ও ক্লেশদান :—**

কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিয়া, অথবা দুস্থ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোন মানুষকে সাহায্য করিয়া, আমরা কাহারও উপর কোন অনুগ্রহ করি না, নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকি মাত্র। অন্যথায় আমরা সেই মালেকের হুজুরে অপরাধী হইতাম। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, নিজেদের মতিভ্রমবশতঃ কার্যাক্ষেত্রে আমরা এই সত্যটাকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া বসি, এবং মনে করিয়া লই যে, এই অর্থদান করিয়া জাতি ও ধর্ম্মের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছি, কএকটা রৌপ্য বা তাম্রখণ্ড দান করিয়া দীনদুঃখীদের মাথা কিনিয়া লইয়াছি। এই ধারণাটা অনেক সময় আমাদের কাজের ও কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। আয়তে ইহাকেই "কৃপাপ্রকাশ" বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, দান করার পর আমরা অন্য লোকের সমালোচনা করিতে বসি, অমুক দেয় নাই বা কম দিয়াছে বলিয়া তাহার নিন্দা করি। আবার, কিছু দান করিয়া দুঃখীজনগণের প্রতি তাচ্ছীল্যপ্রকাশ করি, একটু মতভেদের কারণ হইলে এই দানের 'পোটা' দিয়া তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলি। ইহাই হইতেছে আয়তে বর্ণিত 'ক্লেশদান'। কোর্‌আন মানুষকে যে দানের শিক্ষা দিতেছে, যে দান শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ওয়াদা করিতেছে, তাহার প্রধান শর্ত্ত এই যে, উল্লিখিত কৃপাপ্রকাশ বা ক্লেশদানের ভাব দাতার মনের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে পারিবে না।

২৮১ **ক্ষমা ও সাধুবাক্য :—**

ব্যক্তিগত কাজের জন্য হউক অথবা কোন জাতীয় অনুষ্ঠানের নিমিত্ত হউক, কোন প্রার্থী আমাদের দ্বারস্থ হইলে আমরা তাহার প্রতি রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। প্রার্থীরাও সময় সময় মানুষকে অন্যায়রূপে উত্যক্ত করিয়া তুলেন। আয়তে বলা হইতেছে যে, দান করিয়া ক্লেশদান করা অপেক্ষা কিছু না দিয়া প্রার্থীকে মিষ্টকথায় বিদায় দেওয়া, আর তাঁহার জবরদস্তিগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়াই ভাল।

২৮২ **ব্যর্থ-ছাদ্‌কা :—**

সকল প্রকার সৎকার্য্যে সকল প্রকার অর্থব্যয় করাকে ছাদকা বলা হয়। কতকগুলি ছাদকা করিতে মুছলমান ধর্ম্মতঃ বাধ্য, যেমন জাকাত, ওশর ইত্যাদি। এমাম বা ছরদারের লোকেরা এগুলি হিসাব করিয়া আদায় করিয়া লইবেন, ইহাই এছলামের ব্যবস্থা। যে

তিনটী দোষের জন্য সমস্ত ছাদকাই ব্যর্থ হইয়া যায়, আয়তে প্রথমে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। দান করিয়া কাহারও প্রতি কৃপাপ্রকাশ করিলে সে দান ব্যর্থ হইয়া যায়, কাহাকে দানের অজুহাতে ক্লেশ দিলে সে দান ব্যর্থ হইয়া যায়। লোক দেখাইবার এবং সমাজের নিকট হইতে যশ ও প্রশংসা লাভ করার জন্য যে দান করা হয়, তাহারও কোন সার্থকতা নাই। একটা উপমা দিয়া এই প্রকার ছাদকার ব্যর্থতা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

২৮৩ ব্যর্থ ছাদকার উপমা :—

বৃষ্টিধারা নামিয়া আসে মৃতপ্রায় ধরিত্রীকে সরস করিয়া নবজীবনের সকল অবদানে সম্পন্ন করিয়া দিতে। বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হইলে ভূমির উৎপাদন শক্তিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এই বৃষ্টিপাতের কোন ফলই হয় না। পাহাড়ের মসৃণ চাটালের উপর অনেক সময় আলগা ধূলামাটি জমিয়া থাকে। প্রবল বর্ষাধারা নামিয়া আসিলে উপরের আলগা মাটি ধুইয়া যায়, তাহার তলস্থিত কঠিন শিলাখণ্ডের আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। বৃষ্টি যত অধিক হয়, মৃত্তিকা আচ্ছাদিত প্রস্তরের স্বরূপটাই তত অধিক পরিমাণে প্রকট হইয়া উঠে। ফলতঃ বৃষ্টিধারার মধ্যকার সমস্ত কল্যাণই সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়, কঠিন শিলাখণ্ড তাহাদ্বারা কোন উপকারই লাভ করিতে পারে না। যে ছাদকা শতগুণে উপচিয়া উঠিয়া দাতার ও তাহার জাতির অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে, পরবর্ত্তী আয়তে আর একটী উপমা দিয়া তাহার বিশেষত্বটাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৮৪ ছাদকার উদ্দেশ্য :—

'ছাদকার উদ্দেশ্য কি, তাহা আয়তের প্রথমভাগে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। আধ্যাত্মিক হিসাবে ছাদকার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে, তাহাদ্বারা আল্লার সন্তোষলাভের চেষ্টা করা, এবং পার্থিব হিসাবে তাহার লক্ষ্য—জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় করিয়া লওয়া। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া যে দান খয়রাত করা হইবে, এছলামের পরিভাষায় তাহা সাত্বিক ছাদকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

২৮৫ অপচয়ের উপমা :—

ছাদকা বা সদ্ব্যয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি যাহারা লক্ষ্য রাখে না, বরং তাহার বিপরীত নানা অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া যাহারা নিজেদের সদ্ব্যয়গুলির অপচয় ঘটাইয়া থাকে, অন্তিমকালে গুরুতর অভাবের সময় সর্ব্বাসর্ব্বস্ব হারা হইয়া তাহাদের কিরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে, এই উপমাদ্বারা তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। আয়তে বাত্যাবর্ত্তের সহিত অগ্নির কথা বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে "অগ্নি" অর্থে ছমুম অথবা শীতের কঠোর ঝঞ্ঝাকে বুঝাইয়া থাকে (জরীর)।

সপ্তত্রিংশ রুকু'

—০০০—

দান সম্বন্ধে কএকটা বিশেষ উপদেশ

২৬৭ হে মো'মেনগণ ! তোমরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ এবং আমরা তোমাদিগের জন্য ভূমি হইতে যাহা উৎপন্ন করিয়াছি - তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট যাহা-তাহা হইতে ব্যয় করিবে, আর তাহার মধ্য-কার নিকৃষ্ট যাহা - তাহা ব্যয় করার মতলব করিও না - অথচ চোখ বন্ধ করিয়া না লইলে তোমরা সেরূপ নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না; আর জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন বেনায়াজ মহিমময়। ১৮৬

٢٦٧ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

২৬৮ শয়তান তোমাদিগকে ভয় দেখায় দরিদ্র হইয়া যাওয়ার-আর সে তোমাদিগকে আদেশ করে কৃপণ হইবার, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতি-শ্রুতি দিতেছেন তাঁহার ক্ষমার ও অতিরিক্ত অনুগ্রহের, বস্তুতঃ

٢٦٨ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ

আল্লাহ্ হইতেছেন বিপুলদাতা, সর্ব্বজ্ঞাতা—[২৬৭]

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৬৯ — যাহাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল যে ব্যক্তি - নিশ্চয় সে'ত বহু মঙ্গল প্রদত্ত হইয়াছে ; বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যেরা (ইহা) উপলব্ধি করিতে পারে না।[২৬৮]

٢٦٩ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ج وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

২৭০ আর যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা (নজর) তোমরা গ্রহণ কর না কেন-আল্লাহ্ তাহা নিশ্চয় অবগত হন ; আর অত্যাচারীদিগের সাহায্যকারী কেহই নাই।[২৬৯]

٢٧٠ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

২৭১ তোমরা যদি ছাদ্‌কাগুলিকে প্রকাশ কর - সে'ত বেশ কথা, আর যদি তাহা গোপন কর ও কাঙ্গালদিগকে দিয়া দাও, তবে তোমাদের পক্ষে তাহা উত্তম ; এবং ইহা তোমাদিগের কতকাংশ দুষ্কর্ম্মের মোচন করিয়া দিবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিশেষরূপে খবরদার।[২৭০]

٢٧١ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

২৭২ তাহাদিগকে হেদায়ত গ্রহণ করাইবার দায়িত্ব তোমার উপর নাই, পরন্তু আল্লাহ্ যাহাকে-ইচ্ছা হেদায়ত করেন; এবং ধনসম্পদ যাহা তোমরা ব্যয় কর - সে'ত তোমাদের নিজে-দেরই মঙ্গলের জন্য; আর একমাত্র আল্লার সন্তোষলাভের চেষ্টায় ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থব্যয় করিও না; এবং যে সব ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে - তাহা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, আর তোমা-দিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

٢٧٢ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۞

২৭৩ সেই নিঃস্ব জনগণের জন্য— যাহারা আল্লার পথে অবরুদ্ধ হইয়া আছে - (ফলে, অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য) দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, (ভিক্ষা হইতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞলোকেরা তাহাদিগকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করে, তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পার - তাহাদের লক্ষণের দ্বারা, তাহারা লোকের নিকট কাকুতি

٢٧٣ لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاۤءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا

করিয়া যাচ্ঞা করে না ; বস্তুতঃ যে কোন অর্থ তোমরা ব্যয় কর -সে সমস্তের বিষয় আল্লাহ্ সম্যক্‌রূপে অবগত।

تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

টীকা :—

২৮৬ **উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তুর দান :—**

সাধারণতঃ মানুষ সম্পদ অর্জ্জন করে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা, অথবা কৃষিকার্য্যের মধ্যবর্ত্তিতায়। আয়তে উভয় প্রকার আয়ের একটা অংশ ছাদকা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্য, চাকরী প্রভৃতি হইতে যে নগদ টাকা আয় হয়, শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে, মুছলমানকে তাহার শতকরা ২॥০ টাকা জাতীয় তহবিলে দান করিতে হয়। নামাজ, রোজার ন্যায় ইহাও মুছলমানের পক্ষে ফরজ বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। ক্ষেত্র হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, অবস্থাভেদে তাহার দশ বা বিশ অংশের এক অংশ দান করাও এইরূপ ফরজ, ইহাকে ওশর বলা হয়। কোর্‌আনে বিশেষ তাকিদের সহিত এই সকল আদেশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রোজার ফেৎরা প্রভৃতিও আছে। এই তহবিলের অর্থ আর্ত্তের সেবায়, বিপন্নদিগের সাহায্যে, ঋণগ্রস্তগণের উদ্ধারে, দাসদাসীদিগের মুক্তি-সাধনে, এবং জাতির মঙ্গলজনক অন্যান্য সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে হইবে, ইহাও কোর্‌আন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে। এমন কি, এই বিভাগের সরঞ্জামী খরচ যে, মোট তহবিলের ⅛ অংশের অধিক হইতে পারিবে না, তাহাও নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু পরে সুদ বর্জ্জনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুদ বর্জ্জনের জন্য এই প্রকার জাতীয় তহবিল বা দরিদ্র ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক, সেই জন্য কোর্‌আনে সুদ ও জাকাতের ব্যবস্থা একই সঙ্গে প্রদান করা হইয়াছে। এখানেও এই জন্য জাকাত ও ওশরের ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইতেছে।

এছলামের প্রাথমিক অবস্থায়, বহু মুছলমানকে ধর্ম্মের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই নিঃস্ব অবস্থায় তাঁহারা মদিনায় অবস্থান করিতে থাকেন। ছাহাবী বরা-এবনে-আজব বলিতেছেন—এই সময় মদিনাবাসীদিগের মধ্যকার কোন কোন দুর্ব্বল ঈমানের লোক, নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেজুর আনিয়া ঐ সর্ব্বস্বত্যাগী ভক্তদিগকে খাইতে দিয়াছিলেন। তাহার পর এই আয়তটী নাজেল হয় (তির্‌মিজী, এবনে মাজা)। এই আয়তে দানের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার আদেশ এবং অপকৃষ্ট বস্তুগুলিকে নির্ব্বাচন করার নিষেধ করা হইতেছে।

২৮৭ শয়তানী অর্থনীতি :—

'ফাহ্শা'-শব্দ সাধারণতঃ অশ্লীল কাজ কথার জন্য ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু অতিশয় কৃপণতার স্বভাবকেও আরবী সাহিত্যে ফাহশা বলা হইয়া থাকে।

অর্থের মধ্য দিয়া শয়তান দুই প্রকার অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। প্রাসঙ্গিকতার হিসাবে তাহার মধ্যকার একটীর উল্লেখ এই আয়তে করা হইয়াছে। কোন সৎকর্ম্মে অর্থব্যয় করার সময় মানুষ মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে থাকে। তাহার মনে হয়, এইরূপে অর্থব্যয় করিলে আমি দরিদ্র হইয়া যাইব। অতএব কৃপণতা অবলম্বন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ভাবের উদ্বোধক যে হীন প্রবৃত্তি, তাহাই হইতেছে মানুষের সর্ব্বনাশকারী শয়তান। ইহার সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হইয়াছে—

ان النفس لامارة بالسوء

"নিশ্চয় প্রবৃত্তিই মন্দ কার্য্যের প্রধান উদ্বোধক (১২—৫৩)।" ফলতঃ এইরূপে যথাস্থানে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া ব্যক্তিগণের মধ্যবর্ত্তিতায় শয়তান জাতীয়জীবনে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আল্লাহ বলিয়া দিতেছেন—মানবজীবনের কার্য্যকলাপের জন্য তোমাদের যে অর্থব্যয়, তাহাতে তোমরা দরিদ্র হইয়া যাইবে না। বরং অর্থ-উপার্জ্জনের সময় ধনিকের জীবন সাধারণতঃ যে সব অনাচার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া থাকে, উপার্জ্জিত অর্থের কতকাংশ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলে, সেই সব অনাচারের কথঞ্চিত প্রতিকার হইয়া যাইবে, ধনী ও দরিদ্র শান্তির সহিত সামাজিক জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিবে। অধিকন্তু যে পরিমাণ অর্থ এই সব কর্ত্তব্য পালনে ব্যয় করা হইবে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে না। বরং আল্লাহ দাতাকে তাহা অপেক্ষা অধিক দান করিবেন। পূর্ব্ব রুকু'র প্রথম আয়তে উপমা দিয়া এই কথাই বুঝান হইয়াছে, ২৭২ আয়তের শেষভাগেও ইহার স্পষ্ট বর্ণনা আছে। এইরূপে ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধনের মধ্যকার সম্বন্ধের, তথা অর্থনৈতিক হিসাবে জাতির এবং জাতির সহিত ব্যক্তিগণের জীবন মরণ রহস্যের প্রতি এই আয়তে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইতেছে। শয়তানের আর একটা অর্থনৈতিক অনর্থের কথা ছুরা বানি-এছরাইলে বলা হইয়াছে :—স্বজনগণকে এবং দুস্থ দরিদ্রদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বুঝিয়া দিও, আর অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দিও না,—

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين -

নিশ্চয় অপব্যয়ীরা হইতেছে শয়তানের ভাই (২৭)।" মদ, জুয়া, ব্যভিচার প্রভৃতি যে সব উপকরণকে উপলক্ষ করিয়া শয়তান মানুষকে অপব্যয় করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে, প্রথমতঃ তাহার দ্বারা মানুষের নীতি ও ধর্ম্মভাবের চরম অপচয় ঘটিয়া যায়। তাহার পর অপব্যয়ের অপরিহার্য্য ফল হইতেছে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য কেবল মানুষের "গুণরাশি নাশী"ই নহে, বরং যুগপৎভাবে দুন্য়ার সকল দোষের আকর এবং সকল পাপের জনকও ইহাই। ধলা

বাহুল্য যে, এইগুলিই হইতেছে শয়তানের প্রধান সাধনা ও একান্ত কামনীয় বস্তু। অপব্যয়ী ধনিকগণ এই কার্য্যে শয়তানের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে, অতএব তাঁহারা হইতেছে শয়তানের ভাই। যাহাদিগকে আল্লাহ ধনসম্পদ দান করিয়াছেন, শয়তানী অর্থনীতির এই উভয় অনর্থ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যাওয়ার জন্য কোর্‌আন তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছে।

২৮৮ **হেকমত—প্রজ্ঞা :—**

হেকমত শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—প্রজ্ঞা। "জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ অপরোক্ষ তত্ত্বের উপলব্ধি" এবং "সম্মুখবর্ত্তী জ্ঞাতব্য বিষয়কে আশপাশের সমস্ত ডালপালা হইতে বিবিক্ত করিয়া উপলব্ধ জ্ঞান"—ইহাই হইতেছে প্রজ্ঞার তাৎপর্য্য। এই প্রজ্ঞার কাজ হইতেছে—"নানা বিজ্ঞান প্রবাহিনীর সাগরসঙ্গম হইতে সারমন্থন করিয়া, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্ভব তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা।" (১)

এই আয়তটী উপরের আয়তের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই জন্য উপরের আয়তের শেষে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হয় নাই। মোহ-প্রযুক্ত জ্ঞানের বিকারফলে সাক্ষাৎ সামান্য ক্ষতিটাকেই মানুষ বড় করিয়া দেখে, পরিণামের স্থায়ী ও ব্যাপক লাভ লোকসানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। ব্যক্তিগণের এই অসঙ্গত মনোভাবই জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান অন্তরায়। কিন্তু যে সকল মনিষীব্যক্তি প্রজ্ঞার অধিকারী, মায়ামোহের এই সব অসঙ্গত প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া জাতির জীবন মরণের কার্য্যকারণগত রহস্যগুলি তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন যে, ধনিকের এই মানসিকতা কেবল জাতির সাধারণ স্বার্থেরই বিঘ্নকর নহে, বরং তাহার এই মনোভাব বাস্তবে তাহার জন্যও এক মহাসর্ব্বনাশের সূচনা করিয়া থাকে। প্রজ্ঞা সংক্রান্ত এই উপদেশটী কেবল অর্থ-ব্যয় সম্বন্ধে বর্ণিত হইলেও, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত সকল সাধনা সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযুজ্য। যাঁহারা পারিপার্শ্বিক ভাব ও সংস্কারদ্বারা সম্মোহিত, অন্ধ অনুকরণের মোহপ্রভাবে যাহাদের বিচার শক্তি আড়ষ্ঠ, কোর্‌আনের আদেশ-উপদেশগুলির গভীর রহস্য উপলব্ধি করা আর নিজেদের বাস্তবজীবনে সেগুলিকে সত্যকারভাবে মূর্ত্ত করিয়া তোলা, তাহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তাই আজ কোটি-কণ্ঠের অবিরাম তেলাওত-ঝঙ্কারও মুছলমানের জাতীয় জীবনকে আশানুরূপ সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিতেছে না,—পক্ষান্তরে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত মস্তিষ্কের গর্ব্বগরীমা একটা অনর্থক বাক্যাড়ম্বর মাত্রেই পরিণত হইয়া থাকিতেছে।

২৮৯ **নজর—প্রতিজ্ঞা :—**

আমরা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করি, তাহার ফলদানের কর্ত্তা হইতেছেন আল্লাহ।

---

(১) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের সমস্ত সৎকর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম করার প্রতিজ্ঞাই তিনি বিদিত আছেন। কোর্‌আনে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "সৎকর্ম্মপরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলকে আল্লাহ নষ্ট করিয়া দেন না" (হুদ, তওবা প্রভৃতি)। ২৬৫ আয়তে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মুছলমানের সমস্ত দান ও ছাদকার উদ্দেশ্য হইতেছে দুইটী—আল্লার সন্তোষলাভের চেষ্টা এবং জাতিকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া। অতএব আল্লার অভিপ্রায় অনুসারে অর্থব্যয় করা হইলে, এই উভয় প্রকার ফল মানুষ নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে।

মানুষ কোন সৎকর্ম্মসাধন করার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহাকে 'নজর' বলা হয়। আমি রজব মাসে পাঁচটা রোজা রাখিব, পঞ্চাশজন কাঙ্গালকে ভূরিভোজন করাইব, আমার উপার্জ্জনের চতুর্থাংশ স্বগ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দান করিব-এই প্রকার প্রতিজ্ঞার নামই নজর। কোন অসঙ্গত বা সাধ্যাতীত কাজের জন্য এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার পূরণ করিতে হয় না। তবে এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হয়।' এখানে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল নজরের সঙ্গে কোন শর্ত্ত থাকিতে পারে না। আজকাল নজরের নামে খোদার সঙ্গে যে বেনিয়াগিরি করা হয়, তাহা এছলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার ছেলেটী কঠিন রোগাক্রান্ত, তাহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতেছি। সেই সময় মানত করিলাম—খোদা হাকিম! আমার ছেলেটা যদি রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে আমি ২৫টা মিছকিন খাওয়াইয়া দিব। "আল্লাহ যদি এই কাজ করিয়া দেন, আমি তাহা হইলে এই দান খয়রাত করিব"—এই প্রকারের Conditional নজরের স্থান এছলামে নাই। হজরত রছুলে করিম এই প্রকার নজর মানিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়া দিয়াছেন উহাকে কৃপণের অনর্থক অর্থদণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (বোখারী, মোছলেম)।

২৯০ দান গোপন করা :—

যে সকল ছদকা ওয়াজেব বা এছলামের আইন অনুসারে অপরিহার্য্য নহে, এখানে সেইগুলির কথা বলা হইতেছে। হজরত বলিয়াছেন, এরূপ সঙ্গোপনে দান করিবে যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করে, তোমার বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে (বোখারী)। জাকাত, ওশর প্রভৃতি ফরজ ছাদকাগুলি কর-হিসাবে আদায় করা হয়, সুতরাং তাহা গোপন করা যায় না, নানা কারণে তাহা গোপন করা সঙ্গতও নহে। এছলামের সমস্ত এবাদত ও সৎকর্ম্মের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল এবাদতের সহিত জাতীয়তার একটা গভীর সম্বন্ধ আছে, সেগুলি সম্পাদন করিতে হয় প্রকাশ্যভাবে, সকলের সঙ্গে একত্রে। তাই ফরজ নামাজ জমাতে পড়িতে হয়, সেজন্য মছজিদে উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু নফল নামাজ নিভৃতে গোপন গৃহকোণে পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দান ছাদকা সম্বন্ধেও এই কথা। ব্যক্তিগত দান খয়রাত যত গোপনে ও মানুষের অজ্ঞাতসারে হয়, ততই উত্তম। যে সকল দোষে দানে [illegible] নষ্ট ঘটিয়া যায়, ইহাতে

তাহার আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে দানগ্রাহী দীন দুঃখীদিগকেও লোকসমাজে হেয় হইতে হয় না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল্ যেমন তেমন কোন একটা কাজ করিলে অথবা কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে দুই চারি আনা পয়সা দান করিলে, সংবাদপত্রের মারফতে তাহার ঢোল শোহরত না করাইতে পারিলে মুছলমানের যেন তৃপ্তি হয় না।

২৯১ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দান করা কর্ত্তব্য :—

এছলামের প্রাথমিক যুগে মুছলমানদিগের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাই অবস্থাপন্ন লোকেরা কেবল মুছলমানদিগকে দান করিতেন। হজরত রছুলে করিম ঐ সময় কেবল দরিদ্র মুছলমানদিগকে দান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াও ছাহাবাগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়ত নাজেল হইলে, হজরত ঘোষণা করিয়া দেন— দান সম্বন্ধে বংশ ও ধর্ম্মের বিচার করা উচিত নহে। দুস্থ মানুষ মাত্রকেই দান করিবে, তা সে যে ধর্ম্মের লোক হউক না কেন (নাছাই, এবনে-আবি-হাতেম প্রভৃতি)। অধিকাংশ আলেমের মতে ফরজ ছাদকাগুলি এই আদেশ হইতে বর্জ্জিত। কিন্তু একদল আলেম এই আয়তকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়া বলেন যে, ফরজ বা নফল সকল প্রকারের ছাদকা সকল ধর্ম্মাবলম্বী দুস্থ দীনদুঃখীকে দান করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন যে, কোর্‌আন সাধারণভাবে দীনদুঃখীকে ফরজ ছাদকার একটা অংশ দান করিতে আদেশ করিয়াছে। মুছলমানকে দিতে হইবে বা অমুছলমানকে দেওয়া হইবে না, এরূপ কোন ইঙ্গিতও কোর্‌-আনের কোন আয়ত হইতে পাওয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় কোর্‌আনের সাধারণ ও ব্যাপক আদেশকে, কেবল মুছলমানের জন্য বিশেষিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে না। আলেমগণের সাধারণ মতের বিপরীত, এমাম আবুহানিফা ছাহেব জিম্মী-অমুছলমান-দিগকে ফেৎরা দান করার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আয়তে প্রথমে হজরত রছুলে করিমকে এবং পরে তাঁহার সমস্ত উম্মতকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, হেদায়ত গ্রহণ করাইয়া সমস্ত মানুষকে মুছলমান করিয়া লইতে হইবে, এ দায়ীত্ব তোমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া মাত্র তোমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা এই কর্ত্তব্যপালন করার পরও যদি কেহ তাহাকে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে মানুষ হিসাবে তোমাদের প্রতি তাহার যে দাবী এবং তাহার প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য, তাহা অস্বীকার করা মুছলমান বান্দার পক্ষে কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

২৯২ দানের ধন ফিরিয়া আসে :—

তফছিরকারগণের সাধারণ মত এই যে, এখানে পরকালের কথাই বলা হইতেছে। অর্থাৎ তোমরা ইহকালে যে সকল অর্থের সদ্ব্যয় করিবে, পরকালে তাহার পূর্ণ সুফলপ্রাপ্ত

হইবে, আয়তে ইহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু উপক্রম-উপসংহারের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এবং ছুরা বকরের মূল প্রতিপাদ্যটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃই জানা যাইবে যে, এখানে মুখ্যতঃ এই জীবনের কথাই বলা হইয়াছে। অবশ্য পরকালেও যে মানুষ তাহার সৎকর্ম্মের পুরস্কার ভোগ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোর্‌আনই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছে—

للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة -

"সৎকর্ম্মপরায়ণ হয় যাহারা, এই দুন্‌য়াতে তাহাদের মঙ্গল হইয়া থাকে" (জুমর)। মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে জনহিতকর সৎকর্ম্মে যে অর্থব্যয় করে, সমষ্টির ব্যষ্টি হিসাবে এই জগতেই তাহা ফেরৎ পাইয়া থাকে। এই কথাই এখানে নানা ভাবে মুছলমানের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইতেছে।

২৯৩ **দানের উপযুক্ততম পাত্র কাহারা ?--**

অনেক সময় অপাত্রে দান করিয়া ছাদকাগুলির অপচয় ঘটান হইয়া থাকে। ইহাতে একদিকে ন্যায্য হকদারদিগকে বঞ্চিত করা হয়, অন্যদিকে কর্ম্মবিমুখ ব্যক্তিদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে উৎসাহিত করা হয়। উভয়ই অন্যায় এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। তাই এই আয়তে দান-ছদকার প্রকৃত হকদারদিগের পরিচয় মুছলমানকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে।

আয়তে তাহাদের নিম্নলিখিত পাঁচটী বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে :—

(১) **যাহারা আল্লার পথে অবরুদ্ধ হইয়া আছে।** অর্থাৎ স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। যেমন জেহাদে লিপ্ত গাজী, ধর্ম্মবিদ্যা অর্জ্জনে ব্যাপৃত ছাত্র, ধর্ম্মপ্রচারে নিরত আলেম—ইত্যাদি। এই শ্রেণীর সেবকদিগের ভরণ পোষণের ভার সমাজের উপর অর্পিত আছে। নিজেদের অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইলে, এই সব সাধনায় যথাযথভাবে আত্মনিয়োগ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। ফলে, সেজন্য পরিণামে সমাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

(২) **অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য যাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না।** কারণ, স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের সেবার যে মহাব্রত তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্নচেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় ও সুযোগ তাহাদের নাই। সেদিকে মনোনিবেশ করিতে হইলে, জেহাদের ময়দানগুলি খালি পড়িয়া থাকিবে, ধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৩) **ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য, অজ্ঞ লোকেরা যাহাদিগকে অভাব শূন্য ও অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে।** অভাবে দারিদ্র্যে তাহারা জর্জ্জরিত হইতে থাকে, তত্রাচ আত্মসম্মান জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর

হইয়া উঠে না। ইহার ফলে, অজ্ঞলোকেরা তাহাদিগকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

(৪) তাহারা কাকুতি করিয়া লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় না।

(৫) জ্ঞানী লোকেরা, নানা লক্ষণের দ্বারা তাহাদের অবস্থার আভাষ পাইতে পারেন।

এই শ্রেণীর লোকদিগের সন্ধান লইয়া, গোপনে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। তাহারাই হইতেছে সমাজের সকল দান-ছদকার প্রথম ও প্রধান হকদার। ভিক্ষাবৃত্তিকে এছলাম অতি কঠোর ভাষায় হারাম করিয়া দিয়াছে। ব্যবসাদার ভিক্ষুক-দিগকে দান করিয়া আমরা সেই হারামের সহায়তা করিয়া যাইতেছি, সদ্ব্যয়ের অজুহাতে নিজদিগকে একটা ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করিয়া তুলিতেছি।

আবুদাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে একটী 'হাদিছ' বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"প্রার্থী মাত্রই পাওয়ার হকদার, যদিও সে ঘোড়ায় চড়িয়া আসে।" এই 'হাদিছের' দোহাই দিয়া অজ্ঞ মৌলবী ও ব্যবসাদার ভিক্ষুকগণ মুছলমান জাতির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, বস্তুতঃ ইহা হাদিছ অর্থাৎ হজরত রছুলে করিমের উক্তি আদৌ নহে। এমাম হোছেনের নামকরণে এই রেওয়ায়তটী বর্ণিত হইয়াছে, হজরতের পরলোক গমনের সময়ও তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। তাহার পর, যে يعلي ابن ابي يحيى রাবীর মারফতে এই রেওয়ায়তটী পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার কোন পরিচয়ই জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহা হাদিছও নহে, বিশ্বস্ত রেওয়ায়তও নহে।

অষ্টাত্রিংশ রুকু'

—∞—

সুদ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা

٢٧٤ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

২৭৪ যাহারা নিজেদের ধনসম্পদগুলি ব্যয় করে রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্য ভাবে—তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের পুরস্কার (নির্দ্ধারিত) আছে, কোন ভয় নাই তাহাদের আর তাহারা সন্তপ্তও হইবে না।

٢٧٥ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا

২৭৫ সুদ খাইয়া থাকে যাহারা, (নিজেদের) জ্ঞানের বিকার হেতু, তাহারা ত কেবল সেইরূপ (দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া) দাঁড়ায় — যেরূপ দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি - শয়তান মুহ্যমান করিয়া ফেলে যাহাকে ; ইহার কারণ এই যে, তাহারা বলে ঃ— "ব্যবসায় সুদের অনুরূপ বৈ ত নহে—অথচ আল্লাহ্ ব্যবসায়কে হালাল করিলেন এবং সুদকে করিলেন হারাম !" অতঃপর নিজপ্রভুর হুজুর হইতে উপদেশ সমাগত হয় যাহার নিকট, ফলে

সে নিবৃত্ত হয়, তবে অতীত (সুদ) তাহার ; এবং তাহার বিষয়টা আল্লার হাতে[২২১] ; আর পুনরায় করিবে যাহারা — তাহারাই হইতেছে নরকের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৬ সুদকে আল্লাহ্ ক্ষয় করেন এবং ছাদকাগুলিকে তিনি বৃদ্ধি করিয়া দেন ; বস্তুতঃ অতি-কৃতঘ্ন পাপাচারীদিগকে আল্লাহ্ প্রেম করেন না।[২২৮]

২৭৬ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

২৭৭ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে - আর নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে ও জাকাত দিতে থাকে— নিজপ্রভুর হুজুরে তাহার পুরস্কার (নির্দ্ধারিত) আছে, কোন ভয় নাই তাহাদের আর তাহারা সন্তপ্তও হইবে না।

২৭৭ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭৮ হে মো'মেনগণ ! আল্লার (ন্যায় -দণ্ড) সম্বন্ধে সাবধান হও এবং সুদের যে অংশ বাকী আছে তাহা পরিত্যাগ কর — যদি তোমরা সত্যকার মো'মেন হইয়া থাক।

২৭৮ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৭৯ কিন্তু যদি না কর, তাহা হইলে আল্লার ও তাহার রছুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাবধান হও! আর তোমরা যদি তওবা কর, তবে মূলধন পাওয়ার অধিকার তোমাদের (হইবে)—তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিত হইবে না।

٢٧٩ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৮০ আর (দেনদার) যদি অস্বচ্ছল অবস্থার লোক হয়-তাহা হইলে অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া পর্য্যন্ত অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য ; অধিকন্তু তোমরা যদি (মূলধনটাও) ছাদকা করিয়া দাও - তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমরা অবগত থাক।

٢٨٠ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২৮১ আর সেই দিন সম্বন্ধে সাবধান হও - যে দিন তোমরা আল্লার পানে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তৎপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্ম্মের ফল সম্পূর্ণভাবে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

٢٨١ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ ع

টীকা :-

২৯৪ সুদ নিষেধের ভূমিকা :—

পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে সুদ সম্বন্ধে অতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, এই আয়তটী তাহার ভূমিকা স্বরূপ বর্ণিত। কোর্‌আন একদিকে যেমন সুদ গ্রহণ করাকে হারাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে জাকাত ওশর প্রভৃতিকে ফরজ করিয়া দিয়াছে—ফরজ জাকাত ব্যতীত অন্যান্য প্রকারে দীনদুঃখীদিগকে সাহায্য করারও উপদেশ দিয়াছে। ২৭৭ আয়তের টীকায় পাঠকগণ ইহার বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

২৯৫ সুদখোরের স্বরূপ :—

আয়তে يقوم ও مس দুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিয়াম শব্দের অর্থ—দণ্ডায়মান হওয়া, মজবুত ভাবে অবস্থান করা, দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। (রাগেব, মেছবাহ প্রভৃতি)। কোর্‌আনে ধনসম্পদকে মানুষের "কিয়াম" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৪—৫)। সাধারণ তফছিরকারগণ এখানে 'দণ্ডায়মান হওয়া'-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সুদখোর যে নিজের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, এমন কথা বলা সঙ্গত হয় না। তাই তাঁহারা বলিতেছেন—কিয়ামতের দিন কবর হইতে উঠিবার সময় সুদ-খোরদের ঐরূপ দুরবস্থা ঘটিবে। তাহারা অন্য লোকের মত ত্বরিতপদে হাঁটিতে পারিবে না, বরং মৃগীরোগগ্রস্তদের মত হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গিয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকিবে। আমার মতে এই সব কল্পনার কোন দরকার নাই, প্রমাণও নাই। সুদখোরদিগের জীবন, জ্ঞান ও চরিত্রের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহাই কোর্‌আনের উদ্দেশ্য এবং দুন্‌য়া সম্বন্ধেই উহা বর্ণিত হইয়াছে। مس শব্দের অর্থ—স্পর্শ করা এবং উন্মাদ বা মৃগীরোগ। পূর্ব্বে আরবদের ধারণা ছিল যে, শয়তানের স্পর্শে ঐ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহার পর, আরবী ভাষায় ঐ রোগকেই مس বলিয়া অভিহিত করা হইতে থাকে। সমস্ত অভিধানেই একথা স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন মনুষ্য, মন্বন্তর প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের সময় ব্রহ্মা বা তাঁহার দ্বাদশ মানস পুত্রের কথা আদৌ আমাদের মনে আসে না, সেইরূপ "মছ্"-বলিতে শয়তানের স্পর্শ সম্বন্ধে কাহার মনে কোন ধারণার উদ্রেক হয় না। "শয়তান মুহ্যমান করিয়া ফেলে"-এই পদটী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত একটা পরিভাষা, এবং কেবল সেই হিসাবে এখানে উহার উল্লেখ হইয়াছে। (বায়জাভী)। কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করা ছাড়া, শয়তান যে মানুষের দেহের, প্রাণের বা স্বাস্থ্যের উপর কস্মিনকালেও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে

পারে না, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন (দেখ, কবির ৭২—৫৩২)। আমরা যখন কাহাকে পিশাচ বা কোন বিষয়কে পৈশাচিক কাণ্ড বলিয়া উল্লেখ করি, তখন সংস্কৃত 'পিশিতাশ' বা মাংসাশী প্রেতযোনির অস্তিত্ব কখনই স্বীকার করিয়া লই না।

জাতির মধ্যকার কতকগুলি লোক সুদ খাইতে আরম্ভ করিলে আর্থিক বা নৈতিক হিসাবে সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, ইহার ন্যায় ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। পরন্তু অপহরণের হীন আকাঙ্খা, দুস্থ দীন দুঃখীর শোণিত শোষণের দুর্ব্বার পিপাসা, সুদখোর মহাজনদিগের জীবনের একমাত্র সাধ ও একমাত্র সাধনা হইয়া থাকে। এজন্য মানবতার সমস্ত সৎবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে এবং দুনয়ার সব পাশবিক ও পৈশাচিক ভাবকে আঁকড়াইয়া ধরিতে সে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। পক্ষান্তরে, সুদের ব্যবসায় দ্বারা মহাজনগণ জাতীয় ধনকে নিজেদের ভাণ্ডারে কেন্দ্রীভূত করিয়া লয়—এবং তাহাদের ভাণ্ডার পুষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিও ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতে থাকে। ইহার ফলে দরিদ্রতার ক্রমানুসারে জাতি সমস্ত সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, অভাবে তাহার স্বভাব নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। এই নৈতিক ও আর্থিক প্রতিবেশের স্বভাব ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদখোরকে বেষ্টন করিয়া ফেলে, এবং তাহাকেও নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। ফলতঃ সুদখোরের জীবন আদৌ কোন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। নিজের মানসিক বিকার হেতু সে যাহাকে নিজের উন্নতি বলিয়া ধারণা করিতেছে, বস্তুতঃ সেটাই হইতেছে তাহার পতন, তাহার সর্ব্বনাশ।

২৯৬ সুদ ও ব্যবসার তারতম্য :—

সুদ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার একটা পূর্ণ, ব্যাপক ও শাস্ত্রসঙ্গত সংজ্ঞা প্রদান করা আবশ্যক। কোর্‌আনের আদেশে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, "রেবা" সর্ব্বত্র সকল যুগে ও সকল অবস্থায় হারাম। কিন্তু "রেবা" কাহাকে বলে, কোর্‌আনে তাহা বলিয়া দেওয়া হয় নাই! আমরা যতদূর জানি—হজরত রছুলে করিমও উহার কোন সংজ্ঞা বলিয়া দেন নাই। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং বিশিষ্ট ছাহাবাগণের নামকরণে এমন কথাও বলা হইয়াছে,—যাহাদ্বারা প্রকারান্তরে প্রমাণ হয় যে, হজরত রছুলে করিম সুদের মছলাটা উম্মৎকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ এত বড় গুরুতর বিষয়ে এছলাম অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

"রেবা"কে কোর্‌আন-হাদিছে এত কঠোরতার সহিত হারাম করা হইয়াছে, অথচ তাহাতে উহার কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; পুনঃপুন "রেবা" সম্বন্ধে আয়ত অবতীর্ণ হইল; অথচ কোন ছাহাবীই হজরতকে তাহার সংজ্ঞা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেন না—বাহ্যতঃ ইহা আশ্চার্য্যজনক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে

যে, বস্তুতঃ ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, হজরত রছুলে করিমের প্রতি যখন "রেবা"র নিষেধমূলক আয়তগুলি অবতীর্ণ হয়, তখন "রেবা"-জিনিষটা আরব জনসাধারণের সম্পূর্ণ বিদিত ছিল। সর্ব্ববিদিত ছিল বলিয়া "রেবা"র সংজ্ঞা দিবার দরকার হয় নাই—যেমন শূকরমাংসের সংজ্ঞা দেওয়ার দরকারও হয় নাই।

"রেবা"র নিষেধমূলক আয়তগুলি নাজেল হওয়ার সময়, আরবের জনসাধারণ "রেবা" বলিতে কি বুঝিত, এখন আমাদিগকে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে। তাহা হইলেই "রেবা"র সংজ্ঞা জানিবার জন্য আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। আমাদের এমাম আলেম ও ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে ঃ—

انهم كانوا يدفعون المال على ان ياخذوا كل شهر قدرا معينا و يكسون راس المال باقيا - ثم اذا حل الدين طالبوا المديون براس المال ، فان تعذر عليه الاداء زادوا فى الحق و الاجل - فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به فى الجاهلية -

—"লোকে এই শর্ত্তে টাকা ধার দিত যে, খাতক মহাজনকে প্রতি মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদান করিবে, অথচ আসল কমিবে না। এইরূপে আসল টাকা পরিশোধ করার সময় উপস্থিত হইলে খাতক যদি টাকা দিতে অসমর্থ হইত, তবে সে মহাজনকে বলিয়া সময় বাড়াইয়া লইত এবং আসল টাকাও বাড়াইয়া দিত (কবির, জরির প্রভৃতি)। ফলে আমাদের দেশের মহাজনেরা টাকা কর্জ্জ দিয়া যেরূপে সুদ ও চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ আদায় করিয়া থাকে, আরবে তখন তাহাই "রেবা" বলিয়া পরিচিত ছিল। কোর্‌আন এই সর্ব্বজনবিদিত "রেবা"র উল্লেখ করিয়াছে এবং উভয়কেই হারাম করিয়া দিয়াছে।

সুদখোরদিগের বিকারের কারণ সম্বন্ধে কোর্‌আন বলিতেছে—"তাহারা বলিয়া থাকে যে, মূলধন খাটাইয়া ব্যবসা করা আর টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করা উভয়ই ত সমান।" "অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিলেন"—এই পদাংশটা কাহার উক্তি—আল্লার না সুদখোরদিগের—সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাধারণ তফছিরকারগণের মতে, "ব্যবসায় সুদের অনুরূপ বৈ'ত নহে"-পর্য্যন্ত সুদখোরদিগের উক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতে আল্লার উক্তি আরম্ভ হইয়াছে। চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, সুদ ও ব্যবসায়ের মধ্যে যে কোনই পার্থক্য নাই, তফছিরকারগণ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতে-ছেন—উভয় সমান হইলেও, যেহেতু আল্লাহ সুদকে হারাম ও ব্যবসায়কে হালাল করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্যই একটা হালাল ও অন্যটা হারাম হইয়া গেল—সুতরাং স্বরূপতঃ ব্যবসায় সুদের সমান বলিয়া, সুদকে হালাল বলা আর সম্ভব হইবে না। ইহা বলার জন্যই তাঁহারা শেষ অংশটাকে আল্লার উক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাদ্বারা সুদখোর ও কাফেরদিগের উপস্থাপিত

সমস্যার উত্তর হইতেছে না, বরং তাহাদ্বারা ঐ সমস্যাটা আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।

অন্য পক্ষ দেখাইতে চাহিয়াছিল যে, সুদ ও ব্যবসায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ব্যবসায়কে হালাল বলিলেই যুক্তির হিসাবে সুদকেও হালাল বলিতে হইবে। অথচ মুছলমানেরা বলিতেছে যে, আল্লাহ সুদকে হারাম করিয়া ও ব্যবসায়কে হালাল করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, আল্লার কাজ অযৌক্তিক, সুতরাং অন্যায়। অন্যায় কাজ আল্লার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং "তিনি সুদকে হারাম করিয়াছেন" -এই উক্তি বিশ্বাসের অযোগ্য। আমাদের সাধারণ তফছিরকারগণ এই যুক্তির বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার এই যে, আল্লার কাজে আবার ন্যায় অন্যায় কি আছে। সুদ ও ব্যবসায় উভয় সমান, স্বীকার করি। কিন্তু আল্লাহ যখন দুইটা সমান বিষয় সম্বন্ধে দুইটা অসমান বা বিপরীত আদেশ দিয়াছেন, তখন তাহাই ন্যায় হইয়া যাইবে! সাধারণ মত ইহা হইলেও, অল্পসংখ্যক তফছিরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, আলোচ্য উদ্ধৃতাংশ দুইটাই কাফেরদিগের উক্তি—তাহাদের উপস্থাপিত সমস্যা। এই সমস্যার উত্তরে কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে—এই সমস্যা উপস্থাপিত করা তাহাদের জ্ঞানের বিকার ও বিচার বুদ্ধিহীনতার ফল। এই প্রকার বিকারগ্রস্ত না হইলে তাহাদের বিচার বুদ্ধি তাহাদিগকে বলিয়া দিত যে, বস্তুতঃ সুদ ও ব্যবসায় স্বরূপতঃ সমান কখনই নহে, বরং পরস্পর বিপরীত।

এই বিচার বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরাও সুদ ও ব্যবসায়ের পার্থক্য সম্যকভাবে বুঝিতে পারিব। ব্যবসায়ে, মূলধনের মালিক যেমন লাভের অংশ পায় অন্য যাহারা সেই মূলধনকে খাটায় বা তাহার সংশ্রবে খাটে, যাহারা ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা সকলেও তাহাদ্বারা অল্পবিস্তর উপকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সুদের ব্যাপারে সমস্ত উপকার লাভ করে মহাজন, এবং খাতক কেবলই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ে অবলম্বিত হয় ধনের নিষ্কেন্দ্রীকরণ নীতি, জাতি ইহাদ্বারা নানা সূত্রে উপকৃত হয়—আর সুদ জাতিকে নিঃস্ব করিয়া ব্যক্তি বিশেষের হাতে জাতীয় ধনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেয়। ব্যবসায় জাতিকে কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী ও উদার করিয়া তুলে,—সুদ মানুষকে অলস, শ্রমকাতর ও হীনচেতা করিয়া দেয়। অধিকন্তু সুদ ধনীকে ক্রমশই অধিকতর ধনী এবং দরিদ্রকে ক্রমাগত অধিকতর দরিদ্র করিয়া দিতে থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ে এ দোষ নাই। ফলতঃ এই শ্রেণীর পার্থক্যগুলির জন্যই আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানসিক বিকারের ফলে তাহারা এতদূর মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সহজ কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

২৯৭ **পূর্ব্বে গৃহীত সুদের ব্যবস্থা :—**

আয়তের এই অংশে বলা হইতেছে যে, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবগত হওয়ার পূর্ব্বে যে সুদ

লওয়া হইয়াছে, দেনদার তাহা ফেরৎ পাওয়ার দাবী করিতে পারিবে না। 'তাহার বিষয় আল্লার হাতে'-অর্থাৎ এই অজ্ঞানকৃত পাপ তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও যাহারা এই নির্ম্মম ব্যবসায় হইতে বিরত না হয়, তাহারা নরকদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২৯৮ সুদ ও ছাদকা :—

ক্ষয় হওয়া, হ্রাসপ্রাপ্ত ও বরকৎবর্জ্জিত হওয়াকে 'মহক' বলা হয়। ব্যক্তিগণের সুদ গ্রহণের ফলে জাতি দরিদ্র হইয়া যায়, সুদখোরগণ জাতির শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের ও তাহাদের অন্যায়রূপে সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত গণ-শক্তি বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করার চেষ্টা পাইতে থাকে। সুদ সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় যে ইউরোপকে সাধারণতঃ আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়, সেখানে ধনশক্তি ও গণশক্তির ভীষণ সংঘর্ষ এবং সে সংঘর্ষের মূলীভূত কারণ ও তাহার ভীষণ পরিণামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সুদের এই অকল্যাণগুলির কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারিবে। প্রাতঃস্মরণীয় জামালুদ্দিন আফগানের প্রধান শিষ্য ও স্বর্গাভিষিক্ত মুফতী শেখ আবদুহু ছাহেব তাঁহার তফছিরে লিখিয়াছেন—মুছলমান সাম্রাজ্যগুলি ইউরোপকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার পর হইতেই বিদেশী ও বিধর্ম্মীরা একমাত্র ব্যাঙ্ককে উপলক্ষ করিয়া তাহাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং সুদের টাকার কল্যাণেই তাহাদিগকে একের পর এক করিয়া নিজেদের স্বত্বাধিকারগুলি বিদেশীর নিকট বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে পরপদানত দাসে পরিণত হইতে হইয়াছে। ইউরোপের মোহমন্ত্র তাহাদিগকে এমনই মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছে যে, স্বজাতির ও স্বদেশের সর্ব্বনাশের ইতিহাসটা পাঠ করিয়া দেখাও তাহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করে না।

এছলাম ফরজ ও নফল ছাদকার আদেশ করিয়া ধনসম্পদ বিভাগের যে সুন্দর ও অনুপম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে জাতির আর্থিক সম্বল ও নৈতিক সম্পদ বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, সমাজ শান্তিতে ও স্বর্গের সকল কল্যাণে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আয়তের সার মর্ম্ম এই যে, সুদ ব্যহৃতঃ লাভজনক হইলেও বাস্তবে তাহা ক্ষতিজনক। পক্ষান্তরে ছাদকা আশু ক্ষতিজনক মনে হইলেও পরিণামে লাভজনক। এই লাভ লোকসান ছাদকাদানকারী ও সুদ গ্রহণকারীদের পক্ষে ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন সত্য, তাহাদিগের জাতির সম্বন্ধেও তাহা সেইরূপ সত্য।

২৯৯ সুদ ও ছাদকা :—

এছলামের আদেশ-নিষেধগুলি সম্বন্ধে একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, তাহাতে প্রত্যেক নিষেধের সহিত একটা আদেশ এবং প্রত্যেক বর্জ্জনের সহিত একটা অর্জ্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসজ্জিত হইয়া আছে। সেই অর্জ্জন ব্যতিরেকে বর্জ্জন

নিষ্ফল, বহুক্ষেত্রে অসম্ভব। আল্লার কোর্আন যেমন স্থদকে বর্জ্জন করার আদেশ দান করিয়াছে, সেইরূপ জাকাত দিবার কড়া হুকুমও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিয়াছে। "সঙ্গে সঙ্গে" বলিলে ভুল হয়—জাকাতের বিধিব্যবস্থাকে মুছলমান সমাজে উত্তমরূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া, তাহার পর অবশেষে স্থদ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে। পাঠক দেখিতেছেন, ছুরা বকরেও নানা ভাবে ফরজ ও নফল ছাদকার আদেশ-উপদেশ প্রদান করার পর স্থদের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থদের নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে, রুকু'র প্রথমে আর একবার মুছলমানকে ছাদকার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থদ সংক্রান্ত বর্ণনা শেষ করার পূর্ব্বে, এই আয়তে আবার স্পষ্ট করিয়া জাকাতের আদেশ প্রদান করা হইতেছে। পাঠকগণ ছুরা মরয়মে দেখিতে পাইবেন, সেখানেও প্রথমে জাকাতের আদেশ স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পর স্থদের অনিষ্টকারিতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কোর্আন বলিতেছে:—"অতএব স্বজনগণকে এবং কাঙ্গালদিগকে ও (দুস্থ) বিদেশী পথিকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য (পরিশোধ করিয়া) দাও! আল্লার সন্তোষ প্রার্থনা করে যাহারা-তাহাদিগের পক্ষে ইহাই উত্তম, আর এই সব লোকই হইতেছে, সফলকাম। আর পরের ধন গ্রাস করতঃ বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া, তোমরা যে ধনসম্পদ স্থদে খাটাইয়া থাক, আল্লার সন্নিধানে তাহা কদাচিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না—কিন্তু আল্লার সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে জাকাত প্রদান করিয়া থাক, (জাতীয় সম্পদ) বহু গুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে এই শ্রেণীর লোকেরাই (৩৮, ৩৯)।

"স্থদ গ্রহণকারী এবং স্থদ দানকারী উভয়ই সমান"—এই মর্ম্মের একটা হাদিছের কথা আমরা সচরাচরই শুনিতে পাই। এই হাদিছের বিভিন্ন অংশ, মোছলেম, নাছাই প্রভৃতি গ্রন্থে হজরত জাবের ও হজরত আলীর প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। এই রেওয়ায়তগুলি একত্র করিয়া লইলে হাদিছটী সম্পূর্ণ হয় এবং সেই সম্পূর্ণ হাদিছের মর্ম্মার্থ এইরূপ দাঁড়ায়:— "হজরত রছুলে করিম, স্থদ দাতা, স্থদ গৃহীতা, স্থদের সাক্ষী, স্থদসংক্রান্ত দলিলের লেখক ও জাকাত দানে অস্বীকৃত ব্যক্তির উপর লা'নৎ করিলেন এবং বলিলেন—তাহারা সমান।" *

স্থতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, স্থদ হারাম হওয়া আর জাকাত ফরজ হওয়া—কোর্আনের দুইটী যৌগপতিক আদেশ। অর্থাৎ কোর্আনের শিক্ষা অনুসারে স্থদ দেওয়া যেমন হারাম, জাকাত না দেওয়াও সেইরূপ হারাম। উভয়ই কোর্আনের আদেশ এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উদ্ধৃত হাদিছ হইতেও আমরা জানিতে পারিতেছি যে, হজরত রছুলে করিম জাকাত দানে অসম্মত ব্যক্তিকেও, স্থদদাতা ও গৃহীতার সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ স্থদ দিয়া, স্থদের দলিলে লেখক ও সাক্ষী হইয়া একদল লোক

* 'সব সমান'-পদের সচরাচর যে অর্থ করা হয়, তাহা ঠিক নহে। একজন নিজের হীন অর্থ লালসা চরিতার্থ করার জন্ত বিপন্ন প্রতিবেশীর হৃৎপিণ্ড চর্ব্বণ করার জন্ত লালায়িত, আর একজন নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া অনিচ্ছা সত্বেও স্থদ দিয়া উপস্থিতের মত আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছে—এই দুই জনের পাপ সমান নহে, হাদিছের উদ্দেশ্যও ইহাও নহে (মেরকাত প্রভৃতি হাদিছের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যেমন মহাজনকে সুদ খাইতে সাহায্য করে, সেইরূপ জাকাত দানে অসম্মত ব্যক্তি জাকাত বন্ধ করিয়া অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সুদী কর্জ্জ লইতে বাধ্য করিয়া থাকে। সে ও তাহার সমশ্রেণীর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা যথাবিধি জাকাত ওশর প্রভৃতি আদায় দিতে থাকিলে গরীবগুলি তাহাদের অভাবের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত, সুতরাং সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হওয়ার কোন কারণই তাহাদের ঘটিত না।

জাকাত ওশর প্রভৃতি ফরজ ছাদকাগুলির পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এই ছাদকা-গুলি কোর্‌আন-হাদিছের ব্যবস্থা অনুসারে নিয়মিতভাবে আদায় দিতে এবং যথাবিধি তাহা ব্যয় করিতে থাকিলে সত্যকার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সমস্ত অভাব পূরণ হইয়া যাইবে, কাহাকেও সুদখোর মহাজনের কবলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে না। মুছলমান জন-সাধারণ আজকাল যে পরিমাণ টাকা অমুছলমান মহাজনদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া থাকে, বায়তুল্‌মাল তহবিলের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মতেও এ সন্দেহটা অমূলক নহে। কিন্তু মুছলমান খাতকদিগের অবস্থা যাঁহারা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দৈবদুর্ব্বিপাকে অথবা অন্যান্য সমীচীন কারণে অভাবগ্রস্ত হইয়া টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয় যাহারা, তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। পক্ষান্তরে অপব্যয়, অমিতব্যয়, অপরিণাম দর্শিতা এবং অনর্থক জাঁকজমকের অনুরাগ বশতঃ যাহারা সুদীকর্জ্জ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়—মুছলমান সমাজে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। শহর ও মফস্বলের মুছলমানদিগের এই অজ্ঞতার যে শোচনীয় দৃশ্য আমরা অহরহ দেখিয়া থাকি, তাহা অতি জঘন্য, অত্যন্ত মর্ম্মবিদারক। নিম্নশ্রেণীর ন্যায় উচ্চশ্রেণীর এবং মোটা মাহিনার সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও এই রোগটা সমানভাবে সংক্রমিত হইয়া আছে। এই সর্ব্বনাশ স্রোতের গতিরোধ করিতে হইলে, নানা উপায়ে অবিরাম প্রচারের দ্বারা জাতির মধ্যে এই শোচনীয় অবস্থার তীব্র অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায় সুদ ও সুদী কর্জ্জকে যতই সহজলভ্য করা হইবে, এই সর্ব্বনাশের স্রোত ততই উদ্দাম গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে!

কোর্‌আন-হাদিছের ব্যবস্থা অনুসারে বায়তুল্‌মাল তহবিল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইলে সুদের দায় হইতে রক্ষা পাওয়া মুছলমানের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারিত, ইহা স্বীকার করার পর কোন কোন বন্ধু বলিয়াছেন—"এখনও যে সব মোছলেম-শাসিত দেশে জাকাত রীতিমত আদায় করা হয়, বিতরণ করা হয় এবং বায়তুল্‌মালের ব্যবস্থা আছে, সে স্থানে অভাবগ্রস্ত মুছলমান খুব কম। কিন্তু এই বিদেশী রাজাদ্বারা শাসিত দেশে মুছলমান রীতিমত জাকাত আদায় করে না, ফেৎরা দেয় না বা অন্যান্য কাজকর্ম্ম করে না—যা হচ্ছে বায়তুল্‌মালের মূলধন। মোছলেম-শাসিত দেশে রাজ সরকার লক্ষ্য রাখ্‌ত যাহাতে মুছলমানগণ শরিয়ত-পালন করে—জাকাত ফেৎরা দেয় বা অন্যান্য শরিয়তের আদেশবিধি পালন করে। এই

"দারুল-হরবে" মুছলমানকে সে সব শরিয়ৎ-বিধি পালন করতে বাধ্য করবে কে? এবং এই জন্যই বলে পরাধীন দেশে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায় না।"

লেখক মোছলেম-শাসিত দেশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজার শাসনাধীনে মুছলমানগণ যে রীতিমত জাকাত ফেৎরা প্রভৃতি দেয় না, ইহাও ঠিক—এবং শাসনদণ্ডের ভয় না থাকিলে কেবল উপদেশের দ্বারা সকলকে কোন বিধিব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পালন করিয়া চলিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখাও যে কার্য্যতঃ অসম্ভব, তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিদেশী শাসনের অধীনে বর্ত্তমান অবস্থাতেও, 'সম্পূর্ণরূপে' না হইলেও, চেষ্টা করিলে বায়তুল্‌মাল-প্রথাকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সফল করিয়া লইতে পারি। ইহা কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের অভিনব কল্পনাও নহে। এই বাংলা দেশে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া আহলে-হাদিছ্‌ সম্প্রদায় ইহাকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিয়া দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের জমাতের তনজিম—কতকটা প্রচলিত হওয়ার ফলে এবং কতকটা মৌলবী ছাহেবদিগের স্বার্থপরতার কল্যাণে—অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িলেও, এই বায়তুল্‌মালের বরকতে তাঁহাদের জমাআৎভুক্ত লক্ষ লক্ষ মুছলমান আজও স্দখোর মহাজনদিগের করাল কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া আছে। আমাদের কর্ম্মী, নেতা ও আলেমগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলে, অন্য জমাতের মধ্যেও বায়তুল্‌মাল প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। একদিকে ধর্ম্মের, অন্যদিকে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্য দিয়া মুছলমান জনসাধারণকে ইহার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলা, কষ্টসাধ্য হইলেও, অসাধ্য হইবে না। এজন্য উপদেশ ও আদর্শ উভয়েরই দরকার, এবং তাহার জন্য দরকার কতকগুলি সমাজ হিতকামী কর্ম্মীর সত্যকার দরদের—একটু ত্যাগ ও শ্রম স্বীকারের।

আমাদের দেশ বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজাদ্বারা শাসিত, ইহা ঠিক। কিন্তু বিদেশী বা বিধর্ম্মী রাজশাসনের অধীনে আছি বলিয়া, বায়তুল্‌মাল বা বিবাহ তালাক প্রভৃতি শরিয়তের অন্যান্য বিধি বিধান সম্বন্ধে নিজেদের আবশ্যক মত সন্তোষজনক ব্যবস্থাও যে আমরা শাসক-জাতির দ্বারা করাইয়া লইতে পারি না, একথা স্বীকার করা সঙ্গত হইবে না। খৃষ্টান ইউরোপের দ্বারা শাসিত বহু মোছলেম অধ্যুষিত দেশে এই উদ্দেশ্যে এখনও "মহকমা-শরয়ী" প্রতিষ্ঠিত আছে। কএক বৎসরের আন্দোলনের ফলে, সিলোন বা লঙ্কাদ্বীপের মুছলমানগণ, শাসনসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার স্বতন্ত্র মহকমা বা বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার বৃটিশ রাজেরই নিকট হইতে সম্প্রতি আদায় করিয়া লইয়াছেন। সংহতিবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিলে আমরাও ইংরাজের নিকট হইতে ঐ প্রকার অধিকার আদায় করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে বায়তুল্‌মাল-প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভের সঙ্গে সঙ্গে, বিবাহ, তালাক, ওয়াক্ফ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর অভাবগুলিরও স্থায়ী প্রতিকার হইয়া যাইতে পারিবে।

৩০০ আল্লাহ ও রছুলের সহিত যুদ্ধ :—

২৭৮ আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—সুদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রচারের পর খাতকের নিকট সুদের যে অংশ বাকি আছে, তোমরা যদি সত্যকার মুছলমান হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই বাকি সুদ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে—অর্থাৎ যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, তোমরা প্রকৃত মুছলমান হইতে পার নাই। এ আয়তে বলা হইতেছে যে, যে ব্যক্তি সুদ পরিত্যাগ না করিবে, আল্লাহ ও রছুলের সহিত তাহার state of war বা বৈরীসম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। দুস্থ ও দুর্ব্বল মানুষকে প্রবলের অত্যাচার হইতে মুক্ত করা এছলামের একটী প্রধানতম সাধনা। এ সম্বন্ধে উপদেশ বিফল হইয়া গেলে বলপ্রয়োগের দ্বারা উৎপীড়িতকে রক্ষা করা মুছলমানের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে। সে অবস্থায় এছলামের দোহাই দিয়া কোন প্রকার উপকার লাভ করা সুদখোরের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কারণ দীনদরিদ্রের উৎপীড়নকারী জালেমের সহিত আল্লাহ ও তাহার রছুলের প্রেমের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

৩০১ অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া :—

আল্লাহ ও তাহার রছুলের সহিত এই ভয়ঙ্কর সম্বন্ধের কথা অবগত হওয়ার পর যাহারা অনুতপ্ত হইয়া তওবা করে, তাহারা মূলধন বা আসল টাকা পাইবার অধিকারী। সুদগ্রহণ না করাতে তাহারা অত্যাচারী হইবে না এবং মূলধনের হ্রাস না হওয়াতে অত্যাচারিতও হইবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মূলধন পরিশোধ না করা খাতকের পক্ষে অন্যায় ও অত্যাচার, এবং মূলধনের অতিরিক্ত সুদগ্রহণ করা মহাজনের পক্ষে অত্যাচার। এই আয়তদ্বারা কেহ কেহ সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, যে ক্ষেত্রে সুদের দাতা ও গৃহীতার মধ্যে কেহই অত্যাচারিত না হয়, সে ক্ষেত্রে সেই সুদকে “রেবা”-পদবাচ্য করা যাইতে পারে না। ইহাদ্বারা তাঁহারা ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতির সুদকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে চান। এই যুক্তিবাদটা যে আয়তের স্পষ্ট তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

মানুষ ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা দেয়, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা খাটাইয়া প্রভূত লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ, বার্ষিক শতকরা সুদের হিসাবে, টাকার মালিককে দিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেলে ডিপজিটদাতার টাকাও মারা যায়। পক্ষান্তরে মানুষ ব্যাঙ্ক হইতে বা ব্যাঙ্কের মারফতে যে টাকা কর্জ্জ লইয়া থাকে, তাহা খাটাইয়া সেও প্রভূত মুনাফা পায় এবং সেই মুনাফার একটা অংশ, একটা নির্দ্দিষ্ট হারের সুদের হিসাবে, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করিয়া থাকে। ফলতঃ উভয়পক্ষই এই আদানপ্রদানের দ্বারা লাভের ভাগী হয়, সময় সময় লোকসানের অংশও উভয়পক্ষকে সমানভাবে বহন করিতে

হয়। ফলতঃ 'রেবা'তে ও ব্যবসায়ে সে সব তারতম্য উপরে দেখান হইয়াছে, এখানেও সেই সব তারতম্য বিগুমান। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া ভারতবর্ষ, মিসর প্রভৃতি দেশের একদল আলেম "ব্যাঙ্কের সুদ 'রেবা' পর্য্যায়ভুক্ত নহে" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোছলেম ভারতের হানাফী (দেওবন্দী) সম্প্রদায়ের প্রধান আলেম মুফতী কেফায়তুল্লাহ ছাহেব, আহমদী বা কাদিয়ানী (লাহোরী) সম্প্রদায়ের এমাম মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব, আহলে-হাদিছ সম্প্রদায়ের এমামে শরিয়ত মাওলানা ছানাউল্লা ছাহেব এবং আরও কতিপয় প্রধান আলেম প্রকারতঃ বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙ্কের সুদকে জাএজ বলিয়াই 'ফৎওয়া' দিয়াছেন। আমরাও নিজেদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে এই মতকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অবশ্য এ সম্বন্ধে বুঝিবার ও বলিবার আরও অনেক কথা আছে, 'রেবা'-সংক্রান্ত অন্যান্য আয়তগুলির টীকায় যথাস্থানে আমরা তাহা নিবেদন করার চেষ্টা পাইব।

৩০২. **কোর্‌আনের আদর্শ**ঃ—

মানবতার কোন্ অনুপম, মহীয়ান ও স্বর্গীয় আদর্শকে কোর্‌আন এই অনাচার অত্যাচার জর্জ্জরিত দুন্‌য়ায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, আলোচ্য আয়তে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুদ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করার সময় এই আদর্শের কথা ভুলিয়া যাওয়া যাহার পর নাই অন্যায় হইবে।

---

* সুদ-সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেককে National debt, National welth. নেশনের Lending ও Securing Capacity প্রভৃতি পরিভাষাগুলি বহুলভাবে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু এ সময়ে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নেশন স্বাধীন না হইলে স্বাধীন ষ্টেটের অভ্যুদয় হইতে পারে না, এবং স্বাধীন ষ্টেট কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পৃষ্ঠপোষিত না হইলে ব্যাঙ্কগুলি বিফল, বরং বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিজনক। পক্ষান্তরে ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া Capitalism এবং তাহার মধ্য দিয়া Imperialism যেরূপে বিশ্বমানবের সুখ শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ধনিকে-শ্রমিকে যে সর্ব্বনাশী সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় এই ব্যাঙ্কই হইতেছে দুন্‌য়ার প্রধান সমস্যা, উহা সমাধান আদৌ নহে।

একোনচত্বারিংশ রুকু'

—ooo—

খরিদ-বিক্রয়ের চুক্তি ও সাক্ষী

২৮২ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ

২৮২ হে মো'মেনগণ ! যখন তোমরা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধারের কাজ-কারবার করিবে - তখন তাহা লিখিয়া লইবে ; আর কোন একজন লেখক যেন ন্যায্যভাবে তোমাদের মধ্যে (ঐ আদান প্রদানের দলিল) লিখিয়া দেয়, আর কোন লেখক যেন (দলিল) লিখিয়া দিতে অস্বীকার না করে—আল্লাহ্ তাহাকে যে-রূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার লিখিয়া দেওয়া উচিত, আর দেনার দায়ী (হইবে) যে ব্যক্তি-সেই যেন (দলিলের লিখিতব্য বিষয়গুলি) বলিয়া দেয় এবং সে যেন নিজপ্রভু-আল্লাহ সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলে ও দেনার কোন অংশ যেন হ্রাস না করে; তবে দেনার দায়ী (হইবে) যে, সে যদি নির্ব্বোধ কিম্বা শক্তি-হীন হয়, অথবা সে যদি নিজে

(দলিলের এবারৎ) বলিয়া দিতে অসমর্থ হয় — তবে তাহার অভিভাবক যেন তাহা ন্যায্য-ভাবে[৩০৫] বলিয়া দেয়; আর তোমরা নিজেদের পুরুষদিগের মধ্য হইতে দুইজনকে সাক্ষী রাখার চেষ্টা করিবে, তবে দুইজন পুরুষ যদি না হয়—তবে নিজে-দের মনোনীত সাক্ষীদিগের মধ্য হইতে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী—যাহাতে নারী দুইজনের মধ্যকার কেহ ভুলিয়া গেলে একজন অন্যকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে; এবং সাক্ষীদিগকে যখন আহ্বান করা হয় - তখন তাহারা যেন অস্বীকার[৩০৭] না করে; আর ঋণ ছোট হউক বা বড় হউক, মিয়াদকাল পর্য্যন্তের জন্য তাহা "লেখা - পড়া" করিয়া রাখিতে অবহেলা করিও না; ইহা আল্লার সন্নিধানে অতি সঙ্গত ও সাক্ষ্যকে অতিশয় মজবুতকারী এবং (ভবিষ্যতে) তোমাদিগকে সন্দেহশূন্য করার নিকটতর (পন্থা)[৩০৮]—অবশ্য যদি নগদ কারবার হয় - যাহাতে

يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ط
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ج فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ط وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا ط وَلَا تَسْأَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَى أَجَلِهِ ط ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ط وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ◎

তোমরা হাতে হাতে আদান-প্রদান করিয়া থাক, তবে তাহা "লেখা-পড়া" না করাতে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্ত্তায় না ; এবং পরস্পর খরিদ বিক্রয় করার সময় সাক্ষী রাখিবে,[৩০৯] এবং (সাবধান!) লেখককে ও সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয় ;—আর যদি কর-তবে তাহা নিশ্চয় তোমাদের পক্ষে অনাচার[৩১০] ; এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সাবধান থাকিও ; আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন[৩১১] ; বস্তুতঃ আল্লাই হইতেছেন সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্ জ্ঞাতা।

২৮৩ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط

২৮৩. আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং (এই প্রকার চুক্তির সময়) লেখক না পাও—তবে দখলী-বন্ধক[৩১২] ; অতঃপর তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি অন্য সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হয়-তবে বিশ্বস্ত মনে করা হইয়াছে যাহাকে, সে যেন তাহার আমানত শোধ করিয়া দেয় আর নিজপ্রভু আল্লাহ সম্বন্ধে যেন সাবধান হইয়া চলে[৩১৩] ; আর তোমরা

সাক্ষ্যগোপন করিও না ; বস্তুতঃ তাহা গোপন করে যে ব্যক্তি, নিশ্চয় তাহার মন হইতেছে পাপাচারী ; বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞাতা।

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

টীকা :—

৩০৩ **বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিল :—**

কোরআন মুছলমানকে সাধারণ সদ্ব্যয় ও ছাদকা জাকাত দান করিতে আদেশ দিয়াছে, সুদের ব্যবসায় হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। কোরআনের শিক্ষাফলে হজরতের সমসাময়িক মুছলমানগণ নানা প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া দেন. এই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ ও আত্মবিচ্ছেদের সৃষ্টি না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কোরআন কএকটা প্রাথমিক ও অতি-আবশ্যকীয় নিয়ম তাঁহাদিগকে শিখাইয়া দিতেছে। প্রথমে বলা হইতেছে যে, ধারে কাজ কারবার করিতে হইলে আদান প্রদানের সমস্ত শর্ত্ত ও চুক্তির মিয়াদ প্রভৃতি একখানা দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ধারের কাজ কারবার দুই প্রকারে হইতে পারে :—(১) ক্রেতা নিজের দেয় মূল্য নগদ শোধ করিয়া দিল, কিন্তু বিক্রেতা তাহার বিনিময়ে তখনই মাল সরবরাহ করিতে পারিল না—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই মাল সরবরাহ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। (২) বিক্রেতা মাল সরবরাহ করিল, কিন্তু খরিদার তাহার নগদ মূল্য দিতে পারিল না—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই মূল্য শোধ করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। আয়তে ইহাকেই ধারের কাজ কারবার বলা হইয়াছে এবং এই সকল চুক্তির সময় তৎসম্বন্ধে দলিল লিখিত পড়িত করিয়া নিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কতিপয় আলেমের মতে ঋণ আদান প্রদান করার সময় তাহার জন্য দলিল লেখা পড়া করার আদেশও এই আয়ত হইতে সূচিত হইতেছে।

৩০৪ **দলিলের লেখক :—**

ক্রেতা ও বিক্রেতা বাদে কোন একজন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ দলিল লিখিয়া দিবে। যাহারা লিখিতে জানে, ঐ প্রকার দলিল লিখিয়া দিতে তাহারা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আল্লাহ লেখকগণের প্রতি আদেশ করিতেছেন যে, তাহারা ন্যায্য ভাবে লিখিবে, কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবে না। আর সেই চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে মাল বা মূল্য পরিশোধ করিতে দায়ী হইবে যে ব্যক্তি, সেই-ই লেখককে dictate করিবে—দলিলের এবারৎ বলিয়া দিবে। ইহাতে দলিলের শর্ত্ত বা নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্যায় ওজর আপত্তি তোলা দেনাদারের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইবে না।

৩০৫ অভিভাবকের দ্বারা চুক্তি :—

যে সকল ব্যক্তি তাহার দেয় মাল বা মূল্য বাকি রাখিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছে, তাহাদের পক্ষে উপরিবর্ণিত রূপে দলিলের এবারৎ বলিয়া দেওয়া সকল সময় সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে যে, দেনাদার যদি নির্বোধ হয়, কিম্বা সে যদি শক্তিহীন হয়, অথবা নিজে দলিলের এবারৎ বলিয়া দেওয়ার (dictate করার) মত যোগ্যতা যদি তাহার না থাকে, তবে তাহার অভিভাবক তাহার হইয়া এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে। এখানে 'জইফ' বা শক্তিহীন অর্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অক্ষম বৃদ্ধকে বুঝাইতেছে।

৩০৬ সাক্ষী :—

অন্ততঃপক্ষে দুইজন সাক্ষী রাখার এই যে আদেশ, ইহা এই শ্রেণীর বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। কারণ এই বিষয়গুলি লইয়া গুরুতর বাদ বিতণ্ডা ও মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে। একজন পুরুষের পরিবর্ত্তে দুইজন স্ত্রীলোককে সাক্ষী করার আদেশও এইরূপ একটা বিশেষ ব্যবস্থা। বহু ক্ষেত্রে কেবল একজন সাক্ষীর, এমন কি একজন স্ত্রীলোক সাক্ষীর বয়ানের উপর নির্ভর করিয়াই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে বলিয়া বহু এমাম ও আলেম মত প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সচরাচরই যদি তাহাকে টানিয়া আনা ও বৈষয়িক ব্যাপারে বেষ্টিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সম্বলগুলির অপচয় ঘটিয়া যাইবে। দুই পক্ষে মতানৈক্য হইলেই সাক্ষীদিগকে প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। নারীর পক্ষে ইহা যে কতদূর অসম্মানকর ও অসুবিধাজনক, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এই জন্য নারীকে বিনা দরকারে এই শ্রেণীর ব্যাপারে লিপ্ত না করাই সঙ্গত। তবে দরকার হইলে তাহাদের সাক্ষী হওয়ায় বা সাক্ষ্য দেওয়ায় কোন ক্ষতি নাই—আয়তে তাহা স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নানা কারণে দুনয়ায় সাধারণতঃ নারীদিগের যে অবস্থা তখন ছিল এবং এখনও আছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া দুইজন নারীকে সাক্ষী করিতে বলা হইয়াছে। দুইজন রাখার তাৎপর্য্য কি, আয়তে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩০৭ সাক্ষীর কর্ত্তব্য :—

"সাক্ষীদিগকে যখন আহ্বান করা হয়"—অর্থাৎ তাহাদিগকে সাক্ষী হইতে বা সাক্ষ্য দিতে ডাকা হইলে, তাহাতে অস্বীকৃত হওয়া অন্যায়। ২৮৩ আয়তে সাক্ষ্য গোপন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বিচারস্থলে অনুপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য গোপন করা যায়, সাক্ষ্য দিবার সময় সমস্ত কথা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত না করিলেও সাক্ষ্য গোপন করা হয়।

৩০৮ দলিল লেখাপড়া করিবার ফল :—

আয়তের এই অংশে বিশেষ তাকিদের সহিত বলা হইতেছে যে, ধারের কারবার সংক্রান্ত সকল প্রকার চুক্তি লেখাপড়া করিয়া রাখা উচিত, ছোট ব্যাপার বলিয়া কোনটার দলিল করিতে অবহেলা করা সঙ্গত নহে। এই প্রকারে চুক্তিপত্র লেখাপড়া করিয়া লইলে মুছলমান বহু অন্যায় অনাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবে—স্বতরাং আল্লার নিকট ইহা অতি সঙ্গত। পক্ষান্তরে চুক্তির সময় কি কি শর্ত্ত হইয়াছিল, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করিয়া রাখা সাক্ষীদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। সেগুলি লেখাপড়া হইয়া থাকিলে দলিলের সহায়তায় সাক্ষীদিগের বর্ণনা নির্ভুল হয়, তাহাদের সাক্ষ্যের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। "ইহা সাক্ষ্যকে অতিশয় মজবুতকারী"—পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

৩০৯ নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা :—

এই আয়তে বলা হইতেছে যে, নগদ কারবারে দলিল না করিলে পক্ষদের উপর কোন পাপ বর্ত্তায় না। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে—(১) ধারের কারবারে দলিল লেখাপড়া না করিলে পাপের ভাগী হইতে হয়, (২) নগদ ক্রয় বিক্রয়েও দলিল করিয়া রাখা—অপরিহার্য্য না হইলেও—অভিপ্রেত। আজকাল নগদ খরিদ বিক্রয়ের জন্য নানা প্রকার রসীদের প্রচলন হইয়াছে, ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মরুভূমির "বর্ব্বর বেদুইন"-দিগকে কোরআন এসব বিষয়ে অভ্যস্ত করিয়াছিল।

৩১০ লেখক ও সাক্ষীর ক্ষতি :—

এই অংশে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এইরূপ করিলে নিজেদের প্রতিই অনাচার করা হইবে। লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় দুই প্রকারে :—(১) লেখক দলিল লিখিয়া দিতে, সাক্ষীরা সাক্ষী হইতে, এবং তাহারা উভয় আবশ্যকমত আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে কোরআনের নির্দ্দেশ মতে বাধ্য—এই অজুহাতে তাহাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করা, অথবা তাহাদের ক্ষতির পূরণ করিয়া না দেওয়া। ইহাতে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে

পারে। (২) লেখক বা সাক্ষী সত্য কথা বলিলে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের পরাজয়ের সমস্ত অভিমান, সমস্ত দ্বেষ ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয় সেই সত্যবাদী সাক্ষীদিগের উপর, এবং এজন্য অনেক সময় তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতে হয়। এইরূপে সৎ ও নিরীহ লোকেরা সাক্ষী হওয়ার নামে শিহরিয়া উঠিবে—সাক্ষী হওয়া ও সাক্ষ্য দেওয়া সমাজের দুষ্ট লোকদের একচেটিয়া পেশায় পরিণত হইবে, সত্য প্রকাশের সৎসাহস জাতির অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে—ফলে অনাচারে অত্যাচারে গোটা সমাজটাই জর্জ্জরিত হইয়া পড়িবে। মোছলেম বঙ্গের বর্ত্তমান পল্লী-চিত্রের প্রতি দৃষ্টিদানের সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়াছে, এই কঠোর সত্যটা তাঁহারা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

৩১১ **আল্লার শিক্ষা :—**

এছলামের শিক্ষা গুণে আরবদিগের গৃহযুদ্ধ ও লুটতরাজ স্থগিত হইল, সুদ খাওয়া ও জুয়া খেলা প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল, দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল। হজরত রছুলে করিমের আদর্শে ও কোরআনের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া তখন তাহারা ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এই সময় আল্লার আদেশ হইল, ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত দরকারী দলিল পত্রগুলি লিখিয়া রাখিতে। কিন্তু লেখাপড়ার চর্চ্চা তাহাদের মধ্যে খুব কমই ছিল। তখনকার ইতিহাসে মুছলমানদিগের মধ্যে দুই চারি জন মাত্র লেখকের নাম জানা যায়। কাজেই ব্যবসায়ের খাতিরেও তাহারা লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য হইল—দেখিতে দেখিতে লেখকের সংখ্যা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এইরূপে এই আদেশের কল্যাণে তাহারা যেমন একদিকে সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে শিক্ষালাভ করিল, অন্যদিকে লেখাপড়ার চর্চ্চাও তাহাদের মধ্যে হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল—এবং অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইতে না হইতে মরুভূমির সেই বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল ও নিরক্ষর আরব, ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞানে কর্ম্মে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হইল। সমস্ত আদেশ নিষেধের মধ্য দিয়া কোরআন মুছলমানকে ইহারই শিক্ষা দিয়াছে এবং ইহাই হইতেছে আল্লার শিক্ষা।

৩১২ **দখলী বন্ধক :—**

অর্থাৎ এ অবস্থায় কোন অস্থাবর পদার্থ বন্ধক স্বরূপ প্রাপকের নিকট জামিন রাখিতে হইবে। 'আয়তে প্রবাসের কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং বাড়ীতে থাকার সময় বন্ধক দেওয়া চলিতে পারে কিনা'—ইহা লইয়া অকারণে একটা দীর্ঘ আলোচনার সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'আয়তে প্রবাসের কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইলেও, ইহা প্রবাস-অপ্রবাস সকল অবস্থায় প্রতি সাধারণ ভাবে প্রযুজ্য হইবে।' হজরত রছুলে করিম মদিনার এহুদী মহাজনের নিকট নিজের বর্ম্ম বন্ধক রাখিয়া শস্য কর্জ্জ করিয়াছিলেন—এই হাদিছের দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ

করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এখানে এই আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণের দরকার আদৌ নাই। উল্লিখিত অবস্থায় প্রবাসে দেনদারগণ বন্ধক রাখিতে বাধ্য, অন্যত্র এই বাধ্যবাধকতা নাই—দেনাদার ইচ্ছা করিলে বন্ধক রাখিতে পারে, সুবিধা হইলে বন্ধক না রাখিয়াও কর্জ লইতে পারে। দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, এবং তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য একটুও নাই।

৩১৩ **আমানত বা বিশ্বস্ততা** :—

উপরে একটা সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে। এ আয়তে বলা হইতেছে যে, প্রাপক যদি দেনাদারকে বিশ্বস্ত মনে করে এবং সেই যদি বিশ্বাসের উপর ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে বন্ধক না রাখিলেও চলিতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় দেনাদার যদি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে তাহাকে আল্লার নিকট দণ্ডার্হ হইতে হইবে। শেষভাগে আল্লার সেই ন্যায়দণ্ড সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চত্বারিংশ রুকু'

আল্লাহ্ই একমাত্র মালেক ও সর্ব্বশক্তিমান

২৮৪ স্বর্গে ও মর্ত্তে যাহা কিছু আছে — সমস্তই আল্লার ; এবং তোমাদের মনে যাহা আছে, তোমরা তাহা প্রকাশ কর বা গোপন করিয়া রাখ, আল্লাহ্ তাহার নিকাশ তোমাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন ; অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দণ্ড দিবেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান।[৩১৪]

٢٨٤ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

২৮৫ নিজ-প্রভুর সন্নিধান হইতে তাহার নিকট যে সত্য সমাগত হইয়াছে - রছুল তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করে এবং মো'মেনগণও (বিশ্বাস করে) ;[৩১৫] তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে আর তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণে, তাঁহার (প্রেরিত) সমস্ত কেতাবে এবং তাঁহার সমস্ত রছুলগণে বিশ্বাস করে এবং তাহারা

٢٨٥ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ

مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ
اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ
اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে -) 'আমরা তাঁহার রছুলগণের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে প্রভেদ করি না"[৩১৬] — তাহারা আরও বলে, "শ্রবণ করিলাম ও অনুগত হইলাম, প্রভুহে ! (আমরা চাই) তোমার ক্ষমা, আর তোমারই পানে গতির চরম[৩১৭]।

٢٨٦ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ
عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ
اَخْطَاْنَا ط رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج
وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا قف
وَارْحَمْنَا قف اَنْتَ مَوْلٰنَا

২৮৬ কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ত্তব্য-পালনে বাধ্য করেন না ; নিজের অর্জ্জিত কুফল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে ;—"আমরা যদি ভুলিয়া যাই অথবা ভুল করিয়া বসি, প্রভুহে ! সেজন্য আমাদের (অপরাধ) ধরিও না, প্রভুহে ! আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে যে-রূপ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলে, আমাদিগকে সেরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করিও না,[৩১৮] প্রভুহে ! যাহা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নাই - এরূপ ভার বহনে আমাদিগকে বাধ্য করিও না, আমাদের পাপগুলি ক্ষমা কর ও আমাদের ত্রুটিগুলি আবৃত করিয়া দাও, এবং আমাদের

প্রতি দয়া কর—তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফেরজাতি সমূহের বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর[৩১১] !

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ع

টীকা :—

৩১৪ আল্লার শক্তি, জ্ঞান ও করুণা —

ছুরা-বকরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুছলমানকে আল্লার শক্তি, জ্ঞান ও করুণার সহিত পরিচিত করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই হইতেছে মোছলেম জীবনের চরম লক্ষ্য। এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ছুরায় কতকগুলি কঠোর সাধনার কথাও বলা হইয়াছে—যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া মুছলমান শ্রেষ্ঠতম মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারিবে। এই সাধনাগুলিই আদেশ, নিষেধ ও উপদেশরূপে ছুরার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। এখন উপসংহারে বলা হইতেছে যে, বিশ্বজগতে বিদ্যমান যাহা কিছু আছে, আল্লাহ হইতেছেন সে সমস্তেরই মালিক। ইহাদ্বারা তাওহীদের শিক্ষাকে মুছলমানের অন্তঃকরণে জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ইহার পূর্ব্বে এই ছুরায় তোমাদের প্রতি নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জেহাদ, নেকাহ, তালাক, সুদ ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে " منفعة الخلق " মানবের উপকার। আল্লাহ সে উপকারের ভাগী হন না, তাহার কোন দরকারও তাঁহার নাই। কারণ, তিনিই হইতেছেন বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক, আছমানে ও জমিনে যাহা কিছু আছে—সে সমস্তই তাঁহার অধিকৃত।

"তোমরা যাহা প্রকাশ কর বা গোপন করিয়া রাখ, আল্লাহ তাহার নিকাশ গ্রহণ করিবেন"—অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মনের সঙ্কল্প অনুসারে পুরস্কার বা দণ্ড লাভ করিবে। মানুষের মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক সময় নানাপ্রকার কুভাবের উদয় হয়, অথচ সে তাহাকে 'কু' বলিয়াই জানে, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করার কোন চেষ্টা বা সঙ্কল্পও তাহার থাকে না। আলোচ্য আয়তটী নাজেল হইলে কতিপয় ছাহাবা মনে করেন যে, ইহাতে এই শ্রেণীর কুভাবগুলির কথাই বলা হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং হজরতের খেদমতে নতজানু হইয়া নিবেদন করেন—মনের কুভাব নিবারণের সাধ্য'ত

আমাদের নাই, অথচ এই আয়তে জানা যাইতেছে যে, আল্লাহ এজন্য আমাদিগকে দণ্ডদান করিবেন! ইহার পর ২৮৬ আয়ত অবতীর্ণ হয়, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, আল্লাহ মানুষকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত আদেশ কখনই প্রদান করেন না। উপরের আয়তটার মর্ম্ম বুঝিতে তোমরা ভুল করিয়াছ।

অধিকাংশ তফছিরকারের মতে এই আয়তটী ২৮৬ আয়ত দ্বারা মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সমস্ত আলোচনার সার এই দাঁড়ায় যে, ২৮৬ আয়ত নাজেল হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আল্লাহ মানুষকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার বহনে বাধ্য করিতেন! কিন্তু ২৮৬ আয়ত নাজেল হওয়ার পর হইতে ব্যবস্থা হইল যে, কাজে পরিণত না করা পর্য্যন্ত মনের কোন পাপ, দুরভিসন্ধি বা মন্দ সঙ্কল্পের জন্য মানুষকে আর দণ্ড দেওয়া হইবে না। তফছিরকারগণের এই মন্তব্যটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রমাণিক, সুতরাং সর্ব্বতঃভাবে অগ্রাহ্য। কোরআন সর্ব্বপ্রথমে আল্লার বিশেষণ দিয়াছে রহমান ও রহিম বা করুণাময় কৃপানিধান বলিয়া। কিন্তু দুর্ব্বল বান্দার উপর তাহার শক্তির (যে শক্তি আবার তাঁহারই সৃষ্টি) অতিরিক্ত ভার চাপাইয়া দেয় যে প্রভু এবং তাহা বহন করিতে অসমর্থ হইয়াছে বলিয়া, বান্দাকে আবার দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হয় না যে মালিক, তাহা অপেক্ষা অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? তফছিকারদিগের কথা সত্য হইলে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ২৮৬ আয়ত নাজেল না হওয়া পর্য্যন্ত (মাআজাল্লাহ) আল্লাহতায়ালা বরাবরই এই অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছেন! অথচ ঐ ২৮৬ আয়তেই কোরআন এই ধারণার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে, আল্লাহ কখনও কাহাকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্টদান করেন না। পাঠক আরও ভাবিয়া দেখুন, কাজে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত মনের কোনও সঙ্কল্প বা অভিসন্ধির জন্য যদি মানুষ অপরাধী না হয়, তাহা হইলে বহু মহাপাতকী দণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবে, শেক বেদআতের আকিদাগুলিও তাহা হইলে অনেক সময় নির্দ্দোষ হইয়া দাঁড়াইবে! সুখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল তফছিরকারগণ এই সব উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন (কবির ২—৫৬১)।

৩১৫ **আত্মসত্যে দৃঢ় বিশ্বাস :—**

আত্মসত্যে দৃঢ় প্রত্যয় যাহাদের না থাকে, কোন সাধনায়, জীবন-সংগ্রামের কোন স্তরে, কোন প্রকার সফলতা লাভ তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। হজরত রছুলে করিম ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ এছলামের সত্যতায় কিরূপ বিশ্বাস করিতেন—তাঁহারা আল্লার উপর কিরূপ নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এছলামের প্রাথমিক ইতিহাস তাহার অসংখ্য অনুপম নিদর্শনে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। মোস্তফা-চরিতে তাহার একটু আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি।

৩১৬ রছুলগণের মধ্যে প্রভেদ নাই :—

২৫৩ আয়তের টীকায় এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

৩১৭ গতির চরম :—

মূলে 'মছির' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার ধাতুগত অর্থ—এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় অন্তরিত হওয়া এবং এইরূপে চরম গম্যস্থানে উপনীত হওয়া। জলধারাগুলি অবশেষে যে-স্থানে গিয়া সমবেত হয়, তাহাকে 'মছির' বলা হয় (রাগেব, কামুছ)। মানুষের জীবন ধারারও শেষ গম্য হইতেছেন সেই আল্লাহ। মানুষ আল্লার বাণীগুলি কেবল শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, বরং তাহার জীবনধারার গতিপথ সর্ব্বতঃভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে সেই বাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে। কারণ মানুষের সমস্ত গতির চরম লক্ষ্য হইতেছেন— সেই বাণীর প্রকাশক আল্লাহ। তিনিই যাত্রার সাথী ও যাত্রাপথের আলোক। তাঁহার বাণীকে অমান্য করিলে সেই আলোককেই অস্বীকার করা হয়, যাত্রাপথকে দুর্গম করিয়া লওয়া হয়।

৩১৮ মানুষের কর্ম্মফল তাহারই অর্জ্জিত :—

এই আয়তে প্রথমে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ মানুষকে তাহার সাধ্যাতীত কোন কর্ত্তব্যপালনের আদেশ প্রদান করেন না। তাহার পরই বলা হইতেছে—সে পুরস্কার লাভ করিবে নিজেরই অর্জ্জিত সৎকর্ম্মের জন্য, এবং পক্ষান্তরে সে দণ্ডভোগও করিবে নিজেরই অর্জ্জিত দুষ্কর্ম্মের ফলে। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে, কে কি পাপ বা পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করিবে, মানব জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহতাআলা স্বয়ং তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, এই নির্দ্ধারণের নামই তাঁহাদের পরিভাষায় তক্‌দির। তক্‌দির আল্লার অলঙ্ঘ্য আদেশ, সুতরাং তাহার অন্যথা করা মানুষের অসাধ্য। অতএব পৌত্তলিক প্রতিমা পূজা করিতেছে, ব্যভিচারী পরস্ত্রী হরণ করিতেছে, গুপ্তঘাতক নরহত্যা করিতেছে—আল্লারই এই অলঙ্ঘ্য আদেশে বাধ্য হইয়া, ইহার অন্যথা করার একবিন্দু শক্তিও মানুষের নাই। অথচ এই সকল কুকর্ম্মের জন্য আল্লাহ আবার এই হতভাগা মানুষগুলির প্রতি কঠোরতর নরক দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন! পুণ্যকর্ম্ম ও তাহার পুরস্কার সম্বন্ধেও এই কথা। আলোচ্য আয়তে অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় এই ধারণার প্রতিবাদ করা হইতেছে। তক্‌দির সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার উপর বিশ্বাস করিতে হইলে, স্বতই প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, আল্লাহতাআলা একদিকে মানুষকে পাপাচার করিতে বাধ্য করিয়া এবং অন্যদিকে তাহাকে সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকার আদেশ দিয়া, তাহাকে অসাধ্য সাধনেরই হুকুম দিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি যে চরম অত্যাচারী, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে সপ্রমাণ হইয়া যাইবে। এই ধারণার প্রতিবাদ করার জন্যই আয়তে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ মানুষকে অসাধ্য সাধনের

আদেশ কখনই প্রদান করেন না। তিনি অকারণে কাহাকে পুরস্কৃত বা বিনা কারণে কাহাকে দণ্ডিতও করেন না। মানুষের সমস্ত দণ্ড ও পুরস্কার তাহার স্বহস্ত অর্জ্জিত কর্ম্মেরই স্বাভাবিক ফল।

৩১৯ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া :—

মূলে 'এছ্‌র' اصر -শব্দ আছে, সাধারণতঃ উহার অর্থ করা হয়—গুরুভার ও দুর্ব্বহ বোঝা বলিয়া। কোন কোন অভিধানকারও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাগেব বলিতেছেন, 'উহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে কোন বস্তুকে বন্ধন করা, বলপূর্ব্বক আটক করিয়া রাখা।' ইহা হইতে গৌণার্থে প্রতিজ্ঞাকেও 'এছর' বলা হয়, কারণ মানুষ ইহাতে প্রতিশ্রুতি সূত্রে আবদ্ধ হয়। اخذتم على ذلكم اصري (৩-৮০) পদে এছর শব্দ শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুরা আ'রাফের ১৫৭ আয়তেও এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রাগেব বলিতেছেন, সেখানেও উহার অর্থ বন্ধন। "আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী" বলিতে বানি-এছরাইলকে বুঝাইতেছে। তাহারা পরজাতির দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে তাহাদের জাতীয় জীবন কলুষিত ও নানা অভিশাপে পূর্ণ হইয়া যায়। পরজাতির অত্যাচারে তাহারা একেবারে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এছলাম মানব-মুক্তির ধর্ম্ম, মুক্ত-মানবের ধর্ম্ম। গোলামীর লা'নতের এবং পরাধীনতার অভিশাপের মধ্যে তাহার সত্য সুন্দর রূপের প্রকাশ হইতে পারে না। ছুরা বকরের প্রধান আদর্শ হইতেছে—শক্ত সম্পন্ন, শুদ্ধ বুদ্ধ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্ববিজয়ী সর্ব্বসমন্বয়ী এক বিরাট বিশ্বব্যাপী মোছলেম সংহতি। কিন্তু পরজাতির অধীনতার সংস্পর্শে মোছলেম-জীবনের এ আদর্শ সাধন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তাই তাহাকে ছুরার উপসংহারে প্রার্থনা করিতে শিখান হইতেছে—প্রভুহে! এহুদীদিগের ন্যায়, আমাদিগকে যেন পরজাতির অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিও না।

৩২০ প্রার্থনা :—

মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও নিজের জীবনকে দোষত্রুটী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া লইতে পারে না। তাই ভক্ত সাধক সকল কর্ম্মের শেষে আত্মসমর্পণ করিতেছে তাহার প্রেমময় কৃপানিধান প্রভুর উপর, এবং নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিতেছে—প্রভুহে! দাসের অপরাধগুলি ক্ষমা কর, তোমার করুণা সেগুলিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলুক! তাহার পর বান্দার শেষ কথা, শেষ দাবী, শেষ আবদার, শেষ প্রার্থনা—বন্ধুহে "দয়া কর!" কারণ তুমি যে আমার বন্ধু, তুমিই যে আমার দয়াময় অভিভাবক—আল্লাহ! বান্দার নিকট দয়াল নামেই ত তুমি সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ, তোমার দয়াই ত তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল।

কাফের জাতিসমূহ পৌত্তলিকতার অভিশাপে আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের মাথা হেট করিয়া দিয়াছে, ধর্ম্মের নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া বিশ্বমানবকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের

রক্তলোলুপ করিয়া তুলিয়াছে। তাই তাহারা আজ দুনয়ার একমাত্র সর্ব্বসমন্বয়ী বিশ্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বাহকগণকে বিধ্বস্ত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে এবং পরোক্ষভাবে নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিতেছে। ইহাদিগের অসাধু ও অন্যায় প্রচেষ্টাগুলির বিরুদ্ধে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে সাহায্য কর, এছলামকে ও তাহার বাহক মুছলমানকে সফল কর—জয়যুক্ত কর!—আমীন!

সমস্ত কাফের জাতির উপর সকল দিক দিয়া সর্ব্বতঃভাবে জয়যুক্ত হওয়ার যে সাধনা, এক কথায় তাহারই নাম এছলাম। ইহাই মুছলমানের সাধ্য, ইহাই মুছলমানের কর্ম্ম, এবং ইহাই মুছলমানের ধর্ম্ম।

— ছুরা বকরা সমাপ্ত —

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব প্রণীত

“মোস্তফা-চরিত” ও “আমপারা”

—প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিমত—

"মোস্তফা-চরিত" সম্বন্ধে বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও মনীষীবৃন্দ কি বলেন দেখুন ঃ—

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র "দি মুসলমান" এর প্রবীণ সম্পাদক মওলবী মুজিবর রহমান সাহেব বলেন :—"মওলানা আকরম খাঁর এই গ্রন্থ মওলানা শিবলীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (সিরতন্-নবী) অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হইয়াছে।.........তিনি (মওলানা আকরম খাঁ সাহেব) হজরতের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ঘটনাকে কোরআন এবং হাদিসের উক্তি সমূহের সহিত কঠোর সমালোচনামূলক তুলনার অগ্নি-পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।.........আমরা আজ এমন একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ লাভ করিয়াছি,—যাহা সম্পূর্ণতা, ব্যাপকতা এবং ভ্রান্তিহীনতার দিক দিয়া বিশ্বের যে কোন ভাষায় লিখিত হজরতের শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থের সহিত তুলিত হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।"

মোসলেম-বঙ্গের গৌরব, বহু ভাষাবিদ, অধ্যাপক ডাক্তার মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এম, এ, বি, এল, ডি, লিট লিখিয়াছেন :—"আপনি পূর্ব্ববর্ত্তীগণের পুচ্ছগ্রাহিতা ত্যাগ করিয়া সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদে পদে গবেষণা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার "মোস্তফা-চরিত" হজরতের সমস্ত জীবন-চরিতের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া মনে করি।...... আপনার এই দানের জন্য বাঙ্গালী মুসলমান ধন্য হইয়াছে। আপনার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে।"

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর, নিঃস্বার্থ স্বদেশ-সেবক, হাজী পীর বাদশা মিঞা সাহেব বলেন :—"আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, বাঙ্গলা ভাষায় এমন কি উর্দ্দু ভাষায়ও কোরান, বিশ্বস্ত হাদিস ও তফসিরের অবলম্বনে লিখিত এরূপ পুস্তক আর নাই।"

স্বনামধন্য অধ্যাপক মনীষী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—......সাহিত্য হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মওলানা আকরম খাঁর "মোস্তফা-চরিত।"......যদি বলি যে "মোস্তফা-চরিত" বাংলা ভাষায় লিখিত চরিত-কাহিনী সমূহের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক, তাহা হইলে কিছুই বলা হইল না, বুঝিতে হইবে। এরূপ Critical এবং well-documented biogra-

phy জগতের যে কোন সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। দুঃখের বিষয় এমন অমূল্য গ্রন্থেরও শিক্ষিত হিন্দু সমাজে তেমন আদর নাই। নানা কারণে ইহা যারপর নাই পরিতাপ ও ক্ষোভের কথা। আমরা মুখে কেবল হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বলি। শুধু মুখে বলি তাহা নহে—এটা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার মত খাঁটী কথা যে, হিন্দু মুসলমানের প্রীতি ব্যাতিরেকে বাংলাদেশের তথা, ভারতবর্ষের গতি নাই,—গতি নাই,—গতি নাই। কিন্তু এই ঐক্য, সম্প্রীতি আসিবে কোথা হইতে? খালি Politics হইতে ইহা আসিতেই পারে না; কারণ Politics দ্বন্দ্বের স্থান; সেখানে Right, Privilege, অধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি, ভাগ বাটোয়ারার কথা প্রতি পলে উত্থিত হয়।......হিন্দু বলিতে পারেন,—মুসলমান মত, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভাবচিন্তার ধারা জানিব কি প্রকারে? মুসলমান বাংলা সাহিত্যের তেমন আলোচনা করেন না, বা বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস প্রচার করার চেষ্টা করেন না। এতদিন এ কথা বলা চলিত, কিন্তু আর তাহা বলা চলে না। মওলানা আকরম খাঁর দুইখানি পুস্তক মোস্তফা-চরিত" ও "সমস্যা" এই অভাব পূরণ করিয়াছে।"

কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সভাপতি, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী সাহেব Bar-at-law, ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "সাহিত্যিকে" এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন আমাদের মহানবীর ঘটনা বহুল জীবনকে সাহিত্যের সূক্ষ্ম তুলিকায় প্রতিফলিত করা বড় সহজ কাজ নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন। এটি আমাদের কম গৌরবের কথা নয় যে, **আমাদের একজন বাঙ্গালী মুসলমান এ বিষয়ে যথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যা আমরা কল্পনাও করিতে সাহস করিনি, তাই তিনি বাস্তবে পরিণত করিয়ে দেখিয়েছেন।** তাঁর এই গ্রন্থ পড়্‌তে পড়্‌তে আমরা একেবারে তন্ময় হয়ে যাই;—পারিপার্শ্বিক জীবনের কথা আমরা একেবারে ভুলে যাই;—দেশ, কাল এবং সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করে আমরা সাফা আর মারওয়ার পাহাড়তলীতে উপস্থিত হই। আর সেই 'সরওয়ারে কায়েনাতের' দিদার লাভ ক'রে প্রকৃতই ধন্য হই। আর যে শক্তিশালী লেখকের উছিলায় আমরা এই একবাল লাভ করি, তাঁকে তখন "মারহাবা" না বলে থাকতে পারি না।

"পুস্তকের বর্ণনা কতদূর সুন্দর হ'য়েছে, পাঠক নিম্নে উদ্ধৃত এবারত থেকেই তার বিচার করুন। হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ ইস্‌লামের একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। মওলানা সাহেব এই ঘটনাটীর বয়ান এই ভাবে করেছেন :—

—"ওমর কোরেশ বংশজাত প্রথিতনামা বীর। তাঁহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, তেজোদৃপ্ত নয়ন যুগল, উজ্জ্বল লোহিতাভ দেহকান্তি, সুগভীর কন্ঠ ... ... বিবিধ শৌর্য্যবীর্য্যের সহিত মিলিয়া তাঁহার নামে বিশেষ গুরুত্বের

সৃষ্টি করিয়াছিল। ওমর পূর্ব্বে ইছলামের যে ঘোর শত্রুতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এহেন ওমর বামদেশে দীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত করতঃ আকরমের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। হজরত আবুবকর, হামজা, আলী প্রভৃতি সকলেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন ছাহাবী ছিদ্র পথ হইতে দেখিলেন ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ওমরকে এই অবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া হজরতকে বলিলেন—"খাত্তাবের পুত্র ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।" বীরবর আমির হামজা উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন,—তাহাতে কি ?—আসিতে দাও।

গর আজ্ রাহে-সেদ্ক আমাদা মারহাবা,
ওগার বাশাদ্ উরা বা খাতের দগা।
বা তেগে কে দারাদ্ হামায়েল ওমর,
তনাশ রা সোবক্ সার সাজম্ জে সর্।

'যদি সদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন, মারহাবা, আসুন! অন্যথায় তাঁহারই তরবারী দ্বারা তাঁহার মুণ্ডপাত করিব।' কিন্তু ইহাতে হজরত একটুও বিচলিত হইলেন না,—ওমর কি করিতে পারে? তাঁহার রক্ষক সর্ব্বশক্তিমান প্রভু—যে তাঁহার সঙ্গে আছেন। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, আসিতে দাও।

ওমর গৃহে প্রবেশ করিলে, হজরত তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সবলে ঝটকা দিয়া বলিলেন—'আর কতদিন, ওমর! আর কতদিন সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে?' লজ্জিত অনুতপ্ত ওমর, ভক্তি-গদ্-গদ্-কণ্ঠে উত্তর করিলেন—'মহাত্মন্! আমি সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যই আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। মোস্তফা-চরণের দাসানুদাস ওমর আজ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতেছে যে, সেই এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না, এবং মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রছুল।'

অনুতাপ, ভক্তি ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে "কলেমা" পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে আল্লার নামের জয়গান শ্রবণ করিয়া হজরত উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিলেন—"আল্লাহো-আকবর"। উন্মুক্ত প্রান্তর পার হইয়া কাবার প্রান্তর-প্রাচীরকে কাঁপাইয়া সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল—"আল্লাহো-আকবর।"

বলুন দেখি, পাঠক! সমস্ত ঘটনাটী কি আপনার চোখের সামনে আলোক-চিত্রের মত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে না? ঘটনার এই জলন্ত বর্ণনা-সমাবেশে গ্রন্থখানি যেন অপূর্ব্ব সঞ্জীবতা লাভ ক'রেছে যার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মৃত প্রাণও সজীব

گر از راه صدق آمده مرحبا !
وگر باشد او را بخاطر دغا
به تیغ که دارد حمایل عمر
تنش را سبکسار سازم ز سر

হ'য়ে উঠে। যে বাঙ্গালী মুসলমান এই গ্রন্থ পড়েন নি, তিনি প্রকৃতই এক মুসলমান সাহিত্য-রস থেকে বঞ্চিত আছেন।

"মোস্তফা-চরিত" কেবল হজরতের জীবন-কাহিনী নয়। আরবের সেই অভূতপূর্ব্ব, চিরস্মরণীয় যুগটী লেখকের সুনিপুণ লেখনীর স্পর্শে, জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আমরা কেবল আজ হজরতকেই দেখি না; উভয় দলেরই প্রথিতনামা ধুরন্ধরদিগকে আমরা জীবন্ত, মূর্ত্ত অবস্থায় দেখিতে পাই। কখনও আমরা দেখি,—দুষ্ট আবু জেহেল তার কুটিল চক্ষু পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কখনও দেখি আবুসুফিয়ান ভীত, শঙ্কিত পাদক্ষেপে শিবির থেকে শিবিরান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটাছুটি ক'রছে। পক্ষান্তরে আবার কখনও কোরেশ-শ্রেষ্ঠ আবুতালেবের ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাদের কাণে বজ্র নির্ঘোষের মত বেজে উঠে, কখনও আমির হামজার তল্‌ওয়ারের দ্যুতি আমাদের চোখ ঝল্‌সে দেয়,—আবার কখনও বীরকেশরী [illegible] আমাদের শরীরকে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে।

সেই প্রাতঃস্মরণীয় মোসলেম মোহাজের ও আনসারগণ আমাদের মানসপটে আমাদেরই নিকটতম আত্মীয় অন্তরঙ্গদের মত বীরদর্পে, উন্নত মস্তকে, ভীতিশূন্য হৃদয়ে পাদচারণা করিতে থাকেন। তাঁদের জ্বলন্ত তেজ, তাঁদের অটল অচল ঈমান, তাঁদের আত্মত্যাগের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই দুর্ব্বল প্রাণের মধ্যেও সংক্রামিত হ'য়ে উঠে। আপনা থেকেই আমরা তখন তাঁদের সঙ্গে সমস্বরে চীৎকার করে উঠি—"আল্লাহো আকবর!"—"আল্লাহো-আকবর!"—"লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদোর রসুলুল্লাহ।"

"ভারতবর্ষ" বলেন:—"হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পবিত্র জীবন-চরিত ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আরও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই মোস্তফা-চরিতের ন্যায় সুবৃহৎ পুস্তক আর বাহির হয় নাই। এই আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকেও মোস্তফার জীবন কথা শেষ হয় নাই—আরম্ভ হয় নাই বলিলেই ঠিক হয়; ইহা মাত্র উপক্রম ও ইতিহাস বিভাগ; পরবর্ত্তী গ্রন্থে জীবন-কথা বিবৃত হইবে বলিয়া খ্যাতনামা সুধী গ্রন্থকার আশা দিয়াছেন। গতানুগতিক ভাবে হজরত মোহাম্মদের জীবন-কথার আলোচনা না করিয়া শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; প্রমাণ ও যুক্তিকে মূল ভিত্তি করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত। সুপণ্ডিত [illegible] গ্রন্থকারের নিকট আমরা ইহাই আশা করি। এই গ্রন্থের ভাষা এমন সুন্দর, লিপি-কুশলতা এমন প্রকৃষ্ট ও যুক্তি-পরম্পরা এমন সুসংবদ্ধ যে, আমরা গ্রন্থকার মহোদয়কে [illegible]চে বলিতে পারি, তাঁহার সুদীর্ঘ কালের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রকার একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। শ্রীযুক্ত আকরম খাঁ মহোদয় সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। এ জন্য তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন। (১৬শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা—আশ্বিন; ১৩৩৫ সাল)।

"আমপারা" সম্বন্ধে মনীষীবৃন্দ ও বিশিষ্ট সংবাদপত্র কি বলেন দেখুন ঃ—

বঙ্গের গৌরব অক্লান্ত কর্ম্মবীর, সর্ব্বজন-বিদিত **আচার্য্য সার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কে, টি** বলেন ঃ—"আপনার উপহার প্রদত্ত 'কোর-আন শরীফ আমপারা' সাদরে গ্রহণ করিলাম। বলা বাহুল্য, **আমি ইহার প্রতি ছত্র যত্নের সহিত পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।** এই যে, "কারাগারের সওগাত" ইহা পড়িয়া John Banyan-এর Pilgr im's Progress-এর কথা মনে পড়ে। তিনিও কারাগৃহে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। এতদিন আমরা Stanley Lanepool প্রভৃতির নিকট হইতে এসলাম ধর্ম্মের তথ্য অবগত হইতাম। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত মোসলমানগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। টীকা ও অনুবাদের ভাষা যেমন সরল ও প্রাঞ্জল তেমনই মোলায়েম। আমরা বাল্যকালে "মুসলমানী বাংলায় লিখিত "চাহার দরবেশ" প্রভৃতি পড়িতাম। কিন্তু আজকাল আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ যেরূপ সুন্দর বাংলা লেখেন, তাহাতে আমাদের অবনত মস্তক হইতে হয়। ইহার মধ্যে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দুইটী স্থানে আমার মন আকৃষ্ট হইল, যথা—"আবেদের এবাদৎ ও রেয়াজত এবং সাধকের তপস্যা ও সাধনা······আর বিশ্ব-চরাচর কোন এক স্বর্গীয় ভাবের আবেশে······ছুটিয়া চলিয়াছে" (পৃঃ ৬৩)। পুনশ্চ,—"কৈশোরে, যৌবনে তুমি কপর্দ্দকহীন কাঙাল ছিলে······যে মহাসম্পদ তুমি লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার বক্ষের ধন নহে······বিলাইয়া দাও তাহা অভাব জর্জ্জরিত বিশ্ব-মানবকে" (২৭৮ পৃঃ)। ফল কথা, বাংলা সাহিত্যকে আপনি এক অপূর্ব্ব উপহার প্রদান করিলেন। আমার মনে হয়, **প্রত্যেক হিন্দু পাঠশালায় মোসলেম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাপস ও সাধুদিগের জীবনী ও উক্তি পড়ান উচিত।** ইহাই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রধান সহায়ক হইবে, আমার এইরূপ ধারণা।"

বাংলার বিখ্যাত নেতা ও কর্ম্মী **মওলানা পীর বাদ্‌শা মিঞা সাহেব** ৪ঠা পৌষ (১৩৩০ সাল) তারিখের একখানি পত্রে লিখিয়াছেন ঃ—"আপনার 'আমপারার' বঙ্গানুবাদ পড়িয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। অনুবাদ ও টীকার ভাষা অতি মধুর হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর হইয়াছে। আমি আশা করি, বাঙ্গলার প্রত্যেক মুসলমান ইহার এক একখানা ক্রয় করিয়া **ও পাঠ করিয়া কোর্-আন পাকের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং প্রত্যেক নামাজে যাহা পাঠ করেন, তাহার অর্থ বুঝিয়া এবাদত করিতে সক্ষম হইবেন।** আমি আশা করি, বাঙ্গলার অমুসলমান ভাইগণও ইহা পাঠ করিয়া এসলামের মহিমা জানিতে অমনোযোগী হইবেন না। আমি ফকির, খোদাতালার দরবারে এই মোনাজাত করি,—দয়াময় আপনার এসলামের খেদমতে নেক-বদলা এনায়েত করুন। আমি ইহার বহুল প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

"দৈনিক বসুমতী" বলেন :—……"মহাগ্রন্থ কোর-আনে ভাষার ও ভাবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার সঠিক ভাব বজায় রাখিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ইহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। **এমন কি তিনি ব্যতীত অন্যের দ্বারা এরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।** বাংলার মোসলমানের সংখ্যা কম নহে, এবং পবিত্র কোরআনের এই অনুবাদও তাঁহাদের পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। **বাংলার অন্য ধর্ম্মাবলম্বীও ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।"**

"আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন :—……"মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফ 'আমপারার' অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাব ও ভাষার সরলতা, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ……য়।… যাঁহারা ভাল আরবী জানেন না, তাঁহারাই কেবল এই 'আমপারা' পড়িয়াই কোরআনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক সুরার অনুবাদ, ভাবার্থ ও …… হইয়াছে। **হিন্দু মুসলমান সকলেই পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত …… তাহা বলাই বাহুল্য।** …… ছাপা কাগজ ও বাধাই উত্তম।"

"……বাসী" বলেন :—……"মহাগ্রন্থ কোর-আন শরিফ ৩০ ভাগে বিভক্ত। …… ৩০ ভাগের শেষ ভাগ।……আরবী শব্দের পাশাপাশি ইহার বাংলা অনুবাদ …… পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।……প্রত্যেক দিন পাঁচবার নামাজের সময় ……গণ আমপারার সুরা পড়িয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোসলমান আরবী ভাষায় …… বলিয়া সুরার ভাব ও মর্ম্ম অনুভব করিতে পারেন না। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, ……ঞ মোসলমানগণ (যাঁহাদের সংখ্যা বাংলায় খুব বেশী) ইসলাম ধর্ম্মের শিক্ষা ও সার বুঝিতে ……রেন না। এই আমপারাখানি বাংলার মোসলমানের সে অভাব দূর করিবে।……ইহা **হিন্দু-মোসলমান উভয় সম্প্রদায় সমাদরে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"**

"……ফরওয়ার্ড" বলেন :—……This is a Bengalee translation of Ampara or the last Chapter of the Holy Qoran…… The Mou…… Sahib has further embellished his translation with illuminative commentaries that render it easier even for a non-Muslim to grasp and apprecia…… the beauties of the Holy Scriptures of our Mohammedan fellow-countrymen ..The teachings of the Qoran are now accessible to the vast majority of our countrymen ; whose ignorance of Arabic had……stood in the …… of their deriving instruction and inspiration from the Holy Book…

…… ABDULLAH SUHRAWARDY M.A. **Bar-at-law, ph. D. L. …… Litt, M. L. A** writes……"In my opinion the most commendable …… of the work is the *B H A B A R T H A*. It is the soul of the …… dealt with and couched as it is in a rapt, devotional and poetical style appeals to the spiritual sense of the reader…… *I commend this "present from the prison" to the acceptance of the …… and cultered youth……*

সুবিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক "দি মুসলমান" বলিতেছেন :—